একালের ধনদৌলত
ও
অর্থশাস্ত্র

"বাড়্‌তির পথে বাঙালী"-প্রণেতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক

এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৯৩৫

মূল্য ৪৲

"কাশী-বিদ্যাপীঠ"-প্রতিষ্ঠাতা

স্বদেশ-সেবক

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত

"ভাইয়া"র

করকমলে

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

দ্বিতীয় ভাগ

ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা

ভূমিকা

"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" বইয়ের প্রথম ভাগে আছে "নয়া সম্পদের আকার-প্রকার"। দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইল "ধন-বিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা"। প্রথম ভাগ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া গঠিত। দ্বিতীয় খণ্ডের মাল জ্ঞানকাণ্ড বা "তত্ত্বাংশ" (থিয়োরি)। কোন্ কোন্ প্রণালীতে একালের দুনিয়া সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে তাহার বৃত্তান্ত প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয়। আর একালের দুনিয়া ধনদৌলত, সম্পদবৃদ্ধি, টাকাকড়ি, আথিক উন্নতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কিরূপ "চিন্তা" করিয়া থাকে, কোন্-কোন্ ঢঙের "মত" প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত তাহার বৃত্তান্তের জন্য দ্বিতীয় ভাগের জন্ম।

অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগ একমাত্র চিন্তাপ্রণালীর কথা, গবেষণার কথা, গবেষণা-প্রণালীর কথা, মতামতের কথা, আদর্শের কথা, এক কথায় সাহিত্যের কথা ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই বইটার ভিতর আছে প্রথমতঃ কতকগুলা অর্থনৈতিক বইয়ের নাম। দ্বিতীয়তঃ আছে কতকগুলা অর্থনৈতিক পত্রিকার নাম। আর তৃতীয়তঃ গুঁজিয়া দিয়াছি এই সকল বই ও পত্রিকার জন্মদাতা লেখক-দের নাম। একালের ধনবিজ্ঞান-সেবকদের মগজের খুলিটা খুলিয়া ধরিয়াছি। অর্থশাস্ত্রীদের মুড়োর ভিতর কিরূপ "ঘী", খেয়াল, লক্ষ্য, চিন্তার পোকা, লেখাপড়ার মজ্জি ইত্যাদি চিজ্ কিল্‌বিল্ করিয়া থাকে তাহার সঙ্গে মোলাকাৎ হইবে এই ভাগে।

একালের ধনবিজ্ঞান বহরে বিশ্বকোষ বিশেষ। তাহার একটা চলন-

সই খতিয়ান করিতে হইলে বর্ত্তমান বইয়ের আকারের অন্ততঃ পাঁচখানা বই আবশ্যক। অতদূর লম্বা পাড়ি দিবার জন্য "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" সুরু করা হয় নাই। এই বইয়ের মতলব কতকগুলা হদিশ জোগানো মাত্র। যুবক বাঙ্‌লার জন্য ঠারে-ঠোরে আর্থিক উন্নতির পথ বাৎলানো, বাঙালী জাতিকে ধনবিজ্ঞানের দুনিয়ায় "লেখক"রূপে দেখা দিবার জন্য উৎসাহ জোগানো, আর বাঙালী ধনবিজ্ঞান-গবেষকদের ভিতর দুনিয়ার হোমরা-চোমরা এবং রামা-শ্যামাগুলার সঙ্গে দহরম-মহরম চালাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগানো ছাড়া এই বইয়ের আর কোনো উদ্দেশ্য নাই। অন্যান্য বিদ্যার মতন ধন-বিজ্ঞানবিদ্যার কোঠেও এই লেখক মামুলি বঙ্গ-সেবক মাত্র।

কাজেই অনেক-কিছু—বই, পত্রিকা ও লোক—বাদ দিতে হইয়াছে। যে সকল বই, পত্রিকা ও লোক বাঙালী সুধী-মহলে সুপরিচিত থাকিবার সম্ভাবনা সেই সব লইয়া সময় কাটানো হইয়াছে অল্প মাত্র। ফলতঃ ঘটনাচক্রে ইংরেজি ভাষার নজির লওয়া হইয়াছে কম। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় যে সকল তথ্য ও চিন্তা প্রকাশিত হয় সেই সবের দিকে নজর গিয়াছে বেশী। রুশ ভাষা জানা নাই। কাজেই রুশ তথ্য ও চিন্তার জন্য দলিল ব্যবহার করিয়াছি ফরাসী ও জার্ম্মাণ। জাপানী ভাষাও জানি না। এই জন্য জাপান সম্বন্ধে প্রমাণপঞ্জী লইয়াছি জার্ম্মাণ ও ইংরেজি। মার্কিণ ও বৃটিশ বই, পত্রিকা আর লোক সম্বন্ধে রচনা না থাকিলে একালের বাঙালী-লিখিত বই অসম্পূর্ণ থাকিত। এই অঙ্গহানি যাহাতে না ঘটে তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছি। বইটা সবই "একাল" সম্বন্ধীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তার ধারা দেখাইবার জন্য এখানে-ওখানে-সেখানে "সেকাল"কেও উঁকিঝুঁকি মারিবার সুযোগ দিয়াছি।

এই অধমের হাতে হরেক রকম বই বাহির হইয়াছে বটে। কিন্তু দেশের জন্য যখন যেমন কর্ত্তব্য চোখের সাম্‌নে আসে তখন সেটা করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। বৎসর ত্রিশেক ধরিয়া এইরূপই "বিধির লিখন" দেখা যাইতেছে। ১৯২৫ সনের শেষাশেষি দেশে ফিরিবার পর যতগুলা কাজ দেশের জন্য করা নেহাৎ জরুরি মনে হইয়াছিল তাহার ভিতর "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থের দুই ভাগ রচনা করা অন্যতম। কাজেই এই বইয়ের ভিতর "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" মাঝে-মাঝে শুনিতে পাওয়া যাইবে। আর লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকদিগকে আসরে নামাইবার বাতিক যখন-তখন মালুম হইবে। এই সূত্রে কিছু-কিছু "ঘরোআ" কথাও আসিয়া জুটিয়াছে।

কোনো ভারতসন্তানের হাতে ইংরেজিতে অথবা ভারতীয় ভাষায় এই ধরণের বই বাহির হইয়াছে কি না জানি না। বিদেশী লেখকদের ভিতর ইতালিয়ান কস্‌সা ও তিভারণি, ফরাসী বুস্কে, জিদ্‌ ও রিস্ত্‌, জার্ম্মাণ স্পান্‌, শুম্পেটার, মোম্বার্ট্‌ ও জালিন, ইংরেজ অ্যাশ্‌লে, প্রাইস্‌, বোনার ও কেনান, মার্কিণ হেণী ও হোমান, হাঙ্গারিয়াণ স্থরাণী-উঙ্গার ইত্যাদি সুধীগণ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ গ্রন্থকারদের বইয়ে সাধারণতঃ অন্‌-ইংরেজ অর্থশাস্ত্রীদের নাম-কাম দেখা যায় না। যাহা হউক এই সকল ইয়োরামেরিকান লেখকদের রচনাবলীর সঙ্গে বর্ত্তমান গ্রন্থের তুলনা করিলে বাঙালীর মেজাজটা কিছু-কিছু ধরিতে পারা যাইবে। কোন্‌ উপলক্ষ্যে, কোথায়, কতখানি এবং কিরূপ মাল ঢুকানো হইয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য এইরূপ তুলনা চালানো আবশ্যক হইতে পারে। ইহাতে পরবর্ত্তী বাঙালী ও ভারতীয় লেখকদের কিছু হদিশ জুটিবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু দেশ-বিদেশের ধনবিজ্ঞান-সেবীরা প্রত্যেকে কত

"বিভিন্ন" চিন্তাক্ষেত্রে এক-সঙ্গে কলম চালাইতে অভ্যস্ত তাহাও খানিকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এই বিষয়ে ভারতে গোঁজামিল চলিতেছে।

ধনদৌলত ও আর্থিক উন্নতি বিষয়ক নানাপ্রকার সমস্যা আর ধন-বিজ্ঞান-গবেষণার বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে আমাদের এম, এ, বি, এল পাশ-করা লোকজনের যোগাযোগ ঘটাইয়া দেওয়াই লেখকের আসল উদ্দেশ্য। এই জন্যই যখন যেখানে যতটুকু তথ্য বা "তত্ত্ব" খুঁজিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করা গিয়াছে পাঠক-দের উপর তাহার বেশী বোঝা চাপাইতে চেষ্টা করি নাই। তাহা সত্ত্বেও "নমোনমঃ" করিতে-করিতেই বইটা দুইখণ্ডে বেশ পুরু আকারে দাঁড়াইয়া গেল।

যে-সকল পাঠকের জন্য এই বইয়ের দুইভাগ লেখা হইল তাঁহারা আগামী পাঁচ-সাত-দশ বৎসরের ভিতর লেখকের আশা পূরণ করিতে পারিবেন এইরূপ ভরসা রাখি। সৌভাগ্যশীল দেশের পক্ষে তিন বৎসরের বেশী লাগিবার কথা নয়। যাহা হউক, যুবক বাঙ্‌লা আজ অন্নাভাবে যতই জর্জ্জরিত আর পথ-ভ্রষ্ট হউক না কেন, তাহার ভিতর কর্ত্তব্যের ডাক শুনিবার মতন আদর্শনিষ্ঠ এবং খোলা-চোখের নরনারী আছেই-আছে। লাভালাভ-নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্যের ডাকে সাড়া দিবার মতন উচ্চশিক্ষিত বাঙালী চিরকালই জুটিবে।

লেখকের পক্ষে বাংলা ভাষাকে উচ্চতম শিক্ষা ও উচ্চতম গবেষণার বাহনরূপে গড়িয়া তোলার খেয়াল বা নেশা অনেক দিনের জিনিষ। স্বদেশী যুগে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ-প্রতিষ্ঠার (১৯০৬) সঙ্গে এই নেশার জন্ম। এই পরিষদের আবহাওয়ায়ই মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি কায়েম করিয়াছিলাম (১৯০৭)। বলা বাহুল্য, তাহার ব্যবস্থায়ও বাংলা ভাষাকে সকল প্রকার "লেখাপড়া" এবং অনুসন্ধান-

গবেষণার জন্য মুখ্য ভাষা বিবেচনা করা হইত। "জাতীয় শিক্ষার" যুগে বাংলাভাষার মারফৎ নানা বিদ্যার ক্ষেত্রে উচ্চতম সাহিত্য গড়িয়া তোলা বাঙ্‌লার নরনারীর অন্যতম আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল।

১৯১১ সনে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের মালদহ-অধিবেশনে (ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ-অধিবেশনে (বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে) বাংলাভাষাকে উচ্চতররূপে গড়িয়া তুলিবার মতলবে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সেই প্রস্তাবের জের আজ-ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ধনভাণ্ডারে কিছু-কিছু চলিতেছে। ঘটনাচক্রে "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত "রিকার্ডোর অর্থশাস্ত্র" তাহার তদবিরেই সম্পাদিত হইতেছে। তখনকার দিনে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় বিজ্ঞানপ্রচারক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দর্শনসেবক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিক্ষানায়ক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এবং পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইত্যাদি মনীষিগণের নিকট উৎসাহ পাইতাম।

সেকালের নেশা একালেও রহিয়া গিয়াছে। এই নেশায় সাংসারিক লাভ নাই। বরং উল্টাই আছে। কাজেই বেশী লোককে মাতান করা সম্ভবপর নয়। নেহাৎ বাতিকগ্রস্ত আর আহাম্মুক যে নয় সে কখনো বাংলার পথ মাড়াইতে রাজি হইবে না। এই সাড়ে নয় বৎসরকার অভিজ্ঞতা এইরূপ। ১৯৩৫ সনেও বাঙালী জাতির এইরূপ দুর্দ্দশা থাকিবে তাহা ১৯০৫-১৪ সনের যুগে বিশ্বাস করিতাম না।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও ঝোঁকে বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাংলা ভাষাকে খানিকটা চাঁড়িয়া তুলিতে পারে তাহা

হইলে বিনা নেশায়ও অনেকেই সাংসারিক লাভের আশায় এই দিকে ভিড়িতে সুরু করিবে। তখন ঘটনাচক্রে হয়ত ধনবিজ্ঞানের আসরেও বাংলা রচনা বেশী-বেশী আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিবে।

এই দুই খণ্ড-বইয়ের সব-কিছুই বাহির হইয়াছিল "আর্থিক উন্নতি"তে। "আর্থিক উন্নতি" চালানো লেখকের পক্ষে একটা নেশা ছাড়া আর কিছু নয়। এই নেশায় মস্‌গুল আছেন ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহাও। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ১৯২৬ সনের জানুয়ারি মাস হইতে প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া তিনি "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" বেশ-কিছু ঢালিয়া চলিয়াছেন বলিয়া পত্রিকা-সম্পাদনের নেশা বজায় রাখিতে পারিয়াছি। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎও তাঁহার তদবিরেই চলিতেছে। বাঙালী জাতি নরেন্দ্রনাথের স্বদেশ-সেবা মনে রাখিবে।

বইটার ভিতর "আর্থিক উন্নতি''র নাম অনেক স্থলেই দেখা যাইবে। এই পত্রিকার ভিতর প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া কিরূপ মাল বাহির হইতেছে তাহা জানা থাকিলে ভবিষ্যতের বাঙালী অর্থশাস্ত্রীরা নতুন-নতুন উন্নতির পথ আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

বাড়্‌তির পথে বাঙালীর অন্যতম লক্ষণ ধনবিজ্ঞানে বাঙালী "লেখক"দের সংখ্যা-বৃদ্ধি,—কম্-সে-কম বাঙালীর লেখা "বইয়ের" আর "প্রবন্ধের" সংখ্যা-বৃদ্ধি।

গোটা ১৯০৫-১৪ দশকে বাঙালীর লেখা ধনবিজ্ঞান বিষয়ক "বই" দুএকখানার বেশী বাহির হয় নাই। একালের সকলেরই সেই কথাটা মনে রাখা আবশ্যক। ১৯১৫-২৪ দশকে মাত্রা প্রায় তদ্রূপই ছিল। বোধ হয় দশ বৎসরে মোটের উপর গোটা দুতিনেক বা তিনচারেক "বই" বাহির হইয়াছিল। ১৯২৫-৩৪ দশকে বোধ হয় ফি বৎসর গড়ে একখানা করিয়া "বই" বাহির হইয়াছে। এই সমুদয়ের কয়েকটা

দেশী-বিদেশী পাঠশালায় পরীক্ষা-পাশের উদ্দেশ্যে লিখিত রচনা। সকল ক্ষেত্রেই বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় লেখা বইয়ের কথা বলিলাম। কাজেই ধন-বিজ্ঞান বিষয়ক "লেখালেখি"র দিকে বাঙালীর ঝোঁক যে বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বাড়্তির হার এত খাটো আর পাশফেল-কাণ্ডের বাহিরে স্বাধীনভাবে বাঙালীর লেখা বই এত কম যে, বাস্তবিক পক্ষে বাঙালী জাত্ বাড়িয়াছে কি না অনেকে সন্দেহ করিতে অধিকারী।

দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রে অর্থনৈতিক "প্রবন্ধ"-রচনার হিসাব করিলেও ১৯০৫ হইতে ১৯৩৪ এই ত্রিশ বৎসরের তিন দশক সম্বন্ধে "বই"-বৃদ্ধির হারের জুড়িদারই দেখা যাইবে। "বই" বা "প্রবন্ধে"র ভিতর মাল কিরূপ আছে তাহা সমালোচনা করা হইতেছে না। অধিকন্তু মতামতের কথাও পাড়িতেছে না। সম্প্রতি একমাত্র সংখ্যা বা বহর ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করা হইল না। ১৯৩৫-৪৪ দশকে ফি বৎসর গড়ে যদি বাঙালী জাত্ দুখানা করিয়া ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত "বই" বাজারে ঝাড়িতে পারে তাহা হইলে হাতী-ঘোড়া কিছু হইবে না। তবে বর্ত্তমান হারের "পরবর্ত্তী ধাপ"টাকে চলন-সই গোছের মনে হইবে।

এইখানে একটা প্রাণের কথা বলিয়া রাখি। এই সকল লেখা-লেখি কাণ্ডে গোটা ভারতের নরনারী যাহা-কিছু করে তাহার আধা-আধি করা চাই একা বাঙালীর। বাঙালী আমরা নাক গুন্তিতে ভারত-বাসীর সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র। তাহা ছাড়া টাকাকড়ির বাজারে আর শিল্প-বাণিজ্যের দুনিয়ায় আজও বাঙালীর টিকি নেহাৎ অল্পই দেখা যায়। তাহা সত্ত্বেও যে-কোঠের কথা বলা হইতেছে সেই কোঠে এবং অন্যান্য কোঠেও বাঙালীকে গুন্তিতে সমান হইতে হইবে

অবশিষ্ট ভারতবাসীর। এই আদর্শেই নয়া বাঙ্‌লার গড়িয়া উঠা উচিত। চাই লোক, চাই ভাবুকতা, চাই কর্ত্তব্যজ্ঞান। কথাটা হয়ত কোনো-কোনো বাঙালীর কানে পশিবে।

বুঝিতেছি যে, আজ পর্য্যন্ত অতি নগণ্য ফল পাওয়া গিয়াছে মাত্র। এ সব লইয়া লাফালাফি করা অসম্ভব।

ধনবিজ্ঞানের সাহিত্য সৃষ্টি করা বাঙালী জাতের পক্ষে একটা সংগ্রাম বিশেষ। এ এক বিপুল কৃচ্ছ্র সাধন। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের যেরূপ কষ্ট-কল্পনা আর সাধনা চলিতেছে এই ক্ষেত্রেও অবিকল তাই।

অর্থনৈতিক পত্রিকা-সম্পাদন বাঙালীর পক্ষে কত কষ্টসাধ্য তাহার অভিজ্ঞতাও বর্ত্তমান লেখকের আছে। কাগজ কোনো মতে খাড়া করাও যত কঠিন আবার সেটাকে নিয়মিতরূপে চালাইয়া যাওয়াও সেইরূপ কঠিন। এই হাড়মাসে যে কয়খানা পত্রিকা-সম্পাদনের দাগ আছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল:—

১। ১৯২২-২৪, "কমার্শ্যাল নিউজ" (বার্লিন)। দৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বীরেন দাশ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডো-অয়রোপেয়িশে হাণ্ডেল্‌স্-গেজেল্‌শাফ্‌ট্‌ প্রকাশক।

২। ১৯২৬, "আর্থিক উন্নতি", এখনো চলিতেছে।

৩। ১৯২৬-১৯৩২, "জার্ণ্যাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স্‌" (কলিকাতা)।

৪। ১৯২৯-৩১, "ইণ্ডিয়ান্ কমার্স্ অ্যাণ্ড্ ইণ্ডাষ্ট্রি" (কলিকাতা)। ইণ্ডো-স্বইস ট্রেডিং কোম্পানী প্রকাশক।

৫। ১৯৩৪-৩৫, "ইণ্ডিয়ান কমার্শ্যাল অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল রিভিউ" (কলিকাতা)। ক্যালকাটা ফিনান্স্‌ কোম্পানী প্রকাশক।

এই সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য ১৯৩০ সনের পর কয়েকখানা পত্রিকা

জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্রকাশক আর বেপারীদের বিজ্ঞাপন ছাড়া কাগজ চালানো এক প্রকার অসম্ভব দেখা যাইতেছে। ইহার কুফল ঢের। কু-গুলা ঘাঁটাঘাঁটি করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা সত্ত্বেও এই সূত্রে কোনো কোনো বাঙালী যুবা লেখা-লেখিতে হাত পাকাইবার সুযোগ পাইতেছে। ইহা একটা লাভ সন্দেহ নাই। ১৯৩৫ সনের ধাপ এইরূপ। বস্তুনিষ্ঠরূপে অবস্থাটা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

এই "ধাপ" হইতে বাঙালী জাত্‌কে উঠিতে হইবে জাপানী আর ইয়োরামেরিকান ধাপে। সেই ধাপে ধনবিজ্ঞান বিষয়ক প্রধান-প্রধান পত্রিকাসমূহ একমাত্র প্রকাশক ও বেপারীর বিজ্ঞাপন এবং তাহার কু-গুলা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হয় না। দেখা যাউক, বাঙালী জাত্‌ কত দিনে সেই ধাপে উঠিতে পারে। যুবক বাঙলার আর বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র যুবকভারতের পক্ষে ইহাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন লড়াই। কেননা এইখানেই রহিয়াছে আসল স্বাধীনতার,—মগজের স্বাধীনতার, চরিত্রের স্বাধীনতার—মামলা।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ ভারতীয় মস্তিষ্ক-জীবীর, বিশেষতঃ ধনবিজ্ঞান-সেবকদের ব্যক্তিত্ব অর্থাভাবে এবং সাময়িক মান-অপমানের আকাঙ্ক্ষায় বা তাডনায় নিষ্পেষিত হইতেছে। অর্থাভাব আর সাময়িক মান-অপমানের ভাবনা যাঁহাদের অপেক্ষাকৃত কম তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবত্তা, স্বাধীনতার খেয়াল আর কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর ভারতীয় ধন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

এই বইয়ের দুইখণ্ড "কাশী-বিদ্যাপীঠ"-প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশ-সেবক "ভাইয়া" শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত'র নামে উৎসর্গ করিলাম। তাঁহার সঙ্গে এই বইয়ের এবং বর্ত্তমান লেখকের অন্যান্য অনেক-কিছুর যোগাযোগ অতি-নিবিড়। যুবক ভারতের অনেকেই তাঁহার নিকট ঋণী।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অন্যান্য সকল কথা বিস্তৃতরূপে বলা আছে।

বর্ত্তমানে এইটুকু মাত্র বোধ হয় বলা আবশ্যক যে, "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" বইয়ের দুইভাগ যে-যুগে ও যে-অবস্থায় বাহির হইল সেই যুগে ও সেই অবস্থায়ই বাহির হইয়াছে "নয়া বাঙ্‌লার গোড়াপত্তন" দুইভাগ (১৯৩২) আর "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪)। তাহা ছাড়া ইংরেজিতে বইও আছে কয়েকটা। এই মাসেই আর একটা ইংরেজি বই বাহির হইতেছে। নাম "সোশ্যাল ইন্‌শিওর‍্যান্স" (সমাজ-বীমা)। যাহা হউক, এই দুই বইয়ের অর্থকথা সমূহ বর্ত্তমান গ্রন্থের কথাগুলার সঙ্গে এক খোলায়ই ভাজা হইয়াছে। কিন্তু খোলা হইতে নামিয়াছে ঘটনাচক্রে কোনোটা আগে, কোনোটা পরে। কোনোটার নাম হইয়াছে যেন ফুলুরি আর কোনোটা যেন দেখা দিয়াছে বেগুনী নামে।

বিগত দশ বৎসরের ভিতর এই সমুদয় রচনা ছুটকাভাবে অনেকেই দেখিয়াছেন। এইগুলার আলোচনা-প্রণালী, মালমশ্‌লা আর সিদ্ধান্ত বাঙালী জাতির চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্রে মুখ্য ও পরোক্ষভাবে কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে।

অতএব সবগুলা যাঁহারা একত্রে ঘাঁটিবার সুযোগ পাইবেন তাঁহাদের ভিতর হয়ত কেহ-কেহ বর্ত্তমান লেখকের অসম্পূর্ণতাগুলা শুধ্‌রাইয়া লইয়া বাংলা ভাষায় আগামী নয়া বাঙ্‌লার উপযোগী "আর-ও-নয়া" ধনবিজ্ঞান গড়িয়া তুলিবার মতলব আঁটিতে পারিবেন। সেই "আর-ও-নয়া ধনবিজ্ঞান"-স্রষ্টা বাঙালী যুবাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

যে-সকল পাঠকের উৎসাহে ও আগ্রহে প্রকাশকেরা ১৯২৫ সনের পরবর্ত্তী বাংলা ও ইংরেজি রচনাবলী প্রচার করিয়া আমাকে স্বদেশ-

সেবার সুযোগ দিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। আর প্রকাশকদের বন্ধুত্ব ও স্বার্থত্যাগ এই "ঘোর কলিযুগে" যারপরনাই মহত্বপূর্ণ। তাঁহাদের নিকট গ্রন্থকার ত বটেই, পাঠক-সমাজও ঋণী থাকিল।

কলিকাতা,
৭ই আগষ্ট, ১৯৩৫।   শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

চিত্র-সূচী

২১। গ্নাকপ ত্তিভারণি

২২। গ্যায়েতান পিয়েত্র।

২৩। ফ্র্যাঙ্ক্ টাওসিগ্

২৪। এডুইন্ সেলিগ্ম্যান্

২৫। আভিং ফিশার

২৬। লুই ডাব্লিন্

২৭। পিতিরিম্ সোরোকিন্

২৮। কার্ল্ ডীল্

২৯। ফ্রীড্রিশ্ ৎসান্

৩০। ফ্রীড্রিশ্ বুর্গ্‌ডোর্ফার্

৩১। পাউল্ মোম্ব্যার্ট

৩২। হার্মাণ্ শুমাখার্

৩৩। আল্‌ফ্রেড্ মানেস্

৩৪। কার্ল্ হাউসহোফার্

৩৫। অয়গেন্ ফিশার

৩৬। মিথায়েল্ হাইনিশ্

৩৭। ওথ্মার্ স্পান্

৩৮। গুষ্টাভ্ কাস্‌সেল্

৩৯। তেইজিরো উয়েদা

৪০। আন্তর্জ্জাতিক লোকবল-কংগ্রেসের অধিবেশন, রোম, সেপ্টেম্বর ১৯৩১

৪১। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৩৩

৪২। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ (১৮০৬-১৮৭৩)। এই ছবিটা ৭ ও ৮ নং ছবির ভিতর বসিবে।

এ্যাডাম স্মিথ

(১৭২৩-১৭৯০)

জোহান ফিক্‌টে

। ১৭৬২-১৮১৪ ।

পৃঃ ৫০০

রামমোহন রায়

(১৭৭৪ — ১৮৩৩)

পৃঃ ৮০৩, ৮০৫, ৮০৭, ৮৮৮

আডাম্ মোলার্

১৭৭৯ ১৮২৯ ।

পৃঃ ৪১৪, ৫০১, ৫০২

আর্নেস্ট্ ট্রুম্প্

। ১৮২৮-১৮৮৫

পৃঃ ২৭০, ৬৬৬, ৬৯৮, ৮০১

মহারাজ গোবিন্দ বাহাদুর

(১৮৪১-১৯০১)

পৃঃ ৮০৩, ৮০৪

হেন্‌রিক ইব্‌সেন
(১৮২৮ - ১৯০৬)

পৃ০ ১০, ২৫৭, ৩৭০, ৩৯২ ৩৯৯, ৮০২, ৬০৮, ৬০৫, ৬৬৯, ৬৬৫

পৃঃ ৫৯২, ৬১০-১২

এডুইন সেলিগ্ম্যান

৩৭১, ৩৭৮, ৪০৩ ৪০৬, ৪১০-১৩, ৪২১

আর্ভিং ফিশার্

পৃঃ ১০, ৩৭১ ১৯৮, ৫০৫ ৫০৪, ৮১৮-২৫, ৮২৯, ৮৩৫

পৃঃ ১৪, ১৮, ৪২৮, ৫০৪, ৫০৫

পাউল্‌ মোশ্যার্ট্‌

পৃঃ ৯১, ২৪৮, ৩৭১, ৬৭৮, ৬৭৯

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

দ্বিতীয় ভাগ

ধন-বিজ্ঞানের নয়া নয়া খুঁটা

ধনবিজ্ঞানে "যুক্তিনিষ্ঠা" কি চীজ ?

ফরাসী ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে একটা পারিভাষিক শব্দ সুপ্রচলিত। তাহার সঙ্গে ইংরাজিতে মোলাকাৎ খুব কমই ঘটে। তবে ইংরাজি অর্থশাস্ত্রীরা সেই শব্দের অন্তর্গত বস্তুটার সহিত সুপরিচিত বটে। ১৯২৭ সনে প্যারিসের দোআঁ কোং "একোনোমিক্ র‍্যাসনেল" নামে একখানা বই প্রকাশ করিয়াছে। লেখকের নাম দিহ্বিজিয়া। গ্রন্থকারের "র‍্যাসনেল" শব্দটার কথাই বলিতেছি। এই শব্দ অবশ্য ইংরাজি ভাষার একটা সুপ্রচলিত শব্দ। বাঙলায় তাহার প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে যুক্তিযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিনিষ্ঠ, ইত্যাদি। এই "যুক্তিনিষ্ঠ" "একোনোমিক" বা ধনবিজ্ঞান কি চীজ ? বলা বাহুল্য, যুক্তির উপর ভর না করিলে কোন বিদ্যারই চলে না। অর্থশাস্ত্রও যে যুক্তির উপর ভর করিয়া চলে একথা ত প্রথমেই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে একটা "র‍্যাশন্যাল ইকনমিক্‌স্" (ইংরাজি) অথবা "একোনোমিক্ র‍্যাসনেল" (ফরাসী) শ্রেণীর অর্থশাস্ত্র বাজারে দেখা দিতেছে কেন ?

এইখানে ধনবিজ্ঞানবিদ্যার যুক্তি, যুক্তিনিষ্ঠা ইত্যাদির আসল ঠাঁই আলোচনা করা আবশ্যক। যুক্তি ছাড়া যখন ধনবিজ্ঞান চলিতেই পারে না, তখন যেখানে যুক্তি নাই সেখানে ধনবিজ্ঞানই নাই। একথা সহজেই বুঝা যাইতেছে। ধনবিজ্ঞান মাত্রই যুক্তিনিষ্ঠ। সুতরাং "যুক্তি-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" বলিলে একটা বাগাড়ম্বর জাহির করা হয় মাত্র। "টটলজি" বা পুনরুক্তি দোষের একটা দৃষ্টান্ত ছাড়া এখানে আর কিছু দেখিতে পাই না। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের যে সকল বেপারীরা "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" বোল আওড়াইতেছেন তাঁহারা তর্কশাস্ত্রে নাবালক নন। তাঁহারা "টটলজি", পুনরুক্তি বা বাগাড়ম্বর ইত্যাদি ন্যায়শাস্ত্রের দোষ সামলাইয়া চলিতে সুপটু, তাঁহাদের "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" শব্দে বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ কোন দোষ নাইও।

অতএব বুঝিতে হইবে যে, "যুক্তিনিষ্ঠ" ধনবিজ্ঞানের যুক্তির ভিতর একটা হাতীঘোড়া কিছু আছেই আছে। "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানে"র যুক্তিতে আর অন্যান্য ধনবিজ্ঞানের যুক্তিতে মাল হিসাবে প্রভেদ বিস্তর। দুই ক্ষেত্রের যুক্তি এক চীজ নয়। অর্থাৎ যুক্তি শব্দের অর্থ দুই শ্রেণীর ধনবিজ্ঞানে দুই প্রকার।

যুক্তিনিষ্ঠ বনাম বস্তুনিষ্ঠ

যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বাহিরে যে ধনবিজ্ঞান বা যে সকল ধনবিজ্ঞান বিরাজ করিতেছে তাহার ভিতর যে ঢঙের যুক্তি খেলিতেছে তাহাকে "র‍্যাসনেল"-বাদীরা হয়ত যুক্তিই বলিবেন না। সেই ধনবিজ্ঞানকে মোটের উপর সহজে এক কথায় "রিয়্যালিষ্টিক" বা "বস্তুনিষ্ঠ" ধনবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। তাহার ভিতর যতখানি বা যে প্রকারের যুক্তি খেলিতেছে, তাহাকে বস্তুনিষ্ঠার যুক্তি বলা হইবে। কিন্তু "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের" বেপারীরা তাহাকে "আমলই দিতে" অভ্যস্ত নন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন :—"আমরা যে যুক্তির কেনাবেচা করি সে যুক্তি বিলকুল নিছক

যুক্তি। তাহার ভিতর বস্তুর চাপ আধ কাঁচ্চাও নাই। আর অন্যান্যেরা আর্থিক গবেষণার যে সকল আলোচনাপ্রণালী কায়েম করে তাহাতে বস্তুর গন্ধই প্রধান এবং বেশী। তাহার ভিতর যতখানি যুক্তি আছে সবই বস্তু-ঘেঁসা, বস্তুমিশ্রিত। আমরা "অমিশ্র" বা "পিওর" যুক্তির সেবক আর তাহারা হইতেছে মিশ্র বা মিক্‌স্‌ড যুক্তির সেবক।"

"অমিশ্র" ধনবিজ্ঞান

বস্তুতঃ ফরাসীরা যে সকল ধনবিজ্ঞানকে "র‍্যাসনেল" বলে ইংরেজরা সাধারণতঃ সে সকলকে "র‍্যাসন্যাল" না বলিয়া "পিওর" বলিয়া থাকে। ইতালিয়ান ভাষায়ও তাহার প্রতিশব্দ "পূরা"। জার্ম্মাণ পারিভাষিকে তাহার নাম "রাইণ"। এই "রাইণ" শব্দটা ইংরাজি "পিওর" শব্দের প্রতিশব্দ। ইহার সঙ্গে "র‍্যাসন্যাল" বা "র‍্যাসনেল" শব্দের অন্তর্গত যুক্তির যোগাযোগ নাই। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত "যুক্তিনিষ্ঠ" বা "অমিশ্র" বিশেষণের দ্বারা এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য চিহ্নিত করা সুধীজগতের দস্তুর দেখিতে পাইতেছি।

এই "অমিশ্র যুক্তির" প্রয়োগ কিরূপ ? বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বস্তুগুলা উড়াইয়া দিলে থাকে অঙ্কের ছড়াছড়ি। একমাত্র সেই অঙ্কগুলা লইয়া মাতামাতি করা হইতেছে "অমিশ্রের" কাজ। পদার্থ-জগৎ হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। দুনিয়ায় দেখিতেছি গাছ খাড়া আছে, দরিয়া বহিয়া যাইতেছে, মেঘগুলার মিছিল বাহির হইয়াছে, ঝড়ের ঝাপটায় ঘরের ছাদ মাইল দেড়েক দূরে উড়িয়া গেল, ভূমিকম্পে ঘরবাড়ী লোপাট হইল, রূপরঙওয়ালা গ্রহনক্ষত্র ঘুরাফিরা করিতেছে, ঘরামি খুঁটা গাড়িয়া আটচালা তৈয়ারী করিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। দুনিয়ার এই সবই হইতেছে বস্তু—বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যোগাযোগ। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেই, আর বস্তুতে বস্তুতে

পদার্থবিদ্যার মিশ্র ও অমিশ্র

প্রত্যেক যোগাযোগের ভিতরেই মাপজোক আছে, সংখ্যা আছে, অঙ্ক আছে। হিমালয়ের বরফ গলিয়া কয়েকটা ধারা চীনা মল্লুকে কেন গেল, আর কয়েকটা ধারা ভারতভূমিতে কেন আসিল, আর এই সকল ধারার কতটা কোন্ মুল্লুকে কত বেগে চলিল,—সবই গতিবিধির খেলা। এই গতিবিধিটা আর তাহার আনুষঙ্গিক স্থিতিসাম্যটা অঙ্কের অন্তর্গত। অর্থাৎ যদি কোন পণ্ডিত বলিতে চাহেন যে, "দুনিয়ার ভিতর বস্তু আছে কিনা জানি না। কিন্তু তাহার ভিতর অঙ্ক আছেই আছে। অতএব দুনিয়া-বিষয়ক পদার্থ-বিজ্ঞানে অঙ্কশাস্ত্রই আসল কথা, আর গ্রহনক্ষত্র, ঘরবাড়ী, নদীপাহাড় ইত্যাদির কথা ভুলিয়া দুনিয়াখানাকে অঙ্কশাস্ত্রের গোলাম রাখা সম্ভব", তাহা হইলে তাঁহাকে নেহাৎ আনাড়ি "পণ্ডিতমূর্খ" বিবেচনা করিবার কারণ নাই। তাঁহাকে অমিশ্র গণিতশাস্ত্রের বেপারী বিবেচনা করাই দস্তুর।

গতিবিধি ও স্থিতিসাম্য

ধনবিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে। একদল পণ্ডিত বলিতেছেন "ওরে বাপু, তোরা দামের কথা বলিতেছিস, মুদ্রার হ্রাসবৃদ্ধি মাপিতেছিস, আমদানি-রপ্তানির বহর জরীপ করিতেছিস, পাটের কল, তেলের কল প্রতিষ্ঠা করিতেছিস, ব্যাঙ্ক কায়েম করিতেছিস, গরু-বীমার চাঁদা তুলিতেছিস, সুদ খাইতেছিস, ডিভিডেণ্ডের হার ঠিক করিতেছিস, মুনাফার টাকা পকেটস্থ করিতেছিস। ভাল কথা। মনে কর্, তোরা মুদ্রা, আমদানি-রপ্তানি, পাট, তেল, ব্যাঙ্ক, গরু ইত্যাদির চর্চ্চা যেমন করিতেছিস তেমনই করিয়া চল। আর আমরা আলোচনা করিতে থাকি "বস্তুহীন" ভাবে বহরটা, হারটা, হ্রাসবৃদ্ধিটা, ওঠানামাটা, পরিবর্ত্তনটা, এক কথায় গতিবিধিটা আর তাহার আনুষঙ্গিক স্থিতিসাম্যটা। আর্থিক জীবনের গতিবিধি ও স্থিতিসাম্য বিলকুল নিছক বা অমিশ্ররূপে বিশ্লেষণ

করা সম্ভব। অর্থাৎ "ধনবিজ্ঞানের" 'ধন'টা বাদ দিয়া একমাত্র বিজ্ঞান লইয়া মাতামাতি করা সম্ভব। আর সেই বিজ্ঞান আগাগোড়া অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।"

অতএব যেমন "পদার্থ-বিজ্ঞানের" বেলায় "পদার্থ"-হীন বিজ্ঞান কল্পনা করা সম্ভব আর তাহা হইতেছে অমিশ্র অঙ্কশাস্ত্র, ধনবিজ্ঞানের বেলায়ও ঠিক সেইরূপ ধন-বিবর্জ্জিত বিজ্ঞান গড়িয়া তোলা সম্ভব। আর তাহারই নাম অমিশ্র, র‍্যাসনেল, যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান। সহজে অনেকে তাহাকে গণিতনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র বলিয়া থাকে। "ম্যাথম্যাটিক্যাল ইকনমিক্‌স্" নামে আজকালকার বাজারে সেটা বেশ চলিতেছে।

ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বনাম গণিত-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান

"গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" শব্দ কায়েম করা মাত্রই ধাঁ করিয়া যে-কোন লোক বলিবে,—"ওঃ হরি! এ যে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের কথা বলা হইতেছে।" বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের অঙ্ক ত সর্ব্বদাই চলিতেছে। তাহা হইলে গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের আবার বিশেষত্বটা কোথায়?

রাশি-পর্য্যায়, যোগবিয়োগ, গুণভাগ, অনুপাত, দশমিক, ত্রৈরাশিক ইত্যাদি অঙ্কশাস্ত্রের মাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বিদ্যার সামিল সন্দেহ নাই। আর সেই সব ছাড়া মামুলি ধনবিজ্ঞান চলিতেই পারে না। "আর্থিক উন্নতি"র যে কোন অধ্যায় খুলিলেই তাহা মালুম হইবে। কিন্তু একমাত্র এই সকল অনুপাত বা অনুপাত-বোধক ছবি, চার্ট, গ্রাফ, "কার্ভ" ইত্যাদির যেখানে সেখানে ব্যবহার আছে সেই সকল স্থলে গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান চলিতেছে এরূপ বলা চলিবে না। ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের "ডালভাত" হজম করিবার পর আর এক ধাপে পা ফেলিবার পূর্ব্বে কেহ "ম্যাথম্যাটিক্যাল," "র‍্যাসন্যাল" বা "পিওর" ইকনমিক্‌সের চর্চ্চা করিতে সমর্থ নয়। কেন না ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের তথ্য ও অঙ্কগুলা সবই আগাগোড়া বস্তুনিষ্ঠ। বস্তু ছাড়া

ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ দাঁড়াইতেই পারে না। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ, গণিতনিষ্ঠ অমিশ্র ধন-বিজ্ঞান বিদ্যা "বস্তুর মায়া" আর বস্তুর কাঠাম ফেলিয়া দিয়া "শূন্যের" উপর, —একমাত্র সংখ্যার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রয়াসী। কাজেই ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ আর গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান এক চীজ কোন মতেই হইতে পারে না।

গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানটাকে পাটীগণিতের এলাকার বহির্ভূত বিবেচনা করিলেই সুবিচার করা হইবে। ইহার ভিতর জ্যামিতি, কনিক্‌ সেক্‌শ্যন্‌স্‌, বীজগণিত ও ক্যালকুলাস এই সব গণিতের খেলা। কাজেই যাঁহারা এই সকল গণিতে খেলোয়াড় নন তাঁহাদের পক্ষে "যুক্তিনিষ্ঠ" বা "অমিশ্র" ধনবিজ্ঞানে দন্তস্ফুট করা কঠিন। দুঃখের কথা, দুনিয়ার ধনবিজ্ঞানসাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যত বড় বড় মাথাওয়ালা পণ্ডিত হাত দেখাইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, বীজগণিত ইত্যাদির ধার ধারেন নাই। তাঁহারা গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানে আনাড়ি, অতএব গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বেপারীরা দুনিয়ার অধিকাংশ "বাঘা বাঘা" ধনবিজ্ঞানসেবীকে যুক্তিনিষ্ঠার বহির্ভূত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

জ্যামিতি-বীজগণিত-ক্যালকুলাসের দাবী

এদিকে যাঁহারা "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" বিদ্যায় আনাড়ি তাঁহারা জ্যামিতি-বীজগণিতওয়ালাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই :—"বীজগণিত আর ক্যালকুলাসের দোহাই দিয়া তোরা এমন কোন্‌ সূত্রটা আবিষ্কার করিয়াছিস যাহা আমাদের জানা নাই?" গণিত-নিষ্ঠেরা জবাবে বলেন, "আমরা নতুন কিছুই আবিষ্কার করি নাই, করিতে পারিব বলিয়াও বিশ্বাস করি নাই। তোরা যাকিছু করিতেছিস সেই সবই আমরা ক্যালকুলাস আর বীজগণিতের ক = ও (গ) ইত্যাদির সঙ্কেতে ধরিয়া রাখিতেছি। তোরা যা কিছু বুঝাইবি দশ পৃষ্ঠা বক্তৃতার সাহায্যে আমরা তাহা বুঝাইব একটা মাত্র দাঁড়ি টানিয়া অথবা তিন চারটা অক্ষরের সাহায্যে।"

ফরাসী লেখক দিহ্বিজিয়ার গ্রন্থ

এইবার ফরাসী পণ্ডিত দিহ্বিজিয়ার বইটার যৎকিঞ্চিৎ খতিয়ান করা যাউক। বইটা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত,—(১) সাধারণ কথা, (২) বিনিময়, দাম ও মূল্য, (৩) ধনোৎপাদন, (৪) ধনবিতরণ, (৫) টাকাকড়ি, (৬) অর্থনৈতিক স্থিতিসাম্য (ইকুইলিব্রিয়াম)।

ধনবিজ্ঞানে গণিতের আসল কেরদানি অথবা এমন কি একমাত্র প্রয়োগক্ষেত্র হইতেছে, এই "সাম্য"-তত্ত্বে। "ইকুয়েশুন" বা "সাম্য"-সম্বন্ধটা আর্থিক জীবনের যত ক্ষেত্রে পাওয়া যায় সেই সকল ক্ষেত্রে গণিত-নিষ্ঠার জয়জয়কার। তিন টাকা খরচ করিবামাত্র এক জোড়া জুতা পাইলাম। এইদরে আজকার তারিখে ঠনঠনিয়ার বাজারে এক হাজার জোড়া জুতা বিক্রী হইয়া গেল। দেখা যাইতেছে যে, এক হাজার ক্রেতার পকেটস্থ তিন হাজার টাকা বাটখারার একদিকে যত ভারী, মুচীর দোকান-গুলার এক হাজার জোড়া জুতা বাটখারার অপর দিকে ঠিক সেই পরিমাণই ভারী। অতএব একটা ইকুয়েশ্যন (সাম্যসম্বন্ধ), ইকুইলিব্রিয়াম (স্থিতি-সাম্য) ইত্যাদি পাওয়া গেল। কিন্তু দাম যদি সাড়ে তিন টাকা হয় তাহা হইলে কত জোড়া জুতা বিক্রী হইবে? কে জানে? তখন হয়ত আবার অন্য রকমের একটা ইকুয়েশ্যন পাওয়া যাইবে। ইত্যাদি।

ইকুয়েশ্যন বা সাম্যসম্বন্ধ

গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান এই ইকুয়েশুন-তত্ত্বেরই প্রচারক। আর্থিক জীবন, অর্থনৈতিক ওঠানামা সবই এই বিজ্ঞানের আলোচনায় ইকুয়েশুন মাত্র। পৃথিবীর যা কিছু বৈষয়িক অভাব-অভিযোগ, সাম্পত্তিক সুখ-দুঃখ সবই কোন না কোন ইকুয়েশুনের তাঁবে আনিয়া হাজির করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, ইহা এক প্রকার চরম মতের "শূন্যবাদ" "অ্যাবষ্ট্র্যাকশন"

"বস্তু ছাড়িয়া হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়ানো" সন্দেহ নাই। ইহাকে বৈদান্তিক অদ্বৈতনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এইরূপ কল্পনা করিতে পারা বাহাদুরির কথা বটে। কাজেই গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের কিম্মৎ লাখ টাকা।

টাকার বাজার হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। দেশের ভিতর যতগুলা টাকা চলিতেছে তাহার কোনটা টাকশালে ফিরিয়া আসে এক ঘণ্টার ভিতর আর কোনটা হয়ত একদম ফিরিয়াই আসে না। সেটা হয়ত কোন পল্লীর কিষাণ-ঘরে হাঁড়ীর ভিতর গর্ত্তস্থ হইয়া টাকা-লীলা সংবরণ করিল। আবার কখনো হয়ত একটা টাকা চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর পঞ্চাশ জন লোকের হাত বদলাইয়া দিগ্বিজয় চালাইল। অর্থাৎ একটা মাত্র টাকার দ্বারাই পঞ্চাশটা টাকার কাজ চালানো হইল। অপর দিকে কখনো হয়ত একটা টাকা চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার একজন মাত্র বেপারীর বা গৃহস্থের কেনা-বেচায় ব্যবহৃত হইল। দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক টাকারই গতিবিধি আছে আর গতিবিধিগুলা সর্ব্বত্র একরূপ নয়। কিন্তু কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আজকার তারিখে কলিকাতার যত সব কেনাবেচা হইয়া গেল তাহার কিম্মৎ কতখানি। তাহা হইলে তাহার জবাব দেওয়া কঠিন হইবে কি? কঠিন হইবার কথা নয়। কেননা একটা ইকুয়েশ্যনের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভব। ধরা যাউক যেন টাকার নাম 'ট' আর গতি-বিধির নাম 'গ'। তাহা হইলে কেনা-বেচার দাম (অর্থাৎ দ) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত "সাম্য" পাওয়া যাইতেছে :—

$$\text{ট} \times \text{গ} = \text{দ}$$

ইকুয়েশ্যন আর ফর্ম্মুলা নামক সূত্রের কিম্মৎ খুব বেশী। আর্থিক দুনিয়ায় যতই ওলট-পালট বা ওঠানামা চলুক না কেন, ট×গ=দ ইত্যাদি শ্রেণীর নিয়ম চলিবেই চলিবে। এই জন্যই গণিতনিষ্ঠ ধন-বিজ্ঞানের বেপারীরা নিজ নিজ আলোচনা-প্রণালীকে আসল বা চরম "যুক্তির" কর্ম্মক্ষেত্র বিবেচনা করেন। অন্যান্য ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-

প্রণালীর ভিতর যে সকল যুক্তি আছে তাহা এইরূপ চরম নয়। তাহার ভিতর ধোঁআটে ভাব, গোঁজামেলে, বা অসম্পূর্ণ চিন্তা থাকা সম্ভব ; কিন্তু বীজগণিতের ফর্ম্মুলা চাঁছাছোলা বার্ণিশকরা সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ইহার ভিতর গোঁজামিলের ঠাঁই নাই। এই ধরণের বিজ্ঞানকে ইংরাজি-ফরাসী-ইতালিয়ান পরিভাষিকে "একজ্যাক্‌ট্‌" "একজাকৎ"—"এজাত্তা" বলে। রসায়নের মেলমেশ ভাঙাচুরার ভিতর যেমন কোন প্রকার বুজরুকি বা হযবরল চলা অসম্ভব, গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানও সেই কোঠায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জেহ্বন্‌স্‌-মেঙ্গার-হ্বালরার গণিত-নিষ্ঠা

গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান নেহাৎ কচি-শিশু নয়। অনেক দিন হইতেই ইহার রেওয়াজ চলিতেছে। তবে ইহার জন্মকালে বিজ্ঞান মুল্লুকে বড় একটা সাড়া পাওয়া যায় নাই। আসল ক্রমবিকাশের ধারা নিম্নরূপ :—

১। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ :—ইংরেজ পণ্ডিত জেহ্বন্‌স্‌ (১৮৩৫-১৮৮২) প্রণীত "থিয়োরি অব্‌ পোলিটিক্যাল ইকনমি" (ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা) নামক গ্রন্থ এই বিভাগের এক বড় খুঁটারূপে আজও আদৃত হইতেছে।

২। ১৮৭১-৭২ :—অষ্ট্রীয়ান পণ্ডিত মেঙ্গার (১৮৪০-১৯২২) প্রণীত "গ্রুণ্ড্‌স্থেট্‌সে ড্যর ফোল্‌কস্‌-হ্বির্ট শাফ্‌ট্‌সলেরে" (ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার মূলসূত্র) নামক জার্ম্মাণ গ্রন্থের ইজ্জৎও এইরূপ।

৩। ১৮৭৪-৭৭ :—ফরাসী পণ্ডিত হ্বালরা (১৮৩৪-১৯১০) প্রণীত "এলমাঁ দেকোনেমী পোলিটিক প্যুর" (অমিশ্র ধনবিজ্ঞান , নামক গ্রন্থ আজও প্রথম দুইটার মতনই চলিতেছে।

আজকাল এই তিন খানা বইকেই গণিতনিষ্ঠ অমিশ্র ধনবিজ্ঞানের প্রধান স্তম্ভ বিবেচনা করা হইয়া থাকে। দেখা যাইতেছে যে ১৮৭০-৭৫ সনের ভিতর এই সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

আদিগুরু ফরাসী কুর্ণো আর জার্ম্মাণ গস্‌সেন

কিন্তু এই বিদ্যার নামজাদা জন্মদাতাদের ভিতর সর্ব্বপ্রসিদ্ধ হইতেছেন ফরাসী পণ্ডিত কুর্ণো (১৮০১-১৮৭৭)। ১৮৩৮ সনে তাঁহার "রেশের্শ্‌ স্যির লে প্র্যাঁসিপ্‌ মাৎমাতিক দ্য লা তেওরী দে রিশেস্‌" (ধন-তত্ত্বে গণিতসূত্র-বিষয়ক গবেষণা) বাহির হইয়াছিল। অন্যান্য ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে ইংরেজ অ্যাডাম স্মিথের "হ্বেলথ অব্‌ নেশুন্‌স্‌" (১৭৭৬) যেমন এক প্রকার আদি-গ্রন্থ; গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কুর্ণোর বইও সেইরূপ। এইসঙ্গে ১৮৫৪ সনে প্রকাশিত জার্ম্মাণ পণ্ডিত গস্‌সেন (১৮১০-১৮৫৮) প্রণীত "এণ্টহ্বিকলুঙ ড্যার গেজেটসে ডেস মেনশলিখেন ফার্কেয়ার্স" (মানবীয় লেনদেন-বিষয়ক নিয়মের ক্রমবিকাশ) উল্লেখযোগ্য।

একালের গণিত-নিষ্ঠা

একালে অর্থাৎ ১৮৭০-৭৫ সনের পরে অনেক ধন-বিজ্ঞানসেবীই অল্প-বিস্তর এই গণিতমহলে ঢু মারিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতর নামজাদা হইতেছেন (১) অষ্ট্রীয়ান ব্যেমবাহ্বার্ক (২) জার্ম্মাণ হ্বীজার (৩) জার্ম্মাণ শুমপেটার (৪) ইংরেজ মার্শ্যাল (৫) ইংরেজ এজওয়ার্থ (৬) ইংরেজ পিগু (৭) ইতালিয়ান পান্তালেঅনি (১৮৫৭-১৯২৪) (৮) ইতালিয়ান পারেত (১৮৪৮-১৯২৩) (৯) মার্কিণ জন বেটস্‌ ক্লার্ক (১০) মার্কিণ ফিশার, (১১) মার্কিণ মুর (১২) ফরাসী লাঁদ্রি ইত্যাদি।

এজওয়ার্থ-পান্তালেঅনি-লাঁদ্রি

এই সকল লেখকদের গণিত-চর্চ্চা অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অবান্তর মাত্র। খাঁটি গণিত-নিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নলিখিত বইগুলা উল্লেখযোগ্য:—(১) ১৮৮১:—এজওয়ার্থ প্রণীত "ম্যাথম্যাটিক্যাল সাইকিক্‌স"। (২) ১৮৮৯:—পান্তালেঅনি প্রণীত "প্রিঞ্চিপি দি একনম্যা পুরা"।

(৩) ১৮৯৬-৯৭ :—পারেত প্রণীত "কুর দেকোনোমী পোলিটিক" (লেখক ইতালিয়ান ; কিন্তু বই ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত)। (৪) ১৯০৪ :—লাঁদ্রি-প্রণীত "ল্যাঁতারে দু কাপিতাল" (পুঁজির সুদ)।

মার্শ্যাল, পিগু, ফিশার, মুর ইত্যাদির বইগুলার ভিতর যতখানি গণিতনিষ্ঠা আছে তাহার চাপে সাধারণ বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের অস্তিত্ব লোপ পায় না। অর্থাৎ গণিত-সম্পর্কিত অংশটুকু বাদ দিয়াও স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের প্রচারিত মতামতের অধিকাংশই বুঝা যায়। তাঁহাদিগকে কট্টর গণিতপন্থী বলা চলিবে না।

মার্শ্যাল-পিগু-ফিশার-মুর

আর্থিক ইতিহাসের দু'এক টুকরা

আর্থিক ইতিহাসের দলিল

আমরা ধনবিজ্ঞানের রাজ্যে বাঙালী জাতিকে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ধারাসমূহের সঙ্গে সুপরিচিত দেখিতে ইচ্ছা করি। এই ধারাসমূহের গতি কোন্ দিকে তাহা অনেক উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী পণ্ডিতেরও ভাল করিয়া জানা নাই। এই কারণে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা আর ভবিষ্যতের জন্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিচারের বেলায় গোলযোগ উপস্থিত হয়।

সম্প্রতি হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে একখানা দলিল-দস্তাবেজের বই বাহির হইয়াছে। লেখকের নাম পোস্তুমুস। তিনি আমষ্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ইতিহাস-বিদ্যার অধ্যাপক। বইখানা ওলন্দাজ ভাষায় লেখা হয় নাই, লেখা হইয়াছে ফরাসীতে। কেতাবের নাম রেক্যই দ' দোকুমাঁ অ্যাঁতার্ণাশুনো রেলাতিফ্ আ লিস্তোয়ার একোনোমিক

১৮১৪-১৯২৪ (১৮১৪ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত আর্থিক ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক দলিল-সংগ্রহ)। প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে ১৯২৫ সনে, ৮৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে আছে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর জার্ম্মাণি এই তিন দেশের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সন্ধিবিষয়ক মূল কাগজপত্র।

বুঝা যাইতেছে যে, আর্থিক জীবনের আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন সম্বন্ধে এই তিন দেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে সকল সন্ধি কায়েম করিয়াছে এই বই সেই সমুদয় সন্ধিরই সংগ্রহালয়। কথাটা বাঙালী সমাজে বেশ বুঝিয়া রাখা উচিত। কেননা আন্তর্জ্জাতিক মেলামেশা, সমঝৌতা, আর বুঝাপড়া হইতেছে বর্ত্তমান জগতে আর্থিক উন্নতির এক মস্ত বনিয়াদ। আজকালকার দুনিয়ায় পৃথিবীর অতি নগণ্য পল্লীর নগণ্য চাষী বা মজুরের আর্থিক জীবনও জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই সকল আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-আন্দোলনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

আর্থিক উন্নতির নানা অধ্যায়ে এই তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। পোস্তমুসের গ্রন্থে প্রথমেই বিবৃত হইয়াছে ১৮১৪-১৫ সনের ভিয়েনার সন্ধি। এই সন্ধিতে নেপোলিয়ানী সমর খতম হয়। গোটা সন্ধিটা উদ্ধৃত করা হয় নাই। সন্ধির ১০৮ ধারা হইতে পরবর্ত্তী যে কয় ধারায় আর্থিক ব্যবস্থার কথা আছে, একমাত্র সেই সবই গ্রন্থকারের দৃষ্টি টানিয়া আনিয়াছে।

তাহার পর আছে আফ্রিকার নিগ্রো-জাতীয় নরনারীকে গোলাম রূপে কেনা-বেচাবিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা। এক সন্ধির দ্বারা এই গোলাম-ব্যবসা রদ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার ফলে ইয়োরামেরিকার আর্থিক জীবন মজুর ও চাষী সম্বন্ধে অনেকটা নতুন পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছে।

ইয়োরোপের রাইন-দরিয়ায় ওলন্দাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, সুইস ইত্যাদি নানা জাতির ষ্টীমার জাহাজ চলাফেরা করে। আমদানি-রপ্তানি চলে

বিস্তর। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এই বড় বাহনকে সন্ধিপত্রে সুনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। গ্রন্থে তাহার মোসাবিদাগুলা দেখিতেছি।

১৯১৮ সনে হ্বার্সাই সন্ধি কায়েম হইয়াছে। তাহার ভিতর আর্থিক সর্ত্ত আছে বিস্তর। পরে ১৯২৪ সনে জেনেহ্বায় একটা আর্থিক বুঝা-পড়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহার দ্বারা হ্বার্সাই সন্ধির সর্ত্তগুলাকে নানা প্রকারে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। তাহারই ফলে দেখা দিয়াছে ড্যয়েস-প্রবর্ত্তিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। অর্থাৎ আজকাল জার্ম্মাণি যে-যে সর্ত্তে তাহার বিজেতা শত্রুদিগকে ক্ষতিপূরণ সমঝাইয়া দিতেছে তাহার দলিল হ্বার্সাইয়ের সন্ধি হইতে সরিয়া আসিয়াছে ১৯২৪ সনের জেনেহ্বায় অনুষ্ঠিত "প্রটকলে।"

এই সকল মোটা মোটা আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি ছাড়া অন্যান্য আর্থিক সমঝোতাও পোস্তমুসের গ্রন্থে ঠাঁই পাইয়াছে। হল্যাণ্ডের ৫৯টা ছোট বড় মাঝারি সন্ধি, ওলন্দাজ-ভারত (জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ)-সম্পর্কিত ৮টা সন্ধি, ফ্রান্সের ২৫টা সন্ধি আর জার্ম্মাণির ৩৬টা সন্ধি এই দলিল-সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ৩৬টা জার্ম্মাণ দলিলের মধ্যে আছে ১৯০২ সনের আর ১৯২৫ সনের নবপ্রচারিত শুল্ক-বিধি।

"ইণ্টার্ণ্যাশ্যনাল ল" বা আন্তর্জ্জাতিক আইন নামক বিদ্যা বলিলে যাহা বুঝা যায় বর্ত্তমান গ্রন্থকে তাহার অন্তর্গত বিবেচনা করা চলে। তবে এই বিদ্যা আবার দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। একটার নাম "পাব্লিক" বা রাষ্ট্রগত আর একটার নাম "প্রাইভেট" বা জন-গত। রাষ্ট্র-গত আন্তর্জ্জাতিক আইনে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের লেনদেন, যথা লড়াই, শান্তি, ঔদাসীন্য—নিয়ন্ত্রিত হয়। জন-গত আন্তর্জ্জাতিক আইনের দ্বারা কোন দুই বা তার চেয়ে বেশী রাষ্ট্রের অধিবাসী নরনারীর লেনদেন,—যথা ব্যবসাবাণিজ্য, জাতিবিধি, বিবাহ, দেশত্যাগ, নবদেশ-গ্রহণ ইত্যাদি—শাসন করা হইয়া থাকে পোস্তমুসের গ্রন্থ প্রাইভেট "ইণ্টার্ণ্যাশ্যন্যাল ল"

বিস্তার সামিল। এ বিস্তার দিকে যুবক ভারতের দৃষ্টি আদৌ পড়িয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু ধনবিজ্ঞান আর আর্থিক বিধিব্যবস্থা লইয়া যে সকল পণ্ডিত, ব্যবসায়ী, বণিক্, কংগ্রেস-কর্ম্মী আর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাথা ঘামাইতে অভ্যস্ত তাঁহাদেব পক্ষে এই বিদ্যা খুব বেশী জরুরি।

শিল্প-বিপ্লবের সমসময়কালে

ভারতে আজকাল শিল্প-বিপ্লবের যুগ চলিতেছে। আমাদের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সবের কাঠামই আগাগোড়া বদলাইয়া যাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। এই ধরণের ওলট-পালট ইয়োরামেরিকার নানা দেশে বহু পূর্ব্বেই সাধিত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ-সমাজ এই বিষয়ে দুনিয়ার অগ্রণী। এক কথায় আমরা আর্থিক হিসাবে বিলাতকে বর্ত্তমান জগতের জন্মদাতা বলিতে পারি।

আর্থিক ইতিহাসের এই স্তর সুরু হয় কবে? সাধারণতঃ ১৭৬০ সনকে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম তারিখ রূপে ধরিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান জগতের গোড়ার কথাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-বিপ্লবের আধ্যাত্মিক আদি-গুরুর জন্ম-বৃত্তান্ত বুঝিতে হইলে সেই ১৭৬০ সনের এদিক্-ওদিক্‌কার বিলাতী সমাজই যুবক ভারতে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। তাহার জন্য বাঙালীকে সম্প্রতি কিছুকাল স্বাধীনভাবে মাথা না খেলাইলেও চলিবে। কেননা ইংরেজ এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এই যুগটা সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা চালাইতেছেন। শিল্প-বিপ্লবের তরফ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর তথ্য বাহির হইয়া আসিতেছে। বিগত আট-দশ বৎসরের ভিতর বিলাতের আর্থিক ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলা "গভীরতর গবেষণা"-মূলক (ইন্টেন্সিভ রিসার্চ) রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

মফ্‌ফিট্-প্রণীত "ইংল্যাণ্ড অন্ দি ঈভ্ অব্ দি ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল রেভোলিউশ্যন" (শিল্প-বিপ্লবের সমসময়কালের বিলাতী সমাজ) এই সমুদয় গ্রন্থের অন্যতম। ২১+৩১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ (১৯২৫)। প্রকাশক

লণ্ডনের কিং কোম্পানী। গ্রন্থের বিশেষত্ব ল্যাঙ্কাশিয়ার জেলার চাষ এবং চাষীদের বৃত্তান্ত। নতুন নতুন শিল্প-প্রণালীর প্রভাবে ইংরেজদের কৃষিকর্ম্ম কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল তাহা আজকালকার বাঙালীর পক্ষে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

এই শ্রেণীরই আর এক গ্রন্থ "ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল সোসাইটি ইন্ ইংল্যাণ্ড টুয়ার্ডস্ দি এণ্ড্ অব্ দি এইটিন্থ্ সেঞ্চুরি" (বিলাতের শিল্প-সমাজ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক্কার অবস্থা)। প্রকাশক লণ্ডনের ম্যাক্‌মিলান (১৯২৫, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে শিল্প-বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহার পশ্চাতে কতকগুলা "আধ্যাত্মিক" কারণ ছিল। সেই যুগে বিলাতের ধনী লোকেরা কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং গবেষণা চালাইবার জন্য উপযুক্ত লোক বাহাল করিয়া প্রচুর টাকা ঢালিতেন। ইহা একটা মস্ত কথা।

নতুন নতুন শিল্পের মালিকেরা একটা নবীন অভিজাত সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছিল। টাকার জোরে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রভাবও আপনা-আপনিই তাঁহাদের তাঁবে আসিতেছিল। ছলে বলে কৌশলে পার্ল্যামেণ্টে বসিবার ঠাঁই এই সকল পয়সাওয়ালাদের দল দখল করিতে লাগিল।

সেই সময়ে আর্থিক ঝগড়া চলিতেছিল দুই নম্বর। প্রথম, চাষী বনাম শিল্পী। দ্বিতীয়, প্রাচীন শিল্পওয়ালা বনাম নবীন শিল্প-পতির দল। প্রাচীনেরা নবীনের কর্ম্মকৌশল এবং সফলতা দূর হইতে দেখিয়া হা-হুতাশ করিতেছিল।

এই সকল তথ্য জগতের ইতিহাসে প্রায় ১০০।১২০ বৎসরের পুরাণা। কিন্তু যুবক ভারতের পক্ষে এই ধরণের তথ্য ঠিক যেন আজকালকারই জীবন-কথা। দুনিয়া চলিতেছে সর্ব্বত্র একই পথে।

পুঁজি-নিষ্ঠার ক্রমবিকাশ

আর্থিক ভারত পুঁজিনিষ্ঠায় হাত মক্‌স করিতে সুরু করিয়াছে মাত্র। কিন্তু এই চীজ আর এই চীজের সু-কু ইয়োরামেরিকায় আজ প্রায় একশ' বৎসরের বা তার চেয়ে বেশী বয়সের মাল। "ক্যাপিট্যালিজম্" বস্তুটা আধুনিক যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত শিল্প-কারখানা-সম্পদের যমজ ভাই। কাজেই নব্য ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এই দুইয়ের চর্চ্চা বর্ত্তমান জগতের অতি মামুলি কথা।

ইংরেজ পণ্ডিত হব্‌সন এই চর্চ্চায় বিলাতী সমাজে নামজাদা। তাঁহার নামডাক বিদেশেও আছে। বইখানার নাম "এভোলিউশুন অব্ মডার্ণ ক্যাপিট্যালিজম।" এই ধরণের বই জার্ম্মাণ সাহিত্যে বিস্তর আছে।

হব্‌সনের বইয়ের এক নতুন সংস্করণ বাহির হইল। এই ধরণের বইয়ের মাল কোন লোকের পেটে পড়িলে তাঁহাদের মতিগতি যেরূপ হওয়া উচিত তাহার চিহ্নও বাঙালীদের লেখা প্রবন্ধ-কেতাব-পুস্তিকায় বড় একটা চোখে পড়ে না। তাই বইটার দিকে বাঙলার পণ্ডিত ও স্বদেশ-সেবকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"আর্থিক উন্নতি"র নানা অধ্যায়ে কার্টেল, ট্রাষ্ট ইত্যাদির বিবরণ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সেই সম্বন্ধে হব্‌সনের বইয়ে অনেক কথা পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান জগতের পুঁজিপতিরা নিজেই অধিকাংশ সময়ে শিল্প-বাণিজ্য ঢুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য মাথা খাটায় না। তাহার জন্য মোতায়েন আছে সমাজে আর এক শ্রেণীর মাথাওয়ালা লোক। তাহাদিগকে বলে "কম্পানি—প্রোমোটার।" তাহারা দেশ-বিদেশের আর্থিক গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। নিজ নিজ এলাকায় যে সকল কারবার লাভজনক হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারবারের

গোসাবিদা করা তাহাদের কাজ। খরচপত্র, লাভলোকসান, কাজ চালাইবার প্রণালী ইত্যাদি সব বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা পুঁজিপতিদেরকে এই সকল কারবারে টাকা খাটাইতে পরামর্শ দেয়। এই ধরণের মোসাবিদা আর পরামর্শের মজুরি বড় বড় ক্ষেত্রে বহু বহু লাখ টাকা। অর্থাৎ কম্পানি খাড়া করিবার তোড়-জোড়টাই বর্ত্তমান জগতের এক মস্ত ব্যবসা। এই বিষয়ে ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ বাঙালীরা, এখনো বর্ত্তমান জগতের লোক নয়। আজকালকার বিলাতী সমাজ-দার্শনিকদের ভিতর হব্‌সন অনেকটা চরমমত-ঘেঁশা উদার-পন্থী বিবেচিত হন। ইনি তথাকথিত মধ্যবিত্তদের স্বরাজ খর্ব্ব করিয়া জনসাধারণের আত্মকর্ত্তৃত্ব বাড়াইবার কৌশল ঢুঁড়িয়া থাকেন। অধিকন্তু আন্তর্জ্জাতিকতা হব্‌সনের অন্যতম লক্ষ্য।

একালের বিশ্ব-দৌলত

মস্কো আর লেনিনগ্রাড্ শহর হইতে রুশিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট একখানা সুবৃহৎ বই প্রকাশ করিয়াছে। সম্পাদক সোল্‌ন্‌ৎসেফ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এঙ্গেল, জার্ম্মাণ পণ্ডিত হার্ম্‌স্ ও শুল্‌ট্‌সে ইত্যাদি বিদেশী ধনবিজ্ঞানসেবীদের রচনাও এই গ্রন্থে আছে। রুশ লেখকদের ভিতর দেখিতেছি ট্রট্‌স্‌কি, বুখারিণ, রাডেক ইত্যাদি কয়েকজনের নাম। বইটা জার্ম্মাণ ভাষায় "ডী হ্বেল্টহ্বির্ট শাফ্‌ট্ নাখ্ ডেম ক্রীগে" (যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের আর্থিক জগৎকথা) নামে বাহির হইয়াছে। বুঝানো হইয়াছে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত দুনিয়ার কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। হ্বার্সাই সন্ধির ফলে ইয়োরোপ কতকগুলা স্ব স্ব প্রধান আর্থিক স্বরাজশীল দেশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে ইয়োরোপের নানাদেশে অশান্তি উৎপন্ন হইয়াছে। মুদ্রা-নীতির হযবরল

আর বেকার-সমস্যাও অনেক পরিমাণে ভার্সাই-সন্ধিরই সন্তান। অপর দিকে এই সকল অশান্তি-নিবারণের যে সব চেষ্টা হইয়াছে তাহার পশ্চাতে দেখা যায় আমেরিকার পুঁজিসাহীদের প্রয়াস ও প্রভাব। তাহারাই জগতের উপর চাপ লাগাইয়া ইয়োরোপের নানা দেশকে দুরন্ত করিয়া তুলিতেছে।

"সাম্রাজ্য-নীতি"র বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ একটা আলোচ্য বিষয়। প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্য-সমস্যা অন্যতম। তেলের লড়াই সম্বন্ধে একটা রচনা আছে। বিদেশী পুঁজির সাহায্যে রুশিয়ার আর্থিক জীবন উন্নত হইয়া উঠিতেছে। আর্থিক জগতে মাথা খাড়া করিবার পক্ষে রুশিয়ার আর কোন পথ নাই।

সোহ্বিয়েট রুশিয়ার সমবায়

১৮৬৫ সনে রুশিয়ায় সর্ব্বপ্রথম সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দোকানদারির জন্য এই সমিতি কায়েম হইয়াছিল। ১৯১৭ পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশের মতন রুশিয়ায়ও সমবায়ের আন্দোলন অল্প-বিস্তর বাড়িতে থাকে। সেই বৎসর রুশিয়ায় বোলশেহ্বিক রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সমবায়ের আন্দোলন বরাবর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই বোলশেহ্বিক আমলে ইতিমধ্যেই সরকার পক্ষ হইতে ৩।৪টি কর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথমতঃ কায়েম হয় ষোল আনা কমুনিজম বা ধনসাম্যের নিয়ম। সমবায়-সমিতিগুলিকে বোলশেহ্বিক সরকার ধনসাম্যের মতে নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হন। দ্বিতীয়তঃ, ১৯২১ সনে গবর্ণমেণ্ট বোলশেহ্বিক নীতি শোধরাইতে বাধ্য হন। তাহার পরিবর্ত্তে রুজু হয় অনেকটা অন্যান্য দেশে সুপ্রচলিত আর্থিক নীতি। এই নূতন আর্থিক নীতি অনুসারে সমবায়-সমিতিগুলি পরিচালিত হইতে থাকে।

তৃতীয়তঃ, ১৯২৩ পর্য্যন্ত এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার পর গবর্ণমেণ্ট সমবায়-আন্দোলনকে আরও খানিকটা বেশী স্বাধীনতা দিয়াছেন।

১৯২৫ সন পর্য্যন্ত ৮।৯ বৎসরের ভিতর বোলশেহ্বিক রুশিয়ার সমবায়-আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য জেনেহ্বার আন্তর্জ্জাতিক মজুর-অফিস হইতে এক কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির অনুসন্ধান-ফল সম্প্রতি গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে (১০+৩৬২ পৃষ্ঠা, ১৯২৫)। গ্রন্থের নাম "দি কোঅপারেটিভ মুভমেণ্ট ইন্ সোহ্বিয়েট রুশিয়া।" ১৯২১ সনে নূতন আর্থিক নীতি কায়েম হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়-কেন্দ্রগুলি পুরাণা স্বাধীনতা ফিরাইয়া পায়। বর্ত্তমান গ্রন্থে দোকানদারি-বিষয়ক সমবায়-প্রথাই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কৃষি-সমবায়, শিল্প-সমবায় এবং সমবেত-ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ পড়িয়াছে। ১৯২৩ সনে রুশিয়ায় ব্যবসা-সঙ্কট ও সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক দুর্যোগ দেখা দেয়। তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বোলশেহ্বিক গবর্ণমেণ্ট সমবায়-কেন্দ্রগুলিকে অতিমাত্রায় শাসন করিবার নীতি বর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। সমবায়-সমিতিগুলিও তখন হইতে সরকারী আড়ৎ ও দোকান ছাড়িয়া অন্যত্র জিনিষপত্র খরিদ করিতে অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ সমবায়ের নীতি এই সকল সমিতি অনেক সময় রক্ষা করিয়া চলে না। তাহারা মামুলি ব্যবসাদারের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্য অনেক সময় অত্যধিক ঝুঁকি-বিশিষ্ট কারবারে লাগিতেছে।

বোলশেহ্বিক গবর্ণমেণ্ট সমবায়-সমিতির সঙ্গে মামুলি ব্যবসাদারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন্ পথে চালাইবেন তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। দুই প্রকার ব্যবসা-কেন্দ্রই গবর্ণমেণ্টের হাতে রাখিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

জাপানের শিল্প-ব্যবসা

পাশ্চাত্য দেশের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং ফিউডালিজ্‌ম বা মধ্যযুগ-মাফিক জমিদারি ব্যবস্থার ভিতরকার গলদ উপলব্ধি করিয়া জাপান সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক "ক্যাপিটালিজ্‌ম্" (পুঁজি-তন্ত্র) জাপানে খুঁটা গাড়িয়া বসে। দেখিতে দেখিতে দেশটায় রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতির সাড়া পড়িয়া যায়। কারবারে সকল প্রকার একচেটিয়া ভাব উঠাইয়া দেওয়া হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাধীন নীতি অবলম্বন করা হয়। রুশিয়া এবং চীনের বিরুদ্ধে জাপানের দুই-দুইটি লড়াইয়ে বড় রকমের জয়-লাভের ফলে তাহার শিল্পজাত মাল ও বৈদেশিক বাণিজ্য হু হু করিয়া বাড়িয়া যায়। জাপান দেশটার অদৃষ্ট খুব ভাল। বিগত বিশ্ব-লড়াই জাপানের নিকট এক সুবর্ণ-সুযোগ রূপে উপস্থিত হয়। চতুর জাপান দেখিতে পাইল গোটা ইয়োরোপ মারামারি কাটাকাটিতে হয়রাণ পরেসান। এইবার তার বড় রকমের দাঁও মারিবার সময় হাজির।

এই সুযোগে সে এক বিরাট্ ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিল। মহাযুদ্ধের রসদ যোগাইয়াছে জাপান। কেবল যুদ্ধের মাল সরবরাহ করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই। ইংরেজ যখন তার ম্যানচেষ্টার-লিভারপুলে শিল্প-কারখানা গুটাইয়া লড়াইয়ের মাঠে সৈন্য-প্রেরণ করিয়াছে, জাপান সেই সুযোগে ইংরেজের প্রাচ্য হাট-বাজার দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতে জাপানী মালের দিগ্বিজয় চলিতেছে।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দাভাব আর পর পর ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় জাপানকে কাবু করিয়া ফেলিতে পারে নাই। জাপানের আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা সমভাবেই চলিতেছে। অতগুলি

ভূমিকম্পে কোটি কোটি টাকার ধ্বংস, ব্যবসা-বাণিজ্যের দারুণ ক্ষতি কিছুতেই জাপান টলিতেছে না। জাপান এসবকেই অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। তবে কতকগুলি সমস্যা অন্যান্য দেশের মতন জাপানের সামনেও উপস্থিত। জাপানের লোকসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে বেকার লোকের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। লোকের জীবন-যাত্রার মাপকাঠি বাড়িয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই মজুরীও অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। কাঁচা মালের রসদে ঘাট্‌তি পড়িয়াছে। শিল্প-ব্যবসার চাহিদা-মাফিক কাঁচা মাল মিলিতেছে না। জাপানের রাষ্ট্রিকেরা এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য মাথা ঘামাইতেছেন।

কাগজপত্রে দেখা যায়, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ও যুদ্ধের সময় ইয়োরোপীয় দেশসমূহে জাপানী মালের কাটতি খুব বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানে আমেরিকা, চীন ও ভারতবর্ষে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত এস য়ুয়েহারা তাঁহার নবপ্রকাশিত "দি ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড্ অব্ জাপান" (জাপানের শিল্প-বাণিজ্য) গ্রন্থে (লণ্ডনের পি, এস, কিং প্রকাশিত মূল্য ১৫ শিলিঙ) জাপানের শিল্প-ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতির কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন,—

(১) বস্ত্র-শিল্পে যে ধরণের কর্ম্মকৌশল দরকার তাহা জাপানী মজুরদের সম্পূর্ণ উপযোগী।

(২) মজুরীর হার কম। প্রধানতঃ অল্প মাহিয়ানার স্ত্রী-মজুরদ্বারা নিম্নশ্রেণীর কাজ করান হয়। তাহাতে উৎপাদনের খরচা কম পড়ে।

(৩) জাপান দেশটা চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বড় বড় খরিদ্দার দেশের নিকট অবস্থিত।

(৪) জাপানের শুল্ক-ব্যবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে বেশ কার্য্যকরী। তাহা ছাড়া রপ্তানি মালের দর পড়িয়া গেলে আভ্যন্তরীণ দর চড়াইয়া জাপানী শুল্ক-নীতি স্বদেশী শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করে।

(৫) জাপানের বিরাট্ সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি রপ্তানি-বাণিজ্যের বিস্তার-সাধনের সহায়ক।

এই সকল কারণে জাপান ল্যাঙ্কাশিয়ারে প্রস্তুত দ্রব্যাদি প্রাচ্যের হাট-বাজার হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজে সেগুলি দখল করিয়া বসিতে সমর্থ হইতেছে এবং জাপানী মিলগুলি অংশীদারগণকে মোটা হারে লভ্যাংশ দিতে পারিতেছে। বিদেশী রপ্তানি মালের দর পড়িয়া গেলেও তাহারা যোট করিয়া ও সরকারী সাহায্যে আভ্যন্তরীণ দর চড়াইয়া বস্ত্র-শিল্পের ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে।

জাপানের লৌহ-শিল্পের অবস্থা ততটা সুবিধাজনক নয়। কাঁচা মালের যোগান চলিতেছে না। জ্বালানি মাল-মশলার অভাব। ওদিকে চীন, ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ-শিল্প দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। এসকল দেশের সঙ্গে জাপানকে ভীষণ প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর গড়া নবীন জাপানের উন্নতি সম্বন্ধে লেখক নিম্নলিখিত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) জাপান-সরকার পাশ্চাত্য প্রণালীতে স্বদেশের আর্থিক ব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

(২) দুই দুইটি লড়াইয়ে জয়লাভ।

(৩) শুল্ক-ব্যবস্থায় সুদৃঢ় সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্ত্তন।

(৪) বিগত মহাযুদ্ধে জাপানের শিল্প-ব্যবসা বাড়াইবার মহাসুযোগ।

(৫) জাপানে অল্প পারিশ্রমিকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মজুর পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে য়ুয়েহারার মতে জাপানের শিল্প-মহলে কিছু মন্দাভাব

যাইতেছে। কলকারখানার আর্থিক স্বচ্ছলতা নাই। হাল ফ্যাশানের কলকব্জার জাপানী শিল্প-কারখানায় আরও বেশী ব্যবহার হওয়া আবশ্যক। মজুরদের শিল্প-শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো দরকার। তিনি আরও বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ত্তমান সংরক্ষণ-নীতি কিছু শিথিল করিয়া দেওয়া উচিত। কাঁচা মাল ও খাদ্যশস্যের উপর নির্দ্ধারিত কর উঠাইয়া দেওয়া চাই।

বিলাতে আর্থিক ইতিহাসের ইজ্জৎ

আর্থিক ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে লিলিয়ান নোল্‌স্ বিলাতের একজন নামজাদা লোক ছিলেন। "লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌স্" নামক লণ্ডনবিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ধন-বিজ্ঞানবিদ্যালয়ে আজকাল এই বিভাগে যতটা উৎকর্ষ দেখা যায় নোল্‌স্ তাহার অন্যতম প্রধান উৎস। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নোল্‌সের নামে একটা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আর্থিক ইতিহাসঘটিত কোন বিষয়ে গবেষণা চালাইবার জন্য বৃত্তিটা দেওয়া হইবে।

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ্জ আনুইনও আর্থিক ইতিহাস বিদ্যায় ইংরাজি ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের অন্যতম বড় খুঁটা ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে সেই সব একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার আয়োজন চলিতেছে। সম্পাদক হইয়াছেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টনে। আনুইনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে নানা কথা বর্ত্তমান লেখক প্রণীত "ইংরেজের জন্মভূমি" গ্রন্থে বিবৃত আছে।

অর্থনৈতিক চিন্তার নমুনা

আর্থিক জীবন এক বস্তু; আর্থিক জীবন-বিষয়ক চিন্তা আর এক বস্তু। আর্থিক ইতিহাস বলিলে আর্থিক জীবনের ইতিহাস বুঝায়। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্রম-বিকাশ, ব্যাঙ্কিং, বীমা ব্যবসায়ি-সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-অবনতি এই ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু অর্থনৈতিক মতবাদের ইতিহাসকে আর্থিক জীবন-বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তারাশি বুঝিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত আর্থিক ব্যবস্থা, টাকাকড়ির লেন-দেন, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের গতিবিধি, ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের জীবন-কথা সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, সেই মত এবং চিন্তাগুলা ছাড়া এই সাহিত্যের আর কোন আলোচ্য বিষয় নাই। এক কথায় এই সাহিত্যটা দর্শনের অন্যতম বিভাগ। ধন-বিজ্ঞানের ইতিহাস বলিলেও এই সাহিত্যের স্বরূপ বিবৃত করা হয়।

আমাদের দেশে এই ধরণের সাহিত্য কিছুকাল ধরিয়া ফরাসী পণ্ডিত জিদ এবং রিস্ত্ প্রণীত "হিষ্টরি অব ইকনমিক ডকট্রিনস" নামক গ্রন্থের ইংরাজি তর্জ্জমায় মূর্ত্তি পাইয়া আসিতেছে। মার্কিণ পণ্ডিত হেণী প্রণীত গ্রন্থও সুপরিচিত। তবে উচ্চশিক্ষিত জনসাধারণের ভিতর এই গ্রন্থ দুইটার কোন কোন অধ্যায় বাঙলায় প্রচারিত হইলে বাঙালীর মাথা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

ধন-বিজ্ঞানের ফরাসী ইতিহাস

সম্প্রতি একখানা ফরাসী গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহার ইংরাজি তর্জ্জমা এখনো হয় নাই। লেককের নাম গোনার। গ্রন্থ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ (২৯২, ৩১৯, ৬৬৫ পৃঃ)। ১৯২১-২২ সনে বাহির হইয়াছে, "ইস্তো-আর দে দোক্‌ত্রিন্‌ জেকোনোমিক" (অর্থনৈতিক মতবাদের ইতিহাস) নামে। প্রকাশক নুভেল লিব্রেয়ারি ন্যাশন্যাল (প্যারিস)।

প্রথম খণ্ডে আছে মান্ধাতার আমলের পণ্ডিতগণের চিন্তারাশি। গ্রীক, রোমাণ, মধ্যযুগের ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ান এবং পরবর্ত্তী কালের "মার্ক্যানটাইল" ("ব্যবসায়ী") পন্থী লেখকদের মতামত। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মতবাদের বিশ্লেষণে বা ইতিহাসে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই খণ্ড বিশেষ কাজে লাগিবে।

দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় "ফিজিঅক্র্যাট" (প্রকৃতি-তন্ত্রবাদী) এবং "ক্লাসিক্যাল" (এক কথায় যাহাকে বলা যায় বর্ত্তমান ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার জন্মদাতার দল) মতের রচনাবলী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই সাহিত্যের সীমানা।

তৃতীয় খণ্ডে আছে বর্ত্তমান যুগ অর্থাৎ বিগত ৫০।৬০ বৎসরের পণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারকদের চিন্তা-প্রণালী এবং ধরণ-ধারণ ও দার্শনিক কাঠাম। জিদ ও রিস্ত প্রণীত গ্রন্থের শেষ তৃতীয়াংশে যে সকল কথা আছে তাহারই বিশেষ বৃত্তান্ত এই খণ্ডে পাওয়া যায়। যুবক বাঙলাকে এই অংশের মালের সঙ্গেই বর্ত্তমানে গভীর ভাবে পরিচিত হইতে হইবে। এই যুগকে প্রধানতঃ "সোশ্যালিষ্টিক" (সমাজ-তন্ত্রনিষ্ঠ) এবং "রিয়ালিষ্টিক" (বস্তুনিষ্ঠ) রূপে বিবৃত করা হয়।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সৎসাহিত্যের সারাংশ প্রকাশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা বাহির হওয়া আবশ্যক। সকল বইয়েরই অনুবাদ বাহির করা সোজা নয়। খরচপত্রের মামলা ত আছেই তাহার উপর আছে "কপিরাইটের" হাঙ্গামা।

কিন্তু সমালোচনার আকারে শ'তিনেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বইয়ের সংক্ষিপ্ত সার কোনো মাসিকের দুই তিন সংখ্যায় ছাপা যাইতে পারে। পৃষ্ঠা ত্রিশেকের মাল পাইলে বইয়ের চুম্বক বেশ সরস ভাবে পাইবার কথা। তাহাতে বোধ হয় কপিরাইটও মারা যায় না আর হাজার হাজার বাঙালীর

পেটেও হোমিওপ্যাথিক ডোজে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আসিয়া হাজির হইতে পারে।

বাঙলা মাসিকের সাহায্যেই বাঙালীকে বর্ত্তমান-নিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হইবে। যাঁহারা দিনে এক ঘণ্টা বা সপ্তাহে চার ঘণ্টা মাত্র লেখাপড়ায় খরচ করিতে সমর্থ তাঁহারা নিজ নিজ লাইনে নামজাদা গ্রন্থকারদের রচনাবলী ধারাবাহিকরূপে বাঙলায় বাঁটিতে সুরু করুন। বিদেশী উচ্চ সাহিত্য বাঙলায় বাহির হইতে থাকিলে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্ এ পড়িবার সুযোগ পান না, তাঁহারা ঘরে বসিয়াই এম্ এ পড়ার ফল পাইবেন।

হাজার হাজার বাঙালীকে একসঙ্গে এম্ এ পড়াইতে হইলে বাঙলা মাসিককে উন্নত করিয়া তোলা দরকার। ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার সেবকেরা মাসিকের সেবায় প্রবৃত্ত হইলে এক দিক্ হইতে আমাদের অভাব খানিকটা পূরণ হইতে পারিবে।

তথ্য-তালিকার আলোচনা-প্রণালী

১৯১৯ সনে ইতালিয়ান অধ্যাপক নিচেফর 'লা মেজুরে দেল্লা ভিতা' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই বহির ফরাসী তর্জ্জমা বাহির হইয়াছে, (প্যারিস ১৯২৫, ৬১২ পৃষ্ঠা)।

নিচেফর ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিদ্যাটা একসঙ্গে নানা তরফ হইতে আলোচনা করিবার পক্ষপাতী। তিনি দুনিয়ার সকল তথ্য, বিশেষভাবে জীবনের কথাগুলি, মাপিয়া জুকিয়া বুঝিবার জন্য সচেষ্ট। যাহা কিছু সংখ্যার সাহায্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব তাহার কিছুই তিনি ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিদ্যা হইতে বাদ দিতে রাজী নন। গাছ-পাথর ইত্যাদি বস্তুর তো কথাই নাই, এমন কি সুকুমার শিল্প এবং সাহিত্যও তাঁহার মাপকাটি হইতে বাদ যায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মান্ধাতার আমলের ল্যাটিন কবি হরেস্

এবং আনাক্রেয়ন্ ইত্যাদি কবির কাব্যগুলির দৈর্ঘ্য ও নীচেফরের সংখ্যা-বিজ্ঞানে মাপজোক করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন চিত্রকরের দল যে সকল ছবি আঁকিয়াছেন তাহাও গুণিয়া দেখা হইয়াছে। ফরাসী কবি বোদলেয়ার প্রণীত চতুর্দ্দশপদী কবিতা-সমূহে রং-বাচক শব্দ কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও নিচেফর গুণিয়া দেখিয়াছেন। ফরাসী গল্পবীর বাল্জাক যৌবনের রচনায় বাক্যগুলি কত বড় বড় লিখিতেন তাহাও মাপা হইয়াছে। প্রবীণ বয়সের বাল্জাক গ্রন্থ লিখিবার সময় বাক্যগুলির বহর কতখানি রাখিতেন তাহার সঙ্গে সেগুলির তুলনা করা হইয়াছে। অবশ্য নিচেফর এই ধরণের সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বকে মাপিয়া জুকিয়া বিশ্লেষণ করিবার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বক্তব্য সে সম্বন্ধেও অন্ধ নহেন। সংখ্যা-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা ও সীমানা সম্বন্ধে তাঁহার টনটনে জ্ঞান আছে। ফরাসী ভাষায় গ্রন্থের নাম "লামেতদ স্তাতিস্তিক"।

অঙ্ক-নিষ্ঠা

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যা শিখাইবার জন্য যে সকল অধ্যাপক বাহাল আছেন তাঁহারা লণ্ডনে এক সম্মেলন বসাইয়াছিলেন। এই হইতেছে চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান (১৯২৭)। ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যা শিখাইবার প্রণালী সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়। তাহার একটায় অধ্যাপক বোলে বলিয়াছেন :—তথ্য ও অঙ্কের হিস্যা বাড়াইয়া দেওয়া দরকার। দেশের ভিতরকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদিগকে সেই সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তোলা বাঞ্ছনীয়।"

ধনোৎপাদনের তত্ত্বকথা

য়েনার গুস্টাভ ফিশার কোম্পানী "গেশিষ্টে ড্যর প্রোডুক্টিভটোট্স্-টেওরী" (ধনোৎপাদন-তত্ত্বের ইতিহাস) নামে ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

একখানা বই প্রকাশ করিয়াছে (১৯২৬)। লেখক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাক্সা।

ধনোৎপাদন কাহাকে বলে? সমাজের কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক ধন-স্রষ্টারূপে বিবৃত হইবার যোগ্য? প্রশ্নগুলা নেহাৎ ছেলেখেলা মনে হইতেছে। কিন্তু এই সমুদয়ের জবাব লইয়াও লড়াই চলিয়া আসিতেছে।

দার্শনিকদের ভিতর এমন অনেক পণ্ডিত ছিলেন যাঁহারা বলিতেন যে, চাষ-আবাদই ধনসৃষ্টির একমাত্র উপায়। তাঁহাদের মতে চাষীরাই একমাত্র ধন-স্রষ্টা। ফ্রান্সের "ফিজিওক্রাৎ" বা প্রকৃতিপন্থী দল এই মতের প্রচারক ছিলেন।

আর এক প্রকার পণ্ডিতের মতে সোণা-রূপাই হইতেছে একমাত্র ধন। তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে, ধনোৎপাদন বলিলে বুঝিতে হইবে সেই সকল মেহনত, যার ফলে বিদেশে মাল পাঠাইয়া সোণা-রূপা আমদানি করা সম্ভব। আর্থিক দর্শনের ইতিহাসে তাঁহারা "মার্ক্যাণ্টিলিষ্ট" নামে পরিচিত। এই সকল পণ্ডিতকে সহজে "বাণিজ্য-পন্থী" বা "বাণিজ্যবাদী" বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে এই দুই শ্রেণীর পণ্ডিতকেই আহাম্মুক বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এমন কি বিলাতী,—এবং অনেকটা গোটা দুনিয়ারই,—ধন-বিজ্ঞান শাস্ত্রের জন্মদাতা অ্যাডাম স্মিথকেও আজকালকার দিনে বেকুব বলিবার রেওয়াজ দেখা যায়। কেননা তিনিও নরনারীর বহুসংখ্যক কাজকর্ম্মকে ধনোৎপাদনের কোঠার বাহিরে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি চরমপন্থী প্রকৃতিবাদীদের ধনোৎপাদন-তত্ত্বটা পুরাপুরি হজম করেন নাই। তবে তাঁহাদের মতটাই প্রকারান্তরে বাজারে চালাইয়া যাওয়া অ্যাডাম স্মিথের অন্যতম কীর্ত্তি। শিল্প-কর্ম্ম, কারিগরি, তেজারতি-ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির সঙ্গে অসহযোগ প্রচার করা তাঁহার মতলব ছিল না। কিন্তু চাষ-আবাদকেই তিনি বেশীমাত্রায় ধনোৎপাদক সমঝিতেন।

এই দার্শনিক আলোচনার গর্ত্তে অনেক পণ্ডিতই পড়িয়াছেন। কোন নির্দ্দিষ্ট এক বা দুই প্রকার শ্রমকে ধনোৎপাদক রূপে জাহির করিতে গিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, পুরুতগিরি ধনোৎপাদক নয়। এইরূপে সন্তানের জন্য জননীর মেহনতও ধনোৎপাদনের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত উকিল-ডাক্তার-ফৌজ-সরকারী-চাকুরো-কেরাণী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোককেই "অকর্ম্মণ্য" "কুঁড়ে" বলিয়া ধনোৎপাদকের দলে ঠাঁই দেন নাই। আর ইস্কুলমাষ্টার বেচারারা ত,—কি একালে কি সেকালে,—সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গরু বটেই।

বর্ত্তমান জগতের পণ্ডিতরা আর এরূপ আহাম্মুকি চালাইতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা, কে ধন-স্রষ্টা আর কে ধন-স্রষ্টা নয় এই বিষয় লইয়া অতিমাত্রায় মাতামাতি করেন না। বাণিজ্যকে বাণিজ্য, শিল্পকে শিল্প, চাষকে চাষ, চাকরীকে চাকরী,—সবই ধনোৎপাদন, সবই ধনসৃষ্টির সহায়। এই হইতেছে মোটের উপর সকলেরই ধারণা।

জার্ম্মাণ পণ্ডিত বাক্‌সা সেকালের "বাণিজ্যবাদী", "প্রকৃতীবাদী" হইতে সুরু করিয়া ইংরেজ অ্যাডাম স্মিথ, ফরাসী সে, আর মার্কিণ কেরী পর্য্যন্ত সকলেরই মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে এই নাম-গুলা অপরিচিত নয়। কিন্তু জার্ম্মাণ বইয়ে জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের নামই বেশী। ফিখ্‌টে, সোডেন, ম্যিলার, য়াকোব, হেগেল, ট্যর্ক, হার্ম্মাণ, লিষ্ট, রাও, রশার এবং মার্ক্‌স্‌—এই সকল নামের দু'একটা মাত্র ভারতে জানা আছে। আর এই সব সম্বন্ধেও জ্ঞান আমাদের যার পর নাই ভাসাভাসা।

সোডেন এবং ম্যিলারকে বাক্‌সা অনেক উঁচুতে তুলিয়াছেন। কিন্তু এই দুইজনের নাম বিলাতী-মার্কিণ আর ইতালিয়ান-ফরাসী সমাজেও বিশেষ পরিচিত নয়। ম্যিলার জার্ম্মাণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞান বিদ্যার এক প্রকার আদিগুরু। তাঁহার মতামত সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি"

সম্পাদকের কোন কোন ইংরাজি রচনায় আলোচনা আছে। কিন্তু সোডেন একপ্রকার অজ্ঞাত। বাক্‌সা বলিতেছেন,—"ধনবিজ্ঞান বিদ্যার পণ্ডিতেরা ধনদৌলত জিনিষটাকে সাধারণতঃ অতিমাত্র ভৌতিক বা জড় বস্তু সমঝিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর অ-ভৌতিক অর্থাৎ আত্মিক অংশও আছে। একথা প্রধানতঃ জার্ম্মাণ-চিন্তায় ধরা পড়িয়াছে। এই তরফের বিশ্লেষণে সোডেন এবং মিলার বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন।"

ইংরাজি ধন-বিজ্ঞান-পত্রিকায় বাক্‌সার বই সমালোচনা করিতে গিয়া একজন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন,—"বাক্‌সা বিদেশী পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বটে। কিন্তু জার্ম্মাণ তর্জ্জমা ছাড়া তিনি মূলের খবর রাখেন না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল আর ম্যাককালক সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের সীমা একটা আলটপ্‌কা নজিরমাত্রে আবদ্ধ। আর ইংরেজ ধন-দর্শনের ধারা সম্বন্ধে তাঁহার বিদ্যা রিকার্ডো পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছে।"

এই সমালোচনার মাপকাঠিতে যুবক ভারতের পাণ্ডিত্য কতখানি?

ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার দেড় শ' বৎসর

ইংরেজ দার্শনিক অ্যাডাম স্মিথ প্রণীত "ওয়েল্‌থ্‌ অব নেশ্যন্‌স্‌" (দুনিয়ার ধনদৌলত) ঐতিহাসিক হিসাবে ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার ঋগ্‌বেদ-স্বরূপ। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এই কেতাব বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক সাহিত্যে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহারা এই গ্রন্থকেই নিজেদের "গ্রন্থসাহেব" বিবেচনা করিয়া থাকেন। কম সে কম বিলাতে আর আমেরিকায় এই দস্তুর। ফরাসীরা অ্যাডাম স্মিথকে একদম আদি গুরু সমঝিতে অভ্যস্ত নয়। তবে জার্ম্মাণিতে এই বিষয়ে কোন আপত্তি দেখা যায় না।

১৭৭৬ সন হইতে আজ দেড়শ' বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া

গেল। "দুনিয়ার ধনদৌলত" গ্রন্থের "জয়ন্তী" স্বরূপ কয়েকটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। অধ্যাপক হল্যাণ্ডার "মত-প্রবর্ত্তক অ্যাডাম স্মিথ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। অ্যাডাম স্মিথের মতামত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার জন্য বক্তৃতা করিয়াছেন অধ্যাপক জন মরিস ক্লার্ক। অধ্যাপক ডগলাস "অ্যাডাম স্মিথ-প্রচারিত মূল্যবিজ্ঞান ও ধন-বণ্টননীতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। অধ্যাপক হ্বিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল "অ্যাডাম স্মিথের অবাধ আর্থিক নীতি।" বক্তৃতাগুলা পুস্তকাকারে বাহির হইতেছে।

ধন-বিজ্ঞানের জার্ম্মাণ-মূর্ত্তি

ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিলে জার্ম্মাণরা সচরাচর যাহা বুঝিয়া থাকে ওপ্পেনহাইমার-প্রণীত এক গ্রন্থ তাহার এক সেরা নমুনা। লেখক ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সমাজ-তত্ত্ববিৎ রূপে ওপ্পেনহাইমারের নামডাক বড়। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার "সিষ্টেম ড্যর সোৎসিওলোগী" (সমাজ-বিজ্ঞান) বিষয়ক বিপুল চিন্তা-সৌধের অন্যতম খুঁটা (প্রথম খণ্ড ২৫+৩৩৭ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩+৮০৯ পৃষ্ঠা, ১৯২৩-২৪)।

ফ্রান্সে, বিলাতে এবং ইতালিতে "ধন-বিজ্ঞান" শব্দের জন্য "একনমী" "ইকনমিক্‌স" "একনমিয়া" ইত্যাদি শব্দ কায়েম হইয়া থাকে। জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ তাহার জন্য "ফোল্‌ক্‌স্‌-হ্বির্টশাফ্‌টস্‌-লেরে" (সার্ব্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা-বিষয়ক বিদ্যা) নাম ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। কোন কোন জার্ম্মাণ লেখক "এ্যকোনোমী" শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। ওপ্পেন-হাইমার তাঁহাদের অন্যতম।

কিন্তু ওপ্পেনহাইমারের বইয়ের নামে একটা বিশেষত্ব আছে। জার্ম্মাণির আর্থিক সাহিত্য বুঝিবার জন্য এই বিশেষত্বটার দিকে দৃষ্টি রাখা

আবশুক। ফরাসীরা "একোনোমী পোলিটিক" আর ইংরেজরা "পোলিটি-ক্যাল ইকনমি" নাম ব্যবহার করিবার সময় "পোলিটিক্যাল" (রাষ্ট্রীয়) বিশেষণটার ইজ্জৎ বড় বেশী দেয় না। "ইকনমিক্স্" আর "পোলিটিক্যাল ইকনমি" দু-ইই তাঁহাদের চিন্তায় প্রায় একরূপ। কিন্তু জার্মাণরা "পোলিটিশেন" শব্দ ব্যবহার করিবামাত্র তাহা হইতে পৃথক অ-পোলিটি-ক্যাল (অ-রাষ্ট্রীয়) অতএব "রাইণ" (অর্থাৎ অমিশ্র) একটা কিছু খাড়া করিতে অভ্যস্ত। আর্থিক ব্যবস্থা ("হ্বির্টশাফ্ট্") বিষয়ক "লেরে" বা বিদ্যাটা জার্মাণ চিন্তায় দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ইহা অমিশ্র বা স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্য কোন বিদ্যার আনুষঙ্গিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এই বিদ্যাব অন্তর্গত বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। অতএব সেই দিক্ হইতেও এই বিদ্যার আলাদা আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এই দুই ধরণের বিদ্যাই ওপ্পেনহাইমারের গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের আরম্ভেই গ্রন্থকার বিদ্যার "তত্ত্বাংশ" এবং "কলা" এই বস্তুর প্রভেদ বিচার করিয়াছেন। "ধন-বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা" কি তাহার বিশ্লেষণ আছে। এই তত্ত্বের "সীমানা" কোথায় তাহা জানান হইয়াছে। "সমাজ" কাহাকে বলে এবং "আর্থিক ব্যবস্থার বহির্ভূত" সমাজ-জীবনে যাহা কিছু থাকিতে পারে তাহার উল্লেখও বাদ পড়ে নাই। পরে আলোচিত হইয়াছে আর্থিক উদ্দেশ্য সাধনের বিভিন্ন উপায়সমূহ। এইগুলা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত :—(১) রাজনৈতিক, (২) অর্থনৈতিক।

এই গেল ভূমিকা। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে আলোচনা-প্রণালী। ধন-বিজ্ঞানের সমস্যাগুলা কোন্ কোন্ প্রণালীতে কিরূপ আলোচিত হয় তাহার পরিচয় পাইতেছি। আলোচনা-প্রণালীর ক্রম-বিকাশ দেখান হইয়াছে। প্রথমেই আছে "ক্লাসিক্যাল" প্রণালীর কথা। তারপর আছে "ঐতিহাসিক" প্রণালীর কথা। "ঐতিহাসিক"-পন্থীরা "ক্লাসিক"-পন্থীদিগকে কিরূপ সমালোচনা করিয়া থাকে তাহার বৃত্তান্ত

আছে। বিজ্ঞান-রাজ্যের এই "দ্বন্দ্ব" কেমন করিয়া সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাও বিবৃত হইয়াছে।

"আর্থিক সমাজ-কেন্দ্র" অথবা আর্থিক ব্যবস্থার সমাজ কেমন করিয়া স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে তাহার আলোচনা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। "সমবায়"-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। শ্রম-বিভাগ, শ্রেণী-বিভাগ, কর্ম্ম-বিভাগ একদিকে, আর অপর দিকে শৃঙ্খলাবিধান, ঐক্যবন্ধন, সামঞ্জস্য-স্থাপন ইত্যাদি সমাজ-জীবনের দুই তরফই যথোচিত উল্লেখ পাইয়াছে। এই ক্রমবিকাশের নিট্ ফল কি তাহাও বুঝান হইয়াছে। "সৃষ্টি"-প্রণালীর নিয়ম আর সৃষ্টি করিবার "শক্তিপুঞ্জ" এই উভয় দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। সমাজে শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে কি কি বস্তু দেখিতে পাই? প্রথমতঃ, ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র পরিবার, দ্বিতীয়তঃ, পরিবার বৃদ্ধি, এবং তৃতীয়তঃ, বাজার।

প্রথম খণ্ড এইখানেই খতম। এই সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র হইতে অন্ততঃ এইটুকু আন্দাজ করা চলিবে যে, জার্ম্মাণির ছাত্র-ছাত্রারা ধন-বিজ্ঞান হিসাবে যে মাল হজম করিতে অভ্যস্ত ইংরেজ ও মার্কিণ পণ্ডিতদের ভারতীয় শিষ্যেরা তাহাকে সচরাচর ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত করিতে শিখে না।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে গ্রন্থকার ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে বিদেশী মজুর-কেরাণীর কথা আলোচিত হইয়াছে। আর্থিক সমাজের উচ্চতর কর্ম্মচারীদের কৃতিত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে। কর্ম্ম-কেন্দ্রের সকল প্রকার লোকজনের পরস্পর আইনগত সম্বন্ধও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে "গ্যিটার আৎসয়গুঙ্" (ধনোৎপাদন)। মানবীয় সৃষ্টি-কার্য্যে এই "ধনোৎপাদন"ই একমাত্র বস্তু নয়। মাল-বিনিময় এবং যান-বাহন এই দুই প্রক্রিয়ার সাহায্যেও "সৃষ্টি" ঘটিয়া থাকে। ধন সৃষ্ট হইবার পর তাহার শাসন, স্বত্ব

ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা প্রকার প্রশ্ন উঠে। এই সম্পর্কে সম্পত্তি-বিষয়ক আইন, আয়ের নিয়ম, ধনদৌলতের ভাগাভাগি ইত্যাদি তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় "ন্যাট্সিওনাল এ্যকো-নোমিক" (অর্থাৎ সঙ্ঘগত আর্থিক ব্যবস্থা)। পূর্ব্বের আলোচিত ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থা হইতে এই ব্যবস্থা পৃথক। এই আলোচনার গোড়ার কথা "বাজার"। বাজারের কথা,—বাজারে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার বিঘ্নস্বরূপ যে সব শক্তি দেখা দেয়,—যথা একচেটিয়া প্রভুত্ব, তাহার বিশ্লেষণও দেখিতেছি। বাজার-বিশ্লেষণের প্রথম তথ্য প্রতিযোগী শক্তিসমূহের "সমতা"-বিধান। এই সমতার উপর আর্থিক কর্ম্মগুলের "স্থিতি" প্রতিষ্ঠিত। সমতা ও স্থিতির আলোচনাই "মূল্য"-বিজ্ঞানের আসল কথা। সেই সকল কথা গ্রন্থে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিতও হইয়াছে।

মামুলি দ্রব্যের দাম বিশ্লেষণ করিবার পর ওপ্পেনহাইমার মূলধনের কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক দ্রব্যেরই এক একটা স্থিতি-সমতার অবস্থা আছে সত্য। কিন্তু দ্রব্যগুলার ভিতর পরস্পর-সংযোগের ক্ষেত্রে আর একপ্রকার স্থিতি-সমতার অবস্থা আসিয়া দেখা দেয়। এই তুলনামূলক এবং আপেক্ষিক স্থিতি-সমতার সম্বন্ধ আলোচনা না করিলে মূল্য-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। ওপ্পেনহাইমার সেই অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। আলোচনার প্রণালী নিম্নরূপ। প্রথমে গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন মালের সঙ্গে তুলনায় প্রত্যেক মালের দাম-সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পর দেখান হইয়াছে টাকার হিসাবে মালের দাম এবং মালের হিসাবে টাকার দাম। সঙ্গে সঙ্গে টাকার বাজারে কর্জ্জ নেওয়া-দেওয়ার প্রভাব বিশ্লেষিত হইয়াছে। বাজার, তুলনামূলক স্থিতি, বিনিময়, ও মূল্য ইত্যাদি যে

দুনিয়ায় প্রভাবশালী সেই দুনিয়ায় আর্থিক ব্যবস্থা শ্রমবিভাগ-নীতির জন্মদাতা। ধনবিজ্ঞানে কাজেই শ্রমবিভাগের কথা এক বড় ঘর অধিকার করে। শ্রমবিভাগ ঘটিয়া থাকে প্রধানতঃ দুই দফায়,—প্রথমতঃ, স্থান বা জনপদ হিসাবে, দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা বা কর্ম্মহিসাবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে মাল-সৃষ্টির কাণ্ডে এবং মাল-বিতরণের কাণ্ডে দুই দিকেই শ্রমবিভাগ-নীতির প্রভাব-বিশ্লেষণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষ কথা "কাপিটালিস্‌মুস্‌" বা পুঁজিনীতি। বর্ত্তমান জগতে আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বড় বড় ধন-পুঁজির তাঁবে। তাহার প্রভাব বাজার-বিজ্ঞানের উপর অতি প্রবল। কি শ্রমবিভাগ, কি মূল্য সর্ব্বত্রই কতকগুলা আত্ম-শাসনের বিরোধী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। আর্থিক কর্ম্মকেন্দ্রের কোন অনুষ্ঠানই একমাত্র নিজের প্রভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। কাজেই পুঁজিপতিদের চিত্তে আর্থিক দুনিয়া সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তা জাগিয়াছে। মাল কিনিবার ক্ষমতায় জটিলতা প্রবেশ করিয়াছে। কাজে কাজেই মাল-বিতরণের কাণ্ড নেহাৎ সহজ ও সরল নয়। লাভ-লোকসানের হিসাব করা আজকাল বড় কঠিন। সুতরাং মাল-সৃষ্টির কাণ্ড যার পর নাই গোলমেলে। মুদ্রা-সমস্যা বর্ত্তমান যুগের এক বড় তথ্য। এই সমস্যা আর্থিক দুনিয়ার মাল-চলাচল-কাণ্ডকে বিশেষরূপেই দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর দু'চার বৎসরের ভিতর একবার করিয়া জগতের সর্ব্বত্র এক একটা "হ্বির্টশাফ্‌ট্‌স্‌-ক্রিজে" (আর্থিক সঙ্কট) দেখা দেয়। ফলতঃ মাল-সৃষ্টির সঙ্গে মাল-বিতরণের এক বিরোধ আসিয়া জুটে। "কাপিটালিসমুসের" এই সমুদয় লক্ষণ বিশ্লেষণ করা ওপ্পেনহাইমারের কতকগুলা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

পুঁজিনীতির ক্রমবিকাশ দেখান হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধনবিজ্ঞান-সেবীদের চিন্তার ধারা কিরূপ ছিল তাহা বুঝান হইয়াছে। ম্যাল্‌থাস্‌, রিকার্ডো ইত্যাদি কেহই বাদ যান নাই।

পরবর্ত্তী যুগের জন্য কার্ল মার্ক্স্‌কে প্রধান স্তম্ভ বিবেচনা করা হইয়াছে। অবশেষে পুঁজিনীতির বর্ত্তমান স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

ওপ্পেনহাইমারের মতামত খতাইয়া দেখা হইল না। জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানের কাঠামটা বুঝিবার জন্য সম্প্রতি একখানা বইয়ের আলোচনা-রীতি ছুঁইয়া রাখা গেল মাত্র।

ফরাসী ধন-বিজ্ঞানের কেতাব

প্যারিসের জিয়ার কোং হইতে অধ্যাপক অঁাসিও প্রণীত "ত্রেঁতে দেকোনোমী পোলিটিক" (ধনবিজ্ঞান) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৬)। মূল্য ৬০ ফ্রাঁ। ফরাসীরা সরস রচনায় সিদ্ধহস্ত। অধিকন্তু বাস্তব জীবনের তথ্য হইতে অতি দূরে সরিয়া গিয়া ধন-সম্পদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা তাঁহাদের রেওয়াজ নয়।

বর্ত্তমান খণ্ডে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার ভিতর কয়েকটা উল্লেখ করা যাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব-কথা বিবৃত হইয়াছে। অঁাসিও বলিতেছেন,—"আর্থিক দুনিয়ায় একঘরো হইয়া জীবন কাটানো অসম্ভব। জগতের নানা লোকের সঙ্গে মালের আদান-প্রদান অবশ্যম্ভাবী। ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া মানব-জাতিকে কলা দেখানো কখনই চলিতে পারে না।"

সংরক্ষণ-শুল্ক সম্বন্ধে গ্রন্থকারের রায় নিম্নরূপ:—"ইহাতে দেশের গরীব লোকের ক্ষতি হয়। আটপৌরে জিনিষের জন্য বেশী দাম দিতে হয়। কাজেই সমাজে বহু অনিষ্ট ঘটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জগতের সর্ব্বত্রই সংরক্ষণ-নীতি চলিতেছে। তাহার কারণ এই যে,—জগতে শিল্পোন্নতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এত দ্রুত ঘটিতেছে যে, সংরক্ষণের কু-গুলা

টাকা পড়িতেছে।” অবাধ-বাণিজ্য-নীতির স্বপক্ষে যাহা কিছু বলা সম্ভব আঁসিও সবই বলিয়াছেন।

আর্থিক জগতের “সঙ্কট”-বিশ্লেষণ বর্ত্তমান গ্রন্থের একটা প্রধান জিনিষ। আর্থিক “চক্রের” বিভিন্ন অবস্থা বিবৃত হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় “দেদার মজা,” তাহার পর “ভঙ্গকট” ও অবসাদ এবং শেষ পর্য্যন্ত আবার “স্থিতি-সাম্যে” পুনর্গমন—এই হইতেছে আর্থিক উঠা-নামার ধারা। এই ধারার নানা কারণ সংক্ষেপে বুঝানো হইয়াছে।

টাকা-কড়ির আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য-তত্ত্ব গ্রন্থের অনেক ঠাঁই জুড়িয়াছে। আঁসিও বলিতেছেন,—“চল্‌তি টাকার পরিমাণ বাড়িলে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়ে। মুদ্রা-তত্ত্বের পরিমাণ-পন্থীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য অসত্য নয়। কিন্তু দ্রব্যের দাম বাড়িলে টাকার পরিমাণ বাড়ানো দরকার হয় না কি? ধরা যাউক যেন, বিদেশের সঙ্গে লেন-দেনের দরুণ দেশী মুদ্রার দাম কমিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বেশী টাকা না দিলে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় দেশী মুদ্রার পরিমাণ না বাড়াইলে বেশী দামের দ্রব্য কেনা-বেচা অসম্ভব।”

সমাজ-তত্ত্বের জার্ম্মাণ ধারা

জার্ম্মাণ অধ্যাপক রবার্ট মিকেল্‌স্ “রাষ্ট্রীয় দল” নামক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে পরিচিত। সেই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ আমেরিকায় বাহির হইয়াছে ১৯১৫ সনে। সম্প্রতি তাঁহার “সোৎসিওলোগী আল্‌জ্ গেজেলশাফ্‌টস্-হ্বিস্‌সেন্‌শাফ্‌ট” গ্রন্থ বাহির হইয়াছে (১৯২৬)। প্রকাশক বার্লিনের সোরিট্‌সিউস কোম্পানী। এই ১৫১ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রন্থে মাল ঠাসা আছে অনেক।

গ্রন্থকার ইতালিয়ান সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্যতম জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ।

বর্ত্তমান কেতাবে জার্ম্মাণি ও ইতালির সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানসমূহ সুবিবৃত আছে। এইগুলার উপর সমালোচনা এবং দার্শনিক টীকাটিপ্পনীও কম নাই। বস্তুতঃ আধুনিক ইয়োরোপে সমাজ-বিদ্যা বলিলে কি বুঝা যায় তাহা দখল করিবার জন্য মিকেল্‌স্‌কে পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

পরিবার, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণে গ্রন্থকার শেষের দিকে কিছু সময় দিয়াছেন। জার্ম্মাণ-সমাজ-তত্ত্ববিৎ সিম্মেল-প্রবর্ত্তিত আলোচনা-প্রণালী এই জন্য অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের বিশ্বাস এই যে, সমাজ-বিদ্যার সাহায্যে একটা নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তোলা সম্ভব। বস্তুনিষ্ঠ প্রণালীতে নিরেট তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করিবার ক্ষমতা এই কেতাবের অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্য্যোগ-দৈত্যের মুগুর

আর্থিক দুনিয়ারও চক্রবৎ পরিবর্ত্তন ঘটে অনেক। এই চক্র-তত্ত্বকে নবীন ধন-বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বিবেচনা করা আমাদের দস্তুর। সম্প্রতি এই সকল বিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা-সমন্বিত একখানা বেশ বৃহদাকার বই বাহির হইয়াছে। লেখকও লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অধ্যাপক পিগু। ইনি "ছেলে বেলায়" লিখিয়াছিলেন "আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট" বা বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গ্রন্থ। "ইকনমিক্‌স্‌ অব্‌ ওয়েলফেয়ার, (সমাজ-মঙ্গলের ধন-বিজ্ঞান) গ্রন্থের জন্যই পিগু বিখ্যাত। চক্র-বিষয়ক বইটার নাম "ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল ফ্লাক্‌চুয়েশ্যন্‌স্‌" (শিল্প-জগতে ওঠানামা)। প্রকাশক ম্যাকমিলান কোং (১৯২৭)। পিগু হইতেছেন মার্শ্যালের ইংরেজ চেলাদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নামজাদা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা তাঁহার কাজ।

আর্থিক জগতের চক্রবিজ্ঞানটা কি বস্তু তাহা পিগু-প্রণীত গ্রন্থের

সূচীটা ঘাটিলেই অনেক পরিমাণে মালুম হইবে। গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত :—প্রথমতঃ কারণ-বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়তঃ দাওয়াই-নির্দ্দেশ।

কারণের আলোচনায় আছে নিম্নের বিভিন্ন অধ্যায়,—(১) ওঠানামার সাধারণ লক্ষণ, (২) পুঁজিপাটার সদ্ব্যবহার বা দুর্ব্ব্যবহার, (৩) লাভের আশার সু-কু প্রভাব, (৪) সমাজের শ্রেণী-ভেদ ও তাহার প্রভাবে কেনাবেচার বাজার ও লাভ-লোকসানের দৌড়, (৫) শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনায় আধুনিক যুগের জটিলতা; তাহার প্রভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া রাখা কঠিন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব-বিচারের ভুলের সম্ভাবনা অনেক, (৬) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আস্থাবান থাকার ফলে আবার অতিমাত্রায় সতর্ক হওয়ার বাতিক চাগিয়া যায়, (৭) টাকাকড়ির প্রভাবে চক্র-পরিবর্ত্তন, (৮) সাক্ষাৎভাবে ভোগের জন্য যেসকল শিল্প চলে তাহা হইতে অন্যান্য শিল্পের প্রভেদ, (৯) মূলধনের জোগান, (১০) টাকাকড়ির প্রভাব ছাড়া অন্যান্য যেসকল কারণে চক্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সেই সবের উপর ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রভাব, (১১) ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট কর্জ্জের জোগান, (১২) বাজার-দরের ওঠানামার কারণ-বিশ্লেষণ, (১৩) লাভের আশার সঙ্গে বাজার-দরের যোগাযোগ, (১৪) মজুরির হার ও চক্র, (১৫) মজুরদের চলাচল অবাধ নয়, (১৬) বিভিন্ন কারণের তুলনাসাধন, (১৭) ওঠানামায় তরঙ্গশ্রেণী।

দাওয়াই-নির্দ্দেশ কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ :—

(১) চক্রটা সমাজের ব্যাধি সন্দেহ নাই, (২) অবাধ শিল্প-বাণিজ্য-নীতিতে এই ব্যাধি-নিবারণের সম্ভাবনা খুবই কম, (৩) ব্যাধির কারণগুলা নিবারিত হইতে পারে, (৪) ব্যাধির চিকিৎসাও সম্ভব, (৫) টাকাকড়ির প্রভাব ছাড়া অন্যান্য কারণগুলার নিবারণোপায়, (৬) বহুকালব্যাপী দেনা পাওনার যুক্তি, (৭) ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট কর্জ্জ জোগানের দাওয়াই, (৮) ডিস্কাউণ্ট-নীতি ও কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক, (৯) ডিস্কাউণ্ট-কৌশলের সাহায্য—বাজারদরের

ওঠানামা বন্ধ-করা, (১০) টাকার বাড়্‌তি-কম্‌তি-বিষয়ক শাসন, (১১) টাকার স্থিরীকরণ, (১২) মজুরি স্থিরীকরণ, (১৩) চক্র-চিকিৎসা, (১৪) মাল-স্রষ্টা আর ভোগ-কর্ত্তাদের স্বাধীন প্রয়াস, (১৫) সরকারী হস্তক্ষেপ, (১৬) শুল্ক-নীতি, (১৭) বেকার খাটাইবার জন্য সরকারী তাঁবে কারবার সৃষ্টি, (১৮) বেকার-বীমা।

দুর্য্যোগ-দৈত্য কোন এক কারণের সন্তান নয়। কাজেই কোন এক দাওয়াইয়ে এই দৈত্য দমন করা অসম্ভব। ইতি ভাবার্থঃ।

পল্লী-বিজ্ঞান ও কিষাণ-তন্ত্র

চাষ-বর্জ্জন ও পল্লী-বর্জ্জন

লোকেরা যখন পল্লী বর্জ্জন করিয়া শহরে আসিয়া বাস করিতে চায় তখন ভারতে আমরা লোকজনকে গালাগালি করিতে লাগিয়া যাই। তাহাদেরকে বচন শুনাই,—"ব্যাক্ টু ভিলেজ—ফিরে যা পল্লীতে, পল্লীতে থাক্, পল্লীই স্বর্গ" ইত্যাদি।

এই ধরণের আর এক কাণ্ড ভারতে সুপরিচিত। যখনই দেখি যে, কিষাণেরা চাষ-আবাদ ছাড়িয়া ফ্যাক্টরিতে, কারখানায় মজুরি করিতে আসিতেছে, তখনই তাহাদের উপর খড়্গহস্ত হওয়া ভারতীয় "দার্শনিক" ও স্বদেশ-সেবকগণের এক মস্ত রেওয়াজ। এই বিষয়ে আমাদের বেদান্ত হইতেছে,—"কারখানাগুলা পাশবিক, ম্লেচ্ছ। ব্যাক্ টু ল্যাণ্ড—যা ফিরে চাষ-আবাদের জমিতে, কৃষিকর্ম্ম আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপোষক" ইত্যাদি।

আমাদের পণ্ডিতগণের বেদান্ত যাই হউক না কেন, তথ্য দুইটা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আর্থিক ভারতের প্রথম নিরেট তথ্য

হইতেছে পল্লীবর্জ্জনের ঝোঁক। আর দ্বিতীয় নিরেট তথ্য চাষ-বর্জ্জনের ঝোঁক।

এই দুই ধরণের বর্জ্জন-কাণ্ড ভারতেরই একচেটিয়া আর্থিক তথ্য নয়। "একালের" দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য দেখা যাইতেছে,—কি বিলাতে, কি ফ্রান্সে, কি জার্ম্মাণিতে, কি অন্যান্য দেশে। অবস্থাটা বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণ করিবার জন্য ইয়োরামেরিকায় বিপুল সাহিত্য রচিত হইয়া গিয়াছে। এই সাহিত্য-রচনার শেষ অধ্যায় আজও দেখা যাইতেছে না। সকল দেশেই অনেক পাকা পাকা মাথা সর্ব্বদা এই অবস্থা-বিশ্লেষণের কারবারে মোতায়েন আছে। সঙ্গে সঙ্গে "ব্যবস্থা", "পাঁতি" বা "দাওয়াই" আবিষ্কারের দিকেও বহু পাশ্চাত্য মগজের বহুবিধ প্রয়াস দেখা গিয়াছে। সেই সকল প্রয়াস আজও চলিতেছে।

অষ্ট্রিয়ান রিপাব্লিকের সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট মিখায়েল হাইনিশ ধনবিজ্ঞানের এই বিভাগে অনেক দিন ধরিয়া মাথা খেলাইতেছেন। ১৯২৪ সনে তাঁহার লেখা এক প্রকাণ্ড বই বাহির হইয়াছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রায় শ' চারেক রয়্যাল অকটেভো আকারের। প্রকাশক জার্ম্মাণির য়েনা নগরের ফিশার কোম্পানী।

বইটার নাম "ল্যাণ্ড-ফ্লু্'খ্‌ট"। জার্ম্মাণ ভাষায় "লাণ্ড" শব্দের দুই অর্থ :—(১) জমি (২) পল্লী। বইয়ের নামে বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকার "লাণ্ড" (জমি বা পল্লী) হইতে "পলায়নের" কথা বিবৃত করিতেছেন। ঘটনাচক্রে হাইনিশ এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন। এক পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে যতিনি পল্লীবর্জ্জন আর জমি (চাষ)-বর্জ্জন দুই-ই আলোচনার ভার লইয়াছেন।

প্রথমেই জানিয়া রাখা উচিত যে, চাষ-আবাদ বা কৃষিকর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেই যে, লোকেরা নগর-বাসী হইয়া পড়ে, এরূপ বুঝিবার কারণ নাই। কেননা বর্ত্তমান যুগে বড় বড় শিল্প-কারখানা অনেক সময়েই শহরের

বাহিরে কায়েম হইয়া থাকে। কাজেই শহুরে লোক না হইয়াও লোকজনের পক্ষে চাষ-বর্জ্জন করা সম্ভব। অর্থাৎ চাষ-বর্জ্জন ঘটিলেই পল্লী-বর্জ্জন ঘটা অবশ্যম্ভাবী নয়। চাষীরা চাষ হইতে পলায়ন করিয়াও মফস্বলের পল্লীতে থাকিতে সমর্থ। সুতরাং চাষ-বর্জ্জন আর পল্লী-বর্জ্জন দুইটা স্বতন্ত্র বস্তু, আর স্বতন্ত্ররূপে আলোচ্য।

চাষ আজকালকার দুনিয়ায় লোক-প্রিয় ব্যবসা নয়। এই কথাটা বুঝাইবার জন্য হাইনিশ ইয়োরোপের নানা দেশের একাল-সেকাল আমাদের নিকট খুলিয়া ধরিয়াছেন। আর তথ্য ও অঙ্কের তালিকা দিয়াও চাষের বিরুদ্ধে চাষীদের বিদ্রোহ বস্তুটা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচনাটা তুলনা-মূলক। গ্রন্থকারের বিশেষ দৃষ্টি অবশ্য জন্মভূমি অষ্ট্রিয়ার জন্য দাওয়াই আবিষ্কার করিবার দিকে। কিন্তু মোটের উপর বইখানাকে গোটা ইয়োরোপেরই বর্ত্তমান অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার অন্যতম প্রচারক বিবেচনা করা চলিতে পারে। আমাদের ভারতেও যাঁহারা চাষ-ব্যাধির চিকিৎসায় হাত মক্‌স করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে হাইনিশের সঙ্গে দু'এক বার ডাকিয়া আলাপ করা ভালই।

অধ্যাপক জেরিঙের "আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ"

আগেই বলিয়াছি যে, চাষ-ব্যাধির দাওয়াই আবিষ্কার করিবার জন্য ইয়োরামেরিকার অনেক বাঘা বাঘা ধন-"ডকটর" বহুদিন হইতেই সচেষ্ট আছেন। একজন পাকা "চাষ-চিকিৎসকের" নাম জেরিঙ্‌। তাঁহার পাঁতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাহির হইয়াছিল। ১৮৯২ সনে জেরিঙের এক বই বাহির হয়। তাহার নাম "ইন্নেরে কোলোনিজাট্‌সিওন" (অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপন)। জেরিঙ্‌ এখনো বাঁচিয়া আছেন। বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্ম্মাণিতে শিল্প-কারখানার ধুম সুরু

হয়। সঙ্গে সঙ্গে চাষ-বর্জ্জন চলিতে থাকে। ফ্যাক্টরিগুলা গাঁকে গাঁ উজাড় করিয়া নরনারীকে নিজ নিজ বাস্তভিটা ছাড়াইতেছিল। শিল্পের টানে চাষ হইতেছিল নিষ্প্রভ। আবাদের জন্য আর লোক জুটিত না। কি করা যাইবে? নানা চিকিৎসক নানা প্রকার মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারই অন্যতম হইতেছে "আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ।" "উপনিবেশ" বলিলে সেকালের জার্ম্মাণরা, ফরাসীরা, ইংরেজরা বুঝিত ইয়োরোপের বাহিরে,—আমেরিকা, আফ্রিকা ইত্যাদি মহাদেশে গিয়া শ্বেতাঙ্গ নরনারীদের নয়া নয়া বাসভূমি কায়েম করা। জেরিঙ্ বলিলেন, —"এখন দরকার পড়িয়াছে, দেশের ভিতরেই মফস্বলের নানা অঞ্চলে দেশী লোকের ঘরবাড়ী গড়িয়া তোলা। জার্ম্মাণ নরনারী যাহাতে চাষের কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা হউক। চাষ-ব্যবসাটাকে চাষীদের সমাজে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা হউক। তাহা অবশ্য একমাত্র বা প্রধানতঃ বক্তৃতার জোরে সম্ভবপর নয়। এজন্য গবর্ণমেণ্ট লাখলাখ টাকা খরচ করুক। খরচ করিয়া করিয়া সুবিধাজনক সর্ত্তে লোকজনকে নতুন নতুন জমির মালিকরূপে গড়িয়া তোলা হউক। ইত্যাদি।"

জেরিঙের মতামত বিস্মার্কের যুগে, বিশেষতঃ ১৮৮০-৯০ সনের দশকে, জার্ম্মাণ পণ্ডিত ও রাষ্ট্রিক মহলে একটা যুগান্তর সৃষ্টি করে। তাহার ফলে জমিজমার আইনকানুনে বিপ্লব সাধিত হয়। নয়া জার্ম্মাণ কানুনের নকলে দেন্মার্ক ১৮৯৯ সনে, আর ইংল্যাণ্ড ১৯০৮ সনে "পারিবারিক আবাদ" (ফ্যামিলি-ফার্ম), "স্মল হোল্ডিং" (ছোট আবাদ)", ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া হাজার হাজার "কিষাণ-মালিক" (পেজাণ্ট-প্রোপ্রাইটার) গড়িয়া তুলিয়াছে। আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ" নামক দাওয়াই ৪০ বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকায় একটা সার্ব্বজনীন "পেটেণ্ট" রূপে চলিতেছে। ভারতের চাষ-চিকিৎসক-মহলে এই

দাওয়াইয়ের রেওয়াজ আজও বোধ হয় চলে নাই। এমন কি এই দাওয়াইয়ের নামই বোধ হয় মাত্র দু'এক জন ধনবিজ্ঞান-সেবীর গণ্ডীতে আবদ্ধ।

যাহা হউক, ভারতে যাঁহারা জেরিঙের চাষ-দাওয়াইটার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে হাইনিশের ওস্তাদিটা যথার্থরূপে উপভোগ করা সম্ভব। কেন না হাইনিশ জেরিঙের সকল পাঁতি খাইয়া হজম করিয়াছেন। জেরিঙের দাওয়াইয়ে সমাজের যতটা উপকার সাধিত হইতে পারে তাহা ইয়োরোপের নানা দেশে সাধিত হইয়াছে ও এই সকল তথ্য দখল করিয়া হাইনিশ বলিতেছেন, "এখন আবার আরও কিছু আবশ্যক। জেরিঙের পেটেণ্ট অথবা অন্যান্য টোট্‌কা যাকিছু একালের কবিরাজের নিকট পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে চাষ-চিকিৎসা সুচারুরূপে চলিতে পারে না।" বুঝিতে হইবে যে, ইয়োরোপ আর্থিক উন্নতির বিজ্ঞানে আর আর্থিক উন্নতির কর্ম্মকৌশলে ১৮৯০-১৯০৮ সনকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। হাইনিশ জেরিঙের পরের ধাপ।

পুঁজিতন্ত্রে শিল্প বনাম চাষ

একালের আর্থিক দুনিয়া,—বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকার বড় বড় দেশ হইতেছে পুঁজিতন্ত্রের জগতে। এক সঙ্গে বহু মাল উৎপন্ন হয়। কারবারের বহর বিপুল বিস্তৃত। টক্কর চলে আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে বা শহরে শহরে, নয়ত দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে। কুদরতী মাল সংগ্রহ করায় এই টক্করের এক রূপ দেখিতে পাই। অন্য রূপ হইতেছে কার-খানা-জাত মাল বাজারে ফেলার হাঙ্গামায় পরিস্ফুট। সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির গতিবিধি, লেনদেন, আমদানি-রপ্তানিও, বিশ্ব-জোড়া। টাকাকড়ি অহরহ এক মুল্লুক হইতে আর এক মল্লুকে, এক মহাদেশ হইতে আর এক মহাদেশে—জাতিধর্ম্মরাষ্ট্র-নির্ব্বিশেষে ভবঘুরেগিরি করিতেছে।

দুনিয়ার ধরণ-ধারণই যখন এইরূপ, তখন সকল প্রকার আর্থিক প্রচেষ্টাকেই এই সবের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলিতে হইবে। যে সকল কারবার এই সমুদয় ধরণ-ধারণের সঙ্গে খাপ খাইবে না, সেই সকল কারবারের পক্ষে সফলতা লাভ করা অসম্ভব অথবা সুকঠিন। ধনীরা টাকা খাটাইবার জন্য এই কথাটা বিশেষরূপে খতাইয়া দেখিতে বাধ্য। মজুরেরাও নক্‌রি ঢুঁড়িতে বাহির হইয়া বর্ত্তমান জগতে কোন্ কোন্ কারবার বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ তাহার আলোচনা করিয়া দেখিতে অগ্রসর হয়। যে সকল কারবার বর্ত্তমান যুগে বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না সেই সব কারবারের দিকে ধনীও ধন ঢালিবে না, মজুরও বেশী ঝুঁকিবে না। এই গেল অতি স্বাভাবিক কথা।

প্রশ্ন হইতেছে, বর্ত্তমান জগতের ধরণ-ধারণ দেখিয়া কোন্ কোন্ কারবারকে টেঁকসই বিবেচনা করা চলিতে পারে। শিল্প-কারখানা-সমূহকে প্রথমেই বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত সমঝিয়া লওয়া সম্ভব। কেননা পুঁজিতন্ত্রের অধীন বিপুল-বহরশিল কারবার বলিলে যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কারখানা-শিল্পই সর্ব্বদা চোখে পড়ে। কারখানা-শিল্পকে যখন তখন লম্বায়-চৌড়ায় বাড়াইয়া তোলা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী বাজার সৃষ্টি করা আর গোটা দুনিয়া হইতে পুঁজি সংগ্রহ করাও কারখানা-শিল্পের উন্নতির জন্যই সম্ভব।

কিন্তু চাষ-আবাদ অর্থাৎ কৃষিকর্ম্মের কারবারটা শিল্পকারবারের মতন নয়। ইহাকে বাড়াইয়া বিশ্বব্যাপী করিয়া তোলা একপ্রকার অসম্ভব। চাষীরা অথবা চাষ-ধুরন্ধরেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও একই ঢঙের ইচ্ছানুরূপ পরিমাণ ফসল সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। জগদ্ব্যাপী বাজারের জন্য মাল তৈয়ারী করাও তাহাদের কারবারে অসম্ভব। পুঁজিতন্ত্রের যুগ বলিলে আর্থিক জীবনের যে সকল লক্ষণ নজরে আসে, সেই সব লক্ষণ চাষ-আবাদের পক্ষে পুরাপুরি প্রকট করা এক প্রকার অসাধ্য।

কৃষিকর্ম্মের প্রকৃতি এখনো এই পুঁজিতন্ত্রের চরম লক্ষণগুলার সঙ্গে খাপ খায় না।

কাজেই শিল্পের সঙ্গে চাষের লড়াই সুরু হওয়া মাত্র বর্ত্তমান জগতে চাষ ফেল মারিতে বাধ্য। অর্থাৎ ধনী লোকেরা নেহাৎ ইচ্ছায় কৃষিকর্ম্মে টাকা খাটাইতে রাজি হইতে পারে না। যে সকল লোকের ট্যাঁকে পয়সা আছে তাহারা লাভের জন্যই টাকা খাটাইতে যায়। তাহারা বুঝিতেছে যে, একালে টাকা খাটাইয়া দু'পয়সা আনিবার সুযোগ আছে প্রধানতঃ শিল্প-জগতে। কৃষিকর্ম্মে লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা কম। এই বুঝিয়া তাহারা চাষ-বর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইবে। মজুরেরাও স্বাভাবিক কারণেই নক্‌রি ঢুঁড়িবার বেলায় কৃষিকর্ম্মের কর্ত্তাদের নিকট উমেদারী বেশী না করিয়া ফ্যাক্টরির আওতায় কারখানার আবহাওয়ায় তীর্থের কাকের মতন ঘুরিয়া বেড়াইবে। মজুরদের পক্ষে গুড় মিলিবার বেশী সম্ভবনা এই শিল্পজগতে।

কি মজুর, কি পুঁজিপতি, দুই শ্রেণীর লোকেই নিজ নিজ সম্পত্তির অর্থাৎ মেহনতের আর পুঁজির চরম সদ্ব্যবহার করিতে প্রয়াসী। তাহার সুযোগ আছে একালে প্রচুর। যানবাহনের সুবিধা পাওয়া যায় অনেক। মজুরেরা ঠিক প্রায় পুঁজির মতনই ভবঘুর্‌য়োগিরি করিয়া বেড়াইতে পারে। যখন যেখানে বেশী মজুরির আশা তখন সেখানে মজুরেরা হাজির হয়। টাকা-পয়সার আর কর্জ্জ লেনাদেনার গতিবিধিও বিলকুল এইরূপ। চরম লাভের টানে আজ টাকা এখানে, কাল আবার আর এক জায়গায় তাহার আবির্ভাব বা কেন্দ্রীকরণ। এইরূপ প্রায় ষোল আনা অবাধ গতিবিধির যুগে একই সময়ে কোন সমাজে একপ্রকার পরিশ্রমের জন্য দুই প্রকার মজুরি থাকিতে পারে না। সেইরূপ একই সময়ে কোন সমাজে এক প্রকার লগ্নি কারবারের জন্য দুই প্রকার সুদের ব্যবস্থা

থাকিতে পারে না। যেখানে মজুরি বা সুদের হার বেশী সেইখানেই মজুর আর পুঁজির অভিযান অবশ্যম্ভাবী।

অবস্থাটা আরও তলাইয়া বুঝা যাউক। ফ্যাক্টরির কারবারে মজুরেরা বেশ উঁচু হারে বেতন পায়। এই কথাটা শুনিবামাত্র কৃষি-ক্ষেত্রের মজুরেরা চাঙ্গা হইয়া উঠে। তাহারা কৃষিক্ষেত্রের মালিক বা ধুরন্ধরের নিকট ঠিক সেই ফ্যাক্টরির মজুরি-হার হাঁকিয়া বসে। আর যদি সেই হার-অনুসারে তাহাদের তঙ্খা না জুটে তাহা হইলে তাহারা চাষের কাজ ছাড়িয়া অ-চাষের কারবারে নকরি টুঁড়িতে লাগিয়া যায়। আসল কথা অনেক ক্ষেত্রেই চাষের কর্ত্তারা মজুরদিগকে যথোচিত হারে,—বিশেষতঃ ফ্যাক্টরির মজুরি-মাফিক বেতন দিতে অসমর্থ। কাজেই চাষের মজুরেরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আর চাষ-সেবায় মস্‌গুল থাকিতে সচেষ্ট হয় না। সুরু হয় "লাণ্ড ফ্লুখ্‌ট্‌"—চাষবর্জ্জন।

অপর দিকে পুঁজিপতিদের চিত্তটা বিশ্লেষণ করা যাউক। তাহারা কৃষিকর্ম্মে টাকা ঢালিয়া দেখিতেছে যে, তাহাদের লাভ বড় কম অথবা হয় না। অন্যান্য ব্যবসায় তাহাদের যেসব বন্ধুরা টাকা খাটাইতেছে তাহারা বেশ মোটা হারে দু'পয়সা করিতেছে। কাজেই দরকার হইলে যেমন জুতার কারবার ছাড়িয়া লোকে বইয়ের কারবার খোলে, অথবা বইয়ের কারবারে পয়সা নাই দেখিলে তেলের কারবার করে, সেইরূপ পুঁজিপতিরা চাষের কারবার বর্জ্জন করিয়া অ-চাষের শরণাপন্ন হয়। "লাণ্ড-ফ্লুখ্‌ট্‌"টা মজুরের পক্ষের যেমন স্বাভাবিক পুঁজিপতির পক্ষেও তেমন স্বাভাবিক।

এই অবস্থায় জমিটা লইয়া পড়িয়া থাকে কাহারা ? যাহাদের অন্য কোন গতি নাই তাহারা দায়ে পড়িয়া, নেহাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও মাটিটা কামড়াইয়া থাকে। তাহাতে আর্থিক জীবনবত্তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এই অবস্থায় কোন মতে দিন গুজরানো অথবা চরম দারিদ্র্যের নিদর্শন কপালে ও চোখে-মুখে বহন করা ছাড়া চাষী জমীদারদের আর কোন লক্ষণ নাই।

চাষকে লাভজনক করিবার উপায়

ভাবার্থ হইতেছে যে, চাষ-কারবারটা লাভজনক নয়। পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার লোকেরা বর্ত্তমান জগতের এই আর্থিক তথ্যটা খুব নিরেট ভাবে পাকড়াও করিয়াছে। ভারতবর্ষে এই নিরেট তথ্য-জ্ঞান এখনো জন্মে নাই। জন্মে নাই বলিয়া ব্যাধিটা ভারতবাসী পাকড়াও করিতে অসমর্থ। এই কারণে আমাদের দেশে গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইয়োরামেরিকার ওস্তাদেরা হাতুড়েরা সকলেই খোলাখুলি জানে যে, শিল্পের সঙ্গে টক্করে চাষ জয়ী হইতে পারিবে না। তাহারা কোন প্রকার গোঁজামিলের বড় একটা পক্ষ-পাতী নয়। সোজাসুজি ব্যাধিটা আবিষ্কৃত হইবামাত্র তাহারা প্রতী-কারের ফিকিরে মগজ খেলাইতে লাগিয়া গিয়াছে।

ব্যাধি হইতেছে,—চাষ আর্থিক হিসাবে লাভজনক নয়, অতএব লোক-প্রিয় নয়, অতএব পুঁজিপতি আর মজুর চাষের পথে পা বাড়াইতে রাজি নয়। প্রতীকারটা তাহা হইলে স্বভাবতই নিম্নরূপ,—চাষকে আর্থিক হিসাবে লাভজনক করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে এই কারবার লোক-প্রিয় হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে পুঁজিপতি এই কার-বারে তাহার টাকা ঢালিতে ঝুঁকিবে আর মজুরও চাষ-বাসে "বসতে লক্ষ্মী" বুঝিয়া আবাদ-নিষ্ঠ হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইয়োরামেরিকায় যতগুলা বড় বড় আর্থিক আন্দোলন দেখা দিয়াছে তাহার ভিতর চাষ-ব্যবসাটাকে লাভজনক করিয়া তোলার চেষ্টা অন্যতম।

কত উপায়ে চাষ-ব্যবসাকে লাভজনক করিয়া তোলা সম্ভব? অনেক উপায়ে। একটা উপায়ের কথা আজ বিশ বৎসর ধরিয়া ভারতেও সুপরিচিত। সে হইতেছে সমবায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মাণরা এই দাওয়াই আবিষ্কার করে। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে

আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ। এই উপায়টা ভারতে আজও একপ্রকার অপরিচিত। কিন্তু অল্পদিনের ভিতরই এই উপায়ের প্রচার ভারতে সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

এইবার তৃতীয় উপায়ের কথা বলিব। এইটা হইতেছে হাইনিশের উদ্ভাবিত অথবা প্রচারিত। পূর্ব্বোল্লিখিত দাওয়াই দুইটা খাঁটি কৃষি কর্ম্ম সম্পর্কিত নয়। একটা হইল সমাজ-গঠনের অঙ্গ, আর একটা হইতেছে জমির পরিমাণ সম্পর্কিত আইনের অন্তর্গত। এই দুই দাওয়াইয়ের প্রভাব জবর। সকল দেশেই যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে। কিন্তু খাঁটি ধনবিজ্ঞানের তরফ হইতে চাষ-সমস্যার মীমাংসা হয় নাই।

মূল্যতত্ত্ব

হাইনিশের বিশ্লেষণে সমস্যাটা আসলে মূল্যতত্ত্বের অন্তর্গত। চাষ-ধুরন্ধরেরা তাহাদের মজুরদিগকে উঁচুহারে তঙ্খা দিতে অসমর্থ কেন? চাষ হইতে চাষ-ধুরন্ধরদের নিজের আয়টা নীচু বলিয়া। তাহাদের আয়টাই বা নীচু কেন? যে দরে তাহারা বাজারে ফসল বেচে সে দরটা নীচু এই জন্য। সুতরাং ফসলের বাজার-দর উঁচু না হইলে চাষ-মজুরেরা উঁচুহারে মজুরি পাইবে না। কাজেই তাহারা চাষ-বর্জ্জন করিবে। ভালো কথা, ফসলের বাজার-দর যেন বাড়িল। কিন্তু তাহা হইলে জমির দাম বাড়িয়া যাইবে না কি? খুবই সম্ভব। কিন্তু তাহা বন্ধ করা আবশ্যক। অর্থাৎ "লাণ্ড-ফ্লুখট" নিবারণ করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত জমির দামের উপর দেশের,—অর্থাৎ রাষ্ট্রের—কড়া নজর থাকা চাই।

"লাণ্ড-ফ্লুখট" অর্থাৎ চাষ-বর্জ্জন যে নিবারণ করা আবশ্যক তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সকল দেশেই। চাষের কারবার একদম উঠিয়া যাওয়া কোনো সমাজের পক্ষেই মঙ্গলকর নয়। বহুসংখ্যক চাষী যাহাতে

সুখেস্বচ্ছন্দে ভাল চাষ চালাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা দেশের সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আবশ্যক।

কিন্তু উপায়টা হইতেছে শেষ পর্য্যস্ত জমির দাম, ফসলের বাজার দর আর মজুরির হার এই তিন বস্তু সম্বন্ধে বিহিত করা। ধনবিজ্ঞানের তথাকথিত "স্বাভাবিক" বা "প্রাকৃতিক" নিয়মে এই তিনের যথোচিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি? পারে না। প্রকৃতির উপব নির্ভর করিলে বহুক্ষেত্রেই ঠকিতে হয়। মহা-সমরেব সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিলাতী চাষ-সংরক্ষণের জন্য প্রচুর অ-প্রাকৃতিক বন্দোবস্ত অর্থাৎ শাসন-যন্ত্রের হস্তক্ষেপ চালাইয়াছে। যুদ্ধের পরেও ইংরেজ জাতি কয়েক বৎসর ধরিয়া মজুরির নিম্নতম হার বিষয়ক আইন বানাইয়াছে। ফসলের দাম সম্বন্ধেও ইংরেজরা সরকারী শাসনে বেশ সুফল পাইয়াছে।

সুতরাং চাষ-আবাদেব কর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের শাসন হাইনিশের পছন্দসই। শাসনটা নানা দিকে চলিতে পারে। ফসলগুলার উপর গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া একতিয়ার কায়েম করা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। সংরক্ষণ-নীতির চেয়ে একচেটিয়া একতিয়ার নীতি দেশের পক্ষে বেশী উপকারজনক। বিদেশ হইতে যে সকল মাল আমদানি হইবে তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের ষোল আনা একতিয়ার থাকিলে বিদেশী মালের দাম নির্দ্ধারণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সুসাধ্য। কিন্তু মাত্র সংরক্ষণ-নীতির আইন জারি থাকিলে বিদেশী মালের দাম সম্বন্ধে বেপারীরা স্বাধীন। এই কারণে "মনোপলি" প্রথা কায়েম হইলে সুফল লাভ হইবার কথা। বিদেশী মালের দামটার উপর কর্ত্তৃত্ব কায়েম হইবামাত্র দেশের ভিতর যে সব মাল উৎপন্ন হইতেছে তাহার দাম ঠিক্ করিয়া দেওয়া তাহার হাতের পাঁচ স্বরূপ। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার আর জমির দাম সম্বন্ধেও কর্ত্তৃত্ব চালানো সহজ কথা। গবর্ণমেণ্ট যদি

মূল্যতত্ত্বটার পাকা মালিক হইয়া বসে তাহা হইলে চাষের কারবারকে লোকপ্রিয় করিয়া তোলা বেশী কঠিন নয়। চাষ-বর্জ্জন নিবারণের এই দাওয়াই রাষ্ট্রসর্ব্বস্ব কমিউনিজমের অন্যতম যুগলক্ষণই মালুম হইবে। হাইনিশ অবশ্য বোলশেভিক আদমি নন।

রুশিয়ার চাষা ও চাষ ব্যবস্থা

রুশ ভাষায় প্রকাশিত দুইখানা গ্রন্থের জার্ম্মাণ সমালোচনা বাহির হইয়াছে যেনা হইতে প্রকাশিত হেবল্ট্‌ভির্ট শাফটলিখেস আর্খিভ্‌ পত্রিকায়। গ্রন্থকারের নাম ষ্টুডেন্‌স্‌কি। প্রকাশক মস্কোর সেল্‌স্রো-সোয়ুস্‌ কোং। প্রথম বইটার জার্ম্মাণ নামের অর্থ "কৃষি-ব্যবস্থার বিজ্ঞান-কথা" (১৯২৫, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)। দ্বিতীয় বইয়ের নাম চাষ-ব্যবসায় খরচপত্র ও মুনাফা (১৯২৫, ১১৩ পৃষ্ঠা)। সমালোচক হইতেছেন একজন রুশ পণ্ডিত,—লেনিনগ্র্যাড শহরের হ্বাসিলি লেওনতীফ্‌।

গ্রন্থ দুইটার একটায় "থিয়োরি" বা তত্ত্বাংশ বেশী। অপরটায় বর্ত্তমান অবস্থার বৃত্তান্ত প্রধান ঠাঁই অধিকার করিয়াছে। তবে এই অবস্থার আলোচনায় ও হিসাবপত্রে আঁকজোকের প্রভাব বেশী।

তত্ত্বাংশটা ধনবিজ্ঞানের আসরে, বিশেষতঃ ভারতে, কথঞ্চিৎ নতুন মালুম হইবার কথা। বিষয়টা "মূল্যতত্ত্বের" অন্তর্গত। চাষ-আবাদের কথাগুলাকে মূল্য-বিজ্ঞানের কাঠামে ফেলিবার জন্য ষ্টুডেন্‌স্‌কি কলম ধরিয়াছেন।

বিষয়টার ভিতর হাতীঘোড়া কিছু আছে বলিয়া সাধারণের পক্ষে সন্দেহ করাই কঠিন। কিন্তু এই সামান্য কথার ভিতরও গোলমেলে চিজ আছে। এই লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াইও চলে।

"প্রাকৃত" ও "সংস্কৃত" কৃষিকর্ম্ম

গোড়ায়ই জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান জগতে চাষ-আবাদ বলিলে দুই শ্রেণীর কাজ বুঝিতে হইবে; প্রথমতঃ, আধুনিক বা নব্য কৃষি-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে "পুঁজিনীতি-শাসিত" রূপে বিবৃত করা হইয়া থাকে।

আজকালকার ফ্যাক্টরিতে, ব্যাঙ্কে, আমদানি-রপ্তানিতে যে ধরণের পুঁজিশাহী বা পুঁজি-তন্ত্র চলে, চাষ-আবাদের কাজেও সেই ধরণেরই মূলধন-মাহাত্ম্য, মজুর-মালিক সম্বন্ধ, বাজারে কেনা-বেচার রীতি দেখা যায়। এই কথাটা ভারতে বুঝা সহজ নয়। কেন না এই শ্রেণীর চাষ-ব্যবসা,—যাকে "ক্যাপিটালিষ্টিক" ব্যবস্থা বলিতে পারি,—আমাদের দেশে এখনো মাথা খাড়া করে নাই।

বর্ত্তমান জগতের অন্য প্রকার চাষ-ব্যবস্থা হইতেছে প্রাক্-পুঁজিশাহীর অন্তর্গত। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় মূলধন-মাহাত্ম্য মজুর-সমস্যা, বাজার-প্রভাব ইত্যাদি বস্তু প্রকট নয়। পুঁজিনীতি দুনিয়ায় দেখা দিবার পূর্ব্বে,—অর্থাৎ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মানবসমাজের আর্থিক ব্যবস্থা ও ধরণ ধারণ যেরূপ ছিল কৃষিকর্ম্ম সেইরূপই চলিতেছে। এই ব্যবস্থাকে সহজে "সেকেলে" আদিম বা মান্ধাতার আমলের কৃষিকর্ম্ম বলা চলে। এই ধরণের আদিম বা "প্রাকৃতিক" কৃষি বর্ত্তমান জগতের অনেক মুল্লুকেই চলিতেছে। রুশিয়া, ভারত, চীন ইত্যাদি দেশ তাহাদের অন্তর্গত। ইয়োরোপের বল্কান অঞ্চলে, ইতালিতে এবং স্পেনেও "প্রাকৃত" কৃষির ঠাঁইয়ে "সংস্কৃত" কৃষি প্রবল আকারে দেখা দেয় নাই। যে-যে দেশে বা জনপদে "প্রাকৃত" কৃষিই বিংশ শতাব্দীতেও চলিতেছে, বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল অঞ্চলে বর্ত্তমান জগৎ আত্মপ্রকাশ করে নাই। এই হিসাবে ভারত, চীন, রুশিয়া ইত্যাদি দেশ "সংস্কৃত" ("সভ্য"?) দুনিয়ার বাহিরে।

যাক,—চাষ-ব্যবস্থার "প্রাকৃত" ও "সংস্কৃত" শ্রেণী অর্থাৎ সেকেলে আর আধুনিক গোত্রটা বুঝিয়া রাখা গেল। এখন মূল্য-বিজ্ঞানের মামলা। কোনো কোনো বিজ্ঞানসেবী বলেন যে—"প্রাকৃত" বা সেকেলে চাষ-আবাদে যে ধরণের

ষ্টু্ডেন্‌সকি বনাম চায়ানোফ্

ধন-সূত্র খাটে একালের অর্থাৎ সভ্যভব্য, যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত, পুঁজিশাসিত কৃষিকর্ম্মে সেই নিয়ম খাটে না। বর্ত্তমান যুগের ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্র এই নবীনতম কৃষিব্যবস্থার তথ্যসমূহেরই দর্শন-স্বরূপ। কাজেই এই বিজ্ঞানের সূত্রগুলা সেকেলে চাষ-আবাদের তথ্যসমূহের উপর খাটাইতে গেলে ভুল হইবে। ষ্টুডেন্‌স্‌কি এই মতের বিপক্ষে মত দিয়াছেন। তাঁহার মতে কি "সভ্য" কি "অ-সভ্য," অর্থাৎ সকল প্রকার চাষেই একই বিনিময় নীতি, একই মুদ্রানীতি, একই মূল্যনীতি খাটে। তিনি অদ্বৈতবাদী পুঁজিতন্ত্রের প্রচারক।

এই মতটা রুশ সাহিত্যে প্রচলিত মতবাদের ডাহা উল্টা। যে মতবাদ রশিয়ার পণ্ডিতমহলে চলিতেছে তাহার অন্যতম প্রতিনিধি হইতেছেন অধ্যাপক চায়ানোফ্‌। তাঁহার গ্রন্থ জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইতেছে "ডী লেরে ফোন ড্যার ব্যায়ার্লিখে ন হ্বির্ট শাফ্‌ট" (সেকেলে চাষ-ব্যবস্থার তত্ত্বকথা) নামে। চায়ানোফ্‌ "প্রাকৃত" কৃষি-কর্ম্মকে একদম বিশেষত্বপূর্ণ বস্তু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। এই চাষ-আবাদের নিয়মকানুন সবই স্বতন্ত্র রকমের। বর্ত্তমান জগৎসুলভ পুঁজি-যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কৃষি-ব্যবস্থার মাপকাঠিতে মামুলি "অসভ্য" চাষীদের আবাদকার্য্য নেহাৎ যুক্তিহীন এবং অবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চলিয়া থাকে। সেকেলে ব্যবস্থার মজুরির নিয়ম, দামের নিয়ম, খরচপত্রের নিয়ম এ কালের নিয়ম দেখিয়া বুঝা যায় না।

চায়ানোফের সঙ্গে ষ্টুডেন্‌স্‌কির তাত্ত্বিক লড়াইটা বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ-বিষয়ক তথ্যবিশ্লেষণ। কাজেই বিষয়টা ধনবিজ্ঞানের কোঠা ছাড়াইয়া সমাজ-বিজ্ঞান বা দর্শনের মুল্লুকেও দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ, এই প্রভেদ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক পণ্ডিতের আখ্‌ড়ায় নতুন-কিছু নয়।

ষ্টুডেন্‌স্‌কি বলিতেছেন,—"রবিন্‌সন ক্রুসো যে ধরণের দুনিয়ার চতুঃসীমার ভিতর গণ্ডীবদ্ধ সমাজে বসবাস করিয়াছে, সেই দুনিয়ার নিয়মকানুন স্বতন্ত্র। একথা অস্বীকার করি না। সেই দুনিয়ার সঙ্গে অন্যান্য দুনিয়ার কোনো যোগাযোগ নাই। সেই ক্ষেত্রে সাধারণ্যে প্রচলিত মুদ্রানীতি, মূল্য-নীতি খাটিতে পারে না। দুয়ার-বন্ধ-করা দুনিয়ার, আর দুয়ার খোলা হাওয়া-চলাফেরাকরা দুনিয়ার ধরণ-ধারণ একরূপ নয়। একথা সহজেই বুঝা যাইতে পারে"।

আর্থিক অদ্বৈতবাদ

কিন্তু মামুলি, "অসভ্য", সেকেলে চাষ-আবাদকে দুয়ার বন্ধ-করা রবিন্‌সন ক্রুসোর পরিচিত দুনিয়ার আর্থিক ব্যবস্থার সামিল করা চলিতে পারে না। যখনই দেখা যাইতেছে যে, কোনো জগৎকে ঘিরিয়া কোনো দেওয়াল খাড়া করা হয় নাই, অথবা যে দেওয়ালটা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে তখন আর সেই দুনিয়াকে নিয়মকানুন হিসাবে "স্বতন্ত্র" বিষেশত্বপূর্ণ জগৎ বিবেচনা করা উচিত নয়। সেই দুনিয়ায় বিশ্বশক্তির খেলা চলিতেছে। গোটা মানব-সংসারের যা-কিছু আর্থিক নিয়মকানুন সবই এই দেওয়াল-ভাঙা দুনিয়ায় কাজ করিতে বাধ্য। এই ব্যবস্থায় "প্রাকৃত" নিয়মগুলা "সংস্কৃত" ব্যবস্থার প্রভাবে রূপান্তরিত হইতেছে। অর্থাৎ পুঁজি-শাসিত চাষ-আবাদের মূলসূত্রগুলা এই তথা-কথিত "প্রাকৃত" বা "সে-কেলে" ব্যবস্থায়ও পুরামাত্রায়ই খাটে। কাজেই বর্ত্তমান জগতের কোনো কোনো জনপদে আধুনিক নিয়ম খাটিতেছে আর কোথাও কোথাও সেকেলে নিয়ম খাটিতেছে এইরূপ প্রভেদ স্বীকার করা অসম্ভব। সর্ব্বত্রই পুঁজিনীতির প্রভাব লক্ষ্য করা দরকার।

ষ্টুডেন্‌স্‌কির এই আলোচনা-প্রণালীর মর্ম্মকথা হইতেছে বাজার-

বিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব। রবিন্‌সন ক্রুসোর দুনিয়ায় বাজারটা প্রতিদ্বন্দিতা-বিহীন। এখানে কোনো ক্রেতার সঙ্গে অপর কোনো ক্রেতার টক্কর নাই। খরিদ্দারে খরিদ্দারেও প্রতিযোগিতা চলে না। লেনদেন, বিনিময় ইত্যাদি কাণ্ড অতি সহজ-সরল। কিন্তু যেই এই আর্থিক দ্বীপটার ভিতর বিশ্বশক্তির আনাগোনা স্বরু হইল, তখনই প্রতিযোগিতা, টক্কর ইত্যাদি বস্তু দেখা দেয়। বাজারের দর-কষাকষি মজুরির হার বাড়ানো-নামানো ইত্যাদি সামাজিক লক্ষণ হাজির হয়। চায়ানোফ্‌ "সেকেলে" ব্যবস্থায় বাজার-বস্তুর প্রভাব দেখিতে পান না। কিন্তু ষ্টুডেন্‌স্‌কি এই বাজার-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া "সেকেলে" ব্যবস্থায়ও একালেরই মোটা লক্ষণগুলা পাকড়াও করিয়াছেন।

চাষ-আবাদের বাজার-তত্ত্ব

কিন্তু আসল প্রশ্নটা হইতেছে সম্প্রতি অন্যরূপ। ধরিয়া লওয়া গেল যে, বর্ত্তমান জগতের "সেকেলে" চাষ-আবাদটা বাস্তবিকই আর্থিক দ্বীপমাত্র নয়। তাহাতেও "একাল" বিরাজ করিতেছে। কিন্তু একালের "কতটা" তাহার ভিতর দেখা যায়? ষ্টুডেন্‌স্‌কির জবাব, 'পূরাপূরি'। পুঁজি-শাসিত চাষ-আবাদের খরচপত্র, লাভালাভ যে-যে প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হয়, মামুলি "অসভ্য" রকমের চাষ-আবাদেও কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক সেই সকল নিয়মই ষোল আনা খাটিতেছে।

ষ্টুডেন্‌স্‌কির এই মত পূরাপূরি টেঁকসই নয়। কেননা,—চাষ-আবাদটা 'সেকেলে'ই হউক বা "একেলে"ই হউক, তাহার ধরণ-ধারণ একমাত্র বিনিময়-বস্তুর উপর নির্ভর করে না। ইহার সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধও অতি নিবিড়। কি "প্রাকৃত" কি "সংস্কৃত" উভয় কৃষিকর্ম্মেই প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব আলোচ্য। এই প্রাকৃতিক তরফ বাদ দিয়া ষ্টুডেন্‌স্‌কি বিনিময়, বাজার, প্রতিযোগিতা, দর-কষাকষি ইত্যাদি শক্তির তরফ বিশেষ করিয়া ফুলাইয়া

প্রকৃতি বনাম বিনিময়

তুলিয়াছেন। এই দিক্‌টা ফুলাইয়া তুলিবার দরুণই সকল প্রকার চাষে তিনি পুঁজিনীতির জয়জয়কার দেখিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে চরম মতের অদ্বৈতবাদ চলিতে পারে না। পুঁজিনীতি ছাড়াও অন্যান্য শক্তি—প্রকৃতির প্রভাব,—বর্ত্তমান জগতের "প্রাকৃত" এবং "সংস্কৃত" দুই প্রকার শ্রেণীর চাষে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তবে ঠিক্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রভাব কতটা আর বিনিময়-বাজার প্রতিযোগিতার প্রভাব কতটা তাহা ষ্টাটিষ্টিক্‌সের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠরূপে খতাইয়া দেখা আবশ্যক হইবে।

পল্লী-সমাজে ভোগ বনাম কেনা-বেচা

কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক হিসাবে ষ্টুডেন্‌স্কি চরমপন্থী। অদ্বৈত-বাদের প্রভাবে তাঁহার চিন্তায় একদেশদর্শিতা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁহার গ্রন্থ আর্থিক সাহিত্যে বিশেষ মূল্যবান্। প্রাক্-যুদ্ধ যুগের শেষ কয়েক বৎসর ধরিয়া রুশ কিষাণদের আয়ের পরিমাণ কিরূপ ছিল তাহার অঙ্কগুলা লইয়া গণনা করিতে এই লেখক সিদ্ধহস্ত। সেকালের রুশ সাম্রাজ্য পঞ্চাশ টা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ষ্টুডেন্‌স্কি প্রত্যেক প্রদেশের চাষীদের মোট আয় কষিয়া বাহির করিয়াছেন। চাষের ফসলগুলার প্রত্যেকটা সম্বন্ধেই উৎপাদনের পরিমাণ ও হার মাপিয়া জুকিয়া দেখা হইয়াছে। কোন্ ফসলের কতটা,—উৎপাদনের তুলনায়,—বাজারে বিক্রী হইয়াছে তাহার হিসাবও বাদ পড়ে নাই। এই ধরণের আলোচনা যে-কোনো দেশ সম্বন্ধেই চালানো যাইতে পারে। তাহাতে গবেষকের মেহনৎ লাগে প্রচুর। কৃষি-বিজ্ঞান বিদ্যাটাও নিরেট বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

একটা মস্ত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ষ্টুডেন্‌স্কির গবেষণায় দেখা যাইতেছে যে, রুশ কিষাণরা উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ বাজারে বেচিত। নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণই

তাহাদের কৃষিকর্মের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত না। যে-সকল ধনতাত্ত্বিক দুনিয়ায় প্রচার করিয়াছেন যে, রুশ চাষীরা বাজারের তোআক্কা রাখেনা,—আর্থিক হিসাবে তাহারা যোল আনা "স্বরাজী জীব", তাঁহারা এই বস্তুনিষ্ঠ, অঙ্ক-প্রতিষ্ঠিত ষ্টাটিষ্টিক্যাল ও ঐতিহাসিক আলোচনার আওতায় আসিয়া দাঁড়াইতে অসমর্থ প্রমাণিত হইতেছেন। মজার কথা,—আমাদের ভারতেও যে-সব পণ্ডিত ভারতীয় চাষীদিগকে পল্লীপ্রেমিক, কুটিরশিল্পী, পরিবারসেবী রূপে বিবৃত করেন, আর তাহাদিগকে শহুরে নরনারীর আর্থিক চরিত্র হইতে অন্য কোন বিশেষত্বপূর্ণ চরিত্রের অধিকারিরূপে বিবৃত করিতে ওস্তাদ তাঁহারাও ষ্টুডেন্‌স্‌কি-প্রবর্ত্তিত আলোচনা-প্রণালীর সামান্য ধাক্কা খাইলে একেবারেই চিৎ হইয়া পড়িবেন।

"সেকেলে" চাষের আয়ে অ-সাম্য কেন?

চায়ানোফের পথে চলিলে বলিতে হয় যে, "অ-সভ্য চাষীরা পারিবারিক ভোগের জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী ফসল উৎপাদন করে না। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক চাষীরই মাসিক বা বার্ষিক আয় ফসলের মাপে সমান হওয়া উচিত। কেন না খাওয়া-পরার জন্য প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই সমান মাল আবশ্যক। আয়ের সমতা "প্রাকৃত" চাষী সমাজের একটা বিশেষত্ব বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, "সেকেলে" কৃষি-ব্যবস্থায় আয়-সাম্য দেখা যায় কি?

যায় না। বরং উল্টাই দেখা গিয়াছে। আয়ের অসাম্য হইতেই বুঝা যায় যে, একমাত্র ভোগ-তত্ত্বের দ্বারা চাষ-আবাদের পরিমাণ বা কৃষি-সম্পদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া চলে না।

"সেকেলে" বা "প্রাকৃত" চাষীদের সমাজে আয়-বিষয়ক অসাম্য খুব জবর। ষ্টুডেন্‌স্‌কির গবেষণায় দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তির আয় হয়ত মাত্র ২১ রুব্‌ল। আবার কোনো কোনো ব্যক্তির আয়

১০০ রুব্‌ল। পল্লীগ্রামের আনাড়ি চাষীরা বাজার বুঝে না, দর-দস্তুর বুঝে না, কেনাবেচা বুঝে না, আমদানি-রপ্তানি বুঝে না; তাহারা খুব সাদাসিধা লোক; নিজ গৃহস্থালীর জন্য জিনিষ তৈয়ারী হইয়া গেলেই তাহারা স্বর্গসুখ অনুভব করে,—ইত্যাদি যুক্তির পশ্চাতে কোনো নিরেট তথ্য নাই। থাকিলে ১০০ রুব্‌লের চাষী আর ২১ রুব্‌লের চাষীর মতন ধনগত অসাম্য "সেকেলে" চাষী-পল্লীতে দেখা দিত না।

অসাম্য যখন দেখা গিয়াছে তখন চায়ানোফের দর্শনকে বাতিল বিবেচনা করাই সঙ্গত। পুঁজিনীতি-শাসিত আর্থিক ব্যবস্থায় বিনিময়, লেনদেন, কেনা-বেচা ইত্যাদির যে প্রভাব এই "সেকেলে" চাষী-মণ্ডলেও সেই সব লক্ষ্য করা দরকার। বর্ত্তমান জগতের শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক কর্ম্মক্ষেত্রে আদান-প্রদান, মূল্য-নির্দ্ধারণ, খরচপত্র ইত্যাদির যে নিয়ম, "সেকেলে" চাষীর ফসল-উৎপাদনেও সেই নিয়মই কাজ করিতেছে এইরূপ বুঝিলে বিষয়টা স্পষ্ট হইতে পারে।

"সেকেলে" চাষীও মেহনতের মজুরি বুঝে

চায়ানোফ-পন্থীরা বলেন,—"সেকেলে চাষীরা নিজ মেহনতের কিম্মৎ উৎপন্ন ফসলের কিম্মতের ভিতর গণ্য করে না। অথবা যদিই বা করে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।" মেহনৎটা ঠিক্ যেন পরিবার-প্রীতি আর কি। তাহার জন্য কি আবার দাম ধরা চলে? ষ্টুডেন্‌স্‌কির গবেষণায় দেখিতেছি,—"সেকেলে" চাষীরাও নিজ নিজ মেহনৎকে পারিবারিক প্রেমের ডাক বিবেচনা করে না। তাহার দাম কষিয়া দেখিতে তাহারাও বেশ পটু।

দেখা যায় যে,—প্রাকযুদ্ধ কালের কোনো বৎসর "সেকেলে" চাষীরা ৫৩৪৯,৩ মিলিয়ন রুব্‌ল মুনাফা পাইয়াছিল। এই মুনাফাটার ভিতর চাষীদের মজুরি কতটা? চায়ানোফের যুক্তি অনুসারে কিছুই নয়। কিন্তু ষ্টুডেন্‌স্‌কি বলিতেছেন,—"তাহা ঠাওরানো সোজা।

ধরা যাউক যেন মূলধনের উপর সুদ দিতে হইয়াছে শতকরা ৫ রুব্‌ল। তাহাতে দাঁড়ায় ৬২১,৯ মিলিয়ন রুব্‌ল। তার উপর জমির খাজনা বাবদ যাহা-কিছু চাষী জমিদারকে দেয় তাহাও মুনাফা হইতে কাটিয়া রাখা উচিত। তাহার পরিমাণ ১৪১৪,৯ মিলিয়ন। এই দুই দফা বাদ দিলে খাঁটি মুনাফা দাঁড়ায় ৩৩১১,৫ মিলিয়ন রুব্‌ল। এইটাই হইতেছে চাষীদের মজুরি।"

এক বৎসরে যদি চাষীদের আয় এইরূপ হয়, তাহা হইলে গড়পড়তা রোজ হিসাবে চাষী প্রতি দাঁড়ায় ৮৯,৩ কপ্‌। এই অঙ্কটা পাইবামাত্র ষ্টুডেন্‌স্‌কি বলিতেছেন, "১৯১১ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর ধরিয়া রুশিয়ায় চাষ-আবাদের কাজে মজুর বাহাল করিতে হইলে তাহাকে রোজ গড়পড়তা দিতে হইত ৯২ কপ্‌। অর্থাৎ কৃষিকর্ম্মের মামুলি মজুরের বেতনে আর চাষীর মেহনতের মূল্যে আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে।"

কাজেই বলিতে হয় যে,—"সেকেলে" চাষীরা ১৯১১-১৫ সনে নিজ নিজ উৎপন্ন ফসলের দাম ঠিক্‌ করিবার সময় নিজ মেহনতের কিম্মৎ ধরিত, পুঁজিব্যবহারের জন্য সুদ গুনিত আর খাজনাও ধরিত। অথাৎ নেহাৎ রবিন্‌সন ক্রুসোর মতন তাহারা দুনিয়ার বিশ্বশক্তি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাত্রা চালাইত না। পুঁজিনীতির সকল ধর্ম্মই তাহাদের রপ্ত ছিল। হিসাবপত্রে তাহারা দস্তরমত ওস্তাদ।

এই সঙ্গে ষ্টুডেন্‌স্‌কি স্বদেশভক্তির পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

মাথাটা পুঁজিনিষ্ঠ,—
অভাব কেবল পুঁজির

"রুশ চাষীকে বে-আকেল বা আহাম্মুক বিবেচনা করা হইতেছে বিশ্ববাসীর দস্তুর। এইরূপ নিন্দা করা চলিতে পারে না। আমাদের চাষীরা আঁক কষিতে কম পারে একথা বলা ঠিক্‌ নয়। জমিজমার যেখান হইতে যতটুক নিংড়াইয়া বাহির করা সম্ভব,—অন্যান্য দেশের সভ্যভব্য যন্ত্রশীল পুঁজিশীল

চাষীদের মতনই রুশ কিষাণও সেখান হইতে তাহা নিংড়াইয়া বাহির করিতে অভ্যস্ত ছিল। মগজে তাহাদের পুঁজিশাহী ঘী-টী যে গিজগিজ করিত তাহা সন্দেহ করা চলে না। মাথাটা তাহাদের পুঁজিনিষ্ঠদেরই মতন। অভাব কেবল পুঁজির। পুঁজি হাতে পাইলে রুশ কিষাণও দুনিয়ায় চরম পুঁজিনীতির চাষ দেখাইয়া ছাড়িবে। সহজ কথায় ইহারই নাম,—"কাশীমিত্তিরও জানি আর নিমতলাও জানি, কেবল মরে' আছি তাই!" চাই রুশিয়ায় মূলধন। ভারতেরও অবস্থা তদ্রূপ।

জমিজমাবিষয়ক আর্থিক গবেষণা আর চাষীর চরিত্র-বিশ্লেষণ

"ঘোরতর স্বদেশী" বনাম "পশ্চিমমুখো"

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের রুশ সাহিত্য ও দর্শনে এক প্রকাণ্ড কারবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুশ চাষীরা "পশ্চিমা" অর্থাৎ পশ্চিম-ইয়োরোপীয় চাষীদের মতন নর-নারী নয়, তাহাদের স্বভাবও স্বধর্ম্ম সব আলাদা, এই মতের দার্শনিক ছিলেন এবং আছেন অনেকে। আবার ঠিক্ তার উল্টা মতের প্রচারকও ছিলেন আর আছেন অনেকে। শ্লাভো-ফিল বা শ্লাভ-প্রেমিক অর্থাৎ "ঘোরতর স্বদেশী" রুশ পণ্ডিতের সংখ্যা কম নয়। আবার "পশ্চিম-মুখো" রুশ পণ্ডিতের দলেও "বাবা" "বাঘা" হোমরা-চোমরাদের সংখ্যা বিপুল। নারদ্নির দল "স্বদেশী", আর কার্লমার্কস্-পন্থীরা বিশ্বশক্তির উপাসক। এই দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব ভারতেও খুবই সুপরিচিত।

বিলাতে পল্লী-সংস্কার

ইংরেজ সমাজেও পল্লীসংস্কার-সমস্যা আছে। ফোর্ডহাম নামক এক পণ্ডিত "দি রিবিল্ডিং অব রুর‍্যাল ইংল্যাণ্ড" (পল্লী-বিলাতের পুনর্গঠন) নাম দিয়া একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন (১৯২৫)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২+২১২। লণ্ডনের লেবার পাবলিশিং কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের মতে বিলাতী কৃষির অবনতি ঘটিয়াছে প্রধানতঃ দুই কারণে। প্রথমতঃ এই জন্য দোষী "ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌" বা পুঁজি-দৌরাত্ম্য। তাঁহার বিবেচনায় "অবাধ-বাণিজ্য-নীতি" ও ইংরেজ সমাজে চাষ-আবাদের দুরবস্থার জন্য কম দায়ী নয়।

কো-অপারেশুন বা সমবায়-প্রণালী চাষের কতটা উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে? ফসল উৎপন্ন করিবার কাজে সমবায় প্রথায় অনেক উপকার হইয়াছে সত্য। কিন্তু বাজারে এইসকল মাল জোগাইবার কাজে সমবায়-প্রথা বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। বাজারের মামুলি দোকানদারেরা এই প্রথার যম-বিশেষ। তাহারা ঘোঁট-মঙ্গল করিয়া "সমবায়ী" বেপারীদিগকে কাবু করিতেছে।

কৃষির উন্নতি-বিধানের জন্য গ্রন্থকার কয়েকটা চরম দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। সংসার হইতে ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কার এবং টাকা-কড়ির দালাল নামক জীব তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। বাঁধা দাম নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। মালের উৎপাদনকারী এবং মালের ভোগকর্ত্তাদের মধ্যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর লোক থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক শিল্পকর্ম্মের কর্ত্তা ও পরিচালক থাকিবে মজুরেরা নিজে। আর যদি লাভ কিছু জমে, তাহা হইলে শিক্ষা-প্রচারের জন্য তাহা খরচ করা কর্ত্তব্য। এইসকল মত অনুসারে কাজ চলিলে ইংরেজ পল্লী পুনর্গঠিত হইতে পারিবে।

আয়ের পরিমাণে ক্রমিক হ্রাস

সকল প্রকার কৃষিকর্ম্মের দস্তুর সম্বন্ধে একটা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত ধনবিজ্ঞানের আসরে অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাহার মোটা কথা এই যে, জমির উপর যত বেশীই খরচ কর না কেন, খরচার অনুপাতে আয় উশুল হওয়া অসম্ভব। আয়ের পরিমাণটা খরচের অনুপাতে বাড়ে না, ক্রমেই কমিতে থাকে। আয়ের পরি-

মাণে ক্রমিক হ্রাস কৃষিকর্ম্মের একটা খাঁটি বিশেষত্ব। এই সিদ্ধান্ত কতটা টেঁকসই তাহা যাচাই করিবার জন্য মার্কিন পণ্ডিত প্যাটন নিউইয়র্কের কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটা গবেষণা চালাইয়াছেন। শ'খানেক পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ তৈয়ারী হইয়াছে। ১৯২৬ সনে রচনা ছাপা হইয়াছে "ডিমিনিশিং রিটার্ণস্ ইন অ্যাগ্রিকালচার" (কৃষিকর্ম্মে আয়ের পরিমাণে ক্রমিক হ্রাস) নামে।

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, সিদ্ধান্তটা মোটের উপর টেঁকসই বটে। প্রথমতঃ, ধরা যাউক যেন টাকা কড়ি বা মুদ্রার চল নাই। অর্থাৎ চাষ ব্যবসায় যাহা কিছু খরচ করা যাইতেছে তাহার দাম টাকায় পয়সায় হিসাব করা হইতেছে না। আবার চাষের শেষে যে ফসলটা পাওয়া যাইতেছে তাহারও টাকায় পয়সায় বাজার-দর কষা হইতেছে না। অতগুলা লোক অত ঘণ্টা করিয়া খাটিল। আর অত সের অত মণ সার, বীজ ইত্যাদি চাষের কাজে লাগিল। গো-বলদের মেহনৎ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদিও "বস্তু" হিসাবে মাপিয়া রাখা হইল, দাম বা ভাড়া হিসাবে নয়। এই গেল খরচপত্রের কথা। অপর দিকে ফসলের বেলায় হিসাব রাখা হইল কত মণ মাল উঠিল ইত্যাদি। দুই তরফের তুলনা করিয়া প্যাটন বলিতেছেন যে, বাস্তবিকই মেহনৎ, গো-বলদ, সার ইত্যাদি পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়িতেছে ফসলের পরিমাণ তাহার চেয়ে কম অনুপাতে বাড়িতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ধরা যাউক যেন দেশে টাকাকড়ির চল আছে, আর টাকাকড়ির মাপেই মেহনৎ ইত্যাদির আর ফসলের দামও কষা হইতেছে। বাজার দর অনুসারে যাচাই করিলে এই দুই তরফের সম্বন্ধ কিরূপ দেখা যায়? অবশ্য প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত যে, চাষ সুরু করা হইতে ফসল বাজারে ফেলা পর্য্যন্ত বাজার-দরের কোনো বিভাগে উঠা-নামা ঘটে নাই। তাহা হইলে মজুরি, গো-বলদ, যন্ত্র

পাতির দাম বা ভাড়া আর সার বীজ ইত্যাদির দাম একত্র করিলে যে পরিমাণ টাকা পয়সা দাঁড়ায় তাহাই হইল খরচপত্র। এই খরচপত্র যদি ডবল করা যায় তাহা হইলে ফসল যাহা পাওয়া যাইবে তাহার বাজারদর ডবল হইবে কি? প্যাটনের আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, চাষী ডবল খরচ করিয়া ফসলের বেলায় ডবল দামের চেয়ে কম দাম পাইতেছে।

তৃতীয় দফায় প্যাটন বলিতেছেন যে, ঐতিহাসিক হিসাবে এই সিদ্ধান্তটা টেঁকসই নয়। প্রত্যেক দেশেই এমন অনেক জমি আছে যাহার উপর ডবল খরচ করিলে আয় ডবল বা তাহার চেয়েও বেশী হওয়া সম্ভব। তবে এই সব জমির বিশেষত্বগুলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত। যে সব জমিতে খরচ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয় বাড়িতেছে, সে সকল জমি হয়ত একদম অ-চষা, তাজা জমি। এইরূপ "পতিত জমি"তে আবাদ চালাইতে গিয়া অনেক চাষী হয়ত বা "সোনা" ফলাইয়া ছাড়িতেছে। কিন্তু "পতিত জমি" চিরকাল পতিত থাকে না। শেষ পর্য্যন্ত আয়ের পরিমাণে "ক্রমিক হ্রাস" আসিয়া দেখা দেয়ই দেয়। আবার হয়ত এমন অনেক জমি আছে যে সব জমিতে চাষী অনেক দিন ধরিয়া হাল চালাইতেছে বটে। কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রে যতটা সার দেওয়া উচিত অথবা যে ধরণের উৎকৃষ্ট বীজ ছড়ানো উচিত অথবা যতটা শারীরিক মেহনৎ, যন্ত্রপাতি বা গো-বলদ কায়েম করা উচিত ততটা করা হয় নাই। এই সকল জমিকে আধা-চষা, সিকি-চষা বা দু'আনা-চষা বলা চলিতে পারে। এই ধরণের আধা-চষা জমির উপর যদি চাষী চাষের খরচ বাড়াইয়া দেয়,—অর্থাৎ বেশী মেহনৎ লাগায়, ভালো বীজ ছড়ায়, যথোচিত সার দেয় আর যন্ত্রপাতির সাহায্য লয় তাহা হইলে জমিগুলা পুরা-চষায় পরিণত হইবে। এইরূপ আবাদকে "গভীরতর" বা "পুঙ্খানুপুঙ্খ" চাষ বলা হইয়া থাকে। বিদেশী পারি-

ভাষিকে ইহার নাম "ইনটেন্সিভ্" চাষ। এই ধরণের "গভীরতর" চাষ যখন চলিতে থাকে তখন অবশ্য খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুপাতে অথবা এমন কি খরচের অনুপাতের চেয়েও উঁচু হারে আয় উশুল হওয়া সম্ভব। কিন্তু "পতিত জমি" যেমন একদিন না একদিন চষা জমিতে পরিণত হয়ই হয়, তেমনি আধা-চষা জমিও কোনো দিন পূরা-চাষ বা ইন্টেন্সিভ্-চষা জমিতে ছাড়াইয়া যায়। তখন আবার শেষ পর্য্যন্ত "ক্রমিক হ্রাসের নিয়ম" আয়ের পরিমাণ ও অনুপাতকে আক্রমণ করে।

কৃষিকর্ম্মের যন্ত্রপাতি

বর্ত্তমান যুগের চাষবাসকে মামুলি কৃষিকর্ম্ম বলা চলে না। সেকেলে ডাক-খনার বচন একালের দুনিয়া হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। একালের ডাক-খনারা যন্ত্রপাতির ওস্তাদ, কলকব্জায় সুদক্ষ। আজ কালকার চাষ একটা শিল্পবিশেষ। এই সকল কথা বুঝাইবার জন্য রুডল্ফ আরেন্স 'ডী ড্যয়চে লাণ্ডমাশিনেন-ইণ্ডুষ্ট্রি" (জার্ম্মাণ কৃষি-যন্ত্রের শিল্প-কারখানা) নামে একখানা বই লিখিয়াছেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৪। চাষ-বাসের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি কাজে লাগে সেই সব তৈয়ারী করিবার কারখানা জার্ম্মাণিতে প্রথম কায়েম হয় কখন,—এবং তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সকল কারখানার ক্রমবিকাশ কিরূপ সাধিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের মাল। গ্রাইফ্সহ্বাল্ড নগরের ব্যাম্বার্গ কোং প্রকাশক (১৯২৬)। আরেন্স তথ্যগুলা ধন-বিজ্ঞানের খোরাকস্বরূপ সাজাইয়াছেন। টেক্নিক্যাল কটমট মাল কম আছে।

"যুক্তি-যোগ" ও "স্বদেশ-যোগ"

চাষ-ব্যবসায় পাকা ওস্তাদ এক জার্ম্মাণ জমিদার "যুক্তিযোগে"র স্বপক্ষে রায় দিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্লাঙ্গেন্‌হোনিঙ্গেন। বইটার নাম

রাট্সিওনাল হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট্ উণ্ড নাট্সিওনাল-হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট্ (যুক্তিযোগের ধনব্যবস্থা আর জাতীয়তার ধনব্যবস্থা)। ২১৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ রচনায় লেখক বলিতেছেন যে,—শিল্পকারখানায় সঙ্ঘগঠন যেমন জরুরি তেমনি জরুরি সঙ্ঘগঠন কৃষিকর্ম্মেও। বিশেষভাবে গরু, শূয়র ইত্যাদি "পারিবারিক" জানোয়ার-চাষের কারবারে বৃহদাকার ব্যবস্থা না থাকিলে লাভবান হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। ছোট ছোট পশুপালন-ব্যবসা ছাড়িয়া এই দিকে বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিতে অগ্রসর হইলেই যুক্তিযোগের নিয়ম পালন করা হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। সস্তা তরীতরকারী আর ফলমূলের চাষে গা ঢিলা দিলে চলিবে না। এই দিকে নজর রাখা চাই দস্তুরমত। অধিকন্তু কোনো এক প্রকার চাষে বিশেষজ্ঞ হইয়া পড়িলে দেশের পক্ষে ক্ষতির সম্ভাবনা। চাই এক সঙ্গে নানাবিধ ফসল ও ফলমূলের চাষ। লেখক এইখানেই খতম করেন নাই। তিনি স্বদেশকে খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে ষোল আনা অথবা যথাসম্ভব স্বরাজী ("অটার্কি"-নিষ্ঠ) করিয়া তুলিতে চাহেন। এইরূপ আত্মনির্ভরতার উপায় হইতেছে সংরক্ষণ-শুল্ক। এই শুল্কের সাহায্যে বিদেশী ফসল ও ফলমূল হইতে দেশের আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে।

পল্লীনিষ্ঠায় ফরাসী জাতি

আজও ফরাসীরা কট্টর পল্লীভক্ত। তাহাদের পল্লীনিষ্ঠার পরিচয় পাই যখন-তখন একালের ফরাসী অর্থশাস্ত্রে। একখানা বই সম্প্রতি হস্তগত হইয়াছে, ১৯৩২ সনে ছাপা। লেখকের নাম গাস্তঁ রুপ্‌নেল। বইয়ের ভিতর আছে ফরাসী দৌলতের একাল-সেকাল। লেখক অবশ্য বইটাকে রীতিমত ইতিহাস বলিয়াছেন। "ইস্তোআর ছ্য লা কাঁপান ফ্রাঁসেজ" (ফরাসী পল্লীব্যবস্থার ইতিহাস) এই নামে বইটা পরিচিত।

ফ্রান্সের মধ্যজনপদে পল্লীগুলার বিন্যাসে কোনো নিয়ম ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায় না। পশ্চিম জনপদে বস্তিগুলা ঘন সন্নিবিষ্ট নয়। উত্তর অঞ্চলে পল্লীজীবনের যথার্থ রূপ পাকড়াও করা সম্ভব। পল্লীবিন্যাসে শৃঙ্খলা আছে, ভূমিবিন্যাসে শৃঙ্খলা আছে। মাঠের পর মাঠ সাজানো রহিয়াছে যেন ছক-কাটা জমিনের মতন। এই চাষ-ব্যবস্থা অনেক কালের জিনিষ। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ফ্রান্সেরই একচেটিয়া ব্যবস্থা নয়। জার্ম্মাণিতে, হল্যাণ্ডে, মায় বিলাতেও এইরূপ ভূমি-বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ভূমিবিন্যাসের প্রত্নতত্ত্ব বইটার ভিতর বড় ঠাঁই অধিকার করিয়াছে। জমিনের আকার-প্রকার কোন্ কোন্ জেলায় কোন্ কোন্ পল্লীতে কখন কিরূপ হইল তাহার বৃত্তান্ত পাইতেছি। কোনো পল্লী দরিয়ার কিনারায় অবস্থিত, কোনো পল্লী উপত্যকায় অবস্থিত, আর এক প্রকার পল্লী পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত। প্রত্যেকটার গঠনে রাস্তাঘাট কিরূপ সাহায্য করিয়াছে তাহার পরিচয়ও পাইতেছি।

পল্লীজীবনের অর্থকথাই এই বইয়ের একমাত্র কথা নয়। চাষ-আবাদ, কুটির-শিল্প, যান-বাহন ও হাট-বাজার ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক গড়ন রকমারি রূপ ধারণ করে। সমাজ-ব্যবস্থার বড় কথা আইন-কানুন। কাজেই সেকেলে জমিদারির কথা আলোচিত হইয়াছে। জমিদারি প্রথা সর্ব্বপ্রাচীন যুগে ছিল না। তখন হয়ত যৌথ জমি-প্রথার, পল্লী-স্বরাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল।

ফরাসী জমিদারির ক্রমবিকাশ

কিন্তু জমিদারি প্রথা যখন কায়েম হয় তখন ইহার সঙ্গে রাষ্ট্রিক অর্থাৎ বাদসাহী বা রাজকীয় একতিয়ার সংযুক্ত ছিল না। রাজশক্তির প্রতিনিধি নামক জীব সে যুগে দেখা দেয় নাই। জমিই ছিল জমিদারির

একতিয়ারের কেন্দ্র। জমির মালিক হিসাবেই জমিসংক্রান্ত সকল-কিছু জমিদারের এলাকায় আসিয়া পড়িত। বন-জঙ্গল, নদনদী, খালবিল, রাস্তাঘাট, পুল ইত্যাদির উপর একতিয়ারও জমিদারি-একতিয়ারের অন্তর্গত ছিল। আদায় হইত নেহাৎ অল্প হারে। এই সমুদয়কে খাজনা, রাজস্ব ইত্যাদির সামিল করা চলিত না। চাষীরা ছিল প্রকারান্তরে স্বাধীন জীব।

কিন্তু পরবর্ত্তী কালে জমিদারি-প্রথায় রূপান্তর দেখা দেয়। জমিদারেরা "প্রজাদের" ভিতর জমি বিলি সুরু করে। উত্তরাধিকার-স্বত্বে প্রজারা প্রথম অবস্থায় জমি পাইত না। তবে "স্বাধীন" চাষীর অস্তিত্ব লোপ পাইতে থাকিল। তাহার ঠাঁইয়ে দেখা দিল "প্রজা"। দেখা দিল "চুক্তির বন্ধন"। অর্থাৎ জমিজমার চুক্তির ব্যবস্থা ফরাসী সমাজের মধ্যযুগেও প্রথম-প্রথম জানা ছিল না। মধ্যযুগের "একালে" এই ব্যবস্থা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। একটা বিশেষ কথা মনে রাখা আবশ্যক। "চষা" জমিতে চুক্তি ব্যবস্থা কায়েম হইবার পরও বন ও গোচারণ ভূমিতে যৌথপ্রথা বজায় ছিল।

যে-যুগের জমিদারি-ব্যবস্থায় চুক্তির বন্ধন দেখা দিল সেই যুগে আরও কতকগুলা বিচিত্র "বন্ধন" কায়েম হয়। "সাবেক" কালে'র পল্লী-ব্যবস্থায় সবই ছিল যৌথ। রাস্তা ঘাট তৈয়ারি করা হইত পল্লী-নরনারীর যৌথ খরচে। পুল তৈয়ারি করা হইত সমবেত দায়িত্বে। দুর্গ-নির্ম্মাণ ইত্যাদিও পল্লীবাসীরা নিজ খরচের অন্তর্গত বিবেচনা করিত। কেবল তৈয়ারি মাত্র নয়, এই সব রক্ষা করিয়া চলাও তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। "স্বাধীন" মানুষমাত্রের এই "তিন" কর্ত্তব্য ছিল পল্লী-নীতির গোড়ার কথা। কিন্তু জমিদারি প্রথা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাধীন জীবের তিন কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব লুপ্ত হয়। তাহার ঠাঁইয়ে

দেখা দেয় জমিদারের আজ্ঞা, শাসন, শক্তি। আর এই শাসনের বিধানও বিচিত্র। প্রজারা সড়ক, সেতু, দুর্গ ইত্যাদি তৈয়ারি ও রক্ষা করিবার জন্য খরচ করিতে "বাধ্য" হইত। অধিকন্তু জমিদারকে এই সব ব্যবহারের জন্য একটা খাজনা দেওয়া তাহাদের কোষ্ঠীতে দেখা দিল। কেবল তাহাই নয়। জমিদারের নিজ জমি চষিবার জন্য পল্লীবাসী-দিগকে বিনা তঙখায় গতর খাটাইতে বাধ্য করা হইত। মনে রাখিতে হইবে যে, জমিদারেরা কিছু জমি প্রজাদের ভিতর চুক্তি-প্রথায় বিলি করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহারা প্রচুর জমি নিজেদের তাঁবেই নিজ চাষ-আবাদের জন্য রাখিয়া দিতে ভুলে নাই।

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, জমিগুলা নিজ দখলে আনা ছিল জমিদার-দের প্রথম জুলুম। দ্বিতীয় জুলুম নানা উপায়ে এই প্রভুত্ব রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা। এই সকল উপায়ের ভিতর বহু প্রকার আদায়ের প্রথা আবিষ্কার করা ছিল অন্যতম।

ইংরেজ বনাম ফরাসী

ফ্রান্সে চাষী, পল্লীবাসী, প্রজা ইত্যাদি শব্দের অর্থ চিরকালই ছিল দরিদ্র, নির্য্যাতিত, দুঃখী নরনারী। কিন্তু দারিদ্র্য, নির্য্যাতন, দুঃখ সহিয়াও ফরাসী চাষী চাষ ছাড়ে নাই। মাটির টুকরাকে কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা ফরাসী চাষীর স্বধর্ম্ম। অপর দিকে বিলাতে ছিল চাষীরা প্রথম হইতেই স্বাধীন। জমিদারদের একতিয়ার বড় বেশী ছিল না। জমিদারেরা তঙখা দিয়া যথোচিত সুব্যবস্থা করিয়া নিজ জমিতে মজুর বা চাষী বাহাল করিতে বাধ্য হইত। শেষ পর্য্যন্ত আজ দেখিতেছি যে, বিলাত চাষহীন, চাষীহীন, পল্লীহীন। ফরাসী গ্রন্থকারের মতে এই অবস্থা মঙ্গলজনক নয়। কেন না "চাষীর উপর নির্ভর করিতেছে

মানবজাতির ভবিষ্যৎ।" অপর দিকে ফ্রান্স সেকালের মত একালেও চাষের মুল্লুক, চাষীর মুল্লুক, পল্লীর মুল্লুক রহিয়া গিয়াছে।

একালের ফরাসী চাষী

মধ্যযুগের দুর্গতি একালের ফরাসী চাষীরা আর ভুগিতেছে না। শ'দেড়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা অনেক কিছু স্বাধীনতা আর সুযোগ-সুবিধা চাখিতেছে। চাষীরা আস্তে-আস্তে জমির মালিকে পরিণত হইয়াছে। দেশের আর্থিক অবস্থা এমন রূপান্তরিত হইয়াছে যে, জমি চাষ করাইতে হইলে এখন চাষীকে দখলী স্বত্ব দেওয়া দরকার হয়। চাষের জন্য সহজে মজুর পাওয়া দুষ্কর। মাঝারি বহরের জমিতে চাষীরা মালিক হইয়া বসিতে পারিয়াছে। বড় বড় জমিদারি আপনা-আপনি মাঝারি বহরে টুকরা-টুকরা হইয়া আসিতেছে। ফ্রান্স দেখিতে-দেখিতে মাঝারি "পারিবারিক" চাষের দেশে পরিণত হইতেছে। অধিকন্তু সমবায়-প্রথার দৌলতে একালে আবার সেই মান্ধাতার আমলের "যৌথ"-আবাদ ফিরিয়া আসিতেছে।

লোক-সমস্যা ও লোক-বিজ্ঞান

লোক-সংখ্যার গণিত-তত্ত্ব

ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত শমোল্লার প্রতিষ্ঠিত বর্ষপঞ্জীর নাম—শমোল্লার্স য়ারবুখ্ ফিয়র গেজেট্‌স্‌গেবুঙ্, ফারহ্বাল্টুঙ্ উণ্ড্ ফোল্‌ক্‌স্‌হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট ইম্ ডয়চেন রাইখে। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের আইনকানুন, রাষ্ট্রশাসন এবং আর্থিক ব্যবস্থা-বিষয়ক ত্রৈমাসিক; মিউনিক ও লাইপৎসিগ হইতে প্রকাশিত। প্রকাশক ডুঙ্কার উন্ড হুমব্লট কোং।

আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পঞ্জিকায় (১৯২৪) লোক-সংখ্যার গণিত-তত্ত্ব (মাঠিমাটিশে বেফোলকারুংস্-টেওরী) সম্বন্ধে আলোচনাটা শিক্ষাপ্রদ। জগতের লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে এই কথা অল্পবিস্তর প্রায় সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির হারটা জানা আছে বোধ হয় এক মাত্র তথ্য ও অঙ্কতালিকায় বিশেষজ্ঞ লোকজনের। আর এই হারের সামাজিক প্রভাব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দুনিয়ার কয় জন নরনারীর মাথায় আছে বলা কঠিন। তবে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ব্যবস্থা লইয়া যাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহাদের এই বিষয়ে কিছু কিছু মাথা ঘামাইতে হয়, অন্ততঃ মাথা ঘামাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অষ্ট্রেলিয়ার সরকারী তথ্যতালিকা-দক্ষ পণ্ডিত ক্লিবস্ লোকসংখ্যার বৃদ্ধি বিষয়ক নবীন আলোচনার পথপ্রদর্শক।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার যুগে দুনিয়ার লোকসংখ্যা কত ছিল তাহা বড় একটা জানা যায় না। বোধ হয় জানিবার আর উপায় নাই। ১৮০৪ সনের লোক সংখ্যা ৬৪ কোটী ধরিয়া লওয়া হয়।

আর ১৯২৪ সনে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬৪ কোটি ৯০ লক্ষ। অর্থাৎ ১২০ বৎসরে জগতের লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে প্রতিবৎসর হাজার করা ৮·৬৪ জন হিসাবে। দেখা যাইতেছে যে, ৮০½ বৎসরে লোক-সংখ্যা পূরাপূরি দ্বিগুণ বাড়ে।

বর্ত্তমান যুগে যে হারে মানুষ বাড়িয়াছে সেই হার যদি অতীত কালেও খাটিয়া থাকে, তাহা হইলে দুনিয়ার প্রথম মানুষ,—একদম খাঁটি "আদি মনু"—জন্মিয়াছিল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে। কিন্তু ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব আর নৃতত্ত্বের নজিরে আমরা আদিম মানবকে দেখিতে পাই আরও প্রাচীনকালে; খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ অব্দে ত পাই-ই, এমন কি খৃষ্টপূর্ব্ব ১০,০০০ অব্দ পর্য্যন্তও মানুষের হাড়-মাসে ঠেকা যায়।

তাহা হইলে বলিতে হইবে যে,—"সেকালে" লোকবৃদ্ধির হার বর্ত্তমান যুগের হারের সমান ছিল না। "আজকালকার" হারের চেয়ে সেই হার যারপরনাই কম ছিল। এই অনুমান সত্য হইলে তাহার কারণ কি? কারণগুলা সহজে নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। তখনকার দিনে নরনারী জীবন-ধারণের জ্ঞানবিজ্ঞানে পাকা ওস্তাদ ছিল না, প্রথমেই হয়ত এই কথা মনে উঠিবে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রাচীন ও "প্রাগৈতিহাসিক" যুগে অংসখ্য বার অশেষ প্রকার দৈব-দুর্ব্বিপাক মানব-সংসারে দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে মাঝে মাঝে মানব জাতি "নির্ব্বংশ" হইয়াছে।

যাহা হউক, সম্প্রতি অতীত সম্বন্ধে কল্পনা চালাইয়া বেশী দূর পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। "ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্" (সংখ্যা) বিদ্যার বেপারীরা আজকাল প্রধানতঃ ভবিষ্যতের কথায়ই মাথা ঘামাইতেছেন। এই দিকে কল্পনা খাটাইয়া ভবিষ্য-মানবের ভাগ্য বুঝিতে চেষ্টা করাই তাঁহাদের বিজ্ঞান-সাধনার একটা বড় লক্ষ্য।

এই যে ১৮০৪ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত ১২০ বৎসর, এই কালের ভিতরই লোকসংখ্যা জগতের সর্ব্বত্র সমান হারে বাড়িয়াছে কি? নানাস্থানের হার নানাবিধ। এই ১২০ বৎসরের প্রত্যেক দশকেই বৃদ্ধির হার সমান রহিয়াছে কি? বিভিন্ন দশক বা অর্দ্ধ-দশকের হার বিভিন্ন। ১৯০৬ হইতে ১৯১১ সন—এইটুকু সময়ের বৃত্তান্তই ধরা যাউক। এই কয় বৎসরে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে প্রতিবৎসর হাজারকরা ১১.৫৯ হিসাবে। এই হার যদি জগতে টিকিয়া যায় তাহা হইলে কি দেখিতে পাইব? আগামী ৬০ বৎসরের ভিতর জগতের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িবে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে ফল দেখিতেছি ৮০½ বৎসরে, সেই ফল পাইব মাত্র ৬০ বৎসরে আর এখন হইতে ২০০ বৎসরের ভিতর, অর্থাৎ ২১২৪ সনে লোকসংখ্যা হইবে আজকার সংখ্যার পূরাপূরি ১০ গুণ।

আজকালকার দুনিয়ায় লোক-সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়া অতি সহজ। বিগত বিশ পঁচিশ বৎসরের ভিতর মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্মকৌশল এবং যন্ত্রপাতি অভাবনীয়রূপে উন্নতিলাভ করিয়াছে। মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে এই সবই যারপরনাই মঙ্গলজনক। জগতের শক্তিপুঞ্জকে মানুষের শক্তি, স্বাস্থ্য এবং সুখ বাড়াইবার কাজে আজকাল যত লাগানো যাইতে পারে তাহার তুলনা মানব-ইতিহাসের কোনো যুগে পাওয়া যায় না। অতএব লোক-সংখ্যা যদি অতি দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

কিন্তু লোক বাড়িতে পারে যে হারে লোককে বাঁচাইয়া রাখিবার কলকব্জা,—অর্থাৎ ভাত-কাপড়—ঠিক্ সেই হারে বাড়িতে পারে কিনা সন্দেহ। আবার সেই ম্যালথাসের বাণী কানে পশিতেছে। ৩০০০ বৎসরের ভিতর লোকসংখ্যা এত বাড়িতে পারে যে, বর্ত্তমান ভূমণ্ডলের মতন বারটা ভূমণ্ডলেও নরনারীর ঠাঁই কুলাইবে না। কিন্তু আজকাল

আমাদের তাঁবে যে ধরাখানা আছে তাহার পাহাড়-পর্ব্বত খনি-নদী-হ্রদ-বন সব ষোল আনা "চষিয়া" শেষ করিতে ৬০০।৭০০ বৎসরের বেশী লাগিবে না। অর্থাৎ এই সময়ের ভিতরেই পৃথিবী তাহার মানুষ ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতার চরম দেখিয়া বসিবে। পৃথিবী যখন মানুষকে "জবাব" দিবে মানুষের অবস্থা তখন নেহাৎ কাহিল হইবে সন্দেহ নাই।

এইখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আড্-মির‍্যাল রজারের কথা বেশ চিত্তাকর্ষক। ১৯২৪ সনের আগষ্ট মাসে তিনি হ্বিলিয়ামস্ টাউনের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"যুক্তরাষ্ট্রে আজ ১১ কোটী ২০ লক্ষ নরনারী বাস করে। যে হারে লোক বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ২০ কোটির কোঠায় পৌছিতে বেশী দিন লাগিবে না। ১৯৬০।৭০ সনের দশকে সেই কোঠায় আসিয়া ঠেকিবে। তখন হয়ত আমরা নবনব জনপদ দখল করিয়া আমাদের 'অতিরিক্ত' লোকজনের আবাসভূমি ঢুঁড়িতে বাধ্য হইব! কাজেই লোক-সংখ্যার কল্যাণে লড়াইয়ের প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবী।"

তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রশ্নও উঠিতে বাধ্য। সভ্যতার ইতিহাসে কতকগুলা নবীন সমস্যা কঠোর আকারে দেখা দিতেছে। শীঘ্রই মানব জাতিকে এই সকলের জবাব দিতে হইবে। প্রশ্নের আকার নিম্নরূপ:—"জগতের অধিক সংখ্যক নরনারী একসঙ্গে কথঞ্চিৎ মাঝারি গোছের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে? না, অল্পসংখ্যক লোক প্রত্যেকে বেশী-বেশী স্থখ-স্বচ্ছন্দতার অধিকারী হইবে?" কৃত্রিম উপায়ে লোক-সংখ্যা কমাইবার আন্দোলন ও বর্ত্তমান নৈতিক-আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ বিবেচিত হইতে থাকিবে।

লোকসংখ্যার আর্থিক আলোচনা

দেখা যাইতেছে, আজকালকার ধনবিজ্ঞান-সেবীরা দুনিয়ার লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে মাথা ঘামাইতেছেন। সম্প্রতি বিলাতের অন্যতম নামজাদা ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বোনার তিনখানা ইংরেজি বইয়ের খতিয়ান করিয়াছেন। লণ্ডনের "ইকনমিক জার্ণ্যাল" ত্রৈমাসিকে এই প্রবীণ পণ্ডিতের মতামত বাহির হইয়াছে। ইয়োরা-মেরিকার পণ্ডিতেরা বুড়া হইলেও ছোক্‌রাদের বইয়ের সমালোচনা করিতে লজ্জাবোধ করেন না। কথাটা বাঙ্গালীর জানিয়া রাখা ভাল।

এক খানা বইয়ের প্রকাশক বষ্টন ও নিউইয়র্কের হটন-মিফ্‌লিন কোং। বইয়ের নাম "পপিউলেশুন প্রবলেম্‌স্‌ ইন দি ইউনাইটেড ষ্টেটস অ্যাণ্ড ক্যানাডা" (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর ক্যানাডার লোক-সমস্যা)। বইটা কতকগুলা বিভিন্ন লোকের রচনার সমষ্টি। সম্পাদকের নাম লুইস ডাবলিন। ১৯টা প্রবন্ধ আছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন ভূমিকা। আর প্রথম প্রবন্ধটাও তাঁহারই লেখা।

১৯২৪ সনে "আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশুনের" (মার্কিণ সংখ্যা-বিজ্ঞান-পরিষদের) উদ্যোগে লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একটা সম্মেলন বসে। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই সম্মেলনে অনুষ্ঠিত বক্তৃতাবলীর সংগ্রহ।

লোকসংখ্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞান আলোচনা করিবার পক্ষে মার্কিণ মুল্লুক এক বিপুল পরীক্ষাক্ষেত্র-বিশেষ। এই দেশে লোক বাড়িয়াছে বিস্তর। নানাজাতির মিশ্রণ ঘটিয়াছে নিবিড়ভাবে। প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ বড় শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। নগরে নগরে নরনারীর সন্তান-জন্ম ঘটিতেছে কমকম। পাড়াগাঁয়ের লোক শহরমুখো হইতেছে। ইয়োরোপ আর এশিয়া হইতে লোক-আমদানির স্রোতও আইনে খানিকটা চাপিয়া

রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ধরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও অল্পবিস্তর দেখা যায়। কাজেই জগতের প্রায় যে-কোনো দেশকেই লোকসংখ্যার বিজ্ঞান-বিষয়ক ল্যাবরেটরী বিবেচনা করা চলে। তবে মার্কিণ মুল্লুক নেহাৎ কচি। এই দেশে অল্প সময়ের ভিতর অনেক কিছু ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কাজেই এখানকার বিশেষত্ব কিছু-না-কিছু আছেই।

এই গ্রন্থে ক্যানাডা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন কোট্‌স্। এই ব্যক্তি ক্যানাডার সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিশিয়ান। ক্যানাডায় আর যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল প্রভেদ আছে সেই সব দেখানো তাঁহার মতলব। অধিকন্তু এই দুয়ের পরস্পর সাহায্যের নজীরও তিনি দিয়াছেন। ক্যানাডাদেশের আর এক পণ্ডিত ম্যাক্-ইভর এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে ভবিষ্যতের পানে লোকসংখ্যা কোন্ প্রণালীতে অগ্রসর হইতেছে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এইখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। বিলাতের সেন্সাস রিপোর্ট লোকসংখ্যার বিজ্ঞান সম্বন্ধে যারপরনাই মূল্যবান। ১৯১১ সনের সেন্সাস-বিবরণীর দ্বাদশ খণ্ডে "বিবাহের ফলাফল" সম্বন্ধে অনুসন্ধানমূলক বস্তুনিষ্ঠ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তাহাতে ইংরেজ সমাজকে আটটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। শ্রেণীগুলা আর্থিক কাজকর্ম্ম-মাফিক্। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে পুঁজিজীবী, কর্ম্মপরিচালক, বিদ্যাসেবক ইত্যাদি শ্রেণী। সপ্তম শ্রেণীর লোক হইতেছে খনির কুলী। চাষীরা পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের বিবাহ-ঘটনা আর সন্তান-জন্ম এবং পারিবারিক হ্রাসবৃদ্ধি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া বিলাতী সেন্সাস এই বিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক হইয়াছে।

মার্কিণ গ্রন্থে অধ্যাপক রয়টার যুক্তরাষ্ট্রের লোক-বৃদ্ধির আলোচনা

করিয়া বলিতেছেন,—"১৮৬০ সন পর্য্যন্ত লোক-সংখ্যা ডবল হইত প্রত্যেক ২৫ বৎসরে, কিন্তু তাহার পর লোক-বৃদ্ধির হার কমিয়াছে। ১৯০০ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত যে হারে লোক বাড়িয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের তুলনায় শতকরা মাত্র ৩৫·৬ জন বেশী। আর ১৯১০ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত যে পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী দশকের তুলনায় মাত্র শতকরা ১৪·৯ জন বেশী।"

টম্‌প্‌সন্ বলিতেছেন,—"লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কমিয়াছে বটে। কিন্তু এই কমা দেখা যায় একমাত্র শহরে। খাঁটি শ্বেতাঙ্গ মার্কিণ জাতি শহরে বেশী বাড়িতেছে না একথা ঠিক্।"

অন্য দুইখানা বই বিলাতী। একটির লেখক ফ্লোরেন্স। তাঁহার বইয়ের নাম "ওভার-পপিউলেশুন থিয়োরি অ্যাণ্ড ষ্টাটিষ্টিকস্" (লোক সংখ্যার অতিবৃদ্ধি বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্যতালিকা)। প্রকাশক লণ্ডনের কেগান পল কোং। অপর গ্রন্থের নাম "পপিউলেশুন প্রব্‌লেমস্ অব্ দি এজ অব্ ম্যালথাস" (ম্যালথাসের সময়কার লোক-সংখ্যা-সমস্যা)। লেখক গ্রিফিথ। প্রকাশক কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটী প্রেস।

ফ্লোরেন্সের মতে "ম্যালথাসের বাণী আজও লোকসংখ্যা-বিষয়ক বিজ্ঞানের ভিত্তি। লোক বাড়িতেছে। লোকের আহার্য্যও বাড়িতেছে। কিন্তু আহার্য্য যে পরিমাণে বাড়িতেছে তাহার চেয়ে বেশী পরিমাণে বাড়িতেছে লোক।" আজকালকার বেকার-সমস্যায়ও এই তত্ত্বই খাটিবে।

গ্রিফিথ্ অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলাতে লোক-সংখ্যা ঠিক্ কত ছিল তাহার অনুসন্ধানে মেহনৎ করিয়াছেন। ১৮০১ সনের পূর্ব্বে বিলাতে আদমসুমারির ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক গণনা করিতে গিয়া আজকালকার দিনে নানা মুনি নানা মত চালা-

ইয়াছেন। গ্রিফিথের সিদ্ধান্ত এইরূপ :—"১৭০০ সনে ছিল ৫,৮৩৫,২৭৯। ১৮০১ সনে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৯,১৬৮,০০০।

লোকসংখ্যা বাড়িবার একটি উপায় হইতেছে জন্ম-সংখ্যার বৃদ্ধি। আর এক উপায় হইতেছে মৃত্যু-সংখ্যার হ্রাস। ম্যালথাস প্রথম কথাটার উপর জোর দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কথাটার দিকে তাঁহার নজর ছিল না। আজকালকার বিজ্ঞানে এই দ্বিতীয় দফার উপর নজর পড়িতেছে বেশী।

আর্থিক পত্রিকায় লোকবিদ্যা

লোক-সংখ্যা, লোকজনের গতিবিধি এবং জনগণের দেশান্তর-গমন ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কাগজে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে বিস্তর। বিগত কয়েক মাসের ভিতর যে সকল রচনা বাহির হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মশক্তি (ইউনাইটেড এম্পায়ার পত্রিকা, নভেম্বর, ১৯২৫)। লেখক শ্রীযুক্ত সিলেণ্টো বলেন—শাদা চামরাওয়ালা নরনারী অষ্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান জনপদেও বেশ সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠভাবে জীবন-যাপন করিতে সমর্থ।

(২) পারিবারিক ভাতা (ইউজেনিক্‌স রিভিউ, জানুয়ারী, ১৯২৫)।

(৩) সন্তান-নিবারণ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তরফ হইতে আলোচনা। নিউইয়র্ক প্রদেশের মাতৃস্বাস্থ্য কমিটি এ সম্বন্ধে যে সব অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহার ফলাফল প্রবন্ধে বিবৃত আছে (আমেরিকার জিনিওলজিক্যাল সোসাইটির "ট্রানজাকশ্যনস্" নামক প্রসূতি বিজ্ঞান-পত্রিকার ১৯২৪ সনের সংখ্যায় প্রকাশিত)।

(৪) জন্মসংযম আন্দোলনকারীদের আহাম্মুকি (আট্‌লাণ্টিক মান্থলি, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬)। লেখক শ্রীযুক্ত ডাবলিন বলিতেছেন—"যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসংযম অনাবশ্যক। আমাদের দেশে লোক-সংখ্যা কিছু অত্যধিক হারে বাড়িতেছে না! রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করিবার জন্য আমরা আরও অনেক লোক চাই।"

(৫) লোকসংখ্যা বৃদ্ধির যথার্থ হার (জর্ণ্যাল অব দি আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশ্যন, সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)।

লেখক ডাবলিন এবং লোট্‌কা বলিতেছেন—"যুক্তরাষ্ট্রে হাজার করা বার্ষিক ১০·৯৯ হারে লোক বাড়িতেছে। কিন্তু এই হার যথার্থ হার নয়। বিদেশ হইতে যে সকল লোক আমেরিকায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে তাহাদের সংখ্যা বাদ দিলে আমাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইবে হাজারকরা বার্ষিক ৫·৪৭। ১৯২০ সনে প্রত্যেক বিবাহিত পরিবারে সন্তান ছিল গড়পড়তা ৩·০৬।"

(৬) বার্লিন এবং জুরিখ শহরে পরিবারের আয়তন হ্রাস, (শ্‌মোল্লার্‌স্‌ য়ারবুখ, ৪৯ বার্ষিক চতুর্থ সংখ্যা)। লেখক এর্কার সুইটজারল্যাণ্ড এবং জার্ম্মাণীর নানা শহরে জন্ম-সংখ্যার হ্রাস দেখাইতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক শ্রেণীতে জন্ম-মৃত্যু দেখান হইয়াছে।

(৭) দেশান্তর গমন (রেহ্বিয়ু দেকোনোমী পোলিটিক, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ১৯২৫)। লেখক গোনার বলিতেছেন—"জনগণের স্থায়ীভাবে দেশান্তর-গমন এবং প্রবাস-জীবন সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞানসেবী অথবা সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা যথোচিত নজর দেন নাই। কিন্তু এই সকল বিষয় দুনিয়ার ভবিষ্যৎ গঠন সম্বন্ধে যারপরনাই মূল্যবান। জন্ম এবং মৃত্যু মানব সমাজের খুব বড় ঘটনা। তাহার পরেই এই দেশান্তর-গমন সমাজবিদ্যায় ঠাঁই পাইবার যোগ্য।"

(৮) শহর ও শহুরে জীবন বুঝাইবার প্রয়াস (কোয়ার্টার্লি জার্ণ্যাল অব ইকনমিকস্, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬)। লেখক শ্রীযুক্ত হেগ বলিতেছেন:—আমেরিকার লোকেরা ভবিষ্যতে আরও বেশী নগর-জীবনের দিকে ঝুঁকিবে। নগরের আয়তন বৃদ্ধি বর্ত্তমান যুগের আর্থিক ব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবী।

(৯) আমেরিকার লোক-আমদানি-বিষয়ক নূতন আইন এবং রাষ্ট্রনীতি (সিয়েন্‌ৎসিয়া, মার্চ্চ, ১৯২৬)। ফরাসী লেখক ওজেয়ার এই ইতালিয়ান পত্রিকায় আমেরিকার লোক-সংখ্যা-বিষয়ক আইনকানুন এবং তাহার ফলাফল বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

(১০) দুনিয়ার লোক-সমস্যা (সিয়েন্‌ৎসিয়া, অক্টোবর, নভেম্বর, ১৯২৫)। অষ্ট্রেলিয়ার সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ ক্লিবস নানাপ্রকার হিসাব চালাইয়া বলিতেছেন, "পৃথিবীতে শেষ পর্য্যন্ত কত লোক বসবাস করিতে পারে তাহার আন্দাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতামত পাওয়া গিয়াছে। কোনো কোনো মতে ২৯০ কোটী হইতেছে ধরাতলের চরম শক্তি। যাঁহারা অতিমাত্রায় আশাবাদী তাঁহাদের বিবেচনায় ১৩৪০ কোটী নরনারীর আবাস হইলেও দুনিয়া লোকের ভিড়ে বসবাসের অযোগ্য হইবে না।" ক্লিবসের অন্যান্য কথায় বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। সংসারে লোকসংখ্যার চাপ কোথায় কত বেশী এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে লোকজনের গতিবিধি কখন কোন্ আকার গ্রহণ করিবে তাহার বিশ্লেষণ লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(১১) লোক-চলাচলের বর্ত্তমান ধরণ-ধারণ (আমেরিকান ফেডারেশ্যন, মার্চ্চ, ১৯২৫)। লেখক ম্যাগনুসন বলিতেছেন—"মহাযুদ্ধের পর হইতে দুনিয়ায় লোকজনের দেশান্তর-গমন কমিয়া গিয়াছে। সকল দেশেই প্রবাস সম্বন্ধে কঠোর আইন-কানুন জারী হইয়াছে এবং লোক-

আমদানি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কড়াকড়ি চালাইতেছেন। জেনীভাতে বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদের সম্পর্কে যে আন্তর্জ্জাতিক মজুর আফিস আছে তাহার অধীনে এই দেশান্তর-গমন-সমস্যা অনেকটা শৃঙ্খলীকৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।

(১২) এশিয়ার নরনারী সম্বন্ধে কালিফর্ণিয়াবাসীদের কর্ম্মনীতি। (অ্যান্যাল্‌স্‌ অব দি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স, নভেম্বর, ১৯২৫)। লেখক বলিতেছেন—"কালি-ফর্ণিয়ার আমেরিকানরা এশিয়ার নরনারীর বিরুদ্ধে আর্থিক কারণে খড়্গ-হস্ত। এই সকল লোককে চিরকালের মতন আমেরিকা হইতে বাহিরে রাখা কালিফর্ণিয়ার মতলব। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তাহারা যে কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে তাহা কোনো মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে।"

(১৩) ইয়োরোপে দেশান্তর-গমনের তথ্য (রেহ্বিয় দে সিয়ঁাস পোলিটিক, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)। ফরাসী লেখক মোরিয়িয়ে প্রধানতঃ তিনটি ইয়োরোপীয়ান দেশের লোক-রপ্তানি আলো-চনা করিয়াছেন:—(১) ইতালী, (২) ইংলণ্ড, (৩) পোল্যাণ্ড। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তথ্য-তালিকাও আলোচিত হইয়াছে। ফরাসী দেশে বিদেশী জনগণের লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, একথা লেখক বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্ট লোকজনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে রাষ্ট্রনীতি চালাইতেছেন তাহার বৃত্তান্ত আছে। লেখকের মতে লোকজনের এই আমদানি-রপ্তানি কাণ্ডে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় সমস্যার কতকগুলি জটিল এবং সূক্ষ্ম গোল-যোগ ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

(১৪) নিউজীল্যাণ্ডে শিশু-মৃত্যু-গণনা (জার্ণ্যাল অব দি

আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসেসিয়েশুন সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)। লেখক নীল বলিতেছেন—নিউজীল্যাণ্ডে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা গুনতিতে অন্যান্য দেশের চেয়ে কম। তাহা ছাড়া নিউজীল্যাণ্ডে গভর্ণমেণ্ট জনগণের জন্মমৃত্যু-বিষয়ক তথ্য-তালিকা নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই কারণে শিশুজীবন-বিষয়ক গবেষকদের পক্ষে নিউজীল্যাণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মকেন্দ্র।

(১৫) নগর-মুখী চাষী, যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা (ইকনমিক ওয়ার্লড, আগষ্ট, ১৯২৫)। লেখক টেলার বলিতেছেন—শহরের দিকে পল্লীবাসীর অভিযানে সাহায্য করা দেশের লোকের কর্ত্তব্য। চাষ-আবাদে অন্ন-সংস্থানের স্থবিধা না থাকিলে পল্লী ছাড়িয়া শহরে আসিয়া শিল্প-কর্ম্মে লাগিয়া যাওয়া আর্থিক উন্নতির স্থপথ।

(১৬) ইংরেজ পর্য্যটক আর্থার ইয়াং এবং ফ্রান্সের লোক-সংখ্যা (রেহ্বিয়ু দেকোনোমী পোলিটিক, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯২৫)।

(১৭) জনপদহিসাবে লোকের পরিমাণ এবং নরনারীর সংখ্যাবৃদ্ধি (ৎসাইটশ্রিফট্ ফ্যির গেওপোলিটিক, ১৯২৫)।

(১৮) কলেজের ছাত্রদের পারিবারিক লোকসংখ্যা (জার্ণ্যাল অব দি আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশুন, ডিসেম্বর ১৯২৫)। লেখক টমসন বলিতেছেন—"যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের সন্তান সংখ্যা বাড়িতেছে না। পশ্চিমাঞ্চলের কোনো কোনো জেলারও এই অবস্থা। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে লোকসংখ্যা শিক্ষিত সমাজেও দস্তুরমত বাড়িতেছে।

বংশোন্নতি ও বিবাহ-সংস্কার

লোক-সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিদ্যার চর্চ্চা ধনবিজ্ঞানের

আখড়ায় আজকাল খুব প্রবল। সে হইতেছে সুপ্রজনন বা বংশোন্নতি (ইউজেনিক্‌স)।

এই বিষয়ে ইংরেজ-মহলের অন্যতম নামজাদা লেখক হইতেছেন ক্রমবিকাশবাদের প্রবর্ত্তক জগদ্বিখ্যাত চার্ল্‌স ডারুইনের পুত্র লেনার্ড ডারুইন। বংশোন্নতি-বিদ্যার প্রবর্ত্তক ফ্র্যান্সিস গ্যাল্টনও ডারুইন-গুষ্টিরই আত্মীয় ছিলেন। দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাটা বংশানুক্রমিক রূপেই কিছু কিছু চলিতেছে।

লেনার্ড ডারুইনের বইয়ের নাম "দি নীড্‌ ফর ইউজেনিক রিফর্ম" (বংশ-সংস্কারের আবশ্যকতা)। লণ্ডনের জন মারে কোং প্রকাশক। ৫৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকার বিজ্ঞানের মূলমন্ত্রগুলি সম্বন্ধে বেশী মনোযোগ দেন নাই। বংশোন্নতি-সাধন করিতে হইলে সমাজে কোন্ কোন্ নতুন নিয়ম প্রচলন করা দরকার তাহার আলোচনাই ডারুইনের উদ্দেশ্য।

বংশোন্নতি বিদ্যাটায় দুই স্বতন্ত্র বিভাগ লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ প্রাণিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তমাফিক্ জন্মগত দোষগুণের আলোচনা। দ্বিতীয় ভাগ হইতেছে মানব-সমাজে এই সকল দোষগুণ কোন্ শ্রেণীতে কিরূপভাবে বিস্তৃত তাহার বিশ্লেষণ। বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় অংশকেই খাঁটি বংশোন্নতি-বিদ্যা বলা চলে।

কিন্তু আসল কথা,—আজ পর্য্যন্ত ইউজেনিক্‌স-সাহিত্য বলিলে যে সকল রচনা আমাদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার অধিকাংশেই এই দ্বিতীয় দফার টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। লেনার্ড ডারুইনও একমাত্র প্রথম দফার উপরই নির্ভর করিয়াছেন। তিনি জানোয়ার-মহলে জন্মগত দোষগুণ লাভের চর্চ্চাটাকেই একপ্রকার নিজ বিদ্যার ভিত্তি করিয়া লইয়াছেন।

ডারুইনের গ্রন্থের আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা আবশ্যক। তিনি বংশোন্নতি সম্বন্ধে খাঁটি বিজ্ঞান রচনা করিবার মতলবে কলম ধরেন নাই। বিদ্যাটা আজকাল বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে কোন্ ঠাঁই অধিকার করিতেছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। তিনি এই বিদ্যাটাকে কাজে লাগাইবার কৌশলই খুঁজিতেছেন। যাহাকে "অ্যাপ্লায়ড সায়েন্স" বা কার্য্যকরী বিদ্যা বলে, ইউজেনিক্স ডারুইনের গ্রন্থে সেই মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। তিনি সমাজ-সংস্কারক, বংশ-সংস্কারক, বিবাহ-সংস্কারক রূপে সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন।

গ্রন্থের দুর্ব্বলতা এইখানেই ধরা পড়িতেছে। প্রথমতঃ, ডারুইনের গ্রন্থে যতখানি "থিয়োরেটিক্যাল" বা তাত্ত্বিক বিজ্ঞান আছে তাহা একতরফা বা আংশিক। দ্বিতীয়তঃ, এই আংশিক বিজ্ঞানটাকেই তিনি কাজে লাগাইয়া সমাজ-সংস্কার করিবার প্রয়াসী। কাজেই তাঁহার কর্ম্মনীতি এবং সংস্কার-কৌশলের অসম্পূর্ণতা কম নয়।

একটা প্রশ্ন তোলা যাউক। আজকাল যাহারা গরীব বা সামাজিক ও আর্থিক হিসাবে অনুন্নত, তাহাদের তুলনায় পয়সাওয়ালা লোকেরা কি ব্যক্তিত্বের পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট জীব? তাহারা কি "রক্তের" দোষে, "বংশের" দোষে অনুন্নত হইয়াছে? ধনী আর নির্দ্ধন এই দুই শ্রেণীর গোড়ায় কি কোনো রক্তগত, বংশগত প্রভেদ আছে? আর সেই প্রভেদের দরুণ চরিত্রে এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে নানা প্রভেদ সৃষ্ট হইয়াছে কি?

যাঁহারা বিষয়টা খাঁটি বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ প্রণালীতে আলোচনা করিতে প্রয়াসী,—অর্থাৎ যাঁহারা সমাজ-সংস্কারের "প্রপাগাণ্ডায়" (আন্দোলনে) মস্‌গুল নন, তাঁহারা বড় লোকে আর গরীব লোকে ব্যক্তিত্বের আসরে, স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র-বত্তা ইত্যাদির আখড়ায়

বড় বেশী জন্মগত বা রক্তগত প্রভেদ ঢুঁড়িয়া পান না। কিন্তু লেনার্ড ডারুইন এই দুই শ্রেণীর ভিতর বিস্তর প্রভেদ আছে এইরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তারপর টাকা রোজগার করিতে পারাটা ডারুইন একটা রক্তের গুণ, জন্মগত গুণাধিকারের প্রভাব রূপে ধরিয়া লইতে রাজী। আজকালকার সামাজিক ব্যবস্থাই যে অনেক লোককে আর্থিক হিসাবে দাবিয়া রাখিয়াছে আবার অপরাপর লোককে অন্যায় ভাবে মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছে একথা ডারুইনের মাথায় প্রবেশ করে নাই।

কাজেই ডারুইনের বাণী হইতেছে নিম্নরূপ:—"গরীব লোকগুলা অকাল কুষ্মাণ্ড। তাহারা অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, আহাম্মুক বলিয়াই গরীব। মানব-সমাজের দুর্ব্বহ ভার হিসাবে তাহারা দুনিয়াকে অবনতির পথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। পয়সাওয়ালা লোকদের নিকট হইতে গবর্মেণ্ট মোটা হারে ট্যাক্‌স আদায় করিয়া গরীবের জন্য অবৈতনিক ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিতেছে, হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতেছে, স্বাস্থ্যনিবাস গড়িয়া তুলিতেছে, শহর-পল্লীতে আরাম-বাগান রচনা করিতেছে। গবর্মেণ্টের এই শ্রেণীর কাজগুলা সবই কুঁড়ে ও নির্গুণ লোককে লাই দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। করিৎকর্ম্মা, চরিত্রবান্, ধনশালী লোকদের রক্ত শুষিয়া গবর্মেণ্ট অলসচরিত্র নির্গুণ নরনারীকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, আর এই সকল বদরক্তওয়ালা নরনারীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতেছে।"

বংশ-সংস্কার আর সমাজ-সংস্কার চালাইতে হইলে ডারুইনের মতে গবর্ণমেণ্টকে উল্টা পথে চলিতে হইবে। গরীব লোকেরা যাহাতে বিবাহ করিবার দিকে না ঝুঁকে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। সার্ব্বজনীন অবৈতনিক ইস্কুল রাখা উচিত নয়। যাহারা মরিতে বসিয়াছে তাহাদিগকে

বাঁচাইবার জন্য সস্তায় অথবা বিনা পয়সায় আরোগ্য-শালার সৃষ্টি অনাবশ্যক। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইয়োরামেরিকায় আজকাল ইউজেনিক্স বলিলে সাধারণতঃ এই ধরণের কার্য্যকরী বিদ্যা এবং এইরূপ সমাজ-সংস্কারের মোসাবিদাই বুঝা যায়। এই সকল চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালীকে ভারতীয় কট্টর বর্ণাশ্রমবাদী এবং ভেদপন্থী গোঁড়া হিন্দুয়ানির মাসতুত ভাই বিবেচনা করা চলে।

কিন্তু ইউজেনিক্সের খাঁটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য অন্যান্য লেখকও আছেন। তাঁহাদের সংখ্যাও কম নয়। আর তাঁহারা নামজাদা পাকা-মাথাওয়ালা লোকও বটে। অধিকন্তু এই সকল খাঁটি থিয়োরেটিক্যাল বা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের ফলিত বা "অ্যাপলায়েড" বিভাগ সম্বন্ধেও অনেক লেখক আছেন। আর তাঁহাদের কলম চলেও সংযত ভাবে। তাঁহাদের মোটা কথা এই:—"আরে বাপু, মানব-সমাজে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দোষগুণগুলা ঠিক্ কিরূপভাবে চলাফেরা করে তাহা খাঁটি বিজ্ঞান এখনো বলিয়া দিতে অসমর্থ। বংশের দান আর রক্তের দান ঠিক্ কোন্ কোন্ আকৃতি-প্রকৃতির তাহা আমরা এখনো জানি না। কাজেই কোন্ নরনারীর বিবাহ করা উচিত সে সম্বন্ধে লম্বা গলা করিয়া প্রপাগাণ্ডা চালানো বর্ত্তমান অবস্থায় আহাম্মুকি।"

এই ধরণের সংযত লেখকের দলে ইংরেজ পণ্ডিত কার্-সণ্ডার্স অন্যতম। ইনি লোকসংখ্যা-বিষয়ক বিদ্যার সেবক। "ইউজেনিক্স্" নাম দিয়া তিনি সম্প্রতি একখানা বই ছাপিয়াছেন। ছোট বই। লণ্ডনের হোম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী প্রকাশক। বইটায় সমাজ-সংস্কারের ঝাণ্ডা খাড়া করা হয় নাই। তিনি মানবজীবনের ক্রমবিকাশে রক্তের দান আর সমাজের দান সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ চালাইয়াছেন।

বর্ত্তমান সমাজে দোষগুণগুলা কোন্ শ্রেণীতে কিরূপ ভাবে বিস্তৃত তাহার মাপজোক-সাধনের জন্য কার-সণ্ডার্স একটা "আত্মিক আদমসুমারি" কায়েম করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছেন।

জন্ম-সংযম

অন্যান্য পাশ্চাত্য পারিভাষিক শব্দের মতন জন্ম-সংযম (ব্যর্থ-কণ্ট্রোল) শব্দটাও ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। তবে এই শব্দের অন্তর্গত বস্তুটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যতটা চলে ভারতে তাহার শতাংশও চলে কিনা সন্দেহ। কাজেই ব্যর্থ-কণ্ট্রোল নামে যে একটা বিপুল আন্দোলন চলিতেছে তাহা ভারতের বড় বড় পণ্ডিতমহলেও বোধ হয় সু-জানা নয়। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে স্বইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জেনেহ্বা শহরে লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে এক আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস বসিবে (১৯২৭)। তাহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেই জন্ম-সংযম আন্দোলনের পাণ্ডা।*

১৯২৩ সনে আমেরিকার বাল্টিমোর ও শিকাগো শহরে "জন্ম-সংযম সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সম্মেলনে যে সব প্রবন্ধ পঠিত হয় সেইগুলা একত্রে গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে। কয়েকটা প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

(১) লোক-বৃদ্ধির দৌরাত্ম্য (প্যর্ল)।

---

* জন্মসংযমের দুস্‌মন ও আজকালকার বিজ্ঞান-জগতে কম নয়। এই দিকে ফ্রান্সের যোসেফ বার্থেলেমি একজন নামজাদা লোক। সম্প্রতি জার্ম্মাণ যুবা করহেয়ার একখানা সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার তারিফ করিয়া ইতালিতে মুসোলিনি "গেরার্খ্যা" মাসিকে একটা প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন (সেপ্টেম্বর ১৯২৮)।

(২) লোক-সংখ্যায় দুনিয়ার গতি (রস)।
(৩) জন্মসংযম ও মানসিক স্বাস্থ্য (চ্যাপম্যান)।
(৪) জন্মসংযম ও জনগণের স্বাস্থ্য (স্প্যোট)।
(৫) জন্মসংযমের প্রাণবিজ্ঞান (ঈষ্ট)।
(৬) জন্মসংযমের ধর্ম্ম ও নীতি (রুবেনষ্টাইন)।

কিন্তু জন্মসংযম শব্দটার অর্থ কি? এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন,—পরিবারের লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার অধিকার যদি পিতামাতার হাতে থাকে তাহা হইলে বলিব যে, জন্মসংযম কাজে পরিণত হইতেছে (চ্যাপম্যান)। ইহুদি পুরোহিত রুবেনষ্টাইন জন্মসংযম কথাটা পছন্দ করেন না। তিনি ধর্ম্ম ও নীতির তরফ হইতে লোকসংখ্যা সমস্যাটা আলোচনা করিতে চাহেন। তাঁহার মতে "স্বেচ্ছাপিতৃত্ব" ("ভলাণ্টারি পেরেণ্টহুড") শব্দটা চলিলে ভাল হয়। মার্কিণ মুল্লুকে জন্মসংযম আন্দোলনের মাথা হইতেছেন শ্রীমতী স্যাঙ্গার। জন্মসংযম শব্দের ব্যাখ্যা স্যাঙ্গারের রচনায় নানারূপ।

প্রথমতঃ লোকসংখ্যা কমাইবার যত প্রকার কৌশল থাকিতে পারে সবই স্যাঙ্গারের বিচারে জন্মসংযমের সামিল। কিন্তু স্যাঙ্গার ভাষা সংযত করিয়া অনেক সময় অন্যান্য কথাও বলিয়া থাকেন। "স্বাস্থ্যসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সন্তান-সৃষ্টির ক্ষমতাকে শাসন" করা হইতেছে জন্মের সংযম-সাধন।

বস্তুটার অর্থ সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ। জন্মসংযমের ফলাফলও নানা পাণ্ডা নানারূপে দেখিয়া থাকেন। জগতে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। এত বাড়া উচিত নয়। দুনিয়ায় দারিদ্র্য দেখা দিবে।—এইরূপ চিন্তা হইতেছে প্যর্ল, রস ইত্যাদি পণ্ডিতের। অপরদিকে সুপ্রজনন বা ইউজেনিক্‌স্ বিদ্যার পাণ্ডারা সংসারে অভিনব উৎকর্ষশীল নরনারীর

জন্ম আশা করিয়া জন্মসংযমের সুফল দেখাইয়া থাকেন। অবশ্য সুপ্রজননবাদীরা সামাজিক হিসাবে অকর্ম্মণ্য বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর নরনারীকে সংসার হইতে দূরীভূত করিবার মতলবেই জন্মসংযমের পক্ষপাতী হইয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিতেরা মধ্যবিত্ত ও মজুর পরিবারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজে জন্মসংযমের আন্দোলন চালাইতেছেন। ভারতবর্ষে এই দিক্ হইতে তলাইয়া মজাইয়া বুঝিবার অনেক কথা আছে। দরিদ্র আর মস্তিষ্কজীবী শ্রেণীর কর্ম্মদক্ষতা বাড়াইতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে জন্মসংযমের আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইবে।

যে বইটার বিবরণ দেওয়া গেল তাহার নাম "ব্যর্থ কণ্ট্রোল"। সম্পাদক আডোল্‌ফ মায়ার। প্রকাশক বাল্টিমোরের হ্বিলিয়ম্‌স্ (১৯২৫, ১৭১ পৃষ্ঠা)।

লোরোপ মাল্‌থুজিয়েন

ফরাসী পণ্ডিত বুর্‌ঁ লোকসংখ্যা-বিষয়ক বিজ্ঞান সম্বন্ধে খানিকটা গভীরতর ("ইণ্টেন্‌সিভ্") আলোচনা চালাইয়া একটা পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। ফ্রান্সে এই পুঁথির স্বপক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা চলিতেছে। প্রকাশক প্যারিসের লিব্রেয়ারি কল্‌বেয়ার। কেতাবের নাম "লোরোপ মাল্‌থুজিয়েন" (ম্যালথাস-প্রচারিত লোক-নীতির অধীনস্থ ইয়োরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান অবস্থা)।

ইয়োরামেরিকায় লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে কি কমিতেছে এই বিষয়ে মাথা ঘামানো আজকাল ধনবিজ্ঞানসেবীদের এক বড় ধান্ধা। দুনিয়ার সাদা চামড়াওয়ালা নরনারীর প্রভুত্ব বজায় থাকিবে কি না,—থাকিলে কোথায় কতদিন, এই সকল প্রশ্নের জবাব লোক-বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। সমস্যাটা একমাত্র অর্থনৈতিক নয়। খাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান

আর আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার অন্তর্গত হিসাবে লোক-সংখ্যা-বিষয়ক আলোচনা পশ্চিম মুল্লুকের সকল মহলেই উচু ঁঠাই অধিকার করিতেছে। এশিয়ায় আর আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ-নীতি এই সকল আলোচনার ফলে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে,—ভবিষ্যতে আরও হইবে। কাজেই পশ্চিমা পণ্ডিতদের লোক-বিষয়ক গবেষণা ভারত-সন্তানের পক্ষে যে যার পর নাই দামী সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

বুভ্রঁ যে সকল দিকে গভীরতর আলোচনার পক্ষপাতী তাহার প্রধান কথা নিম্নরূপ :—ধরা যাউক যেন কোনো একটা দেশের লোক-সংখ্য বাড়িতেছে কিংবা কমিতেছে। এই বাড়া-কমার অর্থ কি? বুভ্রঁর মতে বাড়া-কমা কাণ্ডটা বিশ্লেষণ না করা পর্য্যন্ত এই তথ্যটা জানিয়া বিশেষ কোনো লাভ নাই। বাড়া-কমা বিশ্লেষণ করা যাইবে কোন্ প্রণালীতে? বয়স অনুসারে দেশের লোকের শ্রেণী-বিভাগই আসল তথ্য। জন্মসংখ্যা যখন কমিতেছে তখন আগে কমে শিশুদের সংখ্যা তার পর কমে প্রবীণদের সংখ্যা। এই অবস্থায় গুন্‌তিতে বাড়িয়া চলে একমাত্র বুড়াবুড়ীরা।

বুভ্রঁ সনাতন ফরাসী ধনবিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়া বলিতেছেন :— "লোকসংখ্যা বাড়াইবার কমাইবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইনকানুন অথবা পারিবারিক ভাতা ইত্যাদি বিষয়ক নিয়ম অনাবশ্যক।" এই ধরণের "লেস্‌সে ফেয়ার" (সরকারী হস্তক্ষেপ নিষেধ) নীতি "সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক"এর (ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের) পণ্ডিতবর্গের মন-মাফিক কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাপক জিদ-সম্পাদিত "রেহ্বিঊ দেকোনোমী পোলিটিক" পত্রিকার যাঁহারা

পৃষ্ঠপোষক তাঁহারা আর্থিক ব্যবস্থায় সরকারী শাসন, সরকারী সাহায্য, সরকারী আইন-কানুন, এক কথায় সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী নন। তাঁহারা ফ্রান্সে জন্ম-সংখ্যা বাড়াইবার মতলবে গমর্মেণ্টকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে অনুরোধ করিতেছেন।

জিনির মতে লোক-সংখ্যার রাষ্ট্রনীতি

ইতালিয়ান পণ্ডিত জিনি লোক-সংখ্যার রাষ্ট্রনীতিতে মুসলিনির দক্ষিণ হস্ত বা মগজ বিশেষ। জিনির নাম "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নয়। সম্প্রতি তাঁহার আর একখানা বই বাহির হইয়াছে। তাহাতে জনবল বিষয়ক রাষ্ট্রনীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আলোচিত দেখিতে পাই। জগদ্বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত মালথুস-প্রচারিত মত জিনির চিন্তায় টেঁকসই নয়। নিজের গতর খাটাইয়া যেটুকু আয় করা যায় তাহার সাহায্যে বেশী সংখ্যক সন্তানের ভার লওয়া অসম্ভব। তবে পুঁজির দৌলতে অবশ্য জন্মের হার বাড়ানো অসম্ভব নয়।

জিনির মতে কৌলীন্য চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হয়। কোনো শ্রেণীই বেশী দিন ধরিয়া কৌলীন্য ভোগ করিতে পারে না। উঁচু জাতের হাড়মাসে নতুন রক্তের দগুল লাগানো অত্যাবশ্যক। যে জাতের বৃদ্ধির হার কম তাহার পক্ষে নতুন প্রতিবেশী জাতের আমদানি বন্ধ করা অসম্ভব। এইরূপ রক্ত-সংমিশ্রণে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। তবে যে দুই জাতের ভিতর সংমিশ্রণ ঘটে তাহাদের ভিতর অতিমাত্রায় বৈপরীত্য থাকিলে ক্ষতি হইতে পারে। কোনো একটা জাতের মধ্যে জন্মহার উঁচু থাকিলে তাহা বেশ কিছুদিন ধরিয়া নতুন আর্থিক অবস্থায়ও বজায় থাকে।

অয়গেন্ ফিশার, ৎসান্, বুর্গ্‌ড্যেফ্‌র্‌ার

বংশতত্ত্ব আজকাল জোরের সহিত আলোচিত হইতেছে হিট্‌লারী জার্মাণিতে। বার্লিনের নৃতত্ত্বশাস্ত্রী অয়গেন ফিশার এই আন্দোলনের কর্ণধার। বাস্তবিক পক্ষে বংশ আর জাতির উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া ফিশার স্বদেশ-সেবার ঝাণ্ডা খাড়া করিয়াছেন। ফ্রান্সের মতন জার্মাণির লোকশাস্ত্রীরাও স্বদেশের পুনর্গঠনের কাজে মোতায়েন রহিয়াছেন। মিউনিকের সংখ্যাদপ্তরে বসিয়া ৎসান্ অনেক দিন হইতেই লোক-বৃদ্ধির আন্দোলনে ইন্ধন জোগাইতেছেন। আজকাল "ষ্টের্বেন্ ডী ভাইস্‌সেন ফ্যেল্কার্ ?"—লেখক ফ্রীড্‌রিশ বুর্গ্‌ড্যেফ্‌র্‌ার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইনি বার্লিনের কেন্দ্রীয় সংখ্যা-দপ্তরের অন্যতম ডিরেক্‌টর। নামজাদা প্রবীনদের ভিতর মোম্ব্যার্ট, এল্‌ষ্টার, ৎস্বইডিনেক ইত্যাদি লোকশাস্ত্রীরা অনেকটা স্বাধীন মেজাজের লোক। ফিশার-ৎসান্-বুর্গ্‌ড্যেফ্‌র্‌ারের চিন্তাধারাই একালের জার্মাণিতে বেশী পশার ভোগ করিতেছে।

এইবার বুর্গ্‌ড্যেফ্‌র্‌ারের বইয়ের কথা বলিব। "ধ্বংসের পথে শ্বেতাঙ্গ?" ইত্যাদি আওয়াজ তুলিয়া শ্বেতাঙ্গেরা নিজেদেরকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে। মনে পড়িতেছে সেই বিশ-পঁচিশ বছর পূর্ব্বেকার কথা। তখন ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "মরণোন্মুখ হিন্দুজাতি" প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙালী হিন্দুকে আসন্ন ধ্বংসের ভয় দেখাইয়াছিলেন। সেই ভয় খাইয়া বাঙালী হিন্দুরা চাঙা হইয়া উঠিয়াছে কি না এখনো বলা যায় না। তবে একালে ধ্বংসের কথা শুনিয়া বাঙালী হিন্দুদের ভিতর একটা সাড়া পড়িয়াছে মনে হইতেছে। যাহা হউক, ঠিক সেই ধরণের চিন্তা-তরঙ্গই বুর্গ্‌ড্যেফ্‌র্‌ারের কেতাবে উঠিয়াছে।

ধ্বংসের পথে শ্বেতাঙ্গ ?

লোকবিদ্যা প্রধানতঃ সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি—সবই আঁক্ কষার মামলা। বুর্গড্যেফ'ার বার্লিনের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্-দপ্তরের কর্ম্মচারী। লেখক দেখাইয়াছেন নিম্নের চিত্র :—

মহাদেশ	১৮০০	১৯৩২
ইয়োরোপ	১০০	২৯০
এশিয়া	১০০	৩৫২
আফ্রিকা	১০০	২০০
আমেরিকা	১০০	১১২৫
ওশিয়ানিয়া	১০০	১০০০
দুনিয়া	১০০	৩৭৬

বুঝিতে হইবে যে, ১৮০০ সনে ইয়োরোপের লোকসংখ্যা যদি ১০০ ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ১৩২ বৎসরে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এই সংখ্যা বাড়িয়াছে ২৯০ পর্য্যন্ত,—অর্থাৎ তিন গুণের কিছু কম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ের ভিতর এশিয়া বাড়িয়াছে তিনগুণের বেশী ৩৫২ পর্য্যন্ত। আফ্রিকার বাড়্তি মাত্র ডবল। আমেরিকা বাড়িয়াছে প্রায় বার গুণ আর ওশিয়ানিয়া দশ গুণ। গোটা দুনিয়ার বাড়্তি প্রায় সাড়ে তিন গুণ,—৩৪৬ পর্য্যন্ত। দেখা গেল যে, ইয়োরোপের বাড়্তি এশিয়ার বাড়্তির চেয়ে বেশ কম। অন্যান্য মহাদেশের কথা সম্প্রতি না তুলিলেও চলে।

এইবার সাদা চামড়াওয়ালাদের নাক গুনিয়া দেখা যাউক দুনিয়ায় ইহারা কতগুলা আর কোথায়-কোথায় ঘরকন্না করে। বুর্গ্ড্যেফ'ার হিসাব দিতেছেন নিম্নরূপ :—

ইয়োরোপ	...	৪৮,৮০,০০,০০০
উত্তর আমেরিকা	...	১১,৯০,০০,০০০
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা	...	৪,৫০,০০,০০০
ওশিয়ানিয়া	...	৮০,০০,০০০
এশিয়া	...	১,৪০,০০,০০০
আফ্রিকা	...	৪০,০০,০০০
	মোট	৬৭,৮০,০০,০০০

দুনিয়ায় বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা ২০৩,০০,০০০,০০০। বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর সমগ্র লোকবলের তিন ভাগের এক ভাগ হইল সাদা। ভবিষ্যতেও সাদারা তিন ভাগের এক ভাগ থাকিবে কি?

শ্লাভ ও ল্যাটিন বনাম জার্ম্মাণ

ইয়োরোপের কোনো-কোনো জাতির "বৃদ্ধি"র হার বিলকুল কমিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ পশ্চিম-ইয়োরোপের অবস্থা নেহাৎ কাহিল। কয়েকটা দেশের হাজার-করা হার ১৯৩২ সনে ছিল নিম্নরূপ:—

১।	অষ্ট্রিয়া	...	১·৩
২।	ফ্রান্স	...	১·৫
৩।	সুইডেন	...	৩·০
৪।	বিলাত	..	৩·৬
৫।	জার্ম্মাণি	...	৪·৩
৬।	সুইট্‌সাল্যাণ্ড	...	৪·৫

এই দেশ কয়টা টিউটনিক বা "জার্ম্মাণ"-জাতীয় (ফ্রান্স ছাড়া)। কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থা এইরূপ নয়। "শ্লাভ" ও ল্যাটিন জাতীয় নরনারীর বৃদ্ধির হার বেশ উঁচু, যথা—

১।	ইতালি	...	৯.২
২।	স্পেন	...	১১.৯
৩।	লিথুয়ানিয়া	...	১২.১
৪।	পর্তুগাল	...	১৩.২
৫।	পোল্যাণ্ড	...	১৩.৭
৬।	রুমাণিয়া	...	১৪.২
৭।	বুলগারিয়া	...	১৫.১
৮।	উক্রেণিয়া	...	২২.৫
৯।	রুশিয়া	...	২৪.৫

এই সকল লোককেও সাদা বলিতেই হইবে। কিন্তু বুর্গ্ড্যেফার এই দিকে নজর ফেলিতে চেষ্টা করেন নাই দেখিতেছি। তিনি যে-কয়টা ইয়োরোপীয়ান জাতির বৃদ্ধিহার কম তাহাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস যে, সাদারা সকলেই এইবার লোপাট হইতে চলিল এরূপ বুঝিবার কারণ নাই।

কুচিন্স্কির জন্মমৃত্যুর যোগ-বিয়োগ

যাহা হউক, যে-কয়টা জার্মাণ-জাতীয় দেশের বৃদ্ধিহার অল্প সেই কয়টা দেশের লোকবল সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর বিচার কায়েম করা সম্ভব। বুর্গ্ড্যেফার বলিতেছেন:—"ঘটনাচক্রে আজও বৃদ্ধিহার উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা ক্ষয়ের হার। মাঝারি বয়সের অর্থাৎ সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতার বয়সের লোকসংখ্যা এখনো উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অন্যান্য বয়সের লোকসংখ্যা কম। এই কারণে হাজার-করা জন্মহার বেশ উঁচু আর মৃত্যুহার বেশ নীচু মনে হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জন্মহার কম আর মৃত্যুহার বেশী। ফলতঃ জার্মাণি, সুইট্সার্ল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেন্মার্ক, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে

জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী। 'বয়সের শ্রেণী' হিসাবে জন্ম মৃত্যু কষিয়া দেখিলে এই সকল দেশে ক্ষয় চলিতেছে, বৃদ্ধি নয়।" এই আলোচনা-প্রণালী অর্থশাস্ত্রে বিলকুল নয়া। পোলিশ জাতীয় মার্কিণ পণ্ডিত কুচিন্‌স্কি 'ব্যাল্যান্স অব্ ব্যর্থ্‌স্ অ্যাণ্ড ডেথ্‌স্' (জন্ম-মৃত্যুর যোগ-বিয়োগ) নামক গ্রন্থে (১৯২৮, ১৯৩১) এই দিকে দুনিয়ার নজর টানিয়া আনিয়াছেন।

.১৯৬০ সনে ইয়োরোপে শ্লাভ-প্রাধান্য

হিসাব করিতে-করিতে বুর্গ্‌ডোর্ফার দেখিতেছেন যে, ১৯৭৫ সনে জার্ম্মাণির লোকসংখ্যা ১৯৩০ সনের চেয়ে কম হইয়া পড়িবে। ফ্রান্স আর বেলজিয়ামের অবস্থাও সেইরূপ হইবে। ইয়োরোপের লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে নিম্নরূপ (শতকরা হিসাবে):—

জাতি	১৮১০	১৯৩০	১৯৬০
জার্ম্মাণ জাতীয়	৩১.৬	৩০.০	২৬.৯
ল্যাটিন ,,	৩৩.৭	২৪.৪	২২.৩
শ্লাভ ,,	৩৪.৭	৪৫.৬	৫০.৮
	১০০	১০০	১০০

বুর্গ্‌ডোর্ফার দেখিতেছেন যে, ইয়োরোপে শ্লাভজাতীয় নরনারী আগামী ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের ভিতর আসর জাঁকাইয়া বসিবে। কিন্তু জার্ম্মাণজাতীয় নরনারীর ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাদা জাতিগুলা সবই ক্ষয়িষ্ণু একথা বলা চলে না। তাহা সত্ত্বেও তিনি বইটার নাম "ধ্বংসের পথে সাদা জাতি?" কেন রাখিলেন বুঝা যাইতেছে না। জার্ম্মাণির স্বদেশ-সেবক হিসাবে একমাত্র জার্ম্মাণ জাতির কথা বলিলেই বইয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইত।

সাদায়-রঙিনে টক্কর

শেষ পর্যন্ত তিনি সাদায়-রঙিনে টক্কর চালাইতেছেন। সাদারা দুনিয়ার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র, আর রঙিনরা দুই-তৃতীয় অংশ। তাহা সত্ত্বেও সাদারা দুনিয়ার হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা,—রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও আত্মিক হিসাবে। গ্রন্থকারের সন্দেহ,—'দুনিয়ার শ্বেত-প্রাধান্য বুঝি লোপ পাইতে চলিল'। লোপের সম্ভাবনা কতখানি তাহা বুঝিবার জন্য ইয়োরোপ, আমেরিকা ইত্যাদি মহাদেশগুলায় সাদার ঘাট্‌তি কতটা আর রঙিনের বাড়্‌তি কতটা তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তিনি ভয়ের কারণ দেখিতেছেন। বুর্গডোর্ফার বলিতেছেন :— "সাদাদের এই বিপদ হিট্‌লার আর মুসলিনি ছাড়া আর কোনো নামজাদা রাষ্ট্রবীর দেখিতেছেন না। সকলেরই দেখা উচিত। যথাসময়ে জাগিলে সাদারা বাঁচিয়া যাইবে।"

চাই চীনা পারিবারিক-নীতি

গ্রন্থকারের মতে "মানুষ যেমন মরিতে বাধ্য, জাতিও তেমন মরিতে বাধ্য"—এইরূপ চিন্তা করা প্রাণবিজ্ঞানসম্মত কথা নয়। তবে কোন্ কোন্ পণ্ডিতের গবেষণা হইতে বুর্গ্‌ডোর্ফার নয়া প্রাণবিজ্ঞান জারি করিলেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ এই সম্বন্ধে প্রাণ-বিজ্ঞানের কোনো চরম সিদ্ধান্ত আছে কিনা সন্দেহ।

বুর্গ্‌ডোর্ফার বলেন, যে বাঁচিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেই যে-কোনো জাতি বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য। গ্রন্থকার সাদাদেরকে দেখাইয়াছেন চীনাদের দৃষ্টান্ত। "চীনারা যেমন অমর তোরাও তেমন অমর হইতে পারিস,—বারেক জাগিয়া করিলে পণ,—" এই হইল তাঁহার বাণী।

বুঝা যাইতেছে যে, এইসব বাণীর ভিতরে বা পশ্চাতে যুক্তি খেলিতেছে স্বদেশ-সেবার। ইহা সম্মান-যোগ্য। কিন্তু ৎসান্‌-এর মতন বুর্গ্‌ড্যেফ‍ার যদি সোজাসুজি বলেন:—"আরে জার্ম্মাণ স্ত্রীপুরুষ, কর্ তোরা বিয়ে। ছেলে-মেয়ে পয়দা কর্ গণ্ডা-গণ্ডা ঠিক চীনাদের মত। হ' তোরা চীনাদের মত ঠাকুর্দা-ভক্ত, লেখ্ তোরা হাজার-হাজার 'পারিবারিক প্রবন্ধ', লোক চাই আমরা জার্ম্মাণিতে কোটি-কোটি"—তাহা হইলে দুনিয়ার লোক আর জার্ম্মাণরাও কথাটা বুঝিবে বিনা গণ্ডগোলে। প্রাণ-বিজ্ঞান আর ইতিহাসের নজির টানিতে গিয়া গ্রন্থকার বিষয়টা জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। জার্ম্মাণির সঙ্গে অন্যান্য দেশের কথা জড়াইবার কোনো দরকার ছিল না। যাহা হউক, দেখিয়া রাখা গেল,—জার্ম্মাণিতে আজকাল কোন্ দিকে লোকশাস্ত্রের গবেষণা আর পঠনপাঠন চলিতেছে। বুর্গ্‌ড্যেফ‍ার নবীন জার্ম্মাণির বিচক্ষণ সেবক।

নগর-শাসন ও বেকার-নিবারণ *

সরকারী ব্যবস্থায় ঘরবাড়ী তৈয়ারি করানো, রাস্তাঘাট তৈয়ারি করানো, খাল কাটানো, নদী মেরামত করানো ভারতবর্ষে অপরিচিত নয়। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এসব চলে,—বরং বেশী-বেশী চলে। অধিকন্তু শহর বা পল্লী বিষয়ক কর্পোরেশনগুলাও নানা দেশে গবর্মেণ্টের মতনই ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈয়ারি ও মেরামতের দায়িত্ব লইতে অভ্যস্ত। এই ধরণের পূরা-সরকারী ও নিম-সরকারী (শাহরিক বা নাগরিক) ব্যবস্থায় কর্ম্মসৃষ্টির সুযোগ জুটে বিস্তর। ফলতঃ অনেক সময় বেকার-সমস্যার সুমীমাংসা ঘটিতে পারে।

---

* ৩৮ পৃষ্ঠায় "দুর্য্যোগ-দৈত্যের মুগুর" দ্রষ্টব্য।

মার্কিণ মুল্লুকের ফিলাডেল্‌ফিয়া শহর এই ধরণের কর্ম্মসৃষ্টি কাণ্ডে কিরূপ ফললাভ করিয়াছে তাহার একটা সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ পাইতেছি অধ্যাপক লাউক্‌স্‌-প্রণীত গ্রন্থে। বইটার নাম "দি ষ্ট্যাবিলিজেশন্‌ অব্‌ এম্‌প্লয়মেণ্ট ইন ফিলাডেল্‌ফিয়া" (ফিলাডেল্‌ফিয়ায় কর্ম্ম-স্থিতীকরণ)। বইটার নামের সঙ্গে আর একটা কথা গাঁথা আছে। সে হইতেছে "থ্রু লং-রেঞ্জ্‌ প্ল্যানিং অব্‌ মিউনিসিপাল ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট"। নগরসংস্কার সম্বন্ধীয় লম্বা-মেয়াদের কর্ম্ম-মোসাবিদা এই গ্রন্থের আসল আলোচ্য বস্তু।

বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, ১০০ টাকা যদি নগরশাসকেরা সার্ব্বজনিক বাস্তুনির্ম্মাণে খরচ করে, তাহা হইলে স্থানীয় মজুরেরা পায় ৩৫৲, ইটকাঠ-লোহালক্কড়ের দোকানদারেরা পায় ৫০৲ টাকা আর কন্‌ট্রাক্‌টর বা এঞ্জিনীয়ারেরা পায় ১৫৲। সকল প্রকার মজুর আর মজুরি একত্র করিয়াও দেখা গিয়াছে। বুঝা যায় যে, ফিলাডেল্‌ফিয়ার কর্পোরেশন যদি দশ লাখ টাকা খরচ করিবার কাজে হাত দেয় তাহা হইলে শহরের মজুরেরা প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করিয়া বাজারের শওদা কিনিতে সমর্থ হয়।

ফিলাডেল্‌ফিয়ার অভিজ্ঞতা

এই সকল কথা জানা থাকিলে শহরের "বাবারা" (সিটি-ফাদার্‌স্‌) সময় বুঝিয়া কাজে হাত দিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যখন দেখা যাইতেছে যে, বাজারে মন্দা আসিতেছে তখন "বাবারা" যদি নগরের জন্য সার্ব্বজনিক কাজের ফরমায়েস দিতে রাজি হয় তাহা হইলে যথাসময়ে বেকার-সমস্যার হাত এড়ানো সম্ভব।

মার্কিণ-মুল্লুকে শহরের "বাবারা" যত পরিমাণ সার্ব্বজনিক বাস্তু-নির্ম্মাণের জন্য টাকা খরচ করিতে অভ্যস্ত খোদ গবর্মেণ্ট তত পরিমাণ

বাস্তুনির্ম্মাণের জন্য দায়ী নয়। শহরগুলা আমেরিকায় বিপুল কর্ম্মদাতা, কর্ম্মস্রষ্টা এবং জনগণের অন্নবস্ত্রের মালিক। কাজেই বেকারের দাওয়াই এইসকল বাবাদের হাতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, ১৯১৯ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত ফিলাডেলফিয়ার "বাবারা" যদি লম্বা মেয়াদী বাস্তুনির্ম্মাণে হাত দিতেন তাহা হইলে আজকালকার বেকারের দল বেশ কিছু কমিতে পারিত। বোধ হয় শতকরা ১৫ অংশ কম দেখা যাইত।

গৃহ সমস্যা

দুনিয়ার সকল দেশে গৃহস্থদের বাস্তু-ভিটা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মীমাংসা করিবার জন্য সর্ব্বত্র কম বেশী আন্দোলনও দেখিতেছি। "লণ্ডন ন্যাশন্যাল হাউসিং অ্যাণ্ড টাউন প্ল্যানিং কাউন্সিল" নামক গৃহ ও নগর নির্ম্মাণের পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদ হইতে ১৯২৩ সনে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নাম "দি ন্যাশন্যাল হাউসিং ম্যানুয়্যাল"। লেখক শ্রীযুক্ত আলড্রিজ ৫২৬+৫ পৃষ্ঠায় এক বিপুল গৃহ-পঞ্জিকা তৈয়ারী করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় এই সম্বন্ধে এত বড় এবং এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ কেতাব বোধ হয় আর নাই। ১৯১৪, ১৯১৯ এবং ১৯২৩ সনে বিলাতে তিন বার 'হাউসিং অ্যাক্ট' নামক গৃহ-বিধি জারি হইয়াছে। এই বিষয়ক সকল তথ্যই গ্রন্থের ভিতর সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। লেখক বলিতেছেন—দেশের লোক স্বাধীনভাবে ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে আর সমর্থ নহে। গভর্মেণ্ট এবং নগর ও অন্যান্য "স্থানীয়" শাসনকর্ত্তারা এদিকে নজর না দিলে নরনারীকে আসমানের নীচে বিনা ছাদে জীবন কাটাইতে হইবে। ১৮৯০ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসরের ভিতর ১৩ বার

১৩টি আইন পাশ হইয়াছে। প্রত্যেকটী আইনের সকল ধারাই কেতাবের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যাঁহারা ঘরবাড়ার চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এই বই বাস্তবিকই অনেকটা পঞ্জিকার মত ব্যবহারযোগ্য। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক জেমস ফোর্ড বলিতেছেন—আলড্রিজ বিলাতের তথ্যগুলি সবই নির্ভুলভাবে দিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বিদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কথাগুলি প্রায় সবই অশুদ্ধ, আংশিক ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত। গ্রন্থকার গৃহ ও নগর পরিষদের সম্পাদক।

ঘরবাড়ী সম্বন্ধে আর একখানি সুবিস্তৃত ইংরেজি বহি বাহির হইয়াছে লণ্ডনের আর্নেষ্ট বেন কোম্পানী হইতে। গ্রন্থের নাম হাউসিং অর্থাৎ গৃহ-সমস্যা (১৯২৩, পৃষ্ঠা ৪৫০)। গ্রন্থকার বার্নাস ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার খরচপত্র এবং বাড়ীভাড়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিলাতের সরকারী গৃহ-নির্ম্মাণের নীতি বুঝিবার পক্ষে এই কেতাব বিশেষ সাহায্য করিবে।

মহানগরীর আর্থিক জীবন

বড় বড় শহর কিছুদিন পূর্ব্বে ইয়োরামেরিকায়ও ছিল না। পল্লী-জীবন, পল্লী-সভ্যতা পাড়াগাঁয়ের আদর্শ ইত্যাদি মাল মান্ধাতার আমল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সমাজেরও অতি পরিচিত বস্তু। কিন্তু মহানগরী নামক জনপদ বা জীবন-কেন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছে। আর তাহার ধারা বিংশ শতাব্দীতে জোরেই বহিতেছে। আমাদের ভারত এই পল্লী-নগর-সমস্যায় আগাগোড়া পাশ্চাত্যেরই জুড়িদার। তবে আমরা কাল হিসাবে ইয়োরামেরিকানদের পেছনে

পেছনে চলিতেছি—এই যা প্রভেদ। মাল হিসাবে ভারতে এবং পাশ্চাত্যে কোনো তফাৎ নাই।

নগর-জীবনকে দুস্মনের তাণ্ডব বিবেচনা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই সম্বন্ধে মাথা খাটাইতে হইবে। মাথা খাটাইবার কাজেও আবার পাশ্চাত্যেরাই অগ্রণী। বর্ত্তমান জগতের মহানগরী সম্বন্ধে ইংরেজি, ফরাসী এবং জার্ম্মাণ সাহিত্য বিপুল।

প্লাট্স্-প্রণীত "গ্রোস-ষ্টাট উণ্ড মেনশেন্‌টুম" (মহানগরী ও মানব সমাজ) নামক জার্ম্মাণ গ্রন্থে আছে ৮+২৭৬ পৃষ্ঠা। প্রকাশক মিউনিকের কোজেল কোং। ১৯২৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছে।

নগরের নরনারীর আত্মিক উন্নতি-অবনতি আলোচনা করা প্লাট্সের উদ্দেশ্য। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমাজ-কথা তাঁহার গ্রন্থে বিশ্লেষিত হইয়াছে। মস্তিষ্কজীবী, মজুর এবং পুঁজিপতি এই তিন শ্রেণীর নৈতিক এবং মানসিক ফটোগ্রাফ তুলিয়া গ্রন্থকার বর্ত্তমান জগৎটাকে পাঠকের নিকট খুলিয়া ধরিয়াছেন।

বর্ত্তমান জগতের বিশেষত্ব দুনিয়া-নিষ্ঠা, সংসার-শ্রদ্ধা এবং শক্তি-পূজা। নগর-জীবনে এই সবই পুঞ্জীকৃত। লেখক রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎ-প্রীতির বন্যা আনিয়া আধুনিক সাংসারিকতা এবং জগৎ-প্রীতির সংস্কার করিতে প্রয়াসী। রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মের বেদান্তবাগীশেরা সংসারকে সয়তানের কর্ম্মকেন্দ্র বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। আমাদের দেশে যাঁহারা হিন্দুত্বের বড়াই করেন, তাঁহারা এই জার্ম্মাণ ক্যাথলিক পণ্ডিতের কেতাব ঘাঁটিলে নিজ নিজ খেয়াল-মাফিক অনেক যুক্তি পাইবেন।

এই গেল নগর-জীবন আলোচনার এক রীতি। অন্য রীতি দেখিতে পাই লাইনার্ট প্রণীত "ডী সোৎসিয়ালগেশিষ্টে ড্যর গ্রোস্‌ষ্টাট্"

(মহানগরীর সামাজিক ইতিহাস) নামক ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ জার্ম্মাণ গ্রন্থে। প্রকাশক ফেরা কোং, হাম্বুর্গ, ১৯২৫।

লাইনার্ট বস্তুনিষ্ঠ লেখক। "আদর্শ", "সনাতন ধর্ম্মের ডাক" ইত্যাদি বিষয়ে চর্চ্চা করা তাঁহার দস্তুর নয়। আর্থিক ক্রমবিকাশের ফলে পল্লী এবং নগর কোন্ যুগে কিরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে তাহার আলোচনা পাইতেছি প্রথমে। লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি, নরনারীর যৌন সম্বন্ধে, বিবাহ-প্রথা, নগরের চৌহদ্দি এবং বহর, নগরের গৃহ নির্ম্মাণ এবং গৃহসংখ্যা ইত্যাদি লাইনার্টের আলোচ্য বিষয়। বাস্তুরীতি এবং ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার বিভিন্ন কায়দাই গ্রন্থকারের দৃষ্টি বেশী টানিয়া লইয়াছে।

বর্ত্তমান জগতে নগর বলিলেই মজুরদের জীবন, মজুরির কর্ম্মকাণ্ড বিশেষভাবে নজরে পড়িবার কথা। লাইনার্ট সেই দিকে যথেষ্টই আলোচনা চালাইয়াছেন। মজুরদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জার্ম্মাণির আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর অবস্থিত এইরূপ বুঝা যায়।

অধিকন্তু সরকারী এবং বে-সরকারী লোকহিতের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বৃত্তান্ত পাইতেছি। নগর-পরিচালিত শিল্পকর্ম্ম, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, শিক্ষা-কেন্দ্র, যৌবনভবন এবং গ্রন্থশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বিবরণগুলা অতিশয় চিত্তাকর্ষক।

লাইনার্টের বর্ণনায় বর্ত্তমান জগতের জীবনকেন্দ্র সম্বন্ধে আশার কথা এবং উন্নতির লক্ষণ অনেক পাওয়া যায়।

মজুর ও মজুরি

মজুরি-তত্ত্বের আধুনিক সাহিত্য

ধনবিজ্ঞানের রাজ্যে "তত্ত্ব-কথা" আজকাল খুব কমই শুনা যায়। এই মুল্লুকের যা-কিছু আধুনিক সাহিত্য তাহার অনেকটাই ইতিহাস। বলা বাহুল্য অর্থ-নৈতিক "তত্ত্ব" জিনিষটা যত জটিল আর্থিক জীবনের (অথবা এমন কি আর্থিক তত্ত্বের) ইতিহাসবস্তুটা তত জটিল নয়। বুঝিতে হইবে যে, আজকালকার দিনে জগতের নানা দেশে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার এই সরল অংশ সম্বন্ধেই আলোচনা-গবেষণা বেশী হইতেছে।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। আমাদের ভারতে আজ পর্য্যন্ত কোনো ভারত-সন্তান ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ লইয়া আধ-কাঁচ্চাও মাথার জোর দেখাইতে পারেন নাই। আমরা এই বিদ্যার ঐতিহাসিক কোঠায়ই যা-কিছু চলা-ফেরা করিতেছি। অর্থাৎ আসল ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে আজ পর্য্যন্ত যুবক ভারতের প্রবেশ-লাভ একপ্রকার ঘটে নাই।

ইংরেজ পণ্ডিত ফিশার বিলাতের মজুরি ও মজুর-সমস্যা সম্বন্ধে একখানা বই লিখিয়াছেন। ২৭৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রকাশক লণ্ডনের কিং কোম্পানী, ১৯২৬। ইহাতে ১৯১৮ সনের পর হইতে ৭।৮ বৎসরের বৃত্তান্ত আছে।

বৃত্তান্তটা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, মহাযুদ্ধের পর বিলাতী সমাজে যে সকল মজুরি-সমস্যা উঠিয়াছে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ। দ্বিতীয়তঃ আছে মজুরির সঙ্গে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের খরচের যোগাযোগ আলোচনা। এই দ্বিতীয় অংশে খানিকটা দার্শনিক গবেষণা অর্থাৎ তত্ত্ব-কথা পাওয়া যায়।

লেখক যুদ্ধের সময়কার অবস্থাও ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন। তখনকার দিনে মজুর-মহলে "তঙ্‌খা" সম্বন্ধে যে সকল ঘোঁটমঙ্গল চলিত তাহার বৃত্তান্ত আছে। সেকালে ছিল সরকারী "উৎপাদন-কমিটি"। এই কমিটির হাতে ছিল মালিকে-মজুরে মামলা নিষ্পত্তি করিবার অধিকার। এই কমিটি পরে সালিশী-আদালত নামে পরিচিত হয়। এক্ষণে তাহার নাম হইয়াছে "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোর্ট"। বিলাতী সমাজে আন্তর্জ্জাতিক মজুর ও মজুরি বিষয়ক আইন-কানুনের প্রভাব দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বিগত আট-দশ বৎসরের ইতিহাসে এই কথা বেশ বুঝা যায়। আট-দশ বৎসরের ধারাবাহিক আর্থিক ইতিহাস লেখা এমন হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। কিন্তু এইখানেই যুবক ভারতের দুর্ব্বলতাও হাতে হাতে ধরা পড়ে। আমরা তিনশ' বা তিন হাজার বৎসরের পুরাণা মাল না পাইলে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের আসরে তাতিয়া উঠিতে অভ্যস্ত নই। হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য না হয় মোগল-মারাঠা, না হয় মোতাক্ষরীণ ইত্যাদি বস্তু আমাদেরকে মাত করিয়া রাখে। আজ, কাল, পরশু, তরশুর অর্থ-কথা আর অর্থশাস্ত্রটাও যে ইতিহাসেরই মাল এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন-বেদেরই জ্যান্ত অংশ একথা এখনো যুবক ভারতে যথোচিতরূপে প্রচারিত হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে চাই দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিকের "আর্থিক সংবাদ"-বিভাগ। "আর্থিক উন্নতি"র প্রথম তিন-চার অধ্যায়ে আমরা যতটুকু মাল গুঁজিতে পারিতেছি তাহা দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। চাই আরও লেখক এবং আরও কাগজ।

মজুর-বিধি

প্যারিসের ব্যবসা-কলেজের অধ্যাপক দুপা এবং অধ্যাপক দেভো "প্রেসি দ' লেজিস্‌লাসিওঁ উভ্‌রিয়ে এ অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল" (মজুর ও

কারখানা বিষয়ক আইন) নামক এক ৩১+৩৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রকাশক দুনো কোং, প্যারিস ১৯২৫। ফ্রান্সের শিল্প-বিদ্যালয়ে এই বই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদালতের কাজের জন্যও উকিল-জজেরা এই বইয়ের সাহায্য লইতে পারেন।

মজুর-বিধি ফ্রান্সে "কদ দু ত্রাভাই" নামে সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত। ১৯১০ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত মজুর-জীবনের নানা বিভাগে যে সকল আইন কানুন জারি হইয়াছে সবই এই গ্রন্থে শৃঙ্খলীকৃতরূপে বিবৃত আছে। চুক্তির আইন, কারখানার শাসন, বিচারালয়ের ব্যবস্থা, সালিসী ইত্যাদি কিছুই বাদ যায় নাই। শিল্পজগতের আবিষ্কার-সম্বন্ধীয় সম্পত্তি বিষয়ক আইনও বিবৃত আছে। এই ধরণের কোনো বই ভারত সম্বন্ধে আছে কিনা জানি না। এই দিকে ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার সেবকগণের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

চড়া হারে মজুরি

অষ্টিন ও লয়েড নামক দুইজন ছোকরা ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার কয়েকটি শিল্প-সমস্যা মীমাংসার জন্য আমেরিকার ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। "উচ্চ পারিশ্রমিক-রহস্য" (দি সিক্রেট অব হাই ওয়েজেস্) নামক পুস্তিকায় তাঁহারা তাঁহাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি ফিশার আনউইন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৯২৬)। এই পুস্তকখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বহু সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসন্ধানের "মুদ্দা" একটি মাত্র প্রশ্নে গুলিয়া রাখা যায়। তাহা এই যে,—যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-ব্যবসাগুলি বেশী পারিশ্রমিক দিয়াও দ্রব্যের মূল্য এত কম কেমন করিয়া রাখিতে পারে? যুক্তরাষ্ট্রে যে আর্থিক উন্নতি সত্য সত্যই ঘটিয়াছে এ বিষয়ে তাঁহারা

নিঃসন্দেহ। বাজার-দরের তুলনায় পারিশ্রমিকের উচ্চ হার তাঁহাদের প্রধান সাক্ষী। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, আমেরিকায় দ্রব্যমূল্য কম, অথচ মজুরি চড়া আর এই অনুপাত ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমেরিকায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সদ্ভাব আছে। অধিকন্তু, যুক্ত-রাষ্ট্র শিল্প-ব্যবসার পদ্ধতি সম্বন্ধে জগতে মাতব্বরি করিতে অধিকারী। মার্কিণ মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই কর্ম্ম-স্বভাব তাহাদের বৃটিশ প্রতিদ্বন্দ্বী-দের স্বভাব হইতে স্বতন্ত্র। শ্রম-লাঘবের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিয়া বিস্তীর্ণ পরিমাণে মাল উৎপাদন করা যায়, একথা ইংরেজ বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু বহুকালাগত প্রথায় ইংরেজ কারিগরের হাত-পা বাঁধা। তাই সহজ সংস্কার বশতঃ তাহার আস্থা গিয়াছে সঙ্কীর্ণ উৎপাদন ও চড়া দামে বিক্রয়ের দিকে। উচ্চ হারে মজুরি দিতে সে স্বভাবতই নারাজ। ব্যয় কমাইয়া তাহাকে লাভ করিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকাবাসী চায় বিক্রয় বাড়াইবার দিকে মন দিতে। কঠোরভাবে অপচয় নিবারণ এবং দক্ষ ব্যবস্থার দ্বারা ব্যয় কমাইয়া সে উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিবার পক্ষপাতী। কারণ, সে মনে করে যে, উহাতেই উৎপাদনের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলে।

গ্রন্থকারদ্বয় বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তিরূপে নয়টি ব্যবস্থা-বিধির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথাঃ— (১) মজুর ও কেরাণীদিগকে গুণানুসারে উন্নীত করিতে হইবে এবং অনুপযুক্তদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে। (২) দাম কমাইলে এবং বিক্রয় বাড়াইলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা পাওয়া যায়। (৩) ঘন ঘন হস্তান্তর হইলে মূলধন বাঁচে। (৪) সময় বাঁচে ও কষ্ট কমে এমন যন্ত্রপাতি দ্বারা মাথাপিছু মেহনতের হিসাবে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যথেচ্ছ বাড়ানো যায়। (৫) পারিশ্রমিক নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, উৎপাদনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ থাকিবে। (৬) ফার্ম্মগুলি পরস্পরের সহিত স্বাধীনরূপে

কর্ম্ম ও চিন্তার আদান-প্রদান করিবে। (৭) সমস্ত রকম বরবাত্ নিবারণ করা চাই। (৮) মজুরদিগের মঙ্গলের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (৯) রিসার্চের (গবেষণার) কাজে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক।

শিক্ষণীয় হিসাবে এই সকল বিধানের ভিতর নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে ইংরেজ-দস্তুরের বিরোধী অনেক-কিছু এই সকলের মধ্যে আছে। তন্মধ্যে শ্রমলাঘবের যন্ত্রপাতির প্রতি আস্থা সম্বন্ধে ইংরেজের সহিত আমেরিকাবাসীর বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজের "সনাতন" বিশ্বাস এই যে, শ্রমিকেরা মাথা খাটাইয়া কাজ করে না, মাংসপেশী খাটাইয়া পরিশ্রম করে। সুতরাং তাহারা শ্রম-লাঘবকর যন্ত্রপাতিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। কারণ সেগুলি যত বাড়িবে, ততই তাহাদের কাজ মারা যাইবে। কিন্তু আমেরিকাবাসী ঐ যন্ত্রপাতিকে তাহার ক্ষমতা বাড়াইবার কৌশল স্বরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজে-কাজেই তাহার চিন্তায় যন্ত্রপাতিও মজুরি বাড়াইবার কল বিশেষ।

এই বইয়ের মতামত ইংরেজ সমাজে সাগ্রহে আলোচিত হইতেছে। লেখকেরা হয়ত বা খানিকটা "স্বদেশ-সেবক" হিসাবে নিজ মাতৃভূমিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য এক বিদেশের কর্ম্মদক্ষতার তারিফ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই তারিফের মাত্রা হয়ত বা কিছু অতিরিক্ত। তাহা সত্ত্বেও আমেরিকার স্বপক্ষে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহার ভিতর নিরেট যুক্তি কম নাই।

ইংরেজের মুখে ইয়াঙ্কিস্থানের প্রশংসা শুনিয়া ভারত-সন্তানের পক্ষে অন্ততঃ একটা লাভ হইতে পারে। কোনো একটা দেশকে চিরকাল সকল বিষয়ে সকল দেশের সেরা বিবেচনা করিবার প্রবৃত্তি কমিতে পারে। আমেরিকার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান, মার্কিণ সমাজের মজুরি-প্রথা

এবং ফ্যাক্টরি-পরিচালনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিলে যুবক ভারতের উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

বাণিজ্য-সঙ্কট ও মজুর-সমিতি

মজুর-সমিতি বা ট্রেড-ইউনিয়ানের কর্ম্মনীতি সুপরিচিত। দুনিয়ার ও দেশের আর্থিক অবস্থা যখন শান্তিময় মামুলি গোছের থাকে তখন তাহারা কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করে তাহার কিছু-কিছু ভারতেও জানা আছে। কিন্তু "আপৎকালে হ্যুপস্থিতে" তাহাদের ধরণ-ধারণ কিরূপ তাহা বিশ্লেষণ করা দরকার। এইরূপ বিবেচনা করিয়া মার্কিণ পণ্ডিত ভিকফ একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। নাম "ওয়েজ পলিসীজ অব্ লেবার অর্গ্যানিজেশ্যন্স্ ইন্ এ পীরিয়ড্ অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ডিপ্রেশ্যন্" (কারখানা-সঙ্কটের কালে মজুর-সমিতির মজুরি-নীতি)। বাল্টিমোরের জন্স্ হপ্কিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থের প্রকাশক।

১৯২০ হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত দুই আড়াই বৎসর ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে "ডিপ্রেশ্যন" অর্থাৎ শিল্প-কারখানায় মন্দা বা দুর্গতি চলিয়াছিল। বর্ত্তমান রচনায় এই কয় বৎসরের মজুর ও মজুরি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই ধরণের গবেষণায় ভারত-সন্তান এখনো হাত মক্স করিতে শিখেন নাই। কেন না, সাধারণতঃ আমাদের পণ্ডিতেরা ৭৫।১০০।৫০০।১০০০।১৫০০ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা লইয়া মাতামাতি করেন। তাহা ছাড়া সেই প্রাচীন, অতি-প্রাচীন কালের তথ্যসমূহকেও শত শত বর্ষব্যাপী যুগের কাঠামে ফেলিয়া তাহাদের সু-কু বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে। কোনো যুগের ২।৩।৫।৭ বৎসরের ভিতর কোনো একটা প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের আকার-প্রকার কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার বা জানিবার প্রবৃত্তি ভারতীয় পণ্ডিত-সংসারে বড় একটা দেখা যায় না।

অল্প সময়ের ভিতরকার কোনো দুইএকটা প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের জীবন-বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করিবার প্রণালীকে এক কথায় "ইণ্টেন্‌সিভ" আলোচনা-প্রণালী বলে। সেই সূক্ষ্ম, চুল-চেরা, গভীরতর গবেষণার প্রত্যেকটা দফাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিচার করা সম্ভব। ভিকফ সেই মতলবেই কেতাব লিখিয়াছেন। এই কেতাবে তিনি (১) রেল-মজুর, (২) জামা তৈয়ারী করিবার কারখানার মজুর, (৩) ধাতু গালাইবার ফ্যাক্টরির মজুর, (৪) কাচের কারখানার মজুর, (৫) চীনা মাটির কারখানার মজুর এবং (৬) খনির মজুর—এই ছয় প্রকার মজুরদের "ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের" অর্থাৎ সমগ্র যুক্ত-রাষ্ট্রব্যাপী সঙ্ঘের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়াছেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৯ (১৯২৬)।

দুর্দ্দৈবের সময় মজুরে মালিকে সম্বন্ধ কিরূপ ছিল? মালিকেরা মজুরির হার কমাইতে বাধ্য হইয়াছিল। মজুরেরা তাহাতে আপত্তি করে নাই। দুই দলে পরামর্শের ফলেই এই নীতি কায়েম হইয়াছিল। কিন্তু আর একটা বিশেষ কথা লক্ষ্য করা যায়। সে হইতেছে কারখানা-শাসন সম্বন্ধে মজুরদের ক্ষমতা-বিষয়ক। মজুরেরা দরমাহা কিছু ছাড়িয়া দিতেও রাজী। কিন্তু ফ্যাক্টরির পরিচালনায় হাত ছাড়িতে রাজী নয়। বস্তুতঃ, এই দুই আড়াই বৎসরের ভিতর তাহারা কারখানার শাসন-ব্যাপারে অনেকটা স্বরাজ লাভ করিয়া বসিয়াছে। আর্থিক হিসাবে যে যুগটা তাহাদের পক্ষে লোকসানের সময় গিয়াছে, সেই যুগটাই তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে একটা মাহেন্দ্রক্ষণ।

সমাজ-ব্যাধির ফরাসী চিকিৎসক

পাশ্চাত্য সাহিত্যে "সমাজ" শব্দ ব্যবহার করিলে মোটের উপর

এক কথায় আর্থিক লেনদেন বুঝা হইয়া থাকে। সমাজ-ব্যাধি, সমাজ-বিরোধ, সামাজিক অশান্তি ইত্যাদি কথায় আথিক দুর্দ্দশার এপিঠ ওপিঠ বুঝিতে হইবে। আর তাহার দাওয়াইও আজকাল একপ্রকার সুপরিচিত বস্তু। নাম তাহার "সোশ্যালিজম্" অথবা তাহার মাস্তুত, খুড়তুত ভাই (যদিও চড়া রগের ভাই) স্বরূপ "কমিউনিজম্" ইত্যাদি।

মনে রাখিতে হইবে যে,—ইয়োরামেরিকার ধন-সাহিত্যে "সমাজ-সংস্কারে"র ঘর খুবই বড়। ধনবিজ্ঞান-সেবীদের ভিতর হাজার হাজার লোক সমাজ-ব্যাধির দাওয়াই ঢুঁড়িবার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। পাশ্চাত্য নরনারীর আধ্যাত্মিকতা, ভাবুকতা, কর্ম্মদক্ষতা, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদির অনেক কিছুই এই চিকিৎসার বিজ্ঞানে আর চিকিৎসার আন্দোলনে লিপ্ত আছে।

ফরাসী সমাজ-সংস্কারক লুসিআঁ দেলিনিয্যার এই বিজ্ঞানের আর আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ প্রতিনিধি। তাঁহার উল্টাপক্ষীয় পণ্ডিতেরাও তাঁহার পাণ্ডিত্যের এবং আন্তরিকতার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার একখানা বই বাহির হইয়াছে (১৯২৬)। প্রকাশক প্যারিসের ফ্রাঁস এদিসিঅঁ। বইটা "লা ফ্যাঁ দু মাল সোসিয়াল" (সমাজ-দুঃখের অবসান)। সেকালের বুদ্ধদেব বা সেইণ্ট পল ইত্যাদি মহাত্মারা দুঃখ বিশ্লেষণ করিতেন আর দুঃখ নির্ব্বাণের পাঁতিও দিতেন। একালের মহাত্মারাও দুঃখ-বিশ্লেষণে আর দুঃখের শ্রেণীবিভাগে কম ওস্তাদ নন। আর একালকার নির্ব্বাণ-তত্ত্বটাও তুচ্ছ করিবার চিজ নয়।

দেলিনিয্যার ইত্যাদি সমাজ-সংস্কারকের বিচারে আধুনিক দুঃখ নিম্নলিখিত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে:—(১) মাদকতা, (২) বেশ্যাবৃত্তি, (৩) আইন ভাঙা, (৪) লড়াই, (৫) দারিদ্র্য, (৬) ভিক্ষাবৃত্তি (৭) লোক-

ক্ষয় ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই ধরণের আরও অনেক-কিছু উল্লেখ করা সম্ভব। আজকালকার সমাজ-সংস্কারকেরা বর্ত্তমান পুঁজিপতি-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থাকে এই সকল দুঃখের একমাত্র কারণ সমঝিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের চিকিৎসাপ্রণালী অতি সহজ। তাঁহারা বলেন —"দাও তুলে পুঁজি-নীতি, সমাজ আপনাআপনিই দুরস্ত হইয়া আসিবে।"

সমাজ-সংস্কারকদের গুঁতো খাইতে খাইতে পুঁজি-নীতির ধুরন্ধরেরা অনেক বিষয়ে নরম হইয়া আসিয়াছেন। মজুরদের কারখানা-জীবন, মজুরদের সঙ্গে উপরওয়ালাদের ব্যবহার, মজুরির হার, মজুরদের ঘরবাড়ী ইত্যাদি নানা বিভাগে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুঁজি-নীতির ধুরন্ধরেরা জিজ্ঞাসা করিতে অধিকারী, "বহুৎআচ্ছা, —না হয় পুঁজি দুনিয়া হইতে উঠিয়াই গেল। তখন দুনিয়া হইতে মাদকতা, বেশ্যাবৃত্তি দারিদ্র্য ইত্যাদি উঠিয়া যাইবে কি? এই সকল দুঃখ জগতের সকল দেশেই আর সকল যুগেই কোনো না কোনো আকারে দেখা যায় কেন?"

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের মজুর

শ্রাডার এবং ফুর্টভ্যেংলার নামক দুইজন জার্ম্মাণ মজুর-নায়ক কয়েক বৎসর হইল ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। মামুলি দেশ দেখা তাঁহাদের মতলব ছিল না। তাঁহাদের মজুর-পরিষৎ তাঁহাদিগকে ভারতের মজুর ও মজুরি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিল। এই পরিষৎ ছিল কাপড়ের কল বিষয়ক মজুরদের পরিষৎ। শ্রাডার এবং ফুর্টভ্যেংলার দুইজনেই কাপড়ের কলের মজুর। ভারতে আসিয়া তাঁহারা কাপড়ের কলের মজুরজীবন সম্বন্ধেই সকল প্রকার খোঁজখবর লইয়াছিলেন।

আমেদাবাদ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আর দিল্লী হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যেখানে-যেখানে তূলার কাপড়ের কল, পশমের কাপড়ের কল, আছে, তাহার সব জায়গায় তাঁহারা ধাওয়া করিয়াছিলেন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দেশীবিদেশী সকল প্রতিষ্ঠানই তাঁহাদের অনুসন্ধানের সামগ্রী ছিল। কিছুই বাদ পড়ে নাই। খুঁটিনাটি সবই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন।

মজুর ও মজুরি গবেষণা কি চিজ ?

এই সকল খুঁটি-নাটির কথা বিশেষ জোরের সহিত উল্লেখ করা আবশ্যক। কেন না ভারতে আমরা এইরূপ মনোযোগের সঙ্গে তন্নতন্ন করিয়া গবেষণার দিকে এখনো বেশী ঝোঁক দিতে পারি নাই। অধিকন্তু গোটা ভারতের সব-কিছু পরখ করিয়া দেখিবার চেষ্টাও ভারতীয় অভিজ্ঞতায় বিরল।

অনেক সময়ে প্রবৃত্তিই নাই। আর প্রবৃত্তি থাকিলেও ঘুরাফিরা করিয়া লোকের সঙ্গে মোলাকাৎ চালাইবার অথবা কারখানার কাজ দেখিয়া বেড়াইবার পয়সা জুটে না। তাহার উপরে আছে কারখানার ভিতরে ঢুকিবার সুযোগ বা অধিকার। কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি বাঙালী, কি অ-বাঙালী সকল প্রকার কারখানায়ই প্রবেশাধিকার একটা বিপুল কাণ্ড বিশেষ। বিশেষতঃ মজুরদের তন্খা, জীবনধারণ, কাজকর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য লইবার জন্য কারখানা-গবেষণা মালিকদের পক্ষে সাধারণতঃ সুখকর বিবেচিত হয় না। কাজেই সমগ্র ভারতের মজুর-বিষয়ক বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনিষ্ঠ অঙ্কনিষ্ঠ অনুসন্ধান আজও ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীর তদবিরে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু এই দুই জার্ম্মাণ গবেষকের সঙ্গে কয়েকজন ইংরেজ সহযোগী ছিল। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প ঝকমারিতে গবেষণা-কার্য্য সমাধা হইতে পারিয়াছে।

জার্ম্মাণ চোখে মজুর-ভারত

শ্রাডার ও ফুর্টভ্যেংলার দুইজনে মিলিয়া যে বইখানা লিখিয়াছেন তাহার ভিতর মাত্র নিজেদের মতামতই দেখিতেছি। ইংরেজ সহযোগীদের মতামত কোথাও নাই। কাজেই মুঠোর ভিতর পাইতেছি জার্ম্মাণ মজুরদের চোখে মজুর-ভারত কিরূপ দেখায় তাহার চিত্র। বইয়ের নাম "ডাস ভের্ক টোটিগে ইণ্ডিয়েন" (মজুর-ভারত)।

ভারতের যেখানে-যেখানে গ্রন্থকারেরা যাইতেন সেই সব জায়গায় তাঁহারা মজুরদের কুঁড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেন। মজুরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার আগ্রহ তাঁহাদের ছিল। এইজন্য তাঁহারা নিজেদের বিশ্বস্ত দোভাষী বাহাল করিয়াছিলেন। দোভাষী ছিলেন ভারতীয় মজুর-আন্দোলনের ছোট-বড়-মাঝারি প্রতিনিধি। কাজেই মজুরদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা বিনা গোঁজামিলে বুঝিবার সুযোগ তাঁহাদের ছিল। অপর দিকে তাঁহারা ছাপার হরপে যাহা কিছু পাওয়া যায় সেই সবের সদ্ব্যবহার করিতে ভুলেন নাই। মজুরদের তরফ হইতে যে সকল পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাহার অনেক-কিছুই তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল। মালিকরা যে সব রিপোর্ট ছাপেন তাহার ভিতরও ইঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু গবর্মেণ্টের সরকারী গ্রন্থাদিও প্রচুর-পরিমাণে তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছিল। এইগুলি তাঁহারা বয়কট করেন নাই।

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ যে প্রণালীতে ভারতে অর্থশাস্ত্রের গবেষণা প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী সেই প্রণালীর এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই জার্ম্মাণ গ্রন্থ। মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রন্থকারেরা মজুর মাত্র। অথবা কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ইঁহারা মজুর ছিলেন। এখন ইঁহারা মজুরনায়ক। তবে কারখানায় খাটিয়া খাওয়া আজও ইঁহাদের

পেশা। রাষ্ট্রনৈতিক মতামত এই দুইজনের আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইঁহারা রাষ্ট্রিক পাণ্ডা নন। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, জার্ম্মাণিতে লেখা-পড়া, খোঁজ-তল্লাস, গবেষণা, অনুসন্ধান ইত্যাদি চিজ,—কি লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক, কি কেরাণী, কি মজুর, কি মজুর-নায়ক, কি রাষ্ট্রনৈতিক চাঁই,—সকলেই যথাসম্ভব খোলা চোখে বস্তুনিষ্ঠরূপে চালাইতে অভ্যস্ত।

মজুরি ও খাই-খরচা

জার্ম্মাণ পাঠকেরা এই বইটার ভিতর পাইয়াছে কিরূপ মাল? খাদের মজুরদের কর্ম্মপ্রণালী ও ঘরকন্নার বৃত্তান্ত। রেলের কুলীদের নানা শ্রেণীর মেহনতের পরিচয়। বিভিন্ন ফ্যাক্টরির, মিলের, কার-খানার বড় মজুর, ছোট মজুর ইত্যাদি রকমারি মজুরের দৈনিক কর্ম্ম-তালিকা। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা আর বেতন। মজুরির হারটা বিশেষরূপেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই সূত্রে আমরা এমন সব তথ্য পাইতেছি যে, ভারতবাসী ভারতবর্ষে বসিয়া তাহা সহজে পাইতে পারিবে না। খাই-খরচার দিকে শ্রাডার ও ফুর্টভ্যেংলারের নজর বেশ তীক্ষ্ণ। জার্ম্মাণ নরনারীর সামনে তাঁহারা ভারতীয় মজুর-পরিবারের গৃহস্থালীটা দু'ফাঁক করিয়া খুলিয়া ধরিয়াছেন। 'চাল ডালে' কত খরচ, ঘর-ভাড়ায় কত খরচ, কাপড়চোপড়ে কত খরচ আর ওযুধ-পত্রে কত খরচ সবই দেখানো হইয়াছে। ভারতীয় দারিদ্র্য অথবা সম্পদ এই সকল খাতে আপনা-আপনি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়াছে।

মজুরসঙ্ঘ ও "জাত-পাঁত"

মজুর-সঙ্ঘ ভারতে আজ কি অবস্থায় আছে তাহা বুঝিবার জন্য

লেখকেরা বিশেষ মেহনৎ করিয়াছেন। এই জার্ম্মাণ বইয়ে মজুরসজ্ঘ গুলার নিয়মকানুন, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি যত বিস্তৃতরূপে আলোচিত দেখিতেছি তত বিস্তৃত আলোচনা অন্য কোনো বইয়ে এক জায়গায় আজ পর্য্যন্ত নজরে আসে নাই। যেখানে একটুকু চিরকুট পাওয়া গিয়াছে লেখকেরা সেখানে তাহা হইতে মাল নিংড়াইয়া লইয়া বইয়ের ভিতর গুঁজিয়াছেন।

ট্রেড্-ইউনিয়ন বা মজুর-সজ্ঘ ত ভারতে "একালের" জিনিষ। কিন্তু "সেকালে"ও ত ভারতবাসী সজ্ঘ,-দল, বা শ্রেণী কায়েম করিতে অভ্যস্ত ছিল। আর সেই সব "সেকেলে" সজ্ঘ, দল বা শ্রেণী একালেও ত বজায় আছে। জার্ম্মাণ মজুর-নায়কেরা অতি-মাত্রায় আধুনিকপন্থী সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতের সুপরিচিত সেকেলে সজ্ঘ প্রতিষ্ঠান-গুলার দিকে গবেষণা চালাইয়াছেন। ভারতীয় "জাত-পাঁত", "বার রাজপুতের তের হাঁড়ী", "বিবাহের মেল", "জল-চল-সমস্যা", "স্পৃশ্যা-স্পৃশ্যের মামলা" ইত্যাদি বুঝিয়া দেখিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়াস ছিল। জাতিভেদের দরুণ মজুর-সজ্ঘের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে কিনা এই বিষয়টা তাঁহাদের মগজে একটা বড় ঘর অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই সকল সামাজিক ভেদ-ব্যবস্থায় মজুর-আন্দোলনের সজ্ঘ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও মজুরসজ্ঘ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ।

যন্ত্রনিষ্ঠ ভারত বনাম বিশ্বদৌলত

বইটা আগাগোড়া অর্থনৈতিক। অধিকন্তু লেখকেরা মজুর বা মজুর-নায়ক, আর লেখা হইয়াছে জার্ম্মাণ মজুরদের জন্য। এইটুকু বলিলেই চরম বলা হইল না। কেননা ভারতের আর্থিক জীবনে

যন্ত্রনিষ্ঠা কায়েম হইবার পর জার্ম্মাণি, বিলাত ইত্যাদি দেশের আর্থিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা তাহার বিশ্লেষণই বইটার ভিতরকার কথা। কাজেই লেখকেরা এই রচনার মধ্যে ভারতীয় সমাজের কথা, সভ্যতা-ভব্যতার কথা, রাষ্ট্রশাসনের কথা সবই কিছু-কিছু গুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত সম্বন্ধে যে সকল রকমারি তথ্য জানা থাকিলে জার্ম্মাণ সমাজ-শাস্ত্রী, রাষ্ট্রশাস্ত্রী, অর্থশাস্ত্রী এবং জননায়ক-স্থানীয় নরনারী আগামী ভবিষ্যতের ভারতীয় নরনারী সম্বন্ধে পাকা সমঝদার হইতে সমর্থ, সেই সকল তথ্য এই গ্রন্থের ভিতর ঠাঁই পাইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্য বা ব্যাখ্যা সর্ব্বত্রই যে নিভুর্ল তাহা অবশ্য বুঝিতে হইবে না।

ফ্রান্স সম্বন্ধে, জাপান সম্বন্ধে, আমেরিকা সম্বন্ধে, বিলাত সম্বন্ধে, ইত্যালি সম্বন্ধে, রুশিয়া সম্বন্ধে, জার্ম্মাণি সম্বন্ধে কোনো বাঙালী বা অন্য কোনো ভারতবাসী যদি এই জার্ম্মাণ বইয়ের অনুরূপ বই লিখিতে পারেন তাহা হইলে আমরা গৌরব বোধ করিব। দুঃখের কথা,—আজও ভারত-সন্তানের লেখা বিদেশ-বিষয়ক এইরূপ গ্রন্থ কালে-ভদ্রে এক-আধটা চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ।

যাহা হউক, শ্রাডার ও ফুর্টভ্যেংলারের ভারত-বিষয়ক বইখানা কোনো বাঙালী লেখক যদি বাংলায় তর্জ্জমা করেন তাহা হইলে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের পুষ্টি সাধিত হইবে। এমন কি পাঁচ সাত বৎসর পরে তর্জ্জমা করিলেও ক্ষতি নাই। কেন না ইহার আলোচনা-প্রণালী অনেক দিন পর্য্যন্ত যুবক বাঙ্‌লার অর্থশাস্ত্রীদের কাজে লাগিবে।

গবেষণা-পর্য্যটনের খরচা

জার্ম্মাণরা আর্থিক ভারত সম্বন্ধে একমাত্র মজুর-চোখের উপর নির্ভর করিতে রাজি নয়। মনিব-চোখে ভারতবর্ষ কিরূপ দেখায় তাহা

বুঝিবার জন্যও তাহাদের চেষ্টা দেখিতেছি। এইজন্য আসিয়াছিলেন ডক্‌টর নোবেল। প্রসঙ্গক্রমে, কথঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও এই জার্ম্মাণের ভারত-গ্রন্থ খতাইয়া দেখা যাউক।

ইনি অবশ্য খোলাখুলি পুঁজিপতি-সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসাবে আসেন নাই। তবে বিদেশ-পর্য্যটন পয়সার খেলা। "রাহা-খরচ" বহন করা মুখের কথা নয়। রোজ জনপ্রতি দুই বা আড়াই পাউণ্ড খরচ করিতে না পারিলে বিদেশ পর্য্যটন অসম্ভব। বলা বাহুল্য এত টাকা সাধারণ লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের ট্যাঁকে নাই। এমন কি জার্ম্মাণিতেও নিজ ট্যাঁক হইতে রোজ দুই-আড়াই পাউণ্ড খরচ করিয়া দুনিয়া টহল মারিতে পারে এমন লোক লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের শ্রেণীতে বেশী নাই। একমাত্র নিজের পর্য্যটন-খরচা ত সব নয়। পরিবারের জন্য অন্যান্য মামুলি খরচা ত আর পর্য্যটনের সময় বাদ যায় না। কাজেই প্রত্যেক পর্য্যটকের পেছনেই কোনো না কোনো ব্যক্তি অথবা সঙ্ঘ বা পরিষদের টাকার তোড়া বিরাজ করে। ধরিয়া লইতে হইবে যে, নোবেলের পেছনে কোথাও এরূপ একটা তোড়া ছিল। এই ধরণের বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের পর্য্যটন-লীলায় সাহায্য করিবার জন্য এখানে-ওখানে-সেখানে তোড়া আছে। অবশ্য তদবির করিয়া দহরম-মহরম চালাইয়া তোড়াটা হইতে হাজার বা হাজার দেড়েক পাউণ্ড (অর্থাৎ হাজার পনর বা বিশেক টাকা) সংগ্রহ করিতে হয়। বলা বাহুল্য,—প্রণালীটা ভারতেও তাই, তবে সুযোগের মাত্রা এদেশে কম।

জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার-পরিষৎ

নোবেলের বইটা ছাপানো হইয়াছে "ফারাইন ডয়চার ইঞ্জেনিয়রে"

বা জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার পরিষদের প্রকাশভবন হইতে। এই পরিষদের সঙ্গে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের লেনদেন চলে। তাঁহাদের পত্রিকা হইতে আমরা অনেক সময়ই কিছু-না-কিছু রসদ সংগ্রহ করিয়া থাকি। বর্ত্তমানে পত্রিকার নাম "অ্যার, টে, আ নাখ্ রিখ্ টেন" (১৯৩৩)।

নোবেলের বইটা ভারতবিষয়ক ডিরেক্টরি বিশেষ। "ইয়ারবুক" বা বর্ষপঞ্জী শ্রেণীর গ্রন্থে যে ধরণের কাঠখোট্টা অঙ্ক ও তথ্য থাকে তাহাই হইল এই বইয়ের প্রাণ। জার্ম্মাণ বেপারীদিগকে ভারতীয় বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, রাজস্বব্যবস্থা, যানবাহন, সিক্কা, শুল্ক-কানুন ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরেট সংবাদ দেওয়া এই বইয়ের মতলব। বইটার নাম "ইণ্ডিয়েন" (ভারতবর্ষ)।

জার্ম্মাণ বেপারীর চোখে আর্থিক ভারত

আধা বইয়ের ভিতর আছে ভারতীয় প্রদেশগুলার বৃত্তান্ত। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলার বৃত্তান্তও আছে। প্রত্যেক প্রদেশের ভিতর কোন্ কোন্ বাজার প্রসিদ্ধ তাহার কথাই আসল কথা। বাজারে যে সকল দ্রব্যের সওদা হয় তাহার খবরও আছে। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, বইটার নাম "জার্ম্মাণ বেপারীর চোখে ভারতবর্ষ।"

রেল, ষ্টীমার, বায়ুপথ সবই বর্ণিত হইয়াছে। খনিজ পদার্থ, কৃষিজ পদার্থ ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ে নাই। কারখানাগুলার খবর দেওয়া হইয়াছে বলা বাহুল্য। তাহা ছাড়া সেন্সাস রিপোর্টের মত বইয়ে যে-ধরণের সামাজিক তথ্য থাকে তাহাও কিছু-কিছু ছড়ানো আছে।

একটা মজার কথা দেখিতেছি। শ্রাডার ও ফুর্টভ্যেংলারের রচনায় সর্ব্বত্রই স্পর্শ করিতে পারি ভারতীয় নরনারীর সঙ্গে মোলাকাৎ। কিন্তু নোবেল একজন মাত্র ভারতসন্তানের সঙ্গেও কথা বলিয়াছেন কিনা

বইটার ভিতর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। কোনো স্থানে কোনো ভারতবাসীর নাম চোখে ত পড়িলই না। আর বইটা এমন ভাবে লেখা যে, মনে হয় তাহার জন্য ভারতে আসিবার দরকারই ছিল না। কতকগুলা সরকারী রিপোর্ট আর ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত অঙ্ক দেখিয়া নোবেল এমন কি জার্ম্মাণির কোনো গ্রন্থশালায় বসিয়াই বইটা বাজারে ফেলিতে পারিতেন।

ফলতঃ ১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় কৃষিশিল্পবাণিজ্যের আবহাওয়ায় ভারত-সন্তানের যতটুকু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্পর্শ করা সম্ভব তাহার এক দম্‌কাও নোবেলের বইয়ের ভিতর বহিয়া যাইতেছে না। তবে এই ধরণের "রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত" বইয়ের ও দরকার আছে।

আন্তর্জ্জাতিক মাল-বিনিময় ও পুঁজি-লেনদেন

বিশ্ব-বাণিজ্যের বিজ্ঞান-বস্তু

মাল আমদানি-রপ্তানির কারবারে করিৎকর্ম্মা বেপারীদের কর্ম্ম-কাণ্ডই আমাদের একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু নয়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দুনিয়ায় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-কাণ্ডের ঠাঁইও খুব বড়। কর্ম্মদক্ষ ব্যবসায়ী হইতে হইলে এই "তত্ত্বাংশ", "বিজ্ঞান-বস্তু" বা "থিয়োরি"র তরফটাও বুঝিয়া দেখা দরকার। ইংরেজ পণ্ডিত বাষ্টেব্‌ল্‌-প্রণীত "থিয়োরি অব ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রেড" (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব-কথা) বহুকাল হইতে ভারতে সুপরিচিত। এই শ্রেণীর এক উঁচু দরের বই সম্প্রতি (১৯২৪) ইতালিয়ান ভাষায় বাহির হইয়াছে। লেখক জেনোআ শহরের ব্যবসা-কলেজে এবং মিলানো শহরের ব্যবসা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। নাম আত্তিলিও কাব্যাতি। প্রকাশক স্তাবিলিমেন্তো গ্রাফিক এদিতরিয়ালে (জোনোআ)।

"প্রিঞ্চিপি দি পলিতিকা কমার্চিয়ালে" (বাণিজ্যনীতির সনাতন নিয়ম) রূপে গ্রন্থ প্রচারিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবার কথা। প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে "লা তেঅরিয়া জেনেরালে দেলি স্কাম্বি ইন্তার্ণাৎ-স্যনালি" (আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের দার্শনিক তত্ত্ব)। শ'তিনেক পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সম্পূর্ণ। পরবর্ত্তী খণ্ডে অবাধ (অশুল্ক) বাণিজ্য এবং সংরক্ষণনীতি (সশুল্ক বাণিজ্য) আলোচিত হইবার কথা। ইতালির ব্যবসা-কলেজের ছাত্রদের জন্য এই গ্রন্থ তৈয়ারী করা হইয়াছে।

আজকালকার দিনে প্রত্যেক দেশের বহির্ব্বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে

জটিলতা দেখা দিয়াছে। আমদানি-রপ্তানির তালিকা দেখিয়াই দুনিয়ার মালের চলাচল সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা যায় না। যে দেশে রপ্তানি হইতেছে ঠিক সেই দেশই হয়ত মালটার আসল ক্রেতা নয়। এই মালই আবার অন্য কোনো দেশে রপ্তানি হইতে পারে। অপর দিকে প্রত্যেক দেশেই আমদানি-রপ্তানির যন্ত্রে যথেষ্ট পাক চক্র দেখা যায়। মাল অনেক সময়ে ব্যাঙ্কের জিম্মায় থাকে। বীমাকোম্পানীর হাত, যাতায়াত অর্থাৎ রেল জাহাজ সংক্রান্ত কোম্পানীর হাত এবং মালগুদামওয়ালা কোম্পানী ইত্যাদি নানাবিধ ব্যবসা-সঙ্ঘের মধ্যস্থতার ফলে মালের গতিবিধি স্পষ্টরূপে ঠাওরাইয়া উঠা কঠিন হয়। বাস্তবিক-পক্ষে কোন্ ব্যক্তি বা কোম্পানী ক্রেতা এবং কেই বা যে বিক্রেতা এই সামান্য বিষয়েই পরিষ্কার ধারণা জন্মে না।

তাহার উপর গোলযোগ উপস্থিত হয় মালের দাম দিবার প্রণালীতে। কাগজে-কলমে দামটা অবশ্য টাকা পয়সায়ই বুঝাইয়া দিবার দস্তুর আছে। কিন্তু কোনো দেশ হইতেই অপর কোনো দেশে নগদ মুদ্রার চলাচল হয় যার পর নাই কম। সংসারে দেখিতে পাই কেবল মালেরই গতিবিধি। এক দেশের টাকা অন্যদেশে রপ্তানি হয় না বলিলেই ঠিক হয়। চলে কেবল "চেক" বা "কাগজ" আর মাল।

কাজেই বিশ্ববাণিজ্যের জটিলতা যার পর নাই বাড়িয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। এই জটিল পাকচক্রের ভিতরও কোনো সূত্র ঢুঁড়িয়া পাওয়া সম্ভব কি? সেই সূত্রগুলা আবিষ্কার করাই বিজ্ঞান বা দর্শনের কাজ।

প্রথম সূত্র এই যে, কোনো মাল যখন বিদেশে বেচা হয় তখন তাহার পরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে পাওয়া যায় অন্য কোনো মাল। বিদেশে যদি স্বদেশী মাল বেচিতে চাও ত কোনো না কোনো বিদেশী

মাল কিনিতে হইবেই হইবে। মালে মালে বিনিময়ই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথা। এক মালের দাম হইতেছে অপর এক মাল। মালে মালে কাটাকাটি হইয়া গেলেই আমদানি-রপ্তানির মামলা চুকিয়া যায়।

অতএব বিজ্ঞানের আসল সমস্যা হইতেছে কোন্ মালের পরিবর্ত্তে কোন্ মাল পাওয়া যায় তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করা। অন্তর্ব্বাণিজ্যের বেলায় মালে মালে অদল বদল মান্ধাতার আমলে দেখা যাইত। তাহা অবশ্য আজকালকার দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার ঠাঁইয়ে দেখিতে পাই মুদ্রার সাহায্যে মূল্য-নিরূপণ এবং মূল্যে মূল্যে সমতা-স্থাপন ও কাটাকাটি। আমদানি-রপ্তানির কারবারেও সেই নিয়মটাই খাটিতেছে। তবে এই সমতা-স্থাপনের কারবারে মুদ্রার ঠাঁই এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

আমদানিতে রপ্তানিতে যদি সমতা না ঘটে অর্থাৎ যদি পরস্পর কাটাকাটির সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সমতাস্থাপন এবং কাটা-কাটি না ঘটা পর্য্যন্ত বাণিজ্য-জগতে অস্থিরতা বিরাজ করে। ঘরোআ বাজারে মূল্য-বৃদ্ধি নামক "অসাম্য" ঘটিলে মাল-স্রষ্টারা লোভে পড়িয়া অধিক পরিমাণে মাল তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যায়। মালের পরিমাণ বাড়িবামাত্র ক্রমশঃ আবার দাম কমিতে সুরু করে। শেষ পর্য্যন্ত ক্রেতায় বিক্রেতায় সাম্য দেখা দেয়। আমদানি-রপ্তানির মুল্লুকে ও এই সোজা নিয়মটাই সর্ব্বদা কাজ করে। নানা দিক্ হইতে নানা শক্তি আসিয়া অসাম্যের অবস্থাকে সাম্যের দিকে লইয়া যায়।

বর্ত্তমান যুগে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক দেশ ও লোকের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। অধিকন্তু কোনো দেশের চাহিদা বাড়িবামাত্র কোন্ দেশে মাল তৈয়ারী করিবার হুজুগ জাগে তাহা অনেক সময়েই

ধরিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে বিশ্ব-বাণিজ্যের সমতা-সাধন কাণ্ডটা সহজে পাকড়াও করা সম্ভব নয়।

কাব্যাতি এই সাধারণ সূত্র দিয়াই জটিলতম লেনদেন-ময় বিশ্ব-ব্যবস্থার ব্যাখা করিতেছেন। বুঝা যাইতেছে যে,—ধনবিজ্ঞান বিদ্যার অন্যতম জন্মদাতা ডেভিড রিকার্ডো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এক শতাব্দী পরেও আমরা সেই সকল সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি।

আর একটা সূত্র কাব্যাতির গ্রন্থে পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারা যায়। ইনি বলিতেছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সমতা সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল তাহা পূরাপূরি খাটে সোনায় প্রতিষ্ঠিত মুদ্রানীতির আমলে। তুনিয়ায় একটা বড় গোছের লড়াই বাধিবামাত্র আমদানি-রপ্তানির কারবারে সমতা বাঁচাইয়া চলা খুবই কঠিন। তখন আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক ডাকিয়া টাকার বিনিময়-হার সম্বন্ধে দর-কষাকষি করিতে হয়। অধিকন্তু, প্রত্যেক দেশেই তখন গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ এবং আইনকানুনই ব্যবসা-বাণিজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতারূপে দেখা যায়। কিন্তু তখনও এই সকল বৈঠক এবং সরকারী শাসনের সাহায্যে একটা চলনসই বাণিজ্যিক "স্থিতি" বা সাম্য খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টাই চলিতে থাকে।

গ্রন্থকারের তৃতীয় বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লড়াইয়ের পর হইতে মুদ্রায় মুদ্রায় বিনিময়ের হার লইয়া মহা তুর্য্যোগ চলিতেছে। যেসকল দেশের মুদ্রা-প্রণালী এখনো পুনর্গঠিত হইয়া স্থিরতা লাভ করে নাই, তাহাদের অসুবিধা ঢের। কাব্যাতির মতে কোনো প্রকার কৃত্রিম কৌশলে সিক্কার স্থিরতা আনা সম্ভবপর হইবে না। বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ সোনায় প্রতিষ্ঠিত সিক্কাপ্রণালী প্রচলিত ছিল সেইরূপ ব্যবস্থাই পুনরায় কায়েম করা আবশ্যক।

শুল্ক সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহা কাব্যাতি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবেন। কিন্তু প্রথম খণ্ডেই কিছু-কিছু শুল্কবিষয়ক আলোচনা আছে। শুল্ককে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে :—(১) স্বদেশী মালের আত্মরক্ষায় সাহায্য-প্রদান স্বরূপ বিদেশী মালের উপর "সংরক্ষণ"-শুল্ক, এবং (২) স্বদেশের খাজাঞ্চিখানার আয় বাড়াইবার জন্য বিদেশী বণিক-বেপারী-কারখানাওয়ালাদের নিকট হইতে আদায় করা "কর"-শুল্ক। এই কর-শুল্ক বর্ত্তমান খণ্ডেই আলোচিত হইয়াছে।

লড়াইয়ের পর হইতে একটা নূতন কাণ্ড আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-জগতে দেখা দিয়াছে। দেশী কারখানাওয়ালাদিগকে তাহাদের দেশের বাজার হইতেই সমূলে উৎপাটন করিবার মতলবে বিদেশী কারখানা-ওয়ালারা নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছে। এইসকল কৌশলের ভিতর গবর্মেণ্টের সাহায্য অন্যতম। তাহার ফলে বিদেশের বাজারে অতি সস্তায় মাল হাজির করা হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ, যদি কোনো দেশে ঘটনাক্রমে মজুরির হার নীচু থাকে তাহা হইলে যে-দেশে মজুরির হার উঁচু সেই দেশের কারখানাওয়ালারা নিজ মুল্লুকেই বিদেশী মালের সঙ্গে টক্কর দিতে অসমর্থ হয়। এই অবস্থায় বিদেশী মালের দৌরাত্ম্যে দেশ উস্তম-পুস্তম হইয়া পড়িতে পারে। এই ধরণের বিদেশী মাল আমদানিকে ইংরেজিতে "ডাম্পিং" বলা হয়। "ডাম্পিং" হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিদেশী মালের উপর এক প্রকার শুল্ক বসান হইয়া থাকে। সেই শুল্কের কথাও কাব্যাতির এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু "ডাম্পিং"-বিরোধী কৌশলটাকে সাধারণ সংরক্ষণ-নীতি-মূলক শুল্ক হইতে তফাৎ করা উচিত কিনা সন্দেহ। কোনো দেশের বিভিন্ন কারবারগুলা নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যদি বিপুল "ট্রাষ্ট"

বা "কার্টেল" নামক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহার দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে আমদানি-শুল্ক বসানো হয় তাহা যে বস্তু, "ডাম্পিং" হইতে নিজকে বাঁচাইবার কৌশলটাও ঠিক তাই নয় কি? আসল কথা, "ডাম্পিং" বস্তুটা সম্বন্ধেই এখনো খাঁটি বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা বাহির হয় নাই। নিজ দেশের স্বার্থের বিরোধী যেকোনো আমদানিকেই "ডাম্পিং" রূপে গালাগালি করা হইতেছে মাত্র।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

প্রায় প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যই দ্বিবিধ,—(১) অন্তর্ব্বাণিজ্য, (২) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে এই দুই প্রকার বাণিজ্যের কথাই আলোচনা করা দস্তুর। আজকাল ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনার উপলক্ষ্যে প্রধানতঃ আমদানি-রপ্তানি অর্থাৎ বিদেশের সঙ্গে আমাদের লেনদেন সমূহ বিবৃত হইয়া থাকে। কিন্তু দেশের ভিতরই এক জেলা হইতে অপর জেলায় মাল-চলাচল কিরূপ এবং কিরূপে সাধিত হইতেছে সেই বিষয়ে খোঁজখবর খুব কমই লওয়া হইয়া থাকে। ভারতীয় সাহিত্যে আন্তর্ব্বাণিজ্যের চর্চ্চা একদম নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত গারিণ কানিনা "পলিতিকা কমার্চিয়ালে" (ব্যবসা-বাণিজ্যের রাষ্ট্রনীতি) সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা ষোল কলায় পরিপূর্ণ। তাহার ভিতর আন্তর্ব্বাণিজ্যের বস্তু এবং কর্ম্মপরিচালনা ইত্যাদি সবই যথোচিত ঠাঁই পাইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের রচনা-প্রণালীতে যুবক ভারতের লেখকগণ অনেক-কিছু শিখিতে পারেন।

একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। মাছের বাজারে, তরিতর-

কারীর বাজারে এবং দুধ ও ফলমূলের বাজারে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় কি করিয়া? কেনাবেচার ভিতর বিজ্ঞান বা দর্শন আছে কতটুকু? এই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে না পারিলে বাজার-তত্ত্ব বা মূল্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সেইরূপ আমদানি-রপ্তানির বেলায়ও একটা আন্ত-র্জ্জাতিক মূল্যের বিজ্ঞান বা দর্শন আছে। সেই বিজ্ঞান বা দর্শনই বহির্ব্বাণিজ্য বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রাণবস্তু।

বাংলা দেশে যাঁহারা উচ্চতম ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যায় প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই সম্বন্ধে অল্পবিস্তর মাথা খাটাইতে হয়। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বিষয়টার আলোচনা বাস্তবিক পক্ষে বাঙালী সুধীসমাজে এখনো প্রবেশ করে নাই। এই বিষয়ে আমাদিগকে স্বতন্ত্র প্রবন্ধমালার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একখানা বইয়ের বিবরণ দিবার সময় অতদূর দৌড় মারা চলিবে না।

এই আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের ভিতরকার কথা "কস্তি কম্পারাতিভি"। ইংরেজিতে ইহাকে বলে "কম্পারেটিভ কষ্ট্" (আপেক্ষিক খরচ-পত্র)। যে দুইটা বস্তুর বিনিময় সাধিত হইতেছে সেই বস্তু দুইটা তৈয়ারী করিতে যে খরচ হয়, সেই খরচের তুলনা করা আবশ্যক। সেই খরচ হিসাব করিয়া প্রত্যেক দেশ যদি বুঝে যে নিজের লাভ থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলেই অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য পাতাইবার দিকে তাহার মতি ঝুঁকিবে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিশদ আলোচনা আছে। টাকাকড়ির যুগে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এবং এক সঙ্গে দুনিয়ার বাজারে বহু জাতির প্রতিযোগিতায় আন্তর্জ্জাতিক মূল্য কতটা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহার আলোচনাও আছে। অধিকন্তু সংরক্ষণ-নীতি এবং সশুল্ক বাণিজ্য-নীতির প্রভাব বিবৃত হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্বকথা বুঝিতে হইলে একসঙ্গে কতদিকে মাথা খেলানো আবশ্যক এই সামান্য বৃত্তান্ত হইতে তাহার কিছু আন্দাজ চলিতে পারে।

কুদরতী মাল ও খাদ্যদ্রব্য

১৯২৩ সনের জুলাই ও আগষ্ট মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়ামস্-টাউন নগরে বিলাতী "রাউণ্ড টেব্‌ল্" সভার বৈঠক বসিয়াছিল। সভাপতি ছিলেন মার্কিণ "টারিফ কমিশনে"র (শুল্ক-কমিটির) উপ-সভাপতি কালব্যর্ট্‌সন। সেই মজলিশের আলোচ্য বিষয় ছিল কুদরতী মাল ও খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা।

সেই সকল আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিয়া এবং আরও অনেক তথ্য জুড়িয়া দিয়া কালব্যর্ট্‌সন একখানা শ'তিনেক পৃষ্ঠার গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ফিলাডেল্‌ফিয়ার "আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স" কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৪)।

প্রথম অর্দ্ধে আলোচিত হইয়াছে রাউণ্ড টেব্‌ল সভার মন্তব্য এবং সমালোচনাসমূহ। এইগুলা ছয় বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত :—(১) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের কারবারে কুদরতী মাল সম্বন্ধে কোন্ দেশ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে—এই গেল প্রথম দফা। (২) দ্বিতীয় দফা হইতেছে খাদ্যদ্রব্য-বিষয়ক বাণিজ্য-নীতি। (৩) বিভিন্ন দেশের শুল্কনীতি তৃতীয় বিভাগের আলোচ্য বিষয় ছিল। (৪) চতুর্থ আলোচ্য বিষয় ছিল বিভিন্ন দেশের ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক সংবাদ-প্রচার সম্বন্ধে কোন্ দেশ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তাহার আলোচনা। (৫) লোক-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে প্রত্যেক দেশে আর্থিক চাঁড়ের

হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাহার প্রভাবে বাণিজ্য-নীতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার বিশ্লেষণ ছিল "রাউণ্ড টেবল্" বৈঠকের পঞ্চম দফার অন্তর্গত। (৬) ষষ্ঠ আলোচ্য বিষয় ছিল লড়াইয়ের ব্যবস্থায় কুদরতী মাল ও খাদ্য-দ্রব্যের ঠাঁই সম্বন্ধে বিচার।

বৈঠকে অনেক পাকা মাথার ঠোকাঠুকি চলিয়াছিল। কাজেই আলোচনাগুলার ভিতর বস্তুনিষ্ঠা প্রচুর পাওয়া যায়। যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবারে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের পক্ষে তথ্যগুলা বেশ দামী। আর যাঁহারা দেশোন্নতি, রাষ্ট্রীয় উন্নতি অথবা আর্থিক উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইতে অভ্যস্ত তাঁহারা এই সমুদয় তথ্যে ভবিষ্যতের জন্য অনেক-কিছু ইঙ্গিত পাইবেন।

গ্রন্থের অপরঅর্দ্ধে আছে কালব্যার্টসনের নিজের গবেষণা। কুদরতী মালের জোগান সম্বন্ধে তাঁহার প্রচারিত তথ্য ও মতগুলা যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-সেবীর কাজে লাগিবে। দেশের শক্তি-বৃদ্ধির তরফ হইতে গ্রন্থকার এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুদরতী মালের জোগানটা একটা "সমস্যায়" দাঁড়াইয়াছে কেন? প্রথমতঃ, দেশের চতুঃসীমা বাড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-বিপ্লব দেখা দিতেছে নতুন আকারে। আর তৃতীয়তঃ, কোনো কোনো জাতির তাঁবে বিপুলায়তন সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে।

এই সমস্যার জটিলতা বিশ্লেষণ করিবার পর কালব্যার্টসন নানা দেশের "কুদরতী মালের জোগান-প্রণালী" বস্তুনিষ্ঠরূপে বিবৃত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক আর্থিক ব্যবস্থার বৃত্তান্ত-হিসাবে এই অধ্যায় যার পর নাই দামী কথায় ভরা। এই উপলক্ষ্যে আলোচিত হইয়াছে :—(১) আমদানি ও রপ্তানির উপর সংরক্ষণ শুল্ক-প্রথা, (২) মাল সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা ও প্রবেশাধিকারের অনুমতি,

(৩) পক্ষপাত-মূলক শুল্ক-ব্যবস্থা, (৪) রপ্তানি-সাহায্য, (৫) সরকারী একচেটিয়া ব্যবসা, (৬) উৎপাদনকারীদের যৌথ প্রচেষ্টা ও সমবায়, (৭) বেপারীদের সঙ্ঘ, (৮) বিদেশী পুঁজিপতিদিগকে স্বদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা।

কাল্‌ব্যর্টসন ইয়াঙ্কি। তিনি নিজ জন্মভূমির তরফ হইতেই সকল কথা খুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত অযুক্তিসঙ্গত নয়।

আর্থিক লেনদেনের আন্তর্জ্জাতিকতা

ফ্রান্সের মার্সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেণো "লা ভী একনমিক অ্যাঁতার্ণ্যাশন্যাল" (আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক জীবন) নামে একখানা বই লিখিয়াছেন। বহরে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। প্রকাশক প্যারিসের সিরে কোং (১৯২৬)। গ্রন্থ পুরু পুরু পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমতঃ, ধনোৎপাদনের কথা। দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে আজকাল ভিন্ন ভিন্ন মাল তৈয়ারী হইতেছে। এক একটা দেশ এক একটা মাল তৈয়ারীর দায়িত্ব লইতেছে। গোটা দুনিয়া যেন একটা দেশ মাত্র ; আর বিভিন্ন দেশগুলা যেন সেই দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলাবিশেষ। মানবজাতির ভিতর একটা বিপুল শ্রমবিভাগ সাধিত হইতেছে।

মাল তৈয়ারীর কাজে আন্তর্জ্জাতিকতা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে মাল-বিনিময়ের ক্ষেত্রেও বিশ্বজনীনতা আসিয়াছে। দেশ-বিদেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানির সম্বন্ধ এযুগের আর্থিক জীবনের গোড়ার কথা। ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলা নিজ নিজ বিশেষত্ব-সূচক দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু প্রত্যেককেই অন্যান্য দেশের বিশেষত্ব-সূচক দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রেণো এই আমদানি-রপ্তানি বা বহির্ব্বাণিজ্য

কাণ্ডের বর্ত্তমান লক্ষণগুলা বিবৃত করিয়াছেন। মাল-চলাচলের অপর পিঠই হইতেছে মুদ্রার আগমন-বহির্গমন। মুদ্রা আর বাণিজ্যের আন্তর্জ্জাতিকতা এযুগের এক মস্ত কথা।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মজুর ও মজুরি সমস্যা। অন্যান্য জিনিষের মতন মজুর-জীবনও একালে আন্তর্জ্জাতিক। কাজেই বেতন-বিষয়ক আলোচনায় এক সঙ্গে নানা দেশের তথ্য প্রভাব প্রস্তাব করিতে বাধ্য। অর্থাৎ আজকালকার ধনোৎপাদন আর ধন-"বিনিময়" যেমন বিশ্বজনীন, ধন-"বিতরণ" বস্তুটাও ঠিক সেইরূপ। মজুরির হার আগা-গোড়া আন্তর্জ্জাতিক।

আর্থিক জীবন বলিলে ধন-ভোগের কথা স্বভাবতই মনে আসে। বস্তুতঃ, ধনের সৃষ্টি আর বিনিময় হয় কিসের জন্য? ভোগের জন্য। এইখানেই মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, অভাব-চাহিদার কথা আসিয়া পড়ে। একালের ধন-ভোগ ব্যাপারটাও আন্তর্জ্জাতিক। কোনো এক দেশ ধন-ভোগে নেহাৎ দরিদ্র যত দিন থাকিবে ততদিন অন্যান্য দেশের পক্ষে ধনভোগে খুব উঁচু হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। বিভিন্ন জাতিগুলার ভিতর ভোগ-সূত্রে একটা ঐক্য ও সমতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে। আজকাল কোনো দেশের নরনারী একমাত্র নিজের সুখসম্পদ্ লইয়া মস্‌গুল থাকিলেই শেষ পর্য্যন্ত সম্পদশালী দাঁড়াইয়া যাইতে পারিবে না। এক সঙ্গে নানাদেশের ভোগের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া প্রত্যেক দেশেরই স্বার্থ। এই গেল চতুর্থ অধ্যায়ের মাল।

পঞ্চম অধ্যায়ের মাল হইতেছে সমাজবীমার আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা। আর্থিক জীবন বলিলে একালে নরনারীকে স্বাস্থ্যে, শক্তিতে বড় করিয়া তুলিবার নানা কল-কৌশলও বুঝিতে হয়। ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈববীমা এই সমুদয়ের অন্তর্গত। গবর্মেণ্ট, পুঁজিপতি, আর জমিদার একদিকে,

অপর দিকে সাধারণ গৃহস্থ। মজুর ও চাষী সকলে নিজ নিজ তরফ হইতে অথবা সমবেতভাবে স্বাস্থ্য ও শক্তির ব্যবস্থা করিতেছে। এই স্বাস্থ্য-শক্তির সাধনায় বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। কিন্তু মোটের উপর সকলেই একটা উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। অধিকন্তু কতকগুলা বিষয়ে নানা দেশের সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ সাধনা দেখা যাইতেছে। প্লেগ, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, ডিপ্‌থেরিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগ হইতে মানবজাতিকে বাঁচাইবার জন্য একটা আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রাম চলিতেছে।

রেণো সকল দিক্ হইতে একালের আর্থিক জীবনকে আন্তর্জ্জাতিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছেন। বহুদেশের তথ্যতালিকা ও অঙ্করাশি, নানা মুল্লুকের আর্থিক আইন-কানুন গ্রন্থে একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুনিয়া যে নানা সূত্রে ঐক্যগ্রথিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা পাঠক মাত্রেরই সহজে মালুম হইবে। কাজেই একালে যাঁহারা জগতের অন্যান্য মুল্লুকের ব্যাঙ্ক, বীমা, টাকার বাজার, কৃষিশিল্পবাণিজ্য, মজুরির হার ও চাষী-জীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে চাহেন, তাঁহারা দেশের কথাও বুঝিতে পারিবেন না, আর দেশকে ধনসম্পদে বড় করিয়া তুলিতে হইলে কখন কোথায় কিরূপ কৌশল কায়েম করা উচিত তাহাও তাঁহাদের রপ্ত হইবে না।

মূলধন ও বিনিময়

ইতালিয়ান পণ্ডিত ক্রজারা "সাজ্জ্য সুল্লে তেঅরিয়ে দেল্ল স্কাম্ব্য এ দেল্লা কাপিতালিজ্জাৎসিয়নে" (বিনিময় ও পুঁজিনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ) বাহির করিয়াছেন (কাপ্পেল্লি কোং, বলনিয়া, ১৯২৬, ১২৬ পৃষ্ঠা)। এই কেতাবের এক ফরাসী সমালোচনা দেখিলাম। সমালোচক আলবেয়ার

আফতায়িওঁ। প্রধানতঃ আডামস্মিথ-প্রচারিত মতামতের সমালোচনা ক্রজারার উদ্দেশ্য। পুঁজির প্রকৃতি, ধনোৎপাদনে পুঁজির ঠাঁই ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীন গবেষণাও আছে। বর্ত্তমান ইতালিতে পুঁজির অভাব খুব বেশী। সেই দিকে নজর রাখিয়া লেখক দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন। ইংরেজি ও ইতালিয়ান ধন-সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যে ক্রজারার দখল নাই। ফরাসী গ্রন্থাবলী বৰ্জ্জিত হইয়াছে। এমন কি অষ্ট্রিয়ান পণ্ডিত বোমবাভার্ক প্রণীত সুবিখ্যাত গ্রন্থও বাদ পড়িয়াছে। আফ্‌তায়িওঁ বলিতেছেন এই যে, "বোম্‌বাভার্কের পুঁজিবিষয়ক গ্রন্থ বর্ত্তমান জগতের ধন-সাহিত্যে অন্যতম ক্লাসিক।"

স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সকল দেশেই বিদেশী পুঁজি আমদানি করা হইয়াছে ও হইতেছে। আর বোধ হয় ভবিষ্যতেও অনুন্নত জাতিরা উন্নত জাতির ধনভাণ্ডার হইতে পুঁজি আমদানি করিয়া দেশোন্নতির নানা কাজ চালাইতে থাকিবে। কিন্তু পুঁজি রপ্তানি করায় অর্থাৎ বিদেশে ধার দেওয়ায় বা অন্য উপায়ে খাটানোয় ধনী দেশগুলার স্বার্থ কতটা? কাজেই মালের আমদানি-রপ্তানি আর লোক-জনের আমদানি-রপ্তানি এই দুই আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের মতন টাকা-কড়ির আমদানি-রপ্তানিও ধনবিজ্ঞানসেবীদের দার্শনিক খোরাক জোগাইয়া থাকে। ভারতে এই তত্ত্বের দিকে পণ্ডিতদের নজর এখনো বেশী পড়ে নাই। পুঁজি-নীতি, পুঁজি-সংগঠন, স্বদেশী পুঁজির সঙ্গে বিদেশী পুঁজির সম্বন্ধ ইত্যাদি তথ্য লইয়া মাথা খেলাইবার দিকে ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-সেবীদিগকে শীঘ্রই অগ্রসর হইতে হইবে।

প্যারিসের সিরে কোং এই বিষয়ের বিজ্ঞান-বস্তু লইয়া একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন (১১৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৬)। গ্রন্থকারের নাম বারেইয়ে-ফ্লুশে। বইটার নাম "লেক্‌স্‌পর্ত্তাসিওঁ এ ল্যাঁপর্ত্তাসিওঁ দে কাপিতো

এ লেজ্ আভোআর আ লেত্রাঁজে” (পুঁজি ও সম্পত্তির আমদানি-রপ্তানি)।

ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রদ। বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করিবার বিরুদ্ধে ফরাসী গবর্মেণ্ট কড়া আইন কায়েম করিয়াছে। ফ্রান্সের টাকাকড়ি ফ্রান্সেই থাকিবে, এই হইতেছে সরকারী নীতি। গবর্মেণ্ট মাঝে মাঝে আইনটার কড়াক্কড়ি নরম করিবার কথা বলে বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনকানুন ক্রমশই বেশী কঠোর ও জটিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মজার কথা, এত কঠোর আইন সত্ত্বেও ফরাসীরা লুকাইয়া ফরাসী পুঁজি বিদেশে রপ্তানি করিতেছে। পুঁজি-রপ্তানি বন্ধ করা আইনের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য মনে হইতেছে।

বারেইয়ে-ফুশের বইটা ফরাসী আইনগুলার সঙ্কলন-গ্রন্থ। তবে পুঁজি-রপ্তানির বিরুদ্ধে আইন কায়েম করিবার যুক্তিগুলাও দেখানো হইয়াছে।

দেশ-বিদেশের আর্থিক রাষ্ট্র-নীতি

মার্কিণ লেখক কাল্‌ব্যর্টসনের রচনা পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি। সম্প্রতি “ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ইকনমিক পলিসিজ” নামক তাঁহার আর একখানা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। দুনিয়ার আর্থিক রাষ্ট্রনীতি এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। প্রকাশক নিউ ইয়র্কের অ্যাপলটন কোং। লেখক বলিতেছেন,—“আর্থিক আড়াআড়িই রাষ্ট্রীয় আড়াআড়ির একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু কুদরতী মালের জোগান, রপ্তানি-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, বিদেশে বাজার-সৃষ্টি, টাকা-কড়ির কর্জ্জ ইত্যাদি আর্থিক কাজকর্ম্ম লইয়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মনোমালিন্য ঘটিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবে।”

বর্ত্তমান গ্রন্থে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী আর্থিক গতিবিধি বিবৃত হইয়াছে। আর্থিক ইতিহাসের তরফ হইতে এই সকল বৃত্তান্ত বিশেষ মূল্যবান। আজকালকার দুনিয়ার বাণিজ্য-নীতি কোন্ দেশে কি আকার গ্রহণ করিতেছে তাহার বস্তুনিষ্ঠ বৃত্তান্ত আট-দশ অধ্যায়ের বিশেষত্ব। নয়টা পরিশিষ্টে অনেক মাল ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে "প্রেফারেনশ্যাল টারিফ" (পক্ষপাতমূলক শুল্ক-ব্যবস্থা) কিছু কিছু চলিতেছে। এই আন্দোলনের যথাযথ বিবরণ দিবার পর গ্রন্থকার সমালোচনায় বলিতেছেন,—"অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ইত্যাদি উপনিবেশ জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ ইত্যাদি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে এবং কংগ্রেসে প্রায় স্বাধীন অথবা নিম-স্বাধীন দেশের মতন ঠাঁই পাইয়া থাকে। অথচ কোনো কোনো আর্থিক আইনকানুনের সময় তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক একটা প্রদেশমাত্র রূপে থাকিতে চাহে। এইরূপ দু-মুখো ব্যবহার বেশী দিন চলিবে না। যদি বাহিরে বাহিরে তাহারা স্বাধীনতা চায় তাহা হইলে তাহাদিগকে বাহিরের লোকজনের সঙ্গে সমানে-সমানে আর্থিক লেনদেন চালাইতে শিখিতে হইবে।" অর্থাৎ সাম্রাজ্যের আঁচল ধরিয়া চলা এবং সাম্রাজ্যের বহির্ভূত রাষ্ট্রসমূহকে কলা দেখাইয়া পক্ষপাতমূলক শুল্কের ব্যবস্থা করা বৃটিশ উপনিবেশসমূহের পক্ষে আর সাজে না।

মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্ক ব্যবসা

সোনার টাকার প্রত্যাবর্ত্তন

ইতালিয়ান অধ্যাপক কাব্যাতিকে পূর্ব্বে আমরা একবার দেখিয়াছি। তখন বিশ্ববাণিজ্যে বিজ্ঞান-বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার মতামত আলোচনা করা গিয়াছিল। এইবার তাঁহার সঙ্গে টাকাকড়ির কথা লইয়া মোলাকাৎ। বইয়ের নাম "ইল রিতর্ণ আল্-অর" (স্বর্ণে প্রত্যাবর্ত্তন) বা "আবার ফিরো সোনায়"। প্রকাশক মিলানোর বক্‌কনি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৫)।

আজকালকার দিনে টাকাকড়ির সাহিত্য বিপুল আকার ধারণ করিতেছে। কাব্যাতির গ্রন্থ "আন্নালি দি একনমিয়া" নামক পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগের অন্যতম অধ্যায় রূপে বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও রচনায় "অধ্যায়"-সুলভ অসম্পূর্ণতা বেশী নাই। প্রচুর তথ্য একত্র দেখিতেছি। তবে অনেক স্থলেই সংক্ষিপ্ত আকারে।

মুদ্রার মূল্য-স্থিরীকরণ সম্বন্ধে কাব্যাতি যাহা কিছু বলিতেছেন তাহাতে ইতালিয়ানদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী অনেক বিচারই আছে। ইতালিতে, ভারতের মতন, আজও লিয়ার স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এখনো কিছুকাল নানাপ্রকার পরীক্ষা চলিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তত্ত্বের তরফ হইতে কাব্যাতির আলোচনায় সার্ব্বজনিক ও সাধারণ সত্য কতকগুলা দেখিতে পাই। টাকা-কড়ির উঠা-নামার সঙ্গে জিনিষ-পত্রের দাম কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয় তাহার বিশদ অলোচনা আছে। আবার বাজার-দরের অবস্থা অনুসারে টাকার বাজারে যেসব উঠা-নামা ঘটে তাহার বিশ্লেষণেও কাব্যাতির দৃষ্টির অভাব নাই।

বিলাতী টাকার বাজার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এই রচনার এক বিশেষত্ব। ইতালিয়ান মুদ্রাসমস্যাও আলোচিত হইয়াছে। সোনায় ফেরা বিষয়ক কাব্যাতির আলোচনা সম্বন্ধে অধ্যাপক দেল ভেক্ক্যো বলিতেছেন :— "আজকালকার দিনে টাকার বাজারে যত বিচিত্র আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির জটিল খেলা চলে সেইগুলা দখল করিয়া বিশ্লেষণ করা খুব কম লেখকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু কাব্যাতি একাধারে বাজার-দক্ষ এবং বিজ্ঞান-দক্ষ। এই জন্য তাঁহার পক্ষে পাকা খেলোয়াড়ের মতন শক্তি-গুলাকে লইয়া তাসের জুয়া দেখানো সম্ভবপর হইয়াছে। রিকার্ডোর আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত যিনিই টাকাকড়ির বিজ্ঞান আলোচনা করিতে ঝুঁকিয়াছেন তাঁহাকেই কঠিন কঠিন সমস্যার সম্মুখে খাড়া হইতে হইয়াছে। কাজেই কাব্যাতির আলোচনায়ও কট-মট বাদ যাইবার কথা নয়।"

গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে ১৯২৫ সনে, অর্থাৎ "ইনফ্লেশ্যন" বা কাগজী-মুদ্রার পরিমাণে অতিবৃদ্ধির যুগ চলিয়া যাইবার অনেক দিন পরে। কিন্তু কাব্যাতি ধনবিজ্ঞানের তরফ হইতে ইনফ্লেশ্যনের স্বপক্ষেই রায় দিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যেই দেল্ ভেক্ক্যো বলিতেছেন,—সংসারে যাহা-কিছু ঘটিয়াছে তাহা সবই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু তাহা বলিয়া সব-কিছুই সমর্থন-যোগ্য নয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে,—ধনবিজ্ঞানের তরফ হইতে ইনফ্লেশ্যন কোনো মতেই সমর্থন-যোগ্য নয়। সংরক্ষণ-নীতি আর ইনফ্লেশ্যন এই দুইটার কোনোটাই ধনবিজ্ঞান-সম্মত নয়। কিন্তু দুনিয়ায় সংরক্ষণও চলে আর কাগজী মুদ্রার পরিমাণও যখন-তখন বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সব কাণ্ডের *সমর্থনের জন্য যদি যুক্তি ঢুঁড়িতেই হয় তবে তাহা ধনবিজ্ঞানের এলাকার* বাহিরে অন্য কোথাও ঢুঁড়িতে হইবে।

ফরাসী অর্থ-সাহিত্যে টাকাকড়ির আলোচনা

"গ্রন্থপঞ্জী"র ভিতর আমরা মাঝে মাঝে যে সকল বইয়ের নাম করিয়াছি তাহার ভিতর টাকাকড়ি-বিষয়ক ফরাসী গ্রন্থাবলী অন্যতম। ফ্রান্সেও মুদ্রা-সমস্যা যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের একটা বড় কথা। বিশেষতঃ বিগত দুই বৎসর ধরিয়া এই সমস্যার একটা হেস্তনেস্ত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। কাজেই কারেন্সী-সাহিত্য ফরাসী ভাষায় বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। "পত্রিকা-জগতের" সূচীতেও তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছি।

অর্থশাস্ত্রী উয়ালিদ

এখানে এযাত্রায় একটা বইয়ের নাম করিব। গ্রন্থকার উয়ালিদ। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক। ২৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা বই তাঁহার নতুন রচনা। রচনাটার সৃষ্টি বক্তৃতায়। ১৯২৬-২৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন সেইগুলাই বইয়ের আকারে দেখা দিয়াছে। রাজস্ব-বিষয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছে। বইটা "লেসঁ স্যির লা মোনে এ লে প্রোবলেম্ মোনেতেয়ার" (টাকাকড়ি ও টাকাকড়ি-বিষয়ক তর্ক-প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তৃতা)।

"লেসঁ"-জাতীয় বই ফ্রান্সে বিস্তর। ছাত্র পড়াইবার জন্য অধ্যাপক কর্ত্তৃক কখনো কখনো যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করা হয় সেই সবই এই শ্রেণীর বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়। জার্ম্মাণিতেও এই শ্রেণীর বই অনেক। বস্তুতঃ ইয়োরামেরিকায় অধ্যাপকমাত্রেই, কম-সে-কম নামজাদা, অতি-নামজাদা, বা নিম্-নামজাদা অধ্যাপকেরা ছাত্র পড়াইবার জন্য যে সব বক্তৃতা তৈয়ারী করেন সেই সবই গ্রন্থাকারে হাজির হয়। কোনো

কোনো ক্ষেত্রে বক্তৃতাগুলা একদম বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় স্বরূপই লেখা হইয়া থাকে। আবার হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তৃতাগুলা বইয়ের মশলা যোগায় মাত্র। পরে এই সব মশলা সাজাইয়া গুছাইয়া গ্রন্থস্থ করা দস্তর। সোজা কথা, অনেক বইই টেক্স্‌ট-বুক জাতীয় বস্তু; অন্ততঃ পক্ষে টেক্স্‌টবুকের আকারে জন্মলাভ করে।

উয়ালিদের গ্রন্থে আছে কি চীজ? টাকাকড়ি সম্বন্ধে একাল-সেকালের পণ্ডিতেরা যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার উপর বেশী-কিছু বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আসল কথা, বলা সম্ভবপর নয়ও। তাহা হইলে বইটা ছাপা হইল কেন? এই প্রশ্নটা যুবক বাঙলার পক্ষেও চিত্তাকর্ষক।

আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে, বই যখন লিখিতে বসিয়াছ তখন এমন-কিছু লেখা চাইই চাই যা "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"। কিন্তু ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ ইত্যাদি যুবক-ভারতের গুরু-বর্গ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কলম হাতে লয় না। তাহারা প্রত্যেক বৎসরই গণ্ডা গণ্ডা, ডজন ডজন নানা শ্রেণীর বই লিখিয়া চলিয়াছে। সেই বইগুলা যে একমাত্র ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরই কাজে লাগে এমন নয়। উকীল, ব্যবসায়ী, হাকিম, ডাক্তার, সাংবাদিক, জননায়ক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই এই সকল কেতাব ঘাঁটিয়া উপকার লাভ করে।

বাঙালীরা এইরূপ চেষ্টা করিবে না কেন? দশ বিশ জন কেষ্ট বিষ্টু যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন তাহা যখনই তোমার আমার মগজের ভিতর প্রবেশ করিল তখনই তোমার আমার মরমে এক একটা নিজস্ব কিছু,—অতি সামান্য হইলেও সেটা নিজস্বই বটে,—সৃষ্টি করিয়া ছাড়ে। কাজেই এই সব বিষয়ে তোমার আমারও একটা কিছু বাংলা ভাষায় লিখিবার অধিকার আছে।

ফরাসী পণ্ডিত উয়ালিদ টাকাকড়ি সম্বন্ধে এই ধরণের একটা নিজস্ব কিছু—অথচ একদম নিজস্ব নয়—বই ছাপিয়াছেন। আর এই বই সম্বন্ধে ফ্রান্সেরই একজন অতি নামজাদা কারেন্সী-বিশেষজ্ঞ আলবেয়ার আফ্‌তায়িওঁ বলিতেছেন,—"এই বইটা দু'একবার পড়িয়া গেলেই বারে বারে মনে হইবে যে, যখনই কোনো সমসাময়িক সমস্যা উপস্থিত হয় তখনই এই বইয়ের পাতা উল্টাইলে একটা না একটা যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যাইবেই যাইবে। আর যত বার পাতা উল্টানো যাইবে ততবারই মনে হইবে যেন একটা নূতন কিছু শিখিতেছি।"

অথচ মজার কথা, বইটার ভিতর নতুন কিছুই নাই। যুবক বাঙলার যে সকল লোক এম, এ, বি, এল ইত্যাদি পাশের পর আজকে ৩০।৩২ বৎসরের কোঠায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা প্রতিদিনই এক কাঁচ্চা, আধ ছটাক, দেড় লাইন, আড়াই প্যারাগ্রাফ লিখিতে অভ্যাস করুন। তর্জ্জমাকে তর্জ্জমাই সই। সঙ্কলন বা সংক্ষিপ্ত সারই বা মন্দ কি? জগতের অতি নামজাদা লেখকেরাও নিজ নিজ বইয়ের অনেক জায়গাই (১) তর্জ্জমা আর (২) সঙ্কলন দিয়া ভরিয়া রাখেন। যে লোকটার গাঁটরি হইতে টাকাটা-সিকিটা-দোআনিটা বেহাত করা হইল ফুটনোটে বা ভূমিকায় তাহার নাম একবার করিলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়। এই প্রণালীতে হাত আর মগজ মক্‌স করিতে থাকিলে প্রত্যেকেই পাঁচসাত বৎসরের ভিতর বেশ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে বাঙলার অর্থসাহিত্যে ইজ্জৎ পাইতে পারিবেন। চাই সম্প্রতি লেখার নেশা, বাতিক, অভ্যাস, সংকল্প আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

টাকাকড়ি সম্বন্ধে বই লিখিতে হইলে বলা দরকার হয় আর্থিক জীবনে টাকাকড়ির কাজকর্ম্ম। টাকাকড়ি কবে কোথায় কি আকারে দেখা দিয়াছে আর আজকাল কত ঢঙের টাকাকড়ি দেখা যায় তাহার

বৃত্তান্ত চাই। এই সব কথা ত উয়ালিদের বইয়ে আছেই। অধিকন্তু আছে মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগতের কোন্ দেশে মুদ্রা-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা। ভারত-সন্তান সাধারণতঃ এই বিষয়টা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে অভ্যস্ত নয়। তাহা ছাড়া যুদ্ধের যুগের টাকাকড়ি আর যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের টাকাকড়ি কোথায় কিরূপ আকারে দেখা দিয়াছে তাহার কথাও উয়ালিদের বইয়ে স্বতন্ত্র ঠাঁই পাইয়াছে। বইয়ের আর একটা আলোচ্য বিষয়,—"স্তাবিলিজাসিওঁ" বা মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্থিরতা-প্রতিষ্ঠা—ফ্রান্সে অবশ্য এখনো আসে নাই। কিন্তু অন্যান্য দেশে আসিয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধের যুগটা এখন সেকেলে ইতিহাসের অন্তর্গত মাল।

অর্থশাস্ত্রী রুফ

আর একখানা ফরাসী বইয়ের কথা বলিব। লেখক টাকাকড়ি সম্বন্ধে "তত্ত্বকথা" প্রচার করিতেছেন। দুই খণ্ডে বড় বই লেখা হইতেছে। প্রথম খণ্ডেই আছে ৩৭০ পৃষ্ঠা। বইটার নাম "তেওরী দে ফেনোমেন মোনেতেয়ার" (টাকাকড়ি বিষয়ক ঘটনাবলীর দর্শন-কথা)। প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে এই ঘটনাবলীর "স্তাতিক" বা স্থিতিশীল আকার-প্রকার। "দিনামিক" বা গতিশীল আকার-প্রকারের দর্শন-কথা আলোচিত হইবে দ্বিতীয় খণ্ডে। লেখকের নাম রুফ্।

টাকাকড়ির চলাচল বুঝানো গ্রন্থকারের একটা বিশেষত্ব। এই জন্য ফ্রান্সের বিভিন্ন সওদা, মজুরি, "অংশের" মূল্য ইত্যাদি বিষয়ক "কার্ভ" বা উৎরাই-চড়াইগুলা তুলনায় সমালোচনা করা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সূচী-সংখ্যার ছাড়াছড়ি। বস্তুতঃ ছবিতে যাহা "কার্ভ" বা উৎরাই-

চড়াই, অঙ্কে সেটা "সূচী-সংখ্যা" ছাড়া আর কিছুই নয়। বহুসংখ্যক সূচী-সংখ্যা একত্র করিলে একটা দেশের বাজার, টাকাকড়ি, দামের ওঠানামা, ইত্যাদি তথ্য বুঝিতে পারা যায়। ফরাসী মুল্লুকের বহুসংখ্যক বাজার এক সঙ্গে দেখানো রুফের এক বড় মতলব। আর্থিক জীবনে কেনাবেচার সঙ্গে টাকাকড়ির "পরিমাণের" কি সম্বন্ধ তাহা বাহির করিবার জন্য এই সব বাজার-বিশ্লেষণ নেহাৎ জরুরি।

মুদ্রাবিজ্ঞানের পরিমাণ-তত্ত্ব

লেখক বলিতেছেন,—"টাকাকড়ির পরিমাণের সঙ্গে কেনা-বেচার দামের যে সাম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়া থাকে তাহা পূরাপূরি যুক্তি-সঙ্গত নয়।" এই সাম্য-সম্বন্ধটা ধনবিজ্ঞানের পারিভাষিকে "ইকুয়েশ্যন অব একস্‌চেঞ্জ" (বিনিময়ের সাম্য-সম্বন্ধ) নামে সুপরিচিত। টাকা-কড়ির "পরিমাণ-তত্ত্ব" (কোয়াণ্টিটেটিভ থিওরি) নামে যে দর্শন দুনিয়ায় চলিতেছে তাহার এক বড় খুঁটা বা এক প্রকার একমাত্র খুঁটাই হইতেছে এই সাম্য-সম্বন্ধ। মার্কিণ পণ্ডিত ফিশার "বিনিময়ের সাম্য-সম্বন্ধ" নামক ইকুয়েশ্যনটার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত।

রুফ্ ফিশারের বিরুদ্ধে রায় দিতেছেন;—কিন্তু এক বিচিত্র উপায়ে। তাঁহার মতে সাম্য-সম্বন্ধটা জলবৎ তরল বস্তু। তাহার জন্য কোনো প্রমাণাবলী দরকার হয় না। সেটা আবিষ্কার করার ভিতর এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নাইও। বরং এই সূত্রের ভিতর একটা গলদই আছে। কেননা তাঁহার মতে টাকাকড়ির "গতিবিধি" যতই বাড়িতে থাকে ততই এই সাম্য-সম্বন্ধে গলদ আসিয়া জুটে।

ট × গ'এর সঙ্গে "পরিমাণে"র সম্বন্ধ

মতটা অতিমাত্রায় আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই। ফিশার এই

গতিবিধির কথাই এত বেশী আলোচনা করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ইকুয়েশ্যনের প্রধান কথাই হইতেছে এটা। যখনই আমরা টাকাকড়ি শব্দ ব্যবহার করি তখনই তাঁহার মতে আমাদের বুঝা উচিত যে, কোনো মুদ্রাটা দশ দশ বার হাত ফিরিয়া দশ দশটা মুদ্রার কাজ সারিতেছে, আবার কোনো মুদ্রাটা মাত্র একবার হাত ফিরিয়া একটা মুদ্রারই জীবন দেখাইতেছে। কাজেই ফিশার প্রত্যেক "ট"কে (অর্থাৎ টাকাকে) "গ" অর্থাৎ গতিবিধি দিয়া গুণ করিয়া বাজারে ভ্রাম্যমান "টাকার পরিমাণ" নির্দ্ধারণ করিতে অভ্যস্ত। আর এই ট×গ'এর উপরই তিনি তাঁহার সাম্য-সম্বন্ধ খাড়া করিয়াছেন। এই "গ"এর ইজ্জৎ ইংরেজ পণ্ডিত কেইন্‌স্ এবং হট্রে এই দুই জনের চিন্তায় আর রচনায়ও খুব বেশী। অর্থাৎ এই সকল ধনবিজ্ঞানসেবীদের চিন্তায় টাকার পরিমাণের সঙ্গে টাকার গতিবিধির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করা অতি প্রাথমিক কথা।

এক্ষেত্রে ফরাসী পণ্ডিতের রায় মার্কিণ-ইংরেজ পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করার মতন যুক্তি পাওয়া যাইতেছে না। কেননা টাকার পরিমাণের উপর যদি বাজার-দরের উঠানামা নির্ভর করে তাহা হইলে এই উঠানামা টাকার গতিবিধির উপরও নির্ভর করিতে বাধ্য। রুফ "পরিমাণ-তত্ত্ব" স্বীকার করিতেছেন অথচ "গতিবিধি"র বেলায় বাঁকিয়া বসিয়াছেন। এই চিন্তা-প্রণালীর ভিতর আসামঞ্জস্য সহজেই দেখা যাইতেছে। টাকার গতিবিধির উপর যদি বাজার-দরের উঠানামা নির্ভর না করে তাহা হইলে রুফের পক্ষে প্রথম হইতে পরিমাণ-তত্ত্বের বিরুদ্ধেই সটান খাড়া হওয়া উচিত। গতিবিধি বাদ দিয়া টাকার পরিমাণ চিন্তা করা চলিতে পারে না।

বিনিময়ের হারে উঠানামা

বিনিময়ের অন্যান্য দফা সম্বন্ধে রুফের মতামত সুপ্রচলিত মতেরই এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। বিনিময়ের হার উঠিতেছে নামিতেছে। কিন্তু এই উঠানামার ঝোঁক হইতেছে স্থিতসাম্যে (ইকুইলিব্রিয়ামে) ফিরিয়া যাওয়া। দুই দেশের ভিতরকার সকল প্রকার আমদানি-রপ্তানি বা কেনা-বেচা,—আসল কথা সকল প্রকার "দেনা-পাওনা",—সাম্যে আসিয়া ঠেকিতে বাধ্য। আর তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশের বাজার-দরও অন্যান্য দেশের বাজার-দরের সঙ্গে একই আন্তর্জ্জাতিক ভূমিতে আসিয়া ঠেকে। এক দিকে স্থিতি-সাম্য অপর দিকে আন্তর্জ্জাতিক মূল্য-সাম্য বিনিময়ের ব্যবস্থায় দুইটা বড় আর্থিক তথ্য।

সোনার সীমানা ("গোল্ড পয়েণ্ট")

কথাগুলায় নূতনত্ব কিছু নাই। তবে একটা দফায় রুফ নূতন যুক্তি আনিয়াছেন। ফরাসীতে যাহাকে "পোঁয়া দ'র" বলে ইতালিয়ানে তাহার নাম "পুন্ত দেল্ অর"। ইংরেজিতে পারিভাষিক শব্দ হইতেছে "গোল্ড পয়েণ্ট"। তিনটা শব্দই এক। বাংলায় "পয়েণ্ট"কে বিন্দু বলিলে বিশেষ কিছু বুঝা যাইবে না। বিনিময়-হারের "বিন্দু" কি বস্তু? অতএব "গোল্ড পয়েণ্ট"কে "সোনার সীমানা" ধরিয়া লইতেছি।

এই "সোনার সীমানা" জিনিষটা রুফ বেশ নতুন ধরণে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় অন্যান্য বিনিময়, অদল-বদল বা কেনা-বেচা যে নিয়মে চলে দেশে দেশে সোনার কেনা-বেচা, দেনা-পাওনা,

আমদানি-রপ্তানিও বিলকুল সেই নিয়মেই চলিয়া থাকে। একই অর্থনৈতিক সূত্রে অন্যান্য মালের মূল্য-সীমানার মতন "স্বর্ণ-সীমা" ও নির্দ্ধারিত হয়।

দুই দেশের বা দুই বাজারের মালে মালে মূল্য-প্রভেদ থাকিতে পারে কতটা? এক দেশ হইতে আর এক দেশে মাল পাঠাইবার খরচটা যতখানি, একমাত্র ততখানি প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক। তাহার বেশী যদি প্রভেদ থাকে তাহা হইলে মাল এক বাজার হইতে অন্য বাজারে আমদানি বা রপ্তানি হইতে বাধ্য। অর্থাৎ যানবাহনের খরচটা হইতেছে "মালের সীমানা"র নিয়ামক। যেই সেই সীমানার কাছে বাজার-দর আসিয়া ঠেকে অথবা সেই সীমানা টপকাইয়া যায় তখনই মালের জগতে আমদানি-রপ্তানি নামক ঘটনা ঘটিতে বাধ্য। মালের দুনিয়ায় যাহা ঘটিয়া থাকে সোনার দুনিয়ায়ও ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। দুই দেশের সোনার দরে প্রভেদটা যেই সোনা পাঠাইবার খরচ অপেক্ষা কমবেশী হয় তখনই এক দেশ হইতে আর এক দেশে স্বয়ং সোনার চলাচল সুরু হয়। পাঠাইবার খরচটাই সোনার সীমানা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়।

মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্থিরতা-প্রতিষ্ঠা

বেকার সমস্যা বর্ত্তমান দুনিয়ার একটা বড় তথ্য। এই তথ্যের বিশ্লেষণে নানা পণ্ডিত মাথা ঘামাইতেছেন। অবশ্য সকলেই এক পথের পথিক নন। শ্রীযুক্ত বেলার্বি বেকার সমস্যা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মজুরির মুল্লুকে আসিয়া পড়িয়াছেন। সেই পথেই জিনিষপত্রের বাজার-দরের সঙ্গে মোলাকাৎ। যাঁহা বাজার তাঁহা মুদ্রা-সমস্যা। বেলার্বি বলিতেছেন, "যদি বেকার কমাতে চাও তবে মুদ্রাটাকে চঞ্চল হইতে

দিও না।” গবেষণাটা “মানিটারি ষ্টেবিলিটি” (নিউইয়র্ক ও লণ্ডন, ম্যাক্‌মিলান, ১৯২৫, ২৬+১৭৪) নামে বাহির হইয়াছে।

বাজারদরের ওঠা-নামাই হইতেছে সকল দোষের গোড়া। এইটাকে কাবু করিতে পারাই আর্থিক সমতা-সাধনের উপায়। কিন্তু তাহা করা যায় কি করিয়া? তাহার জন্য চাই বাণিজ্যের ওলট-পালট বন্ধ করা। বাণিজ্য বস্তুটা অর্থাৎ লেন-দেন, কেনা-বেচা, আমদানি-রপ্তানি নির্ভর করে ব্যাঙ্কের উপর। কেন না ব্যাঙ্কগুলা কারবারকে যেরূপ কর্জ্জ দেয় তাহার উপরই অনেকটা নির্ভর করে মাল-কেনাবেচার আকার-প্রকার। ব্যাঙ্ক যদি বেপারীকে অতি সহজে মালের রসিদ দেখিবামাত্র টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে বেপারীরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়ে। আর তখন তাহারা একেবারে দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া বাজারে মাল চালাইতে লাগিয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, ব্যাঙ্কগুলা সহজে টাকা ছাড়িতে রাজী হয় কেন? তাহাদের তহবিলে কাঁচা টাকা অনেক মজুত হয় বলিয়া। কিন্তু কাঁচা টাকা মজুতই বা হয় কেন? দেশের গবর্মেণ্ট অথবা নোট-ব্যাঙ্ক যদি অনেক পরিমাণ সোনার মালিক হইয়া পড়ে, আর সোনা পাইবামাত্র তাহার সমান দামের টাকা ছাড়িতে সুরু করে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলাও টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে থাকিবে। এই গেল সোজা কথা।

প্রধান সমস্যা হইতেছে ব্যাঙ্কগুলাকে টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে না দেওয়া। অর্থাৎ বেপারীদিগকে কর্জ্জ দিবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কগুলার হাতে কম থাকিলেই অথবা উচিত পরিমাণের মাত্রা ছাড়িয়া না গেলেই ‘আপদঃ শান্তি’। তাহা হইলে কর্জ্জ-নীতিকে শাসন ও সংযত করা দাঁড়াইতেছে বর্ত্তমান দুনিয়ার আসল রাষ্ট্রনীতি ও অর্থশাস্ত্র।

টাকার বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্য

ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত বারিঅল ফ্রান্সে এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে অন্যতম স্থলেখক রূপে পরিচিত। তাঁহার "তেওরী এ প্রাতিক্ দেজ্ ওপরাসিওঁ ফিনাঁসিয়্যার" (টাকা-কড়ি-বিষয়ক লেনদেনের তত্ত্ব ও কর্ম্মকথা) টেকসট-বুক হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। প্যারিসের দোআঁ কোম্পানী প্রকাশক। ১৯২৫ সনে এই বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

অল্প মেয়াদের টাকা খাটানো সম্বন্ধে বারিঅল আলোচনা করিয়াছেন প্রথমে। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে লম্বা মেয়াদের লগ্নি কারবার। ষ্টক্-এক্স্চেঞ্জের টাকা-চলাচল স্বতন্ত্র ভাবে বিবৃত হইয়াছে। আর ব্যাঙ্কের কারবারে টাকার ব্যবসা-সম্বন্ধেও স্থবিস্তৃত আলোচনা আছে। সরকারী রাজস্বও গ্রন্থে ঠাঁই পাইয়াছে। এই সূচী হইতে গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালী ধরিতে পারা যাইবে। এই ধরণের গ্রন্থ ভারতীয় পাঠকদের চোখে একটা পড়ে না।

বিদেশে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক

ভারতসন্তান স্বদেশেই ব্যাঙ্ক কায়েম করিবার ব্যবসায় পাকিয়া উঠে নাই, বিদেশে ব্যাঙ্ক চালাইবে কোথা হইতে? কিন্তু বিদেশীরা ভারতে বড় বড় ব্যাঙ্ক চালাইতেছে। জার্ম্মাণদের ব্যাঙ্কও ভারতে একদিন ছিল। আজ এখনো নাই। কিন্তু অন্যান্য বিদেশে জর্ম্মাণদের ব্যাঙ্ক আজও আছে। সেইগুলার অবস্থা বিরূপ তাহার বৃত্তান্ত পাইতেছি "ডী নয়েরে এণ্টভিক্লুঙ্ ডেস্ ড্যয়চেন আউসলাণ্ডস্-বাঙ্ক-ভেজেন্স্ ১৯১৪-২৫" (বিদেশে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থা—১৯১৪ হইতে

১৯২৫ সন পর্য্যন্ত সময়ের বৃত্তান্ত) নামক গ্রন্থে। দুইজন লেখকের সমবেত চেষ্টায় বই তৈয়ারী হইয়াছে। ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বার্লিনের স্প্যেট কোং প্রকাশক (১৯২৫)।

জার্ম্মাণ মুল্লুকে যে সকল বিদেশী ব্যাঙ্কের কাজ চলিতেছে গ্রন্থে তাহার খবরও আছে। বিদেশী ব্যাঙ্কের সকল শ্রেণীর আকার-প্রকারই লেখকদের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রথম অংশে বিবৃত আছে বিদেশে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-প্রণালী। প্রথমতঃ,—বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে "ইণ্টারেস্সেন-গেমাইন্শাফ্ট" (স্বার্থ-সাম্য) কায়েম করিয়া কাজ চালানো অনেক জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের দস্তুর। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী ব্যাঙ্কের মূলধন জোগাইয়া অথবা মোটা মোটা শেয়ার কিনিয়া কোনো কোনো জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক কাজ চালাইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, বিদেশী ব্যাঙ্কের হাতে প্রতিনিধির কাজ দেওয়াও দস্তুর। চতুর্থতঃ, বিদেশে শাখা-ব্যাঙ্ক কায়েম করা এক কর্ম্মপ্রণালী। পঞ্চমতঃ, বিদেশে একদম স্বাধীন ব্যাঙ্ক কায়েম করাও জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের রেওয়াজ।

বিদেশে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের মূর্ত্তি উক্ত পাঁচ শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহাদের কাজ নিম্নরূপ,—(১) স্থানীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কাজ করা, (২) আমদানি-রপ্তানির কাজে হিস্যা লওয়া, (৩) শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজি সাহায্য করা, (৪) সরকারী, নাগরিক বা অন্যবিধ সার্ব্বজনিক কারবারের জন্য কর্জ্জ তুলিয়া দেওয়া।

গ্রন্থের তৃতীয় অংশে জগতের নানা দেশে যে সকল জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক চলিতেছে তাহাদের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ আছে। দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা সকল অঞ্চলের তথ্যই আছে।

বিলাতী ব্যাঙ্কের ঐক্যগঠন

বাংলা দেশে আজকাল ছোট-বড়-মাঝারি লোন-আফিস বা ব্যাঙ্কের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এই সকল কর্জ্জপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নতির পথে উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। বর্ত্তমানে আমরা ব্যাঙ্ক-পরিচালনার যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থা ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশে অনেকদিন হইল অতীত হইয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশের মতন এই সকল দেশেও বহুসংখ্যক ছোট খাটো ব্যঙ্কের যুগ ছিল। ব্যাঙ্কগুলাও ক্রমে ক্রমে ঐক্যবদ্ধ হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এই ক্রমবিকাশের ধারা বেশ স্পষ্টরূপে ধরিতে পারা যায়। সম্প্রতি ইংরেজী ভাষায় একখানা বই বাহির হইয়াছে বিলাত সম্বন্ধে (১৯২৬)। প্রকাশক লণ্ডনের কিং কোং। লেখকের নাম সাইক্‌স্।

গ্রন্থকার "দি অ্যামালগ্যামেশ্যন মুভ্‌মেণ্ট ইন্ ইংলিশ ব্যাঙ্কিং" (বিলাতী ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে ঐক্যবন্ধনের আন্দোলন) নাম দিয়া তাঁহার তথ্যগুলা শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮২৫ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত পূরাপূরি একশ' বৎসরের বৃত্তান্ত এই কেতাবে পাই। আমাদের দেশে যাঁহারা ব্যাঙ্ক বা লোন আফিস চালাইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এই বই যার পর নাই মূল্যবান।

সাইক্‌স্ বিলাতী ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসমূহের ঐক্যবন্ধন পাঁচ যুগে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই যুগ-বিভাগের দিকে ভারতীয় পাঠকের নজর ফেলা আবশ্যক। কোন্ যুগে কতগুলা যোগাযোগ কায়েম হইয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

১৮২৫-৪৩	...	...	১২২
১৮৪৪-৬১	...	...	৪৪
১৮৬২-৮৯	...	...	১৩৮
১৮৯০-১৯০২	...	...	১৫৩
১৯০৩-১৯২৪	...	...	৯৫
			৫৫২

একশ' বৎসরে মোটের উপর ৫৫২ বার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ভিতর "ছোট ভাঙ্গিয়া বড় গড়িবার" কাজ দেখা গিয়াছে। অর্থাৎ গড়পড়তা বৎসরে প্রায় ৫॥০ উপলক্ষ্যে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্মিলিত হইয়া বিপুলয়াতন ধন-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে।

বিলাতী আর্থিক ইতিহাসের এই সকল তথ্য বাঙালী সমাজে বড় কাজে লাগিবে। আমরা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় এই "অ্যামালগ্যামেশ্যন" বা একীকরণের প্রাথমিক যুগে পা ফেলিবার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ছোট ভাঙ্গিয়া বড় গড়িবার প্রয়াস এখনো বিশেষ বলবান নয়। কিন্তু শীঘ্রই বাঙালী ব্যাঙ্ক-মাতব্বরদিগকে এই পথের পথিক হইতে হইবে।

ইতালির ব্যাঙ্ক-সম্পদ্

মিলানোর "স্তাম্পা কমার্চিয়ালে" কোম্পানী হইতে ইতালিয়ান ব্যাঙ্ক-সম্পদ্ সম্বন্ধে একখানা বই বাহির হইয়াছে। ১৯১২ হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরের ব্যাঙ্ক বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। লেখকের নাম সেগ্রে। কেতাব "লে বাঙ্কে নেল উল্‌তিম দেচেন্নিয়" অর্থাৎ "শেষ দশকের ব্যাঙ্ক সমূহ" (১৯২৬) নামে পরিচিত।

গ্রন্থকার যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের "স্‌ভিলুপ্‌প পাতলজিক"

(অস্বাভাবিক,—ব্যাধিমূলক,—বিকাশের লক্ষণসমূহ) বিশেষ রূপেই বিবৃত করিয়াছেন। বহুসংখ্যক ইতালিয়ান ব্যাঙ্কের বার্ষিক আয়ব্যয়-তালিকা একসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন অধ্যাপক আইনোদি। ইতালিয়ান রাজস্ব সম্বন্ধে এই পণ্ডিত অন্যতম বিশেষজ্ঞ। আইনোদি বলিতেছেন,—"এই দশ বৎসরের ভিতর ইতালিতে মাঝারি ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ছোট এবং বড় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমিয়াছে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, ইতালিয়ান সমাজের আর্থিক মেরুদণ্ড খানিকটা শক্ত হইবার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।"

দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা সহজে বুঝানো যাইতে পারে। লাখ বা দশ লাখ লিয়ায়ের কম যেসব ব্যাঙ্কের মূলধন সেগুলা ১৯১২ সনের পূর্ব্বে সংখ্যায় ছিল শতকরা ৫২টা। কিন্তু এই দশকে শতকরা ১৩তে দাঁড়াইয়াছে। যে সকল ব্যাঙ্কের মূলধন দশ লাখের উপর আর আড়াই ক্রোরের নীচে তাহারা গুণতিতে আগে ছিল শতকরা ৪৫টা। এক্ষণে শতকরা ৭১। আর দশ কোটির উপর মূলধনওয়ালা ব্যাঙ্ক শতকরা ১'৪ এ নামিয়াছে।

কিন্তু সেগ্রে অথবা আইনোদির মত গ্রহণীয় কিনা সন্দেহ। বিষয়টা তলাইয়া দেখা আবশ্যক। লিয়ায়ের দাম প্রাক্-লড়াইয়ের যুগে যাহা ছিল আজকাল নামিতে নামিতে তাহার $\frac{1}{৫}$ অংশে দাঁড়াইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে লিয়ার ছিল ভারতীয় দশ আনার সমান। আজকাল লিয়ার মাত্র দুই আনার চেয়ে বেশী নয়। "কাগজের টাকায়" লাখ বা ক্রোর লিয়ার ধরিলে সেগ্রে আর আইনোদির কথা হয়ত বা ঠিক। কিন্তু লিয়ারের আসল দাম,—"সোনার টাকা"—বিচার করিলে ইতালিয়ান ব্যাঙ্কের অবস্থা অন্যরূপ।

দশলাখ বা দশ লাখের চেয়ে কম "সোনার লিয়ার" যে সব ব্যাঙ্কের পুঁজি তাঁহারা সংখ্যায় কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে শতকরা ৫২ ছিল তাহাদের সংখ্যা, এক্ষনে তাহারা গুণতিতে শতকরা ৬১টা। আর "মাঝারি" ব্যাঙ্কগুলার—অর্থাৎ যে সব ব্যাঙ্কের পুঁজি "সোনার লিয়ারে" দশ লাখ হইতে আড়াই কোটী—তাহারা গুণতিতে বেশ নামিয়াছে। আগে ছিল ৪৫, এক্ষণে এই হার ২৮ মাত্র। অধিকন্তু বড় ব্যাঙ্ক, যার পুঁজি দশ ক্রোর "সোনার লিয়ার",—গুণতিতে সত্যিসত্যিই বাড়িয়াছে। আগে ছিল এইগুলা সংখ্যায় ২টা। এক্ষণে ইতালিতে ৩টা এই ধরণের বড় ব্যাঙ্ক আছে। বুঝিতে হইবে যে, আইনোদি যে কথাটা বলিয়াছেন আসল কথা ঠিক তাহার উল্টা।

জাপানী ব্যাঙ্ক

বৎসরখানেক হইল,—জার্ম্মাণ ভাষায় জাপানের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একখানা পুস্তিকা বাহির হইয়াছে (১৯২৫)। নাম "য়াপানিশেস্ বাঙ্ক-ভেজেন" (জাপানী ব্যাঙ্ক-প্রথা)। লেখক শ্রীযুক্ত তুশিমাতো একজন জাপানী। প্রকাশক ষ্টুটগার্ট শহরের প্যেশেল কোম্পানী। গোটা পঞ্চাশেক পৃষ্ঠার ভিতর গ্রন্থকার জাপানের সকল প্রকার ব্যাঙ্কের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। জমিজমার ব্যাঙ্ক, শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সকলপ্রকার "কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানে"রই বিবরণ আছে। ব্যাঙ্ক-পরিচালনার ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক-বিষয়ক আইন-কানুন কিছুই বাদ যাই নাই। জার্ম্মাণিতে জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত বলিয়া জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দফায় দফায় তুলনা সাধন করা হইয়াছে। বাঙালীর পক্ষে এই কেতাব বিশেষ মূল্যবান হইবার কথা। বাংলায় ইহার তর্জ্জমা অথবা সংক্ষিপ্তসার বাহির হইলে ভাল হয়।

গ্রন্থকার জাপানী মুদ্রা-সমস্যা সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই। টাকশাল, কাগজের টাকা ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় বাদ পড়িয়াছে।

শাখা-ব্যাঙ্কের "দৌরাত্ম্য"

আমেরিকায় নিয়ম আছে,—"ন্যাশনাল" নামধারী ব্যাঙ্কগুলা কোনো শাখা কায়েম করিতে পারিবে না।" "ষ্টেট" নাম ধারী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেও ঐ আইন। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বপ্রান্তের নগরগুলায় এই কানুনের কড়াক্কড়ি খুব বেশী। নিউইয়র্ক, বষ্টন, শিকাগো ইত্যাদি শহরের কোটী কোটী ডলারওয়ালা ব্যাঙ্কসমূহ নিজ নিজ শহরের প্রাসাদেই বন্দী থাকিতে বাধ্য। শহরের নানা পাড়ায় অথবা মফঃস্বলের কোনো পল্লীতে ইহাদের গতিবিধি নিষিদ্ধ।

কিন্তু দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলের মার্কিণরা অন্য পথের পথিক। কালিফর্ণিয়া প্রদেশের ব্যাঙ্কগুলা পল্লীতে পল্লীতে শাখা কায়েম করিতে অধিকারী। যখন যে-অঞ্চলে টাকার চলাচল বেশী তখন সেই অঞ্চলে এই সকল ব্যাঙ্ক সশরীরে হাজির থাকে। কালিফর্ণিয়া বিপুল দেশ। এখানকার অসংখ্য জনপদে চাষ-আবাদের বৈচিত্র্য অনেক। কাজেই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন কেন্দ্রে টাকার স্রোত বহিতে থাকে। এই টাকার আমদানি-রপ্তানি কাজে ব্যাঙ্কের শাখাগুলা খুবই সাহায্য করে। ফলতঃ, অল্প-সংখ্যক স্বাধীন ব্যাঙ্কের দ্বারাই সুবিস্তৃত প্রদেশের টাকার চলাচল নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, যে-সকল ব্যাঙ্কের শাখা আছে তাহাদের ব্যবসা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যে-সকল ব্যাঙ্ক আইনতঃ শাখা কায়েম করিতে অনধিকারী তাহাদের "মালখানায়" ক্রোর ক্রোর টাকা থাকা সত্ত্বেও

তাহারা জেলায় জেলায় যাইয়া ব্যবসা বাড়াইতে অনধিকারী। আজ-কাল দেখা যাইতেছে যে, বড় বড় ব্যাঙ্কগুলা এখন এই শাখাওয়ালা ছোট ব্যাঙ্কদের সঙ্গে তুলনায় খাটো হইয়া পড়িতেছে। কাজেই "ন্যাশন্যাল" এবং "ষ্টেট" নামধারী ব্যাঙ্কগুলার চোখ টাটাইতেছে। তাহারা আদালতে মামলা রুজু করিতেছে। তাহারাও সর্ব্বত্র শাখা খুলিয়া দেশের সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যে আঙ্গুল চালাইতে চায়।

এই হইতেছে মার্কিণ মুল্লুকের অন্যতম ব্যাঙ্ক-সমস্যা। ভারতের পক্ষে এই সমস্যাটা নূতন এবং বোধ হয় খানিকটা কিম্ভূতকিমাকারও বটে। কিন্তু কলিন্‌স্-প্রণীত "দি ব্রাঞ্চ-ব্যাঙ্কিং কোয়েশচ্যন" (শাখা-ব্যাঙ্ক-সমস্যা) পড়িয়া দেখিলে আর্থিক জীবন বিষয়ক আইন-কানুনের অনেক কথা সহজে মালুম হইবে। বইটা ছোটও বটে (১৭৬ পৃষ্ঠা)। প্রকাশক নিউ ইয়র্কের ম্যাক্‌মিলান (১৯২৬)।

চেকের চলন ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসা

চেক-বস্তুটা কি আর তার চলাচল কিরূপে সাধিত হয় এই বিষয়ে সুবিস্তৃত বই ইংরেজি ভাষায় বেশী নাই। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে সকল টেক্‌ষ্ট্ বুক বাজারে বিক্রী হয় তাহার কোনো কোনোটায় আট-দশ পৃষ্ঠা মাত্র এই বিষয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে আজকাল আর ঐ আট-দশ পৃষ্ঠায় পেট ভরিতেছে না। আমরা ব্যাঙ্কের ভিতর-বাহির তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার জন্য খানিকটা উদ্‌গ্রীব হইয়াছি।

এই ক্ষুধা মিটাইবার পক্ষে একখানা মার্কিণ বই বিশেষ কাজে লাগিবে। গ্রন্থকারের নাম স্পার। "দি ক্লীয়ারিং অ্যাণ্ড কলেক্‌শ্যন অব্ চেক্‌স্" (চেক-খালাস ও সংগ্রহ) নামে ৫৯৭+২৪ পৃষ্ঠায় তিনি একখানা সুবিস্তৃত বই লিখিয়াছেন (১৯২৬, নিউ ইয়র্কের

ব্যাঙ্কার্স পাবলিশিং কোং প্রকাশক)। যাঁহারা ব্যাঙ্ক চালাইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এই বই বিশেষ দরকারী। মার্কিণ পণ্ডিত ক্যানন-প্রণীত "ক্লীয়ারিং হাউসেজ" (চেক খালাসের প্রতিষ্ঠান) নামক বইটা ছোট বটে, কিন্তু অনেক কাজের কথায় পূর্ণ। সেই বইটায় বিগত ১০।১৫ বৎসরের তথ্য নাই। কিন্তু বাংলাদেশের এখন যে অবস্থা তাহাতে ক্যাননের বইটা পড়িলেই অনেকটা চলিবে।

স্পার যুক্তরাষ্ট্রের "ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" নামক সরকারী বা নিম-সরকারী নোট-ব্যাঙ্কের আইন-মাফিক ব্যাঙ্ক-শাসন এবং চেক চলাচলের বিশদ বৃত্তান্ত দিয়াছেন। এই দিকে যাঁহারা মাথা ঘামাইতে অ-রাজী তাঁহারা ভারতের "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" সমস্যা পূরাপূরি বুঝিবেন না।

বীমা-ব্যবসার একাল-সেকাল

জার্ম্মাণ বীমাশাস্ত্রী মানেস

ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বোধ হয় বীমা-বিদ্যা। ভারতে ত কথাই নাই, এমন কি জার্ম্মাণিতেও বিশ-বাইশ বৎসর পূর্ব্বে বীমা-প্রথা সম্বন্ধে ষোল কলায় পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত গ্রন্থ বড় বেশী ছিল না। কিছু দিন হইল জার্ম্মাণির আইনদক্ষ পণ্ডিত এরেণব্যর্গ "ড্যয়চে য়ুরিষ্টেন-ৎসাইটুঙ" নামক আইন-পত্রিকায় বলিয়াছিলেন,—আলফ্রেড মানেস প্রণীত গ্রন্থেই সমাজ জীবনের বীমা-তথ্যগুলা সর্ব্বপ্রথম স্বতন্ত্র আকারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শৃঙ্খলীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তখনকার দিনে জার্ম্মাণিতেও বীমা সম্বন্ধে একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর "টেক্‌স্‌ট-বুক" ঢুঁড়িতে হইলে গলদঘর্ম্ম হইতে হইত।

মানেসের বই বাহির হইয়াছিল ১৯০৪ সনে। নাম "ফার্জিখারুংস-ভেজেন।" চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে ১৯২৪ সনে। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ দুই খণ্ডে, (লাইপৎসিগ, ট্যয়বনার কোং)। এই বিশ বৎসরে অন্যান্য লেখকের বইও বিস্তর বাহির হইয়াছে। বীমা-সাহিত্য জার্ম্মাণিতে আজকাল বিপুল। বস্তুতঃ, বীমা বস্তুটাই জার্ম্মাণ সমাজে যারপর নাই বাড়িয়া গিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯০১) জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের তরফ হইতে বীমা-বিষয়ক আইনের প্রয়োগ-বিষয়ে তদ্‌বির করিবার জন্য সবে মাত্র সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র কায়েম হইয়াছিল। অর্থাৎ বীমা প্রথার উপর গবর্মেণ্টের নজর তখনও বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল না। তখনও বীমা-বিষয়ক চুক্তি সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা কায়েম হয় নাই।

আজকাল বীমা-প্রথা বৈচিত্র্যময়। এই সকল বিচিত্র শাখা-প্রশাখার নাম পর্য্যন্ত সে যুগে অজ্ঞাত ছিল। আজ যেমন কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কোনো না কোনো বীমা-প্রণালীর শিকড় জড়ানো আছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। তখনও দু'চারটা বড় বড় বীমা-প্রতিষ্ঠান ছিল সত্য, কিন্তু আর্থিক জীবনের উপর সে সমুদয়ের প্রভাব অল্পমাত্র দেখা যাইত।

কাজেই বিশ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার জার্ম্মাণ আইনজ্ঞেরা বীমা সম্বন্ধে অনেকটা অজ্ঞ থাকিত। ধনবিজ্ঞানের সেবকেরাও বীমা-বিদ্যার ধার ধারিত না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-চর্চ্চায় বীমার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত হইত কিনা সন্দেহ। বোধ হয় এক গ্যোটিঙ্গেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে পঠন-পাঠন চলিত।

আজ জার্ম্মাণির অলিতে গলিতে বীমা-প্রতিষ্ঠান, বীমাবিধি, বীমা-কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বীমা-সাহিত্যেরও জোয়ার বহিতেছে। মানেসের বইটা কিন্তু আজও বীমা-দক্ষেরা আদর করিয়া থাকে। মানেস তাঁহার গ্রন্থের এই চতুর্থ সংস্করণে বিশ বৎসরের সকল প্রকার ব্যক্তিগত এবং দেশোন্নতি-বিষয়ক তথ্য যথোচিত পরিমাণে ঠাসিয়া দিতে ভুলেন নাই। সেযুগে মানেস "ড্যয়চার ফারাইন ফ্যির ফার্জিখারুংস্-ভিসেন্‌শাফট্" (জার্ম্মাণ বীমা-বিজ্ঞান-পরিষৎ) এর কর্ম্মকর্ত্তা মাত্র ছিলেন। এক্ষণে তিনি সভাপতির পদে উঠিয়াছেন।

যুদ্ধের যুগে যে সকল নতুন নতুন বীমা-তত্ত্ব গজিয়া উঠিয়াছে সেই-সব পুরাপুরিই শেষ সংস্করণে ঠাঁই পাইয়াছে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের তথ্য-তালিকা, আইন-সংস্কার এবং বীমা-তাত্ত্বিকদের মতামত সবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য যে মূলধন লাগে আজকাল তা দু-চার-দশ জন পুঁজি-পতির অধীনে কেন্দ্রীকৃত। ট্রাষ্ট, কার্টেল ইত্যাদি নানা নামে একচেটিয়া ব্যবসা চলিতেছে। এই সমুদয়ের প্রভাবে বীমা-প্রথা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এই রূপান্তরের কাহিনীও মানসের গ্রন্থে বিবৃত আছে।

আমাদের দেশে আজকাল বীমার আইন শোধরাইবার প্রস্তাব চলিতেছে। অন্যান্য দেশের কোথাও কোথাও এই সংশোধন সাধিত হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণির ১৯২৩ সনের আইন এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, মানসের গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

আজকালকার দিনে বীমা-কোম্পানীর মূলধন ও আমানত-সমস্যা সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই কঠোরতা লক্ষিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে হিসাব-পত্র রাখার নিয়মে এবং কর্ম্ম-পরিচালনা সম্বন্ধে ও কড়াক্কড়ি দেখা যাইতেছে। ইয়োরোপের নানা দেশ সম্বন্ধে এই সকল বিষয়ক তথ্য মানেসের গ্রন্থে যথোচিত স্থান পাইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে বীমা-বিষয়ক সার্ব্বজনিক এবং সাধারণ কথা। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় আগুন, দৈব, সমুদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার আর্থিক ও পরিচালনা-তথ্য। ১৯১৯ সনে জার্ম্মাণির সমুদ্র-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলা সমবেত হইয়া কতকগুলা নিয়ম জারি করিয়াছে। এই বিষয়ের বিশ্লেষণও গ্রন্থের অন্যতম বিশেষত্ব।

বীমা-সাহিত্য ভারতে এখনো এক প্রকার অজ্ঞাত। তবে এই দিকে ক্রমে ক্রমে আমাদের দৃষ্টি পড়িতেছে। একখানা জার্ম্মাণ "টেক্‌ষ্ট্‌ বুকের" সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল মাত্র। সকল বইয়েরই তর্জ্জমা বা দফায় দফায় সারসঙ্কলন সম্ভবপর নয়।

জীবন-বীমার প্রত্ন-তত্ত্ব

"জীবন-বীমার ইতিহাস এবং জীবন-বীমার কর্ম্মকোশল" সম্বন্ধে ব্রাউনের "গেশিষ্টে ড্যর লেবেন্স্-ফার্জি থারুঙ উণ্ড ড্যর লেবেন্স্-ফার্জি-থারুঙস্-টেখ্নিক" (ন্যির্ণব্যার্গ, কোখ কোং) ১৯২৫ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যের তরফ হইতে ভারতে জানিয়া রাখা দরকার যে, গ্রন্থকার একদম মান্ধাতার আমলেও জীবন-বীমা-প্রণালীর শিকড় ঢুঁড়িয়া পাইয়াছেন। জানিতে পারি যে, প্রাচীন গ্রীস ও রোম এই দিকে কিছু-দূর অগ্রসর হইয়াছিল। মধ্যযুগে বীমা-প্রথা উন্নতি বা বিস্তৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ইয়োরোপীয় নরনারী বীমা-প্রথাকে সমাজে বেশ সুপ্রচলিত করিতে থাকে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীই বীমা-প্রতিষ্ঠানের আসল যুগ। ভারতে পাশ্চাত্য যুগের পূর্ব্বে বীমা-প্রথা কোথাও প্রচলিত ছিল কি? আর্থিক ইতিহাস, আর্থিক প্রত্নতত্ত্ব এবং আর্থিক নৃতত্ত্বের অনু-সন্ধানকারীরা এই প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে পারেন। ব্রাউনের গ্রন্থ অবশ্য প্রধানতঃ বর্ত্তমান যুগের তথ্যেই ভরপুর।

এই সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন হিন্দু নীতিশাস্ত্রের পারিবারিক আইনও উল্লেখযোগ্য। দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য, বিকলাঙ্গ লোকজনের নিত্য-নৈমিত্তিক ভরণ পোষণ সমগ্র পরিবার কর্ত্তৃক বহন করিবার নিয়ম দেখা যায়। বিধবার ভরণ পোষণ, অনাথ পিতৃমাতৃহীনদের ভরণপোষণ সবই হিন্দু আইনের ব্যবস্থাধীন।

বাবিলনের হামুরাবি-নীতি (খৃঃ পূঃ ২২৫০) একটা সাক্ষ্য দিতেছে। সেকালের বণিকেরা দল বাঁধিয়া দেশবিদেশে যাওয়া আসা করিবার সময় পরস্পর একটা সমঝোতা করিয়া লইত। তাহার ভিতর চুরি,

ডাকাইতি, মারপিট ইত্যাদি সড়কের দুর্দ্দৈব ঘটিলে কোনো এক ব্যক্তির লোকসান অন্যান্য সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

স্থলপথের মতন জলপথ সম্বন্ধেও বণিকের দল একটা পারস্পরিক সমঝোতায় বাঁধা থাকিত। বাবিলন, ফিনিসিয়া, গ্রীস এবং রোমেও এই ব্যবস্থার চিহ্লোৎ আছে।

ইহুদিদের ভিতর মেয়ের বিয়ের জন্য লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যৌতুকের সঙ্গস্থা করিতে অভ্যস্ত ছিল।

প্রাচীন গ্রীসের গোলাম-মালিকেরা কোনো ধনী লোকের হাতে "চাঁদা" হিসাবে কিছু টাকা দিয়া রাখিত। ঘটনাচক্রে কোনো গোলাম যদি মালিকের একতিয়ার হইতে চম্পট দেয় তাহা হইলে সেই ধনী লোক নির্দ্দিষ্ট টাকা দিয়া মালিকের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিত।

রোমাণ সাম্রাজ্যের "ইতর জাতিরা" "কলেজিয়া" নামক সঙ্ঘ গঠন করিতে অভ্যস্ত ছিল। তাহারা মাস মাস চাঁদা দিয়া যাইত। কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে কবর দিবার খরচ "কলেজিয়ার" ভাণ্ডার হইতে আসিত। এই সাম্রাজ্যের ফৌজেরাও এই ধরণের সঙ্ঘ গঠন করিত। চাঁদা দিবার দস্তর ছিল। নতুন কোনো স্থানে বদলি হইলে, কিম্বা চাকরি হইতে বরখাস্ত হইলে অথবা মারা গেলে সঙ্ঘ হইতে টাকা দিয়া সাহায্য করা হইত।

এই সমুদয়ের কোনো ব্যবস্থাকেই একালের বীমা-প্রথার অন্তর্গত করা চলিবে না। সেগুলা হয় পারিবারিক ব্যক্তিবর্গের ভিতর আবদ্ধ সহযোগিতা বা সঙ্ঘনিষ্ঠার সামিল। অথবা সেগুলা কোনো নির্দ্দিষ্ট পেশার বা জাতির লোকজনের ভিতর আবদ্ধ পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্যমূলক কাজকর্ম বিশেষ। এই টুকু শুধু বলা চলে যে, অতি প্রাচীন কালেও

লোকেরা ভবিষ্যতের আপদবিপদ সম্বন্ধে প্রথম হইতে সতর্ক থাকিত। আর, একজনের ঝুঁকি অন্যান্যেরা "আত্মীয়" হিসাবে অথবা "পেশা-বন্ধু" কিম্বা "জাত-ভাই" হিসাবে ঘাড়ে লইবার ব্যবস্থা করিত।

এই গেল প্রাচীন বা "প্রাগৈতিহাসিক" যুগের কথা। মধ্যযুগেও এইরূপ পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি নানা প্রকার বণিক-শিল্পীর মহলে দেখা যায়। ইয়োরোপে ছিল "গিল্ড" প্রথা। ভারতে গিল্ড প্রথার অনুরূপ সঙ্ঘ-ব্যবস্থাকে "শ্রেণী" বলা হইত। জাপানেও "গিল্ড' বা "শ্রেণী" সদৃশ প্রতিষ্ঠান ছিল। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর বিলাতী গিল্ডের ব্যবস্থায় গরু চুরি হইলে তাহার বদলে গরু জোগাইবার কথা জানিতে পারা যায়। কবরের জন্য সাহায্য ত জুটিতই। আর আগুনের দরুণ ক্ষতি ঘটিলে তাহার পূরণের ব্যবস্থাও সেকালের ইংরেজরা গিল্ডের বিধানে করিতে অভ্যস্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ডেন্মার্কের লোকেরা গিল্ডের ব্যবস্থায় জাহাজডুবি ঘটিলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে চাঁদা তুলিয়া সাহায্য করিত। তীর্থযাত্রায় বাহির হইবার সময় যদি কোনো ব্যক্তির টাকার খাঁকৃতি ঘটিত তাহা হইলেও গিল্ডের লোকেরা চাঁদা দিয়া তীর্থযাত্রীর সহায় হইত। এমন কি, জেল হইতে খালাশ করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যেও গিল্ডওয়ালারা তাহাদের অন্তর্গত লোকজনের জন্য চাঁদা তুলিতে অভ্যস্ত ছিল।

পরিবার-প্রথায় পরস্পর-সাপেক্ষতা রক্তের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। "*গিল্ড*" বা "*শ্রেণী*"-প্রথায় ইহার প্রতিষ্ঠা পেশা বা ব্যবসা বিষয়ক ঐক্যের বা সাম্যের উপর। এই দুই ব্যবস্থায় "বাহিরের লোকের" প্রবেশ অর্থাৎ আপদবিপদে সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কাজেই এই দুই ব্যবস্থাকে বর্ত্তমান যুগের বীমা ব্যবস্থার জন্মকেন্দ্র বিবেচনা করা চলিবে না। এই সমুদয়কে "সেকেলে" বীমা, আধা-বীমা, সিকি-

বীমা, "নিম"-বীমা, "কোয়েসি"-বীমা, "সেমি"-বীমা ইত্যাদি রূপে বিবৃত করা চলে।

ইয়োরামেরিকার বীমাবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা বীমাপ্রথার ইতিহাস লিখিবার সময় এই সমুদয় প্রাচীন, প্রাগৈতিহাসিক এবং মধ্য যুগের "অ-বীমা" বা বীমার "কাছাকাছি" যাহক্-কিছু পরস্পর-সাহায্যমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংবাদও প্রচার করিয়া থাকেন। বীমার প্রত্নতত্ত্ব গবেষণাকারীরা আধা-বীমা জাতীয় রীতি-নীতি ও আইনকানুন গুলা সম্বন্ধে বেশ কিছু মনোযোগী। জার্ম্মাণ পণ্ডিত আল্‌ফ্রেড মানেস তাঁহার "ফার্জিখারুংস-ভেজেন" (বীমাতত্ত্ব) নামক তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থে (১৯৩০) আমাদের প্রাচীন ভারতকেও উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু আইনে আছে যে, যে সকল ঋণী লোক বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া যাওয়া আসা করে তাহাদের উপর মাসিক শতকরা দশ টাকা হিসাবে স্থদ বসানো যাইতে পারে। যাহারা সমুদ্র পাড়ি দেয় তাহাদের উপর ন্যায্য স্থদ শতকরা বিশ টাকা। কিন্তু সাধারণ মাসিক স্থদ চরম পক্ষে শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র। এই কথাটাও মানেস বীমার ইতিহাসে ভারতের দান স্বরূপ উদ্ধৃত করিতে ছাড়েন নাই।

আসল কথা বর্ত্তমান যুগ ছাড়াইয়া খানিকটা অতীতে গিয়া হাজির হইলে অনেক তথ্যই নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যার অন্তর্গত তথ্য। প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থায় গণতন্ত্র (ডেমোক্রেসি), সমাজতন্ত্র (সোশ্যালিজ্‌ম্) ইত্যাদি বস্তু ছিল কি না সেই সম্বন্ধে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন যে, বর্ত্তমান জগতে এই সব শব্দে যাহা বুঝা যায় তাহার অনেক কিছুই একমাত্র ভারতে কেন, দুনিয়ার অনেক দেশেই ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই ধরণের শব্দের অন্তর্গত মালের কতটুকু কোথায় কথন দেখা যাইত তাহার

আলোচনা করা সুধীমহলের দস্তুর রহিয়াছে। যে সকল ক্ষেত্রে এই সকল মালের গন্ধ মাত্রও নাই সেই সকল ক্ষেত্রে ও এই সবের "কাছাকাছি", নিকট-আত্মীয় অথবা দূর-আত্মীয় স্বরূপ যে সকল বিধি-ব্যবস্থা বা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দেখা যায় সেই সমুদয় খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করা বিজ্ঞান-সেবার অন্তর্গত বিবেচিত হইয়া থাকে। সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের "ক্রমবিকাশ" বুঝিবার জন্য প্রাথমিক স্তরগুলার দিকে নজর ফেলা হয়।

প্রাচীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আর্থিক ভারতের সেকাল সম্বন্ধেও আজকাল গবেষকদের দৃষ্টি দেখা যায়। এই সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় "গিল্ড" বা "শ্রেণী", ব্যাঙ্ক, পথঘাট, যানবাহন, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি সম্বন্ধেও গবেষণা সুরু হইয়াছে। ঠিক সেই প্রণালীতেই বীমা সম্বন্ধেও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বসেবীরা অনুসন্ধান চালাইতে সুরু করুন।

অন্যান্য বিষয়ের মতন বীমা সম্বন্ধেও ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চা জার্ম্মাণিতে বিস্তর হয়। গোল্ডশমিট, শাউবে, রেআট্স্, ম্যিলার, ভ্যের্ণার, মানেস ইত্যাদি পণ্ডিতগণ বীমাবিজ্ঞানের নানা বিভাগের সঙ্গে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনায় ও মাথা খেলাইয়াছেন। মানেসের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ বর্ত্তমান রচনার জন্য কাজে লাগানো গেল।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কালকে বীমাপ্রথার প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়। এই যুগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে:—(১) প্রাচীন, (২) মধ্যযুগ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য হইতে আজ পর্য্যন্ত কালকে তিন যুগে ভাগ করা দস্তুর। প্রথম যুগ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত। এই যুগে বীমাপত্রের উৎপত্তি। দ্বিতীয় যুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। বীমা-কোম্পানীর জন্ম এই

যুগের বড় কথা। তৃতীয় যুগ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। এই যুগে বিপুল বহরের বীমা-কোম্পানী বাড়িয়া চলিয়াছে। আর এক কথা দেশবিদেশব্যাপী বীমা-কোম্পানীর আকার প্রকার। অধিকন্তু, "সমাজ"-বীমার নানা শাখাপ্রশাখা এই আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান তথ্য।

আধুনিক বীমার ইতিহাসে সমুদ্র-বীমা পথ প্রদর্শক।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে ইতালির নানাস্থানে—জেনোভায়, পিসায়, ফ্লোরেন্সে,—সমুদ্রবীমার বর্ত্তমান মূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনের বর্সেলোনায় এই বীমার প্রসার দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতালি আর স্পেন সমুদ্রবীমা সম্বন্ধে ইয়োরোপের অগ্রবর্ত্তী দেশ। সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণি সমুদ্র-বীমার আসল সূত্রপাত করে। আগুনবীমা বিলাতে দেখা দেয় ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ডের পর।

"কোম্পানী" হিসাবে বীমার কাজ সর্ব্বপ্রথম সুরু হয় ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে। কিন্তু প্রথম কোম্পানীটা টেকসই হয় নাই। এই কোম্পানী সমুদ্রবীমার জন্য কায়েম হইয়াছিল। বিলাতের সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রবীমা "কোম্পানী" ১৭২০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর জার্ম্মাণদের সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রবীমা-কোম্পানী ১৭৬৫ সনে দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সর্ব্বপ্রথম "জীবন-বীমা"-"কোম্পানী" বিলাতে প্রাতিষ্ঠিত হয়। জার্ম্মাণিতে ১৮২৭ সনের পূর্ব্বে "জীবনবীমা"-"কোম্পানী" ছিল না।

"সমাজ-বীমা"র মার্কিণ গ্রন্থ

বিগত দশবারো বৎসর ধরিয়া ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বেকার-বীমা সম্বন্ধে বাংলায় ও ইংরেজিতে নানা প্রকার আলোচনা চালাইতেছি। "আর্থিক উন্নতি" প্রথম হইতেই এই বিষয়ে সজাগ আছে। তথ্যগুলা সাধারণতঃ বিদেশী ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কখনো-কখনো ফরাসী-জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান সরকারী-দপ্তরের কার্য্য-বিবরণগুলাও রসদ জোগাইয়াছে। ইংরেজি ভাষার মারফৎ কোনো একখানা বইয়ের ভিতর সমাজবীমার বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে পেট ভরিবার মতন খাদ্য পাওয়া যায় না। ১৯৩৩ সনের শেষাশেষি আমেরিকায় একখানা বই বাহির হইয়াছে। তাহার ভিতর আছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সমাজ-বীমা বিষয়ক সকল প্রকার সংবাদ ও আইন। বইয়ের নাম "ইন্‌সিকিওয়িটি" (বা অনিশ্চয়তা)। এক কথায় ইহার নাম "আপদ-বিপদ" বলিতে পারি। মানুষের জীবনে যতপ্রকার দুঃখ জুটিতে পারে, সেই সম্বন্ধে মার্কিণ নরনারীকে সজাগ করিয়া দেওয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্য। লেখকের নাম আব্রাহাম এপ্‌ষ্টাইন।

আমেরিকায় ঘটনাচক্রে জার্ম্মাণি, বিলাত ইত্যাদি দেশের মতন আজও সমাজ-বীমা বিশেষ বিকাশলাভ করে নাই। ভারতে আমরা এই হিসাবে প্রকারান্তরে মার্কিণের "কাছাকাছি" আছি। কাজেই এপ্‌-ষ্টাইনের আলোচনাপ্রণালী বাঙালীর পক্ষে কাজে লাগিবে। গ্রন্থকার মার্কিণ জাতিকে এই সম্বন্ধে কর্ত্তব্য শিখাইতেছেন। তাঁহার যুক্তিগুলা আমাদেরও যুক্তি। তবে মার্কিণ মজুর চাষী ও কেরাণীর "দারিদ্র্য" (আর আপদবিপদ) এবং ভারতীয় চাষী-কেরাণী-মজুরের "দারিদ্র্য" আর আপদবিপদ একগোত্রের জিনিষ নয়।

গ্রন্থের সূচীপত্র নিম্নরূপ :—

১। অনিশ্চয়তা ও সমাজবীমা।

২। যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবীমার দরকার আছে কি না?

৩। বেকার সমস্যা।

৪। বেকার-চিকিৎসায় হাতুড়্যেগিরি।

৫। বেকার-বীমায় "স্বাধীন" ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা।

৬। ব্যাধিবীমা।

৭। বার্দ্ধক্য এবং দৈহিক অক্ষমতা ও কর্ম্মপঙ্গুত্ব।

৮। দৈব ও মজুরের ক্ষতিপূরণ।

৯। বিধবা ও অনাথবীমা।

১০। আমেরিকার দায়িত্ব জাগরণ।

এপষ্টাইন্ পূর্ব্বে বার্দ্ধক্যবীমা সম্বন্ধে তিনখানা বই লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের মাথায় আছে আমেরিকাকে মজবুদ করিবার ধান্ধা। তিনি খোলা মাঠে দাঁড়াইয়া বাড়ীঘরের ছাদ হইতে চীৎকার করিয়া মার্কিণ নরনারী, মার্কিণ রাষ্ট্রিক আর মার্কিণ গবর্মেণ্টকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যবোধ জাগাইয়া তুলিতেছেন। এই জন্য ইয়োরোপের দেশে দেশে যে ধরণের আইন-কানুন আছে সেই সব সুবিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে।

বেকার-বীমায় ইয়োরোপ বনাম আমেরিকা

সমাজবীমার নানাকথা "আর্থিক উন্নতি"র বহুসংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। বাঙালী সুধীরা এই দিকে নজর ফেলিতে সুরু করুন। ইংরেজী ভাষায় সমাজবীমা বিষয়ক বই ঢুঁড়িতে হইলে প্রধানতঃ মার্কিণ সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হয়। সম্প্রতি আমেরিকার

ন্যাশন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল কন্‌ফারেন্স বোর্ড হইতে দুইখানা কেতাব বাহির হইয়াছে। কেতাব দুইটা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের লেখা নয়। বোর্ডের বিশেষজ্ঞ-দপ্তর হইতে তৈয়ারি করানো হইয়াছে। জেনীভার লীগ অব্‌ নেশ্যন্‌স্‌ হইতেও এই ধরণেরই বেনামী বিশেষজ্ঞ-দপ্তরের লেখা বই বাহির হইয়া আসে।

একটা বইয়ের আলোচ্য বস্তু বেকারদের ভাতা। আগেকার দিনে অর্থশাস্ত্রীরা বেকার-সমস্যাটার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে বেশী যত্ন লইতেন। একালে আর স্বরূপ-বিশ্লেষণ তত মারাত্মক কাণ্ড বিবেচিত হয় না। বিশেষতঃ বেপারীরা আর কারখানার মালিকেরা বেকার-কাণ্ডের ব্যাখ্যায় সময় কাটাইতে প্রস্তুত নয়। বর্ত্তমান জগতে বেকার-কাণ্ড অবশ্যম্ভাবী সামাজিক তথ্য এইরূপ প্রথম হইতে স্বীকার করিয়া লওয়া বণিক-শিল্পীদের দস্তুর। মার্কিণ বোর্ডের বিশেষজ্ঞরাও তাহাই করিয়াছেন। আজকালকার আসল আলোচ্য বিষয় হইতেছে বেকার-ব্যধির দাওয়াই। বেকার-নিবারণের অথবা বেকার-চিকিৎসার কিম্বা বেকার-মেরামতের কর্ম্মকৌশল ঢুঁড়িয়া বাহির করা একালের অর্থশাস্ত্রী ও বেপারী-মহাজনের প্রধান ধান্ধা।

কর্ম্মকৌশল আলোচনা করিতে যাইয়া মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা একটা বড় প্রশ্ন তুলিয়াছেন। প্রশ্নটা অবশ্য অনেক দিনের পুরাণা প্রশ্ন। তবে সেই প্রশ্ন আজও জবররূপেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে,—বিশেষতঃ আমেরিকায়। বেকার-চিকিৎসার দায়িত্ব কাহার? ব্যক্তির না গবর্মেণ্টের? লোকেরা নিজ নিজ দায়িত্বে বেকার-সমস্যার মীমাংসা করিবে? না গবর্মেণ্টের তদবিরে বেকার-নিবারণের অথবা বেকার-চিকিৎসার আয়োজন কায়েম করা হইবে? বিলাত প্রথম হইতে সরকারী ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে। ফ্রান্স বহুদিন ধরিয়া ব্যক্তিগত

দায়িত্বের পক্ষে ছিল, এখনো আছে। কিন্তু আজ প্রায় আধা ইয়োরোপে (জার্ম্মাণিতে এবং ইতালিতেও) চলিতেছে বিলাতী কর্ম্মকৌশলের অর্থাৎ সরকারী ব্যবস্থার দিগ বিজয়। কাজেই আমেরিকার ন্যাশন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল কনফারেন্স বোর্ড যেভাবে প্রশ্নটা তুলিয়াছে তাহাতে মার্কিণ নরনারীকে ভাবিতে হইতেছে তাহাদের মধ্যে "ইয়োরোপীয়ান" কর্ম্মকৌশল আমদানি করা যুক্তিসঙ্গত কিনা। সমস্যাটা দাঁড়াইতেছে নিম্নরূপ— "ইয়োরোপ বনাম আমেরিকা"। কেননা বোর্ডের বিশেষজ্ঞরা মোটের উপর ব্যক্তির দায়িত্ব পছন্দ করিতেছেন।

লোকেরা বলাবলি করিতেছে যে, বেকার-বীমার জন্ম হইয়াছে বিলাতে। ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল বেকার-বীমার সাহায্যে কর্ম্মসৃষ্টির ব্যবস্থা করা—কম সে কম্ কর্ম্মক্ষেত্রের স্থিতীকরণ। কিন্তু বিলাতে তেইশ বৎসরের ভিতরও সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশেও হয় নাই। অতএব মার্কিণ মতে ইয়ো-রোপের বেকার-বীমা ফেল মারিয়াছে।

সরকারী গৃহস্থালীর অর্থশাস্ত্র

রাজস্ব-আইন

প্রায় শ' চারেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা রাজস্ববিষয়ক বই বাহির হইয়াছে প্যারিসে। প্রকাশক সিরে কোং। এই আফিস হইতে শার্ল জিদ্-সম্পাদিত "রেভ্যি দেকোনোমী পোলিটিক" নামক ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত জিরো পোআতিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-ফ্যাকাল্টির "দোইআঁ" (অগ্রণী)।

গ্রন্থের নাম "ম্যাম্নুয়েল দ' লেজিসলাসিঅঁ ফিনাঁসিয়্যার" (রাজস্ব-আইনের কেতাব)। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ডে আছে একমাত্র "লে রেস্সুর্স প্যিবলিক" অর্থাৎ সরকারী আয়ের আলোচনা।

সাধারণতঃ লেখকেরা রাজস্ব-বিষয়ক "তত্ত্ব-কথা" বা দার্শনিক বিশ্লেষণ লইয়া গ্রন্থ সুরু করিয়া থাকেন। গ্রন্থের শেষের দিকে খাঁটি বাস্তব তথ্যগুলা দিবার রেওয়াজ। কিন্তু জিরো সাহেব একদম উল্টা পথে চলিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তথ্যগুলাই "প্লাস্ দ'ন্যর" অর্থাৎ সম্মানের ঠাঁই পাইয়াছে। "তত্ত্বাংশ"কে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে পিছনে।

সরকারী আয়গুলার আলোচনায় প্রত্যেক দফা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় এই দুই ভাগে দেখানো হইয়াছে। পল্লীতে এবং শহরে কত টাকা উঠিতেছে এবং পল্লী ও নগরের জন্য কত টাকা খরচ হইতেছে তাহা বেশ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখানো হইয়াছে। প্যারিস শহরের শাসন-

কর্ত্তারা সমবেতভাবে যে সকল কাজকর্ম্ম দ্বারা নরনারীর সেবা করিয়া থাকে তাহার বিশদ বিশ্লেষণটা চিত্তাকর্ষক।

"ফিনাঁস্ লোকাল" (স্থানীয় আয়-ব্যয়) আর "ফিনাঁস্ দেতা" (রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয়) এই দুই দফা স্বতন্ত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু করদাতার পক্ষে এই দুইয়ের প্রভেদ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কেন না ট্যাঁকের উপর তলব পড়ে দুইয়ের ডাকেই সমান প্রণালীতে। কাজেই জিরো এই দুই দফার চুলচেরা পার্থক্য করিতে রাজি নন।

সকল দিক হইতেই গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালী ভারতীয় বিজ্ঞান-সেবীর অনুকরণীয়।

বৃটিশ ও জার্ম্মাণ আয়কর

অনেকদিন হইতেই জার্ম্মাণির রাজস্ব-সংস্কারকেরা ইংরেজ কর-নীতির তারিফ করিয়া আসিতেছেন। কম-সে-কম আয়কর আদায় করিবার বৃটিশ প্রথাটা জার্ম্মাণ সমাজে চালাইবার স্বপক্ষে অনেক পণ্ডিতই মত দিয়াছেন।

বিলাতী প্রথার অন্যতম ভক্তরূপে ডীট্‌ৎসেল সুপরিচিত। বিশ্বযুদ্ধ থামিবার পরের বৎসর,—১৯১৯ সনে, ডীট্‌ৎসেলের লেখাগুলা "ফারাইন ফ্যির সোৎসিয়ালপোলিটিক" (সামাজিক রাষ্ট্রনীতি পরিষৎ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্গত হইয়া বাহির হয়। ডীট্‌ৎসেল বলেন—"ঠিক যেখানে-যেখানে কোনো আয়ের উৎপত্তি হয় ইংরেজ গবর্মেণ্ট ঠিক সেইখানেই কর বসাইতে অভ্যস্ত। কিন্তু জার্ম্মাণ সমাজে এই নিয়ম প্রচলিত নয়। এই নিয়ম কায়েম করিলে আয়-কর সম্বন্ধে জার্ম্মাণিতে সুবিচার ঘটিতে পারিবে।"

সরকারী খাজনার সঙ্গে অন্যান্য প্রশ্ন ও জড়িত। খাজনার ভারটা

সকল দেনাদারের পক্ষে "সমান" কি না? এই প্রশ্ন রাজস্ব-প্রথায় বড় ঠাঁই অধিকার করে। অধিকন্তু, যে-যে লোক কোনো প্রকার কর দিতে আর্থিক হিসাবে অসমর্থ তাহাদিগকে রেহাই দিবার রেওয়াজ অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই আছে। এই হিসাবে জার্ম্মাণরা ইংরেজের নিকট কিছু শিখিতে পারে কিনা তাহাও আজকাল জার্ম্মাণিতে আলোচিত হইতেছে।

সকল কথা তলাইয়া-মজাইয়া বুঝিবার জন্য ফ্রান্‌ৎস্ মাইজেল এক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (১৯২৫)। কেতাব প্রকাশিত হইয়াছে ট্যিবিঙ্গেন হইতে মোর কোম্পানী কর্ত্তৃক। প্রায় শ'পাঁচেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। "বৃটিশে উণ্ড ড্যয়চে আইনকোমেন-ষ্টয়ার" গ্রন্থে দুইদেশের আয়কর-প্রথা তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে। তুলনার দফা প্রধানতঃ দুই:—(১) আয়-করের "মোরাল" অর্থাৎ ন্যায়ান্যায়, যৌক্তিকতা বা সমাজ-নীতি এবং (২) আয়-করের "টেখ্‌নিক" অর্থাৎ আদায়-প্রণালী।

বিলাতে কর উশুল করা হয় আয়ের উৎপত্তিস্থলে। কিন্তু জার্ম্মাণিতে (এবং অষ্ট্রিয়ায় ও পুরাতন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি হইতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে) আয়কর আদায় করা হয়,—আয়টা লোক-জনের পকেটস্থ হইবার পরে। বিলাতী প্রথায় আফিসে বা কর্ম্মকেন্দ্রেই কর্ম্মচারীদের বেতন হইতে আয়-কর কাটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। চাকুরেরা দেয় টাকাটা স্পর্শ করিবার সুযোগই পায় না। আর জার্ম্মাণ প্রথায় আয়-কর-দেনেওয়ালা লোকেরা নিজ নিজ ট্যাঁক হইতে গণিয়া খাজাঞ্চির আফিসে কর সমঝিয়া দিয়া আসিতে অভ্যস্ত। এই প্রথাই মোটের উপর সমগ্র মধ্য-ইয়োরোপে প্রচলিত।

মাইজেল বলিতেছেন,—"এই জার্ম্মাণ বা মধ্য-ইয়োরোপীয় প্রথাকে নেহাৎ নিন্দনীয় বিবেচনা করা উচিত নয়। ইহার ভিতরেও অনেক

সু আছে। প্রথমতঃ, খাজনার পরিমাণ এই প্রথায় বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ, করদাতার সংখ্যা বাড়িয়া চলে। তৃতীয়তঃ, আয়ের পরিমাণ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর হারে কর বসাইবার ব্যবস্থা করা যায় অপেক্ষাকৃত সহজে। চতুর্থতঃ, প্রত্যেক কর-দাতার সকল প্রকার আর্থিক অবস্থা বুঝিয়া-শুনিয়া করের হার বা পরিমাণ ধার্য্য করা সম্ভব।"

মোটের উপর,—জার্ম্মাণ প্রথায় খাজনা উশুল হইতে পারে বেশী। কিন্তু এই প্রথার অসুবিধাও কম নয়। কর-সংগ্রাহকের হাত এড়াইয়া পার পাইতে পারে অনেকে। এই দোষ অষ্ট্রিয়ার রাজস্ববিভাগে প্রচুর দেখা যায়। অষ্ট্রিয়ান খাজাঞ্চিখানার অঙ্ক-তালিকায় দেখিতে পাই যে, যেসব লোক বাঁধা মাহিয়ানা পায় তাহাদের নিকট হইতে আয়-কর বেশ নিয়মিতরূপে এবং আইন-মাফিকই আদায় হয়। কিন্তু জমিজমার মালিকেরা কর দান হইতে সহজেই আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। আর ফ্যাকটরি-কারখানা-ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের মালিকেরাও এই বিষয়ে খুব হুসিয়ার। এই দুই শ্রেণীর কর-দাতার নিকট হইতে যত আদায় হয় তাহা বাঁধা-মাহিয়ানা-ভোগী চাকুর্‌য়েদের নিকট হইতে আদায়-করা খাজনার তুলনায় আপেক্ষিক হিসাবে অনেক কম।

অষ্ট্রিয়ার কথা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা প্রদেশ সম্বন্ধেও খাটে। এই সকল দেশে কিষাণ-জমিদারেরা এবং শিল্প-বাণিজ্যের স্বত্বাধিকারীরা অষ্ট্রিয়ার তুলনায় পরিমাণে কিছু-বেশী আয়-কর দেয়। কিন্তু সমগ্র রাজস্ব-তহবিলে বেতন-ভোগী চাকুর্‌য়েদের নিকট হইতে আদায়-করা আয়-করের হিস্যাই শতকরা হিসাবে বেশী। বুঝিতে হইবে, অন্যান্য শ্রেণীর করদাতারা গবর্মেণ্টকে ফাঁকি দিয়া আসিতেছে।

এই সকল ফাঁকিবাজির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মধ্য-ইয়োরোপীয় প্রথায় আয়-কর পরিমাণে খুব বেশীই দেখা যায়। কাজেই মাইজেল এই

প্রথাকে মোটের উপর সুনজরে দেখিতেই প্রস্তুত। তবে তাঁহার মতে এই বিষয়ে কঠোরতর আইন কায়েম হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু, আদালতের বিচারেও কথঞ্চিৎ বেশী পরিমাণে সাজা দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বিলাতী আয়-করের ব্যবস্থা দফায়-দফায় আলোচনা করিয়া মাইজেল জার্ম্মাণির ব্যবস্থার স্থ-কু দেখাইয়াছেন। ইংরেজ খাজাঞ্চি-খানায় "ক" শ্রেণীর করদাতাদের ভিতর পড়ে ভূমির মালিক। জমিদারী, গির্জ্জা-সম্পত্তি, এবং বিভিন্ন দেবোত্তর, "বিদ্যোত্তর" ইত্যাদি নানা প্রকার জমিজমার আয় হইতে প্রাপ্ত কর এই শ্রেণীর সামিল। মাইজেলের মতে,—বাড়ীঘর, ইমারত ইত্যাদি হইতে ইংরেজ সমাজের আদায় বেশ প্রচুর। আর চাষ-আবাদ, জমিজমা হইতে বৃটিশ গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়ান এবং অন্যান্য মধ্য-ইয়োরোপীয় গবর্মেণ্টের চেয়ে অনেক বেশী আদায় করিয়া থাকে।

তবে এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। ইংরেজ সমাজে জমিদারী হইতে আয়-কর এত বেশী উঠে কেন? মধ্য-ইয়োরোপে বর্ত্তমানকালে এবং আজকালকার ভূমি-ব্যবস্থায় আসল জমিদার,—অর্থাৎ বিপুলবিস্তৃত ভূখণ্ডের মালিক নামক শ্রেণী এক প্রকার নাই। কিষাণেরা স্বয়ংই জমিদার; অথবা জমিদারেরা স্বয়ংই নিজ নিজ জমিজমা মজুরের সাহায্যে চষাইয়া ধনদৌলত সৃষ্টি করিতে অভ্যস্ত। রাইয়ত, প্রজা ইত্যাদি বলিলে যে শ্রেণীর লোক বুঝা যায় তাহার সংখ্যা নেহাৎ কম। এই শ্রেণী উঠিয়া যাইতেছে বা গিয়াছে বলিলেও চলে। কিন্তু বিলাতে জমিদার-রাইয়তের সম্বন্ধ এখনো অটুট রহিয়াছে। সেদেশে ভূম্যধি-কারীদের নিকট হইতে জমি ভাড়া করিয়া লইয়া চাষীরা আবাদ চালাইতে অভ্যস্ত। জমিদারেরা চাষের ধার ধারে না। তাহারা ভাড়া-

দেওয়া জমির জন্য "প্রজা"দের নিকট হইতে খাজনা ভোগ করিয়া থাকে।

সুতরাং জমিজমা সম্বন্ধে বৃটিশ ও জার্ম্মাণ আয়-করের প্রভেদ দেখিবার সময়ে স্বভাবতই সন্দেহ উপস্থিত হয়,—প্রভেদটা কি রাজস্ব-নীতির প্রভেদের ফল? বোধ হয় ভূমি-ব্যবস্থা এবং জমিজমার আইন-কানুনকেই এই প্রভেদের আসল কারণ বিবেচনা করিলে বিষয়টা ঠিক বুঝা হইবে।

"খ" শ্রেণীর কর-দাতা হইতেছে রাইয়ত, প্রজা বা চাষীরা। জমিদারকে যে পরিমাণ খাজনা দেওয়া হয় তাহার মাপে গবর্মেণ্ট রাইয়তদের নিকট হইতে কর আদায় করে। মাইজেল বলেন,—"এই প্রণালীতে করটা আদায় করা সহজ। আর আদায়টা নিশ্চিতও বটে। কিন্তু মোটের উপর আদায়ের পরিমাণ অল্প।"

ইংরেজ আয়-করের "গ" শ্রেণীতে পড়ে সকল প্রকার সুদ। এই উপলক্ষ্যে লগ্নি-কারবারের, ব্যাঙ্কে জমা-রাখার, কোম্পানীর কাগজের এবং এই ধরণের অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট আয়যুক্ত সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করা তহশিলদারদের কার্য্য। গবর্মেণ্ট দেশের নরনারীর নিকট হইতে যে সকল সরকারী কর্জ্জ লয় তাহার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক সুদ ভোগ করা কর্জ্জদাতাদের জীবনে একটা ছোট কথা নয়। বড় বড় নগরশাসক-সঙ্ঘও এইরূপ কর্জ্জ লইতে এবং সুদ দিতে অভ্যস্ত। প্রায় সকল সুদের উপরই গবর্মেণ্টের খাজনা আদায় করিবার দস্তুর আছে।

সুদের উপর কর বসাইতে যাইয়া ইংরেজ গবর্মেণ্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কেন না, ঠিক যে-যে কর্ম্মকেন্দ্রে সুদ জমা হইতেছে সেই সকল কর্ম্মকেন্দ্রের কর্ত্তারা কর্জ্জদাতাদের সুদের হিস্যা হইতে কর কাটিয়া রাখিয়া গবর্মেণ্টকে সমঝাইয়া দেয়।

যে সকল লোক বাঁধা মাহিয়ানা বা পেন্‌শ্যন পায় তাহারা এক স্বতন্ত্র "ঙ" শ্রেণীর অন্তর্গত। মধ্য-ইয়োরোপে এই দফায় যত আয়-কর আদায় হয় বিলাতে তত হয় না। ইংরেজ-সমাজে সরকারী চাকুর্‌য়েদের শাসন সম্বন্ধে উপরওয়ালারা যথোচিত পরিমাণে যত্নশীল নয়। জার্ম্মাণিতে কড়াক্কড়ি খুব বেশী। এই কারণে জার্ম্মাণিতে আদায় হয় বেশী। মাইজেলের মতে এই দফা সম্বন্ধে বিলাতের নিকট জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের নতুন-কিছু শিখিবার নাই।

"ঘ" শ্রেণীর আয়কর দেয় বণিকেরা, শিল্পীরা এবং খনিওয়ালারা। করটা আদায় করা বিলাতের মামুলি প্রণালীতে অসম্ভব। কেন না,—এইসকল ক্ষেত্রে "ধনের উপত্তিস্থলে" কর বসানো সহজ কথা নয়। কারখানা, ব্যবসা ও খনির স্বত্বাধিকারীরা নিজ নিজ কারবারের ভাল-মন্দ যেমন রিপোর্ট দেয় গবর্মেণ্ট তাহারই উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, আসল খবর পূরাপূ্রি জানা যায় না। অধিকন্তু, দেশের ভিতরকার কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা কোম্পানী কর দিতে বাধ্য তাহার তালিকা আজও সম্পূর্ণ নয়। কাজেই "ঘ" দফায় বৃটিশ গবর্মেণ্টের হাত হইতে ফসকিয়া যায় অজস্র টাকা। মাইজেলের মতে, প্রুশিয়ায় জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা গবর্মেণ্টকে যতটা ঠকাইতে পারে, বিলাতের গবর্মেণ্টকে ইংরেজ কারবারীরা তাহার চেয়ে বেশী ঠকাইয়া থাকে।

খুঁটিয়া-খুঁটিয়া দফায়-দফায় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে,—ইংরেজের আদায়-প্রণালীটাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ঠাওরানো উচিত নয়। তাহার ভিতর গলদ রহিয়াছে অনেক। কাজেই চোখ-কান বুজিয়া ইংরেজের প্রণালী হুবহু নকল করিবার বিরুদ্ধে মাইজেল রায় দিতেছেন।

একটা অসুবিধার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আজ-

কালকার দিনে আয়ের পরিমাণ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়াইয়া দিবার রীতি সর্ব্বত্র অল্প-বিস্তর চলিতেছে। ইহাকে "প্রোগ্রেসিভ্" (বর্দ্ধনশীল) করাদান বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিলাতের মতন দেশে,—যেখানে আয়ের উৎপত্তিস্থলে কর আদায় করা দস্তুর, সেখানে এই বর্দ্ধনশীল প্রথা কায়েম করা খুবই কঠিন। কেননা, অনেক ব্যক্তির আয় আসে এক সঙ্গে বহু ক্ষেত্র হইতে। এই ভিন্ন ভিন্ন আয়ের কেন্দ্রে তাহাদের কর দিবার যথার্থ ক্ষমতা পূরা মাত্রায় আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তির সকল প্রকার আয় একত্র হইবার পর আসল ঐশ্বর্য্য এবং সমাজ দেশ বা গবর্মেণ্টকে কর দিবার খাঁটি ক্ষমতা বুঝিতে পারা যায়।

তথাপি ইংল্যাণ্ডে "প্রোগ্রেসিভ্" প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল কি করিয়া? মাইজেলের মতে কারণটা ঢুঁড়িতে হইবে দুনিয়ার বর্ত্তমান ঝোঁকের ভিতর। বিশ্বশক্তি আজকাল সমাজতন্ত্রের প্রভাবে ধনীদের ধনদৌলতের উপর আক্রোশশীল। বিলাতের গবর্মেণ্টও এই সোশ্যালিজ্‌মের দিগ্বিজয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

কিন্তু এখন আর বিলাতের সেই ইংরেজ-সুলভ, সনাতন "উৎপত্তি-স্থলে করাদায়"-নীতি অটুট থাকিতে পারে কি? পারে না;—ইংরেজদের রাজস্ব-দক্ষ পণ্ডিতেরা "উৎপত্তিস্থলের" মায়া কাটাইয়া ক্রমশঃ ব্যক্তিমাত্রের "সমগ্র আয়"টার হিসাব করিবার দিকে ঝুঁকিতেছেন। আর যেই সমগ্র আয়ের কথা ভাবা হইতেছে তখনই প্রকারান্তরে ইংরেজ সমাজ জার্ম্মাণ রাজস্ব-নীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে না কি? তাহা অবশ্য এখনো ভবিষ্যতের কথা। ইংল্যণ্ডের রাজস্ব-সংস্কারকদের মাথার ভিতর এইসকল চিন্তা খেলিতেছে।

ইংরেজ সমাজ জার্ম্মাণ-ঘেঁসা হইতে চলিল বটে। কিন্তু জার্ম্মাণ

সমাজেরও আবার ইংরেজ-ঘেঁসা না হইয়া উপায় নাই। মাইজেলের মতন ভবিষ্যপন্থী জার্ম্মাণ রাজস্বশাস্ত্রীরা বলিতেছেন,—"জার্ম্মাণ খাজাঞ্চিখানার শাসনে আইনকানুনের আওতা যতটা দেখিতে পাই, ধনবিজ্ঞানের প্রভাব ততটা নাই। কিন্তু ইংরেজরা আর্থিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি আল্‌গা-আল্‌গা করিয়া বিশ্লেষণ করিতে সুপটু। জার্ম্মাণিতে এই আর্থিক বিশ্লেষণ-দক্ষতা আমদানি করা আবশ্যক।"

জার্ম্মাণিতে আজকাল যে-সব "প্রত্যক্ষ" (ডাইরেক্‌ট) কর আছে সেগুলাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া "অপ্রত্যক্ষ" (ইন্‌ডাইরেক্ট) করে পরিণত করিবার দিকে ভবিষ্যপন্থীরা ঝুঁকিতেছেন না। প্রত্যেক আয়ের দফা যাহাতে চুলচেরা করিয়া বিশ্লেষণ করা হয় তাহার দিকে গবর্মেণ্টের নজর আনা জার্ম্মাণ রাজস্ব-সংস্কারকদের মতলব। তাঁহাদের মতে ধনোৎপাদনের আকার-প্রকারগুলা,—শাখায় শাখায়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর্থিক কর্ম্মদক্ষতার তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহার জন্য কোনো বিপুল দপ্তরের দরকার হইবে না। চাই কেবল ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌-বিদ্যায় অভিজ্ঞ কয়েকজন মাথাওয়ালা ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিতের সমবেত কর্ম্ম। তাঁহাদের সাহায্য পাইলে গবর্মেণ্ট আয়করের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে অর্থকরীরূপে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে।

সোভিয়েট শাসনের আর্থিক দরদ

রুশ গবর্মেণ্ট ৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা বিপুল বই বাহির করিয়াছেন। কেতাবটা ফরাসী ভাষায় লিখিত। নাম "আন্নুয়্যার পোলিটিক এ একোনোমিক পুর লানে ১৯২৫।২৬" (১৯২৫।২৬ সনের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক পঞ্জিকা)। বইখানা টেক্‌ষ্ট্‌ বুকের মতন করিয়া গিলিবার উপযুক্ত। বাজে বক্তৃতা অথবা প্রপাগাণ্ডা,—যথা কমিউনিজমের গুণগান ইত্যাদি মাল আগাগোড়া বর্জ্জিত হইয়াছে। আমরা "ইম্পীরিয়্যাল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থাবলীর ভারতবিষয়ক ভৌগোলিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক এই তিন খণ্ডে যে সকল তথ্য পাই সেই শ্রেণীর তথ্যই এই রুশ বর্ষ-পঞ্জীতে আছে। রুশিয়া সম্বন্ধে না জানিয়া-শুনিয়া আবল-তাবল বকিবার লোক দুনিয়ার সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ভারতেও অবশ্য দেখিতে পাই। অধিকন্তু দু'চার জন রুশিয়ার স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষীয় ইংরেজ বা মার্কিণ পর্য্যটকের—এক কাঁচ্চা তথ্য-মূলক আর বাকীটা উচ্ছ্বাসমূলক—বই পড়িয়া ভারতবাসী রুশ-ক্ষুধা মিটাইতে অভ্যস্ত। এই অবস্থায় "আন্নুয়্যার"খানা আমাদের উচ্চ-শিক্ষিত সাহিত্য-সেবী, কাউন্সিল-সভ্য, কংগ্রেস-সভ্য, সাংবাদিক ও ধনবিজ্ঞানসেবক ইত্যাদি নরনারীর হাতে পড়িলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

দেশটার নাম

বইটা বড় বড় চার অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে আছে সোভিয়েট রুশিয়ার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও লোক সংখ্যা। মার্কিণ

যুক্তরাষ্ট্রের স্বদেশী নাম যেমন ইউ, এস্, এ (সংক্ষেপে) সেইরূপ নবীন রুশিয়ার জন্মদাতারা তাহাদের সন্তানকে "ইউ, আর, এস, এস্" নাম দিয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত নামের পূরা অর্থ "ইউনিয়ন" "রিপাব্লিক" "সোশ্যালিষ্ট" "সোভিয়েট অর্থাৎ সোশ্যালিষ্টধর্ম্মী সোভিয়েট শাসনমূলক রিপাব্লিকান যুক্তরাষ্ট্র। ইহার ভিতর "রুশিয়া" শব্দটাই নাই। অতএব মার্কিণ মুল্লুককে যদি আমরা বাংলা দেশে সহজে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অথবা মাত্র যুক্তরাষ্ট্র বলিতে অধিকারী হইতে পারি তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়াকেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বলা চলিতে পারে।

রুশ ও অ-রুশ

১৯২৫ সনের আদমসুমারিতে রুশ যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটি ৯৭ লাখ ৫৩ হাজার ৯০০। তাহার ভিতর পল্লীবাসী প্রায় ১১ কোটি ৬৭ লাখ আর নগরবাসী মাত্র ২ কোটি ২৯ লাখ।

রুশিয়ায় রুশ "জাতীয়" বা রুশ "রক্তের" (?) লোক ছাড়াও বিস্তর অ-রুশ নরনারীর বাস। রুশ-"জাতি" বা রুশ-রক্তের লোক বলিলে বড়-বড় তিন জাতি বা উপজাতি বুঝায়,—(১) মহারুশ (২) উক্রেণ আর (৩) শ্বেতরুশ। মান্ধাতার আমলে,—অর্থাৎ বাদশাহী রুশিয়ায়,—যথা ১৮৯৭ সনের আদমসুমারিতে এই তিন জাতীয় "খাঁটি" রুশরক্তওয়ালা লোকের প্রায় আধাআধি ছিল অ-রুশ জাতীয় লোকের সংখ্যা। অনুপাত নিম্নরূপ:—রুশ ৬৫·৫% আর অ-রুশ ৩৫·৫%।

বোলশেভিক রুশিয়ায় অ-রুশ নরনারীর সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। তাহারা অনেকে লাগাও দেশের বাসিন্দা রূপে স্বাধীনতা লাভ

করিয়াছে। ফলতঃ সোভিয়েট রুশিয়ার রক্তমাংস প্রধানতঃ রুশ। ১৩ কোটি ৯৭ লাখ নরনারীর শতকরা ৭৮·২ জন খাঁটি রুশ (আগে যেখানে ছিল ৬৫·৫ মাত্র)। আজকাল অ-রুশ জাতীয় রুশিয়ার বাসিন্দা হইতেছে শতকরা ২২·৮ জন।

রুশিয়ার অ-রুশ জাতি বলিলে প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর লোক বুঝা যায়:—(১) শ্লাভ জাতীয় লোক, যথা পোল, এস্‌থোনিয়ান, লেট, রুমেণিয়ান ইত্যাদি। এই সব লোক পূর্ব্বে ছিল রুশ জনসংখ্যার শতকরা ৯·৬। আজ শতকরা দাঁড়াইয়াছে ০·৮ মাত্র। (২) ইহুদি। জারের রুশিয়ায় ইহুদিরা ছিল শতকরা ৪। এক্ষণে সংখ্যা হইয়াছে শতকরা ১·৮। (৩) ফিন। ইহাদের সংখ্যা শতকরা ৪·৫ হইতে ৩·৩ এ নামিয়াছে। (৪) জার্ম্মাণ। আজকাল শতকরা ০·৯ মাত্র। পূর্ব্বে ছিল ১·৪। (৫) এশিয়ান—যথা তাতার, কির্গীজ, কালমুক, মোগল ইত্যাদি। ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে ছিল শতকরা ১০·৭। আজকাল রুশিয়ার অধিবাসীর ১০০ জনের ভিতর ১২ জনই এশিয়ান (বৌদ্ধ-মুসলমান)। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে এশিয়ান সমস্যা একটা গুরুতর চিজ।

ছয়টা রিপাব্লিক

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্রগড়ন। শাসন ও নির্ব্বাচন-প্রণালী এই অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্য বিষয়। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-বিষয়ক ও রাষ্ট্রীয় জনপদ।

এই শাসন-বিষয়ক জনপদগুলা সহজে বুঝিয়া উঠা যে-সে লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ইউ, আর, এস, এস হইল সমগ্র দেশটার নাম।

কিন্তু এই ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্র একটা ফেডারেশুন বিশেষ। এই ফেডারেশুনের প্রত্যেক জনপদ স্বরাজশীল। জনপদগুলা প্রত্যেকেই আবার কতকগুলা স্বরাজশীল কেন্দ্রের এক একটা ফেডারেশুন।

দেশটার নামের গায়ে লেখা আছে রিপ্লাবিক। ইউ, আর, এস, এস ছয়টা রিপাব্লিকের ইউনিয়ন। এই রিপাব্লিকগুলার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

১। রুশ সোভিয়েটের সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিক। এইটার মানে বুঝা অতি কঠিন। সহজে বলা যাইতে পারে যে, এই জনপদে "মহারুশ" নামক জাতির বাস। লোকসংখ্যা ৯ কোটি ৬৭ লাখ ৪৬ হাজার ৩০০। অর্থাৎ সমগ্র ইউনিয়নের শতকরা ৬১·৮ জন লোক এই জনপদের বাসিন্দা।

এই জনপদটা বড় বড় দুই ভাগে বিভক্ত। উপবিভাগ সহ এই দুই বিভাগ নিম্নরূপ :—

(ক) ইয়োরোপীয়ান অংশ :—(১) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল (এই অঞ্চলে লেনিনগ্র্যাড অবস্থিত), (২) উত্তরপূব অঞ্চল, (৩) মধ্য শিল্প-জনপদ (এই অঞ্চলে মস্কো আর নিশ্‌নি-নভগরদ বড় শহর), (৪) ভিয়াৎকা আর ভেৎলুগা অঞ্চল, (৫) ভলগা অঞ্চল, (৬) মধ্য কৃষি-জনপদ, (৭) উরাল পাহাড়ী অঞ্চল, (৮) উত্তর ককেসাস অঞ্চল, (৯) দাগেস্তান, (১০) ক্রিমিয়া।

(খ) এশিয়ান অংশ :—(১) সাইবিরিয়া, (২) কির্গীজ, (৩) প্রাচ্যতম অঞ্চল (আমুর-বৈকালের অপরপার, সমুদ্রের কিনারা, সাগালিয়েন দ্বীপ)।

এই ১৩টা জনপদ, অঞ্চল বা প্রদেশের কোনোটা রিপাব্লিক নামে পরিচিত, কোনোটা "রিজ্যন" বা মামুলি জনপদ। "রিজ্যন" বলিলে

সাধারণ আভ্যন্তরীণ স্বরাজশীল মুল্লুক বুঝিতে হইবে। "রিপাব্লিক" নামে যে সকল মুল্লুক পরিচিত সেই সকল মুল্লুকের ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ স্বরাজের চেয়েও বেশী। এইগুলা মামুলি স্বায়ত্ত-শাসন ছাড়াও অনেকটা খাঁটি স্বাধীনতা ভোগ করে। এইজন্য তাহাদের কেন্দ্র-কমিটি আর জনগণের "কমিসার"-সভা আছে।

২। উক্রেণ রিপাব্লিক।

৩। শ্বেতরুশ রিপাব্লিক।

৪। "ককেসাস পাহাড়ের অপর পার" রিপাব্লিক। এই জনপদ তিনটা রিপাব্লিকের ফেডারেশ্যন,—যথা (১) আজরবেজান (২) জর্জ্জিয়া (৩) আর্মিণিয়া।

৫। উজ্‌বেকিস্থান (প্রধাননগর সমরকন্দ)

৬। তুর্কমেনিস্থান।

সাতটা কমিসার-সভা, উনিশ জন প্রেসিডেণ্ট

ভারতবাসীর পক্ষে রুশিয়ার শাসন-প্রণালী বুঝিতে হইলে প্রথমে ইউ, আর, এস, এস্ এর গবর্মেণ্টকে ভারতগবর্মেণ্টের অনুরূপ কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা হইলে এই ছয়টা রিপাব্লিক বাঙ্‌লা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ইত্যাদি প্রদেশের অনুরূপ দাঁড়াইবে। অধিকন্তু বুঝিতে হইবে যেন বঙ্গীয় সোভিয়েট রিপাব্লিকের বা পাঞ্জাবী সোভিয়েট রিপাব্লিকের যে সব জেলা তাহার ভিতর কোনোটা "রিপাব্লিক" আর কোনোটা "রিজ্যন"। অর্থাৎ প্রত্যেক জেলাই পুরামাত্রায় সমান-সমান আত্মকর্ত্তৃত্বশীল নয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা দরকার। কল্পনা করিতে হইবে যেন বাঙ্‌লা রিপাব্লিকের প্রতিনিধি গিয়া ভারত-

গবর্মেণ্টে বসিতেছে। আবার ভারত-গবর্মেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ বিভাগের পাঁচ প্রতিনিধি বঙ্গীয় শাসন-পরিষদে আসিয়া বসিতেছে। এই ধরণের ফেডারেশ্যন-প্রণালী জগতে অদ্বিতীয়।

প্রত্যেক রিপাব্লিকের শাসন-পরিষৎকে "সেণ্ট্রাল একৃসেকিউটিভ কমিটি" বলে। ভারতীয় পরিভাষায় ইহার নাম প্রদেশে-প্রদেশে "একৃসেকিউটিভ কাউন্সিল"। কমিটির মাথায় প্রেসিডেণ্ট, আমাদের যেমন ছোট লাট, গবর্ণর ইত্যাদি। তবে এই কমিটির সকল সভ্যাই সোভিয়েট কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত। পরিভাষায় মন্ত্রি-সভাকে বলে জনগণের "কমিসার-সভা।" এই কমিসার-সভার সভ্যেরা প্রাদেশিক শাসন-পরিষৎ বা সেণ্ট্রাল একৃসেকিউটিভ কমিটি কর্ত্তৃক বাহাল করা লোক। এই প্রণালী ছয়টা রিপাব্লিকের প্রত্যেকটা সম্বন্ধেই খাটে।

ছয় রিপাব্লিকের যে ফেডারেশ্যন অর্থাৎ ইউ, আর, এস, এস (আমাদের ভারত-গবর্মেণ্ট) তাহাতেও জনগণের কমিসার-সভা বসে। অতএব বুঝিতে হইবে রুশিয়ায় আজকাল সাতটা স্বতন্ত্র কমিসার-সভা চলিতেছে,—আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক প্রদেশেই একটা করিয়া মন্ত্রিসভা আছে। এইগুলা অবশ্য লেজিস্লেটিভ আসেম্ব্লি বা কাউন্সিল নয়।

রুশিয়ায় সভাপতি কয়জন? প্রত্যেক কমিসার-সভার একজন করিয়া প্রেসিডেণ্ট। এই গেল ছয় জন। তাহা ছাড়া প্রত্যেক রিপাব্লিকের এক জন করিয়া সেণ্ট্রাল কমিটির বা শাসন-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট। এই গেল ছয় জন। তাহা ছাড়া ইউ, আর, এস্, এস এর কমিসার-সভার একজন প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু মজার কথা এই যে, ইউ, আর, এস্, এস নামক যুক্তরাষ্ট্রের মাথায় সেণ্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেণ্ট বলিয়া কোনো একজন ব্যক্তির ঠাঁই নাই। বুঝিতে হইবে

যেন, ভারত-গবর্মেণ্টের মাথায় বড়লাট নামক কোনো শাসনকর্ত্তা নাই। আছে ছয় ছয় জন প্রেসিডেণ্ট। অতএব রুশিয়ার সভাপতি বা প্রেসিডেণ্ট দাঁড়াইল নিম্নরূপ :—

ছয় রিপাব্লিকের কমিসার-সভার প্রেসিডেণ্ট	৬
,, ,, সেণ্ট্রাল কমিটির ,,	৬
ইউ, আর, এস, এস এর কমিসার-সভার ,,	১
,, ,, ,, সেণ্ট্রাল কমিটির ,,	৬
প্রেসিডেণ্ট সংখ্যা	১৯

রীকফ্ নামক যে ব্যক্তি লেনিনের পর গদিতে বসিয়াছেন সেই ব্যক্তির নেতৃত্ব তাহা হইলে কোথায়? এই ব্যক্তি আমাদের সুপরিচিত বড়লাটও নহেন আর রুশ-পরিচিত "জার" বাদশাও নহেন, মার্কিণ মুল্লুকের বা ফরাসী মুল্লুকের প্রেসিডেণ্টও নহেন, আর বিলাতের রাজাও নহেন। ইনি হইতেছেন ইউ, আর এস, এস নামক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কমিসার-সভার প্রেসিডেণ্ট মাত্র। এমন কি ইনি এই যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট্রাল একসেকিউটিভ কমিটির প্রেসিডেণ্ট ও নন। তবে রীকফ্ আবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রথম নম্বর রিপাব্লিকে অর্থাৎ মহারুশ রিপাব্লিকেরও কমিসার-সভার প্রেসিডেণ্ট।

আর্থিক জীবনের মন্ত্রী ৬৮ জন

জনগণের কমিসার বলিলে আমাদের সুপরিচিত মন্ত্রী বুঝিতে হইবে। এই ধরণের মন্ত্রী প্রত্যেক রিপাব্লিকে ১৬ জন করিয়া। তাহার ভিতর ৫ জন আসে ইউ, আর, এস, এস হইতে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৬ জনের ভিতর ১০ জনই আর্থিক

জীবনবিষয়ক ধান্ধা লইয়া মাথা খেলাইয়া থাকে। এই দশ জন কমিসারের কাজ ও বিভাগ নিম্নরূপ :—(১) দেশোন্নতির অর্থ-নীতি, (২) অন্তর্ব্বাণিজ্য, (৩) কৃষি, (৪) মজুর ও চাষী তদবির, (৫) সমাজ-সেবা, (৬) মজুরির বাজার, (৭) রাজস্ব, (৮) বহির্ব্বাণিজ্য, (৯) ডাক ও তার, (১০) পথঘাট। শেষের তিন বিভাগের কাজের জন্য কমিসার আসে কেন্দ্রগবর্মেণ্ট হইতে।

ছয় রিপাব্লিকে তাহা হইলে ৬০ জন কমিসার আর্থিক ধান্ধায় মোতায়েন আছে। অধিকন্তু কেন্দ্র-গবমেণ্টের (ইউ, আর, এস, এস,) কমিসার-সভায় ৮ জন এইরূপ বিভাগের কর্ত্তা। সমাজ-সেবা আর কৃষি এই দুই ধান্ধা প্রত্যেক রিপাব্লিকের নিজস্ব। কেন্দ্র-গবেমেণ্ট এই দুই দিকে স্বতন্ত্রভাবে মাথা খেলায় না। দাঁড়াইল তাহা হইলে ৬৮ জন আর্থিক মন্ত্রী। প্রত্যেক কমিসারের দপ্তরে আবার আট দশ জন করিয়া বিশেষজ্ঞ বাহাল করা দস্তুর।

আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা। এই জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলা বিবৃত হইয়াছে :—(ক) কৃষিকর্ম্ম ও কৃষিজ মালের রপ্তানি, (খ) বনসম্পদ্।

(গ) শিল্প কর্ম্ম :—(১) কয়লার খাদ, (২) কেরোসিন তেল, (৩) লোহা, মাঙ্গানিজ, সীসা, ক্রোম, রূপা ইত্যাদি ধাতুর খনি, (৪) লবণের কারবার, (৫) মণি-রত্ন, (৬) লোহার কারখানা, (৭) ধাতু-ঘটিত এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরি, (৮) বিজলীর কারখানা, (৯) কাঠের ফ্যাক্টরি, (১০) রাসায়নিক কারখানা, (১১) সীমেণ্ট, কাচ, পোর্সলেন ইত্যাদি, (১২) বয়ন-শিল্প, (১৩) চামড়ার কারখানা, (১৪) খাদ্যদ্রব্যের ফ্যাক্টরি,

(১৫) কাগজের কারখানা, (১৬) ছাপাখানা, (১৭) মাছের কারবার, (১৮) জীবজন্তুর লোম ও ছাল।

(ঘ) বিজলী শক্তির ব্যবহার-বৃদ্ধি, (ঙ) রাজস্ব ও টাকাকড়ি, (চ) বহির্ব্বাণিজ্য, (ছ) শিল্প-বানিজ্যে কন্‌সেশ্যন-নীতি, (জ) অন্তর্ব্বাণিজ্য, (ঝ) সমবায়, (ঞ) রেল, উড়োজাহাজ, খাল-হ্রদ-নদী অটো-মোবিল, সমুদ্র-বাণিজ্য, (ট) ডাক, তার, টেলিফোন, (ঠ) নগর শাসন, (ড) সরকারী বীমাপ্রথা।

চতুর্থ অধ্যায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তথ্য বিবৃত করিতেছে। বিষয়গুলা নিম্নরূপ :—(১) মজুরবিষয়ক আইনকানুন, (২) মজুর-সমিতির ক্রমবিকাশ ও বর্ত্তমান অবস্থা, (৩) বিচার ব্যবস্থা, (৪) শিক্ষাপদ্ধতি, (৫) ধর্ম্মকর্ম্ম, (৬) বিজ্ঞান, সাহিত্য স্থকুমার শিল্প, সঙ্গীত, মিউজিয়াম, থিয়েটার, সিনেমা, সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রকাশ, বইয়ের দোকান, (৭) সর্ব্বজনীন স্বাস্থ্য, (৮) সরকারী সমাজ-সেবা, (৯) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীদের ঠাঁই।

আর্থিক রুশিয়ার বর্ষ-পঞ্চক

জার্ম্মাণির ব্রেসলাও-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান পরিষদের নাম "ওষ্ট-অয়রোপা ইন্‌ষ্টিটুট" অর্থাৎ প্রাচ্য ইয়োরোপ পরিষদ। এই পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক ওটো আউইহাগেন "ডী বিলানৎস্‌ ডেস অ্যাষ্টেন ফ্যিমফ্‌ইয়ার-প্লানেস্‌ ড্যর সোভিয়েট-ভির্ট্‌শাফ্‌ট্" (সোভিয়েট-আর্থিক ব্যবস্থার প্রথম বর্ষপঞ্চকের খতিয়ান) নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বইটা বহির হইয়াছে ১৯৩৩ সনে। ইহার ভিতর আছে অর্থনৈতিক মোসাবিদা অনুসারে কাজ কতটা হইয়াছে তাহার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ ও সমালোচনা। লাভ এবং লোকসান দুই-ই দেখাইতে চেষ্টা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

আজকাল দুনিয়ার সর্ব্বত্র "ইকনমিক প্ল্যানিঙ্" শব্দটা জোরে চালানো হইতেছে,—মায় আমাদের ভারতেও। এই শব্দর জন্মদাতা বোলশেভিক রুশ। সেই শব্দের অন্তর্গত বস্তুটা কি চিজ তাহার সঙ্গে মোলাকাৎ হইবে এই বইয়ের ভিতর।

১৯২৭ সনেও কোনো কোনো জার্ম্মাণ শিল্পপতি বলিতেন যে, রুশ ধাতে শিল্পনিষ্ঠা সহিবে না। রুশ জাতির পক্ষে চাষ-আবাদ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসা পোসাইবে না। কিন্তু গ্রন্থকার তখন শিল্পক্ষেত্রেও রুশিয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখিতে রাজি ছিলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল নিম্নরূপ—"ইংরেজেরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জার্ম্মান নরনারীকে চাষীর জাত ছাড়া আর কিছু ভাবিত না। জার্ম্মান হাড়ে শিল্পনিষ্ঠা সহিবে না, এইরূপ ছিল ইংরেজ শিল্পপতিদের মত। এমন কি 'সেদিন' ১৮৭৩ সনে আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে যে বিশ্বপ্রদর্শনী বসে তাহাতে জার্ম্মাণ দ্রব্য দেখিয়া লোকেরা বলাবলি করিয়াছিল যে, জার্ম্মাণ মালগুলা সস্তা বটে, কিন্তু রদ্দি। তাহা সত্ত্বে ও দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণরা একালে আর পূরাপূরি চাষীর জাত নয়। জার্ম্মান শিল্পনিষ্ঠা জবর রূপেই দেখা দিয়াছে। কাজেই রুশ নরনারী যে এক-দিন না একদিন শিল্পনিষ্ঠায় হাত দেখাইতে সমর্থ হইতে পারে, এই বিষয়ে সন্দেহ করিতে যাওয়া গা-জুরি মাত্র।"

গ্রন্থকার প্রথমেই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন :—রুশ নরনারী আজও পূরামাত্রায় শিল্পনিষ্ঠ নয় একথা ঠিক। কিন্তু রুশিয়ায় শিল্পনিষ্ঠার দিগ্‌বিজয় স্থরু হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে, জার-বাদশা-দের আমলেই। ১৯১৪-১৮ সনের মহালড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে রুশিয়ার লোকেরা শিল্পজগতে একদম আনাড়ি বা অজানা লোক ছিল না। কাপড়ের কলে রুশিয়ার হাত ছিল, রবারের শিল্পে রুশেরা বেশ-

কিছু কাজ করিত। রেলের জন্য এঞ্জিন আর গাড়ী তৈয়ারি করিবার কারখানাসমূহও রুশ কব্জায় পরিচালিত হইত।

যাহা হউক, ১৯২৭ সনে রুশিয়ার শিল্প-দুনিয়া কিরূপ অবস্থায় ছিল? এক কথায় লড়াইয়ের ঘা তখন একপ্রকার সারিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ ১৯১৩-১৪ সনে যে-যে ক্ষেত্রে আর যে-যে কর্ম্মকেন্দ্রে রুশিয়ার ধনদৌলত পায়দা হইত ১৯২৭ সনে সেই সকল ক্ষেত্রে আর কর্ম্মকেন্দ্রে দস্তুরমত কাজ চলিতেছিল। কাজেই মাত্রাও লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্রায় গিয়া ঠেকিয়াছিল। একমাত্র লোহার কারবার তখনও পূরাপূরি সারিয়া উঠে নাই। ১৯২৭ সনের মাঝামাঝি রুশিয়ার অবস্থা মোটের উপর রুশিয়ার সুপরিচিত কাঠামে দেখা যাইত এইরূপ বলা চলে।

কিন্তু নতুন-কিছু করিবার ক্ষমতা তখন রুশিয়ার ছিল কি? বোলশেভিকরা লড়াইয়ের পরবর্ত্তী আট নয় বৎসর ধরিয়া নতুন-কোনো কারবার একপ্রকার ফাঁদিতে পারে নাই। লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আর লড়াইয়ের সময়কার ফ্যাক্টরি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদিই পুনরায় কাজে লাগাইয়া তাহারা ঠাট বজায় রাখিতেছিল মাত্র। কিন্তু নতুন-কিছু ফাঁদিতে হইলে চাই পুঁজি। সেই পুঁজির টিকি ১৯২৭ সনে ততবেশী দেখা যাইত না। অধিকন্তু পুরাণা কারখানা আর যন্ত্রপাতিগুলায় মরিচা ধরিতেছিল। সেইগুলাকে কর্ম্মক্ষমরূপে মেরামত করিতে হইলেও চাই টাকা। কিন্তু টাকা আসে কোথা হইতে? অতএব দেশ-বিদেশের লোকের সন্দেহ হইতেছিল যে, রুশিয়া ১৯২৭ সনের পর শিল্প-কর্ম্মে একদম কাৎ হইয়া পড়িবে। ১৯১৩-১৪ সনের অবস্থায় রুশ নরনারী কায়ক্লেশে পুনরায় উঠিতে পারিয়াছে বটে। কিন্তু এখন হইতে তাহাদের জীবনের গতি নীচুর দিকে। বাড়তির পথে বোলশেভিক রুশিয়াকে দেখিবার সম্ভাবনা একদম নাই। এইরূপ ছিল অধিকাংশ লোকের মত।

কিন্তু আশ্চর্য্যর কথা, সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে রুশ মাতব্বরেরা শিল্পনিষ্ঠার বিপুল দিগ বিজয় চালাইবার মোসাবিদা হাজির করিলেন। এই মোসাবিদায় ছিল বর্ষপঞ্চকের ব্যবস্থা। ১৯২৭-২৮ সনের তুলনায় পাঁচ বৎসরের শেষে শিল্পকর্ম্মকে ঠেলিয়া তুলিতে হইবে ১০০ হইতে ২৩৬ পর্য্যন্ত. আর কৃষিকর্ম্মকে ১০০ হইতে ১৫৫ পর্য্যন্ত; সমগ্র ধন-দৌলতের মূল্য ডবল করিয়া ছাড়িতে হইবে, আর মজুরদের "আসল মজুরি" কমসে কম শতকরা ৭০ অংশ বাড়াইতে হইবে;—এইরূপ ছিল মাতব্বরদের লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য সাধনের জন্য তাহাদের বরাদ্দ ছিল ৭৮,০০০,০০০,০০০ রুব্‌ল্‌। এক রুব্‌ল্‌ তখনকার দিনে প্রায় এক জার্ম্মাণ মার্ক বা বিলাতী শিলিঙের সমান। অর্থাৎ ৫,২০০ কোটি ভারতীয় মুদ্রার ডাক ছিল এই মোসাবিদার ভিতর। ইহার নাম "ইকনমিক প্যানিঙ্" (অর্থনৈতিক মোসাবিদা)!

বর্ষপঞ্চক ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে সুরু হইবার কথা ছিল। আর মোসাবিদা-মাফিক ইহা খতম হইত ১৯৩৩ সনের অক্টোবর মাসে। কিন্তু বোলশেভিক গবমেণ্ট ১৯৩০ সনে মেয়াদটা খাটো করিয়া দেয়। চার বৎসর তিন মাসে অর্থাৎ ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে মোসাবিদা মাফিক কাজকর্ম্ম খতম করা হয়। এই গেল প্রথম মোসাবিদার জীবন বৃত্তান্ত।

আউহাগেনের মতে "প্রথম" পঞ্চবর্ষকের ফলাফল সম্বন্ধে একতরফা প্রশংসা করা চলে না। রুশিয়ার শিল্পনিষ্ঠা বাড়িয়াছে, যন্ত্রপাতির কল বাড়িয়াছে, যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে, ফ্যাক্টরি বাড়িয়াছে, কারখানা বাড়িয়াছে, যন্ত্রনিষ্ঠ কারিগর ওএঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। এই সব নিরেট সত্য। কিন্তু এই জন্য নরনারীকে মূল্য দিতেও হইয়াছে অতি প্রচুর, যৎপরোনাস্তি। জনসাধারণকে অনেক

কষ্ট সহিতে হইয়াছে। খাওয়া-পরার দৈন্য রুশিয়ায় আজও ঘুচে নাই।

মোসাবিদায় ছিল যে, পাঁচ বৎসরের ভিতর রুশিয়ার লোকেরা বিদেশে রপ্তানি বাড়াইতে পারিবে। রপ্তানি বাড়াইয়া তাহারা বিদেশে হইতে যন্ত্রপাতি আর যন্ত্রনিষ্ঠ ওস্তাদ, এঞ্জিনিয়ার ও কারিগর ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বেশী-বেশী আমদানি করিতে পারিবে। এই আমদানি-বৃদ্ধির. ফলে রুশিয়ার ধনদৌলত বাড়াইবার আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সে আশা যথোচিতরূপে পূর্ণ হইতে পারে নাই। কেননা রপ্তানির পরিমাণ প্রথম-প্রথম বাড়তির দিকে ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘাট্‌তির পথে আসিয়াছে। নিম্নের তালিকায় রপ্তানির দৌড় দেখা যাইবে।—

১৯২৮ :—৭৯৯,৫০০,০০০ রুব্‌ল্
১৯৩০ :—১,০৩১,৪০০,০০০ „
১৯৩২ :— ৫৬৩,৯১০,০০০ „

রপ্তানিতে ঘাট্‌তির ফলে এই বর্ষপঞ্চকে (১৯২৮-৩২) আমদানির পরিমাণ রপ্তানি ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ "অতি-আমদানির" মাত্রা ৫৬১,৬০০,০০০ রুব্‌ল্। অন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বর্ষপঞ্চক রুশিয়ার পক্ষে একটা বড় গোছের "কলিযুগ"।

রপ্তানিতে ঘাট্‌তির কারণ ঢুঁড়িবার জন্য বেশীদূর যাইতে হইবে না। কেননা ভারতেও আমরা এই কয় বৎসরে বেশ পূরা দস্তুরই রপ্তানি-ঘাট্‌তির কাণ্ড দেখিতেছি। বস্তুতঃ দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ঘাট্‌তি দেখা গিয়াছে। ১৯২৯ সনের শেষাশেষি হইতে আজ পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বত্র চলিতেছে দুর্য্যোগ বা সঙ্কট। এই বিশ্ব-দুর্য্যোগের আওতা ছাড়াইয়া রুশিয়ার পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

রপ্তানিতে ঘাট্‌তির আর একরূপ কারণ আছে। তাহাও ভারতে সুপরিচিত। রুশিয়াকে ভারতবাসীর অন্যতম মাসীবাড়ী বলা বর্ত্তমান লেখকের দস্তর। আমাদের মতন রুশ নরনারীও চাষীর জাত। বিদেশে রপ্তানি করে উহারা কৃষিজ দ্রব্য,—ঠিক আমাদেরই মত। কিন্তু এই বিশ্ব-দুর্য্যোগে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম কমিয়া গিয়াছে অসম্ভবরূপে। বাঙ্‌লার চাষী ও জমিদার পাটের মূল্যপতনের দরুণ চিৎ হইয়া পড়িয়াছে। এই অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে তাহারা সহজেই বুঝিবে রুশিয়ার নরনারীর দুর্দ্দশা কিরূপ। কাজেই ওজন হিসাবে রপ্তানির পরিমাণে যাহাই হউক না কেন, মূল্য হিসাবে রপ্তানির পরিমাণ নেহাৎ নগণ্য।

ফলতঃ বর্ষপঞ্চকের মোসাবিদায় রপ্তানিতে বাড়তির উপর নির্ভর করিয়া রুশিয়ার জন্য যেসকল আর্থিক উন্নতি আশা করা গিয়াছিল তাহার অনেক কিছুই কাগজস্থ মাত্র রহিয়াছে।

১৯৩৩ সনের জানুয়ারী মাসে মস্কো নগরে যে বোলশেভিক কংগ্রেস বসে তাহাতে স্তালিন প্রচার করিয়াছেন যে, রুশিয়া আজকাল আর কৃষি-রাষ্ট্র মাত্র নয়। রুশিয়াকে এখন হইতে শিল্প-রাষ্ট্ররূপে সমঝিয়া চলা উচিত। তাঁহার যুক্তি নিম্নরূপ। ১৯২৭-২৮ সনে শিল্পজাত মাল ছিল সমগ্র মালের শতকরা ৪৮ অংশ মাত্র অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও কম। কিন্তু বর্ষপঞ্চকের শেষে অর্থাৎ ১৯৩৩ সনের গোড়ায় এই হিস্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৭০ অংশ।

আউহাগেন এই যুক্তির গলদ দেখাইয়া বলিতেছেন, স্তালিন শিল্পজাত দ্রব্যের বর্ত্তমান দাম যে অত্যধিক সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। অপর দিকে কৃষি-দ্রব্যের দাম যে অসম্ভবরূপে নামিয়া গিয়াছে সে কথাও তাঁহার বিচারে ঠাঁই পায় নাই। কাজেই সকল প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যের

দামের ভিতর দৈবক্রমে শিল্পজাত দ্রব্যের দামের হিস্যাটা খুব পুরু দেখাইতেছে।

বিজ্ঞানসম্মতরূপে হিসাব চালাইলে বলিতে হইবে নিম্নরূপ। রুশিয়ায় আজকাল মাত্র সত্তর লাখ লোক শিল্পকর্ম্মে ভাত-কাপড় জুটাইয়া থাকে। অর্থাৎ এক কোটীরও কম নরনারী শিল্প-নিষ্ঠ। কিন্তু তার চাষের আওতায় এখনো প্রায় দশগুণ লোক (সাত কোটি) কর্ম্মক্ষম। তাহাদের ভিতর কম-সে-কম প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটী নরনারী চাষের কাজে বাহাল আছে। কাজেই চাষীর বহর শিল্পীর বহরের চেয়ে রুশিয়ায় বড়। এই সম্বন্ধে গোঁজামিল রাখা চলিবে না।

বোলশেভিক রুশিয়ার সরকারী সংখ্যা-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত অঙ্কগুলা দুনিয়ার সর্ব্বত্রই সন্দেহের চোখে দেখা হইয়া থাকে। আউহা-গেনও এইসব পূরাপূরি বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। অনেক সময়েই নাকি গভর্ণমেণ্টের দপ্তর হইতে সংখ্যাগুলা বদলাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। মন-মাফিক অঙ্ক দেখানো সরকারী সংখ্যা-বিভাগের দস্তুর। কিন্তু মিথ্যা কথা বলা বড় কঠিন। কেননা একদিকে সংখ্যাগুলা বদলাইতে গেলে অন্যান্য অসংখ্য দিকে সংখ্যা বদলানো আবশ্যক হয়। কখনো কখনো তাল সামলাইয়া সকল দিক্‌কার সংখ্যাগুলা নির্দ্দিষ্ট মাপে বদলানো হয়ত ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত সংখ্যা-দপ্তরের এক বিভাগের দেওয়া অঙ্কের সঙ্গে অন্য বিভাগের দেওয়া অঙ্কের সামঞ্জস্য দেখা যায় না। কাজেই চুরি ধরা পড়িয়া যায়। এইরূপ অসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত নাকি একালের রুশ ষ্টাটিষ্টিকস্‌এ প্রচুর। যাহা হউক, দুনিয়ার পণ্ডিতেরা এই সংখ্যাগুলাকে আসল বস্তুর যথার্থ পরিচয়রূপে গ্রহণ করিতে নারাজ। তবে এই অঙ্কগুলা একদম ফেলিয়া দিতে তাঁহারা রাজিও নন। আউহাগেন

বলিতেছেন যে, রুশ সংখ্যা-দপ্তরের কর্ম্মচারীরা একতরফা বাড়তি দেখাইবার জন্য লালায়িত নয়। তাহারা আর্থিক জীবনের ঘাটতি-গুলাও দেখাইতে কসুর করে নাই। সুতরাং উৎরাই-চড়াই দুইই রেখা-তরঙ্গের সাহায্যে পাকড়াও করা সম্ভব। আর্থিক জীবন কতখানি উঠিল অথবা কতখানি নামিল তাহা হয়ত অঙ্কগুলার জোরে যথার্থরূপে বুঝা যাইবে না। কিন্তু উঠার সঙ্গে নামার তুলনা সম্বন্ধে মাপজোখগুলা বিশেষ মূল্যবান্।

একটা কথা এই সঙ্গে মনে রাখা ভাল। সংখ্যা-দপ্তরের কর্ম্মচারীরা শিল্পকর্ম্মঘটিত উৎপাদনের পরিমাণ জরীপ করিবার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছেন কৃষি কর্ম্মঘটিত উৎপাদনের জন্য ততটা করেন নাই। কৃষি-প্রধান দেশের প্রধান সম্বল সম্বন্ধে অঙ্কগুলা অতিশয় হাল্কা ও ফাঁকা-ফাঁকা। কাজেই বোলশেভিক রুশিয়ায় আর্থিক উন্নতি ঘটিয়াছে কি অবনতি ঘটিয়াছে সংখ্যাগুলার জোরে তাহা বলা অসম্ভব।

ফরাসী ও ইতালিয়ান আর্থিক পত্রিকা

চাই ভারতে বিদেশী মাথার ঘী

এখনো বহুকাল পর্য্যন্ত যুবক ভারতকে বিজ্ঞানের রাজ্যে বিদেশী মাথার উপরেই,—পূরাপূরি না হইলেও অনেক পরিমাণে—নির্ভর করিতে হইবে। বিদেশী মগজে যে ঘী আছে তাহা শুষিয়া আত্মপুষ্টি করিতে পারিলেই সম্প্রতি আমরা আমাদের চলনসই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিব। অন্যান্য বিদ্যার মতন, আর্থিক উন্নতি-বিষয়ক বিদ্যায়ও ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতেরাই আমাদের গুরু। এখনো আমাদের স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা এবং আবিষ্কারের দৌড় বেশী নয়। সুতরাং বিদেশী লোকজনের চিন্তা এবং কর্ম্মরাশি যত বেশী বাংলার পল্লীতে-পল্লীতে ছাত্রবৃত্তি-পাশকরা আর বি, এ-ফেলকরা অর্থাৎ "শিক্ষিত" নরনারীর রপ্ত হয় ততই দেশোন্নতির পক্ষে মঙ্গলকর। আজ "সজ্ঞানে" বিদেশের নিকট আধ্যাত্মিক গোলামি বা সাকরেতি করিতে প্রস্তুত না থাকিলে যুবক ভারত কোনো দিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুনিয়ায় স্বরাজ দখল করিয়া সাম্রাজ্য গড়িতে পারিবে না।

এইখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, ভারতের—আর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের—বিশ্ববিদ্যালয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, এম, এ শ্রেণীর ছাত্রেরা ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা-কিছু শিখিয়া থাকে সে সবই,—প্রায় ষোল আনাই,—ইয়োরামেরিকান পণ্ডিতদের রচনার চুম্বকমাত্র। আমাদের মাষ্টার মহাশয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদিগকে বিদেশীদের বই অথবা বইয়ের সংক্ষিপ্তসার মুখস্থ করাইতে অভ্যস্ত। কাজেই দেশের যে-সকল

নরনারী কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি মাড়াইতে অধিকারী নয় তাহাদিগের জন্য জেলায়-জেলায় বিদেশী গ্রন্থ-পত্রিকার আড়ৎ কায়েম করিতে থাকিলে অথবা সমাজের নানা ঘাঁটিতে এই সমুদয়ের ছোট-বড়-মাঝারি চুম্বক প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিলে আমাদের স্বদেশ-সেবকগণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-জাতীয় কাজই করিতেছেন,—দেশের লোক এইরূপ বিবেচনা করিতে শিখিবে।

কিঞ্চিৎ-কিছু মৌলিক গবেষণা, স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট অনুসন্ধান, ব্যক্তিত্বপূর্ণ রীসার্চ ইত্যাদি যে জোরজবরদস্তি করিয়া বাংলা-দেশের চৌহদ্দি হইতে খেদাইয়া দিতেই হইবে এমন কোনো কথা বলা হইতেছে না। "স্বাধীনতার" সঙ্গে অসহযোগ প্রচার করা বর্ত্তমান লেখকের মতলব নয়। বলিতেছি মাত্র এই যে,—ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার এবং বিদ্যাঘটিত কলার মুল্লুকে যুবক ভারত আজ, কাল এবং পরশু যে সকল গবেষণাই করুক না কেন তাহার ভিতর বিদেশচর্চ্চা, "বিদেশী আন্দোলন", বিদেশী সাহিত্যের বিশ্লেষণ, তর্জ্জমা, সমালোচনা, ও প্রচার ইত্যাদি কাজই প্রধান ঠাঁই অধিকার করিতে বাধ্য।

আর্থিক ভারতের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে গবেষণা করিতে বসিলেও,—বস্তুতঃ, বসিবামাত্রই আগে দরকার পড়িবে পাশ্চাত্য দুনিয়া সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের ধারা আর তর্কশাস্ত্র বা আলোচনা-প্রণালী। ভারতসন্তানের ভিতর যাঁহারা এইসকল পশ্চিমা মালের বড় বেপারী তাঁহারাই ভারতীয় তথ্যের সুবিশ্লেষণ এবং ভবিষ্য-ভারতের গোড়াপত্তন করিতে অধিকারী।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশেও এইরূপ "বিদেশী-আন্দোলনের", বিশ্ববোধের বা দুনিয়ানিষ্ঠার ঠাঁই যথোচিত পরিমাণেই রক্ষিত হয়। এরা কোনো বিদেশকে বয়কট করে না। তবে

এই সকল দেশের লোকেরা যে পরিমাণ এবং যে দরের স্বাধীন মাথার "ঘী" দেখাইতেছে সেই পরিমাণ এবং সেই দরের স্বাধীন মাথার "ঘী" দেখানো বর্ত্তমানে যুবক ভারতের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য। তাহার কারণ ঢুঁড়িতে বসা সম্প্রতি চলিবে না। "বিদেশী আন্দোলন", বিশ্ববোধ, দুনিয়া-নিষ্ঠা বা "পর-চর্চ্চা" ভারতবাসীর পক্ষে এখনো কিছু কাল যত দরকারী ইয়োরামেরিকার বড় বড় জাতির লোকের পক্ষে তত দরকারী কিনা সন্দেহ। এই কথাটা খোলাখুলি বুঝিয়া বিদেশী মগজের ঘী শোষণ করিবার আয়োজন করিতে পারিলেই আমরা ভারতে দেশোন্নতির একটা বড় ধাপ ডিঙাইতে পারিব।

ফরাসী ভাষায় আর্থিক পত্রিকা

ফরাসী ভাষায় যে সকল আর্থিক পত্রিকা বাহির হইতেছে তাহার কতকগুলির নাম প্যারিসের ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের নিকট হইতে সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। নামগুলা অনুবাদ সহ ছাপিয়া দেওয়া গেল। বাংলা নামগুলা পড়িলেই বাঙালী ধনবিজ্ঞান-সেবীরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কিছু কিছু ঠাওরাইতে পারিবেন। "আর্থিক উন্নতি"র বিভিন্ন বিভাগে যে ধরণের মাল বাহির হয় সেই ধরণের মাল সম্বন্ধে এক একটা স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পত্রিকা বাহির করিবার জন্য কয়েক দল গবেষক ও লেখক আবশ্যক। কিন্তু এই ধরণের তথ্য ও তত্ত্বের "পাঠক" বাঙালী সমাজে আছে কিনা অথবা জুটিবে কিনা সেকথা পরে বিবেচ্য। এখন চাই অনুসন্ধান, রীসার্চ, গবেষণা আর লেখালেখির জন্য উচ্চ-শিক্ষিত নরনারীর কর্ত্তব্যজ্ঞান।

ফরাসী পত্রিকাগুলার নাম নিম্নরূপ :—

১। লাক তিভিতে ফ্রঁাসেজ এ এত্রাঁজেয়ার (ফরাসী ও বিদেশী

কর্ম্মকাণ্ড), ২। বুলতাঁ দে লাসোসিয়াসিওঁ ফ্রাঁস-গ্রাঁদ্‌ব্রেতান্ (ফরাসী-ইংরেজ সমিতির পত্রিকা), ৩। বুলতাঁ দ'লা বাঁক ন্যাস-নাল ফ্রাঁসেজ দু কম্যার্স একস্‌তেরিয়্যর (বহির্ব্বাণিজ্যবিষয়ক ফরাসী ব্যাঙ্কের সমাচার), ৪। বুলতাঁ বিব্‌লিঅগ্রাফিক্ দ' দকুমাঁতাসিওঁ অ্যাঁতার্ণাসনাল কঁতাপঁরেণ (আন্তর্জ্জাতিক দুনিয়ার দলিল বিষয়ক পত্রিকা), ৫। বুলতাঁ দ'লা শাঁবর দ' কম্যার্স ফ্রাঁকো-পর্ত্তুগেজ (ফরাসী-পর্ত্তুগীজ বাণিজ্য-ভবনের পত্রিকা), ৬। বুলতাঁ ফিতু-সিয়্যার (কর্জ্জলগ্নির সংবাদপত্র), ৭। বুলতাঁ দ'লা সোসিয়েতে দাঁকু-রাজমাঁ পুর ল্যাঁদুস্ত্রী নাশ্যনাল (স্বদেশী শিল্প-প্রসার-সমিতির-পত্রিকা), ৮। বুলতাঁ দ' লুনিওঁ দেজ্ অ্যাসোসিয়াসিওঁ দেজ্ আঁসিয়াঁজ্ এলেভ দেজ্ একল সুপেরিয়্যর দ' কম্যার্স (বাণিজ্য-বিদ্যালয়সমূহের ভূত-পূর্ব্ব ছাত্রগণের সঙ্ঘ-পত্রিকা) ৯। লে দোকুমাঁ দু ত্রাভাই (মজুর দলিল), ১০। লেকোনোমিক্ (আর্থিক), ১১। লোকোনোমিস্ত্ পার্ল্যমাতেয়ার (আইন-সভার অর্থকথা), ১২। লা ফ্রাঁস একো-নোমিক এ ফিনাঁসিয়্যার (ফ্রান্সের আথিক ও রাজস্ব চিত্র), ১৩। ল'জুর্নাল দ'লা বুর্স্ এ দ'লা বাঁক্ (ষ্টক একস্‌চেঞ্জ ও ব্যাঙ্ক-পত্রিকা) ১৪। জুর্ণাল দেজ্ একানোমিস্ত্ (ধনবিজ্ঞান-সেবীদের পত্রিকা) ১৫। জুর্ণাল দ' লা সোসিয়েতে নাশ্যনাল দ'র্ত্তিকুল্‌ত্যির দ'ফ্রাঁস (ফরাসী-বৃক্ষ-পরিষৎ পত্রিকা), ১৬। লা লীগ দু লিবর-এশাঁজ (অশুল্ক-বাণিজ্য-পরিষৎ) ১৭। ল'মঁদ্ একোনোমিক (আর্থিক দুনিয়া), ১৮। লা রেফর্ম সোসিয়াল (সমাজ-সংস্কার) ১৯। লা রেভ্যি একোনমিক এ ফিনাঁসিয়্যার (আর্থিক ও রাজস্ব-পত্রিকা), ২০। লা রেভ্যি একোনো-মিক এ ফিনাঁসিয়্যার দ' বর্দো এ দু স্যুদ-ওয়েস্ত্ (বর্দো ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব জনপদের আর্থিক পত্রিকা) ২১। লা রেভ্যি অ্যাঁত্যার্ণ্যাশ্যনাল দ'লা

প্রোপ্রিয়েতে ফঁসিয়্যার বাতী (ঘরবাড়ী-জোতজমার আন্তর্জাতিক পত্রিকা) ২২। লা ভী ফিনাঁসিয়্যার (রাজস্ব-ও টাকাকড়ি)।

রেভ্যি দেকোনোমী পোলিটিক

ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা; বৎসরে ছয়বার করিয়া বাহির হয়, প্যারিস; —সম্পাদক অধ্যাপক শার্ল্ জিদ্। সম্পাদন-কার্য্যে সহায়ক আছেন এগার জন,—তাঁহারা প্রায়ই প্যারিসের বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক। বাহিরের লোক আছেন মিশেল উবেয়ার। ইনি ফ্রান্সের সরকারী তথ্য-তালিকা ও সংখ্যা (ষ্টাটিষ্টিক্স্)-বিভাগের কর্ত্তা। অধ্যাপক রিস্ত্, ক্রশি, ইতিয়ে, জার্মাঁ-মার্ত্ত্যাঁ, দেশাঁ ইত্যাদির নাম ফরাসী পণ্ডিত মহলে সুপরিচিত। এই পত্রিকার দুইটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, রোজ রোজ যে সকল আর্থিক আইনকানুন জারি হইতেছে অথবা ঐ সকল বিষয়ে আলোচনা হয় সেই সব মাসের পর মাস ধারাবাহিক-রূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সরকারী ও নিম-সরকারী যতগুলা প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিধি-ব্যবস্থাই এই "ক্রোণিক লেজিস্লাতিভ্" অধ্যায়ে ঠাঁই পায়। ১৯২৫ সনের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ১৩৪ দফায় তথ্যগুলা বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগৎ আইন-কানুনের জগৎ। আর ইহার ভিতর আর্থিক জীবন বিষয়ক বিধিব্যবস্থার পরিমাণ বিপুল। ভারতে আর্থিক আইন-কানুন স্বতন্ত্র আকারে আলোচনা করিয়া দেখিবার সুযোগ এখনো নাই। কিন্তু সেই দিকে ফরাসীরা বিশেষ ওস্তাদ। বস্তুতঃ, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যাগুলা ফরাসী চিন্তায় আইন-বিদ্যারই অন্তর্গত। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে "ফ্যাকুল্তে দ' দ্রোআ" (আইন-ফ্যাকালটি) এইসকল বিদ্যার শাসনকর্ত্তা।

জিদ-সম্পাদিত পত্রিকার অপর বিশেষত্ব,—"নৎ এ মেমরাঁদা" (আর্থিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তথ্যপঞ্জী)। এই অংশটা "নমো নমঃ" করিয়া সারিয়া দেওয়া হয় না। যে সংখ্যায় ১৭৬ পৃষ্ঠা (রয়্যাল অক্টেভো) সেই সংখ্যার ৫৫ পৃষ্ঠায়ই তথ্য-পঞ্জীর মাল। ১৯২৬ সনের প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়ে "নৎ" বাহির হইয়াছে,—(১) ধন-বিজ্ঞানের নয়া মোসাবিদা (রেণে গণার), (২) ইয়োরোপের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবায়-নীতি শিখাইবার ব্যবস্থা (তোতোমিয়াঁৎস,) (৩) মুদ্রা-স্থিতীকরণের বৃত্তান্ত, ফ্রান্স এবং ফিন্ল্যাণ্ড এই দুই দেশের কথা আছে (রিস্ত্), (৪) আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃত্তান্ত, লীগ অব নেশ্যন্সের (বিশ্ব-রাষ্ট্রপরিষদের) আর্থিক কাজকর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে (পিকার), (৫) রুশিয়ার শিল্প-কারখানা (এনিয়া-শেফ), (৬) ফরাসী কর্জ্জ-সমস্যা এবং ফ্রান্সের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য (মেলিয়াল), (৭) ফ্রান্সের রাজস্ব-ব্যবস্থা,—১৯২০ হইতে ২৯২৫ পর্য্যন্ত কালের বিবরণ (রিস্ত্)।

মে-জুন ১৯২৬ :—(১) বিনিময়ের বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা (আল্বেয়ার আফতালিয়োঁ), (২) টাকাকড়ি সম্বন্ধে আজকালকার বিলাতী মতামত (জাঁ পেয়ার লাজার), (৩) বিলাতের দুর্গতির বিলাতী ব্যাখ্যা (লুই বোদাঁ), (৪) শুল্ক-সমস্যায় কৃষি ও শিল্প, (৫) রুশিয়ায় কন্‌সেশ্যনের (অনুগ্রহের) যুগ, (৬) জেনীভার আন্তর্জ্জাতিক মজুর-কর্ম্মকেন্দ্র।

জুলাই-আগষ্ট, ১৯২৬ :—(১) বিনিময়ের চিত্ত-বিজ্ঞান (আলবেয়ার আফতালিয়োঁ), (২) "ক্রয়-শক্তির সমতার" উপর বিনিময়ের হার নির্ভর করে কি ? (আল্ফ্রেদ পজ)। সুইডেনের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক কাসেল এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় সকল দেশেই

মূল্যবৃদ্ধি ঘটে আর কাগজের টাকার চলও বাড়ে। সোনার টাকা কোথাও ছিল না। কাসেল বলেন, এই অবস্থায় কাগজের টাকার আসল মূল্য ছিল মাল বা পণ্যদ্রব্য। এক দেশের টাকার সঙ্গে অন্য দেশের টাকার তুলনা করিবার সময় লোকেরা প্রত্যেক টাকার পশ্চাতে সোনা কতখানি আছে না আছে ভাবিয়া দেখিত না। ভাবিয়া দেখিত একমাত্র মাল খরিদ করিবার ক্ষমতা। এক দেশের টাকার ক্রয়-শক্তির সঙ্গে অপর দেশের টাকার ক্রয়-শক্তির সমতা দেখিয়া বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা হইত। এই হার-নির্দ্ধারণটা নেহাৎ খামখেয়ালীর চিজ নয়। সোনার টাকার আমলে বিনিময়ের হার যেরূপ কড়ায়-ক্রান্তিতে সম্ভবপর ছিল এই কাগজী টাকার আমলেও সেইরূপই দেখা গিয়াছে। কাসেলের মতে এই নয়া হারটা সহজেই বাহির করা যায়। যে-দেশে টাকার দাম যত কমিয়াছে তত দিয়া পুরাণা হারকে গুণ করিলেই হইল। ধরা যাউক যেন সোনার যুগে ১ পাউণ্ডের দাম ২০ মার্ক। ইন্‌ফ্লেশনের (কাগজীমুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধির) ফলে ধরা যাউক নয়া পাউণ্ডের দাম হইয়াছে পুরাণা পাউণ্ডের দুই ভাগের এক ভাগ আর নয়া মার্কের দাম হইয়াছে ১০ ভাগের এক ভাগ। তাহা হইলে এই কাগজী মুদ্রার বিনিময়ের হার হইবে ২ পাউণ্ড = ২০০ মার্ক। কাসেলের এই মত কতটা টেঁকসই তাহা সমালোচনা করিবার জন্য পজ সুইডেন, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যণ্ড, এবং জার্ম্মাণি এই কয়দেশের মূল্য-বৃদ্ধি, ইন্‌ফ্লেশ্যনের পরিমাণ এবং বাস্তব জগতের বিনিময়-হার এক সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পজ বলিতেছেন,—"কাসেলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাস্তবের মিল নাই।"

মে—জুন ১৯২৭,—(ক) প্রবন্ধ :—(১) যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক

ভবিষ্য গণনার কর্ম্মকৌশল, কৃষিকর্ম্মের ভবিষ্যৎ বুঝিবার প্রণালী, অর্থ চক্র :—অধ্যাপক মুরের প্রদর্শিত পন্থা, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত পন্থা, ফিশার, কার্স্‌বেন এবং ওয়াকিংয়ের কর্ম্মপ্রণালী, মার্কিণ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সঙ্গে আর্থিক চক্রের যোগাযোগ (আলবেয়ার আফ্‌তায়িওঁ), (২) সঞ্চয়ের উপর ট্যাক্‌স (উম্ব্যার্ত্ত রিচ্চি), (৩) জেনীভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন (রেণে হফহ্বার)। (খ) আর্থিক দুনিয়ার গতিবিধি :—(১) জার্ম্মাণির আর্থিক জীবন (আঁরি লাওফেনবুর্গার) (২) রুশিয়ার আর্থিক জীবন (এনিয়াশেফ), (গ) দলিল :—(১) সমবায়ের সমাজ (জিদ)। (২) বিশ্ববাণিজ্য ১৯১১ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত পনর বৎসরের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে জেনীভায়। সেই দলিলের উপর টীকাটিপ্পনী (জঁালেস্কুর)। (ঘ) আর্থিক আইনকানুন :—মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে ফরাসী পার্ল্যামেণ্ট যে সকল আইন জারি করিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে,—(১) কৃষি, (২) উপনিবেশ, (৩) বাণিজ্য, কারখানা, শুল্ক, (৪) সরকারী খাজাঞ্চিখানা ও টাকার বাজার, (৫) মজুর, মজুরি ও সমাজ জীবন (৬) মাল জাহাজ (সাঁ-জার্মা) । (ঙ) গ্রন্থসমালোচনা :—দশখানা বইয়ের খতিয়ান। (চ) পত্রিকাজগৎ :—(১) ফরাসী ভাষার ১১ খানা, (২) জার্ম্মাণ ভাষার ২ খানা, (৩) ইংরেজি ভাষার ২ খানা, (৪) ইতালিয়ান ভাষার ১ খানা, (৫) ওলন্দাজ ভাষার ১ খানা। ২৩ জন লেখক এই সমালোচনা বিভাগের জন্য বাহাল আছেন। অর্থাৎ পত্রিকা-জগতের চুম্বক প্রকাশ করিবার দায়িত্ব লইয়া থাকেন ফ্রান্সের নং ১ শ্রেণীর পণ্ডিতেরা। (ছ) গ্রন্থসূচী।

১৯২৭ সনের শেষ সংখ্যায় আছে :—(১) আমেরিকা ভূখণ্ডে স্পেন

দেশের হুণ্ডি (ষোড়শ শতাব্দীর বৃত্তান্ত)। সেকালের দুনিয়ায় আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বলিলে স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার, আর পর্ত্তু-গালের সঙ্গে ভারতের আদান-প্রদান একটা বড় ঘর অধিকার করিত। কিন্তু এই সকল আমদানি-রপ্তানির কর্ম্ম-কাণ্ড বা ব্যবসা-পরিচালনার কর্ম্মকৌশল সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান-গবেষণা একপ্রকার অনুষ্ঠিতই হয় নাই। জার্ম্মাণ পণ্ডিত সোম্বার্ট-প্রণীত "ড্যর মডার্ণে কাপিটালিস্‌মুস" (আধুনিক পুঁজি-নিষ্ঠা) গ্রন্থে এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা আশা করা যাইত। কিন্তু পাওয়া যায় না। অপর দিকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরেশিয়া আর ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্রীয় ঔপনিবেশিক ইতিহাস লইয়া দেশ-বিদেশের নানা পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়া থাকেন। তাঁহারা ও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরি-চালনা-প্রণালী, বাণিজ্যিক কাগজ-পত্র, হুণ্ডি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো তল্লাস চালাইতে অভ্যস্ত নন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ফরাসী পণ্ডিত সায়্ পৃষ্ঠা ত্রিশেকের ভিতর নানা তথ্য দিয়া এই মহলে অনু-সন্ধানের সূত্রপাত করিলেন। ভারতীয় ইতিহাসের ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী সম্পর্কে যে সকল ভারতীয় সুধী ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জের লেনদেন খতিয়ান করিতে বাধ্য তাঁহারাও এই দিকে নজর ফেলিলে আর্থিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নতুন তথ্য বাহির হইতে পারে।

(২) বিজ্ঞানসম্মত কর্ম্মপরিচালনা। মার্কিণ এঞ্জিনিয়ার টেলার যুক্ত-রাষ্ট্রের নানা শিল্প-কারখানায় বিজ্ঞান-সম্মত কর্ম্ম-পরিচালনা কায়েম করিয়া সুফল দেখাইয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মকৌশল "সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেণ্ট" নামক গ্রন্থে সুবিবৃত আছে। দুনিয়ায় আজকাল টেলার-প্রণালী (টেলার-সিষ্টেম) অথবা "সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেণ্ট" পারি-ভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নয়। জগতের

নানা দেশে এই প্রণালী কায়েম হওয়া সম্ভবপর কিনা তাহার পরীক্ষা চলিতেছে জার্ম্মাণিতে, বিলাতে, ফ্রান্সে, ইতালিতে। অধিকন্তু এই বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রথম সম্মেলন বসে প্যারিসে (১৯২৩), তাহার পর প্রাগে (১৯২৪) ও ব্রুসেল্‌সে (১৯২৫), এইবার ১৯২৭ সনে বসিয়াছে রোমে। এই সকল বিষয়ে ওসয় একটা সুবৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। (৩) চীনে বিদেশীর স্বার্থ ও একৃতিয়ার (এস্কারা), (৪) অর্থনৈতিক সূচীসংখ্যা (রোআ), (৫) যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক জীবন, (৬) আর্থিক আইন কানুন (ফরাসী), (৭) গ্রন্থসমালোচনা (২২ খানা বইয়ের এক এক পৃষ্ঠা ব্যাপী বিবরণ; সমালোচকসংখ্যা ১৪)। (৮) পত্রিকাজগৎ (ছোট হরপে ৪০ পৃষ্ঠা)।

লে দোকুমাঁ দু ত্রাভাই

"মজুর, মজুরি ও মেহনতের দলিল"। ফরাসী মাসিক, প্যারিস। জানুয়ারি ১৯২৬ :—(১) জার্ম্মাণিতে মজুর-সঙ্ঘের বর্ত্তমান কাজকর্ম্ম। ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেসলাও শহরে এই সঙ্ঘের যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত। (২) আঁতনেলি এক প্রবন্ধে ১৯২২ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত চার বৎসরের জার্ম্মাণ মজুরির হার বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণ মুদ্রা কাগজের নোটে যে পরিমাণে বাড়িতেছিল সেই পরিমাণে মজুরির হার বাড়ে নাই। কাজেই মজুরেরা ধর্ম্ম-ঘট চালাইয়াছে।" ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় (১) এক প্রবন্ধে বিলাতী সমাজ-বীমার ক্রমবিকাশ আলোচিত হইয়াছে। বিধবা এবং অনাথ বালক-বালিকাদিগের ভাতার হার ও পরিমাণ বাড়িতেছে। (২) দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখিতেছি যে, নরওয়ে দেশের

আইনে কোনো-কোনো কারবারে মজুরে-মালিকে ঝগড়া শালিসী দ্বারা মীমাংসিত হইতে বাধ্য। মার্চ সংখ্যায়,—মার্কিণ শিল্প-কারখানায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে যেসকল উপায়ে মজুরির হার বাড়ানো হইয়াছে তাহার আলোচনা আছে। আমেরিকার আর্থিক জীবনে যুগান্তর আসিয়াছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কর্ম্মকেন্দ্রের পুনর্গঠন, রদ্দি বা বরবাতি মালের চরম সদ্‌গতি করা ইত্যাদি কৌশল নবীন মার্কিণ শিল্পের প্রাণ। জিনিষপত্রও সস্তা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মজুরিও বাড়িয়াছে আর কর্ম্মকেন্দ্রের আবহাওয়ায় উন্নতি ঘটিয়াছে।

১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে আঁরি ফুর "অর্থ নৈতিক যুক্তিযোগ" ও "বেকার সমস্যা" এই দুই বিষয় এক সঙ্গে আলোচনা করিয়া কয়েকটা সিদ্ধান্তে হাজির হইয়াছেন। "র‍্যাশন্যালিজেশ্যন" বা "যুক্তিযোগ" বস্তুটা পূর্ব্বে "আর্থিক উন্নতি"তে নানা উপলক্ষ্যে আলোচনা করা হইয়াছে। এবার ১৯২৭ সনে জেনীভায় যে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল তাহার আলোচনায় "যুক্তিযোগে"ই ছিল অন্যতম বড় কথা। এই জন্য জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্য সুবিস্তৃতরূপে খতাইয়া দেখা হইয়াছে। ১৯২৪ সন এই "যুক্তিযোগ" নীতির প্রথম বৎসর। তিন চার বৎররের অভিজ্ঞতায় বুঝা যাইতেছে যে, যুক্তিযোগ একমাত্র কারখানার পরিচালনায় কায়েম করিলে বেকারের দল কমিবে না। এইজন্য চাই আর্থিক জীবনের সকল বিভাগে যুক্তিযোগের প্রবর্ত্তন। কৃষি-শিল্পের সকল মহলে ত চাই-ই। অধিকন্তু চাই ব্যবসাবাণিজ্যের সর্ব্বত্র।

আক্‌সিঅঁ নাস্যনাল

ফরাসী মাসিক। ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ ১৯২৬ :—(১) রারেতি

বলিতেছেন :—"ফরাসী মুদ্রার মূল্য তাড়াতাড়ি স্থির-প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে দেশের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। "স্থিতীকরণ"কে আর্থিক ব্যবস্থার ফল স্বরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইহাকে কারণ সমঝিলে গোলে পড়িতে হইবে। আগে রাজস্ব সংস্কার কর,—আর বিদেশী কর্জ্জ শোধার ব্যবস্থা কর। তাহার পর মুদ্রানীতির পুনর্গঠনে মাথা খাটানো চলিতে পারে,—পূর্ব্বে নয়। (২) ফ্রাঁ কিরূপে স্থিতীকৃত করা সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাব দিতে যাইয়া নোগারো গোল্ড-এক্‌স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা স্বর্ণবিনিময়-মানের কথা পাড়িয়াছেন। তাঁহার মতে এই মানই আজকালকার ফ্রান্সের পক্ষে প্রশস্ত।

রেভ্যি একোনোমিক অঁ্যাতার্ণাস্যনাল

ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক পত্র। ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে ইংরেজ স্যার চার্ল্‌স মাগারা তুলা-শিল্পের আন্তর্জ্জাতিক তথ্যসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। মাগারা হইতেছেন তুলা-বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক ফেডারেশ্যনের (সঙ্ঘের) প্রথম সভাপতি। দুনিয়ার সকল দেশে সূতার কারবার করে যেসব কারখানার মালিক, তাহাদের ভিতর সমঝৌতা কায়েম করার প্রস্তাব এই প্রবন্ধের "মুদ্দা।" রুশিয়ার খনি-শিল্প সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন জেরিকফ্‌। বাকু জনপদের তেল, পেচোরার কয়লা আর সীসা এই কয় বস্তু প্রধান আলোচ্য বিষয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-সচিব হুভার আমেরিকান বণিক-সঙ্ঘের সম্মুখে একটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার ফরাসী তর্জ্জমা এই পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। হুভারের মতে মজুরির হারবৃদ্ধি আর মালের মূল্য-হ্রাস এই দুই বস্তু মার্কিণ ধনোৎপাদনের বনিয়াদ। ধ্বংসকারী টক্কর আর গঠনমূলক টক্কর এই দুই

প্রকার টক্কর বিশ্লেষণ করা হুভারের এক মতলব। আর একটা
াড় তথ্য সম্বন্ধে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। হুভার
লিতেছেন যে, আজকালকার আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলে ধনী
ুঁজিপতিদের তাঁবে নয়, তাহাদের অধীনস্থ (বেতন প্রাপ্ত) কর্ম্মদক্ষ
ও সুবিবেচক পরিচালকদের (ডিরেক্টরদের) তাঁবে। বাস্তবিক পক্ষে
ডিরেক্টরদের কর্তৃত্বই বর্ত্তমান যুগের আর্থিক গড়নের বিশেষত্ব। ফরাসী
াণ্ডিত লেমোআন জার্ম্মাণির শিল্প-সংসারে কেন্দ্রীকরণের ধারা যুদ্ধের
ার কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র দিয়াছেন। লেখক
লিতেছেন,—"এ কিছু নূতন চিত্র নয়। যুদ্ধের পূর্ব্বেও জার্ম্মাণশিল্পের
তি এই দিকেই ছিল।" অষ্ট্রেলিয়ার কৃষি-সম্পদ্, আর্জ্জেণ্টিনা-ব্রেজিল-
রুগুয়ের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অন্যান্য প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হাতের রচনা।

রেভ্যি অঁ্যাদুস্ত্রিয়েল

ফরাসী ভাষায় সম্পাদিত মাসিক শিল্প-পত্রিকা। ১৯২৭ সনের
ফেব্রুয়ারি মাসে আছে,—(১) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধনোৎপাদনে "যুক্তি-
যাগ", (২) ফরাসী কয়লার বন্দরগুলাকে বর্ত্তমান মোতাবেক করিবার
পায়, (৩) চেম্বার অব্ শিপিং (জাহাজ-সঙ্ঘ) কর্ত্তৃক ইংল্যাণ্ডের
ন্দর-বিষয়ক তদন্ত কায়েম, (৪) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বাধাবিঘ্ন,
৫) রংয়ের ব্যবসায় সঙ্ঘঠন, (৬) কৃত্রিম রেশমের শিল্পে ইতালির
দ্যোগ, (৭) কৃষি-সমবায় বিষয়ক চতুর্দ্দশ ফরাসী কংগ্রেস, (৭) জার্ম্মাণিতে
রবাড়ী তৈয়ারী করিবার কাজে কর্জ্জ-সাহায্য, (৯) ১৯২৪ সন হইতে
পার বাজার।

রেভ্যি অঁতার্ণাস্যনাল দু ত্রাভাই

জেনীভার বিশ্বরাষ্ট্রপরিষৎ হইতে প্রকাশিত মজুর ও মজুর বিষয়ক

আন্তর্জ্জাতিক পত্রিকা। ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে আলবেয়ার তোমা "আটঘণ্টার রোজ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়াছেন। এই দিকে কোন্ দেশের গবর্মেণ্ট কতটা কাজ করিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত এই রচনার প্রথম কথা। ইংল্যাণ্ডে খনির মজুর সম্বন্ধে সম্প্রতি যে আইন কায়েম হইয়াছে তাহাতে আটঘণ্টার রোজ বিষয়ক নিয়ম পূরাপূরি পালিত হয় না। এদিকে ইতালিতেও নতুন আইনের ফলে আট ঘণ্টার রোজ বিষয়ক নিয়মটা চাপা পড়িবার সম্ভাবনা।

তোমা বলিতেছেন,—"ইংলণ্ডের আর ইতালির নতুন আইনগুলা বিশেষ মারাত্মক নয় বটে; কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থায় ঐক্য কায়েম করিতে হইলে এই ধরণের দুই ব্যতিরেক থাকা বাঞ্ছনীয়।" তাঁহার মতে এই সকল ব্যতিরেকের ব্যবস্থায় মজুরদের কর্ম্মজীবন খানিকটা নীচ ধাপে নামিয়া আসিতে বাধ্য। অথচ মালোৎপাদনের পরিমাণও যে বাড়িয়া যাইবে এরূপ কোনো সম্ভাবনা নাই।

আঁরি ফুস্ ১৯২৫ সনের বেকার-বিষয়ক তথ্য ও অঙ্ক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই কারখানার সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে বেকার-সমস্যার যোগাযোগ নিবিড়। বহির্ব্বাণিজ্যের উঠানামার সঙ্গেও যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু তত বেশী নয়।

বুল্‌তাঁ দ' লা শাঁবর দ্' কমার্স দ' পারি

প্যারিসের বণিক-সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯২৬ সনের শেষ তিন মাসে আছে:—(১) আটঘণ্টার রোজ বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে যুক্তি (বোদে), (২) প্যারিস জনপদের গৃহ-সমস্যা, (৩) বিদেশে ফরাসী দূত ও কন্‌সালদের আর্থিক জীবন। লেখক

ব্রিজঁ বলিতেছেন,—"১৯২৬ সনে বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স নগরে ইংরেজ রাষ্ট্রপ্রতিনিধি পাইতেন বৎসরে ৭০৪,০০০ বেলজিয়ান ফ্রাঁ, ব্রেজিলের প্রতিনিধি পাইতেন ১৯২,৯০০ ফ্রাঁ, কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিনিধি পাইতেন ১৮৫,০০০ ফ্রাঁ মাত্র। প্রতিনিধিদের অবস্থাই এইরূপ। সরকারী কেরাণী ইত্যাদির অবস্থা এই অনুপাতের চেয়েও ছোটো দরের। ইহাতে বিদেশে ফ্রান্সের ইজ্জৎ যায়।" (৪) রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর কর রদ করা আবশ্যক (সুরি)। (৫) মজুর-দুনিয়ায় বিরোধ ঘুচাইবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ল্যেব্‌নিট্‌জ্‌ বলিতেছেন,— "এ জন্য কোনো আইন কায়েম হওয়া উচিত নয়। হইলেই গণ্ডগোল বেশী বাড়িবে। যে-যে দলে বিরোধ তাহারা আপনা হইতেই স্বাধীনভাবে বিরোধ ঘুচাইবার কাজে অগ্রসর হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।"

১৯২৭ সনের এক সংখ্যায় সুরি "রপ্তানি-বাণিজ্যে কর্জ্জদান" সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ দিয়াছেন। জগতের নানা দেশে আজকাল বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কসমূহের কাজে সাহায্য করিবার জন্য বীমা-প্রতিষ্ঠান কায়েম হইতেছে। ফ্রান্সে ও আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে গবর্মেণ্ট কর আদায় করিবে কোন্ প্রণালীতে? ফ্রান্সে এই সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে যে, সমুদ্র-বীমা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলার সঙ্গে এই নতুন কর্জ্জবীমা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান সমূহকে এক গোত্রে ফেলা উচিত। সেই মর্ম্মে আইনের খস্‌ড়াও প্রস্তুত হইয়াছে।

প্যারিসের চেম্বার অব কমার্স (বণিক সঙ্ঘ) কর্ত্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রিকার আর এক সংখ্যায় (১) বাণিজ্য-জাহাজ সম্বন্ধে লেখক হুরি গঠন-শুল্ক বা নির্ম্মাণের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য চাহিতেছেন।

(২) বিদেশী টাকাকড়ির কেনা-বেচা "বাঁক্ দ' ফ্রাঁস" নামক নোট-ব্যাঙ্কের একচেটিয়া কারবার হউক এইরূপ এক প্রস্তাব চলিতেছিল। ব্রিজঁ বলিতেছেন:—"এইরূপ একতিয়ার দেওয়া যাইতে পারেনা। জনসাধারণের হাতেই এই ক্ষমতা যেমন আছে তেমন থাকুক।"

অন্য এক সংখ্যায় দৈববীমা বিষয়ক আইন-সংস্কার আলোচিত হইয়াছে। গোদার এবং গোনিও এই দুই জনে পার্ল্যামেণ্টে ১৮৯৮ সনের আইনটা সংস্কার করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছেন। ফ্যাক্টরিতে কাজ করিতে করিতে মজুর ও কর্ম্মচারীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি মারাত্মক-রূপে জখম হয় অর্থাৎ ভবিষ্যতের কর্ম্মক্ষমতা পূরাপূরি হারাইয়া বসে, তাহা হইলে মালিকেরা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য আছে। আইন-টার সংস্কার সাধিত হইলে ক্ষতিপূরণের হার বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু "শাঁবর" অর্থাৎ বণিকসঙ্ঘ এই হার-বৃদ্ধির বিরোধী।

"রেভ্যি দ'ফ্রাঁস"

১৯২৭ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বোনে ইতালির মুদ্রানীতি সম্বন্ধে সমালোচনা চালাইয়া ফরাসী জাতিকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। ইতালির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ফরাসী মুদ্রা-সংস্কারকেরা ফ্রান্সে নতুন আইন চাহিয়া থাকেন। বোনে বলিতেছেন,—"ইতালিতে মুদ্রা-সংস্কার ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার জন্য ইতালিকে আর্থিক হিসাবে ভুগিতেও হইতেছে জবর। ইতালির আমদানি-রপ্তানিতে একটা সমতা দেখা দিতেছে সত্য। কিন্তু তাহার আসল কারণ কি? ইতালিয়ানরা জোর জবরদস্তি করিয়া বিদেশী মাল কিনিতেছে কম। অপর দিকে শিল্প-জগতে মন্দা চলিতেছে। বেকার-সংখ্যা তাহার এক সাক্ষী। নতুন-নতুন কোম্পানী কায়েম হওয়া অনেকটা কমিয়াছে। টাকার বাজারে ব্যবসায়ীরা ধার

াইতেছে না। অনেক কোম্পানীর অংশের দাম নামিয়া গিয়াছে। দ্রা-সংস্কারের ফলে লিয়ারের দর বাড়িয়াছে। কাজেই বাজার দর মা উচিত ছিল, কিন্তু যথোচিত পরিমাণে কমে নাই। দর কমাই-ার জন্য কড়া আইন জারি হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সুফল ফলিতেছে না। াহার উপর আর এক কথা। ইতালিয়ান বাজেটের তিন ভাগের ক ভাগই হইতেছে সরকারী কর্জ্জের চাপ। বাজেটের আয় অনুসারে ্যয় চালানো অসম্ভব। মার্কিণ পুঁজিপতিদের নিকট হইতে প্রতি াসে ইতালিয়ান শিল্প-বাণিজ্যের জন্য টাকা আমদানি হইতেছে। াহার ফলে সরকারী গৃহস্থালীতে খরচমাফিক আয় জুটিতেছে। কিন্তু ই অবস্থাকে কোনো মতেই অনুকরণযোগ্য বিবেচনা করা চলে না।

"রেভ্যি দ' পারি"

১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে লেস্কুর ইতালির মুদ্রা-সংস্কার সম্বন্ধে লিতেছেন যে, ইতালি ছাড়া অন্য কোনো দেশে এইরূপ জবরদস্তি লিতে পারিত না। কোনো স্বরাজশীল সমাজ মুসলিনির আইন হিবে না। অধিকন্তু এই সংস্কারে সুফল ফলিবে কিনা সন্দেহ। দশের ভিতরকার সরকারী কর্জ্জ আধাআধি রদ করিবার পর মুসলিনি দ্রা-সংস্কারে হাত দিয়াছেন। এই জুলুম ফরাসী ধাতে হজম করা াসম্ভব,—ইত্যাদি।

জুর্ণাল দেজ্‌ একনমিস্ত্‌

"ধনবিজ্ঞান-সেবীদের পত্রিকা,"—প্যারিসের মাসিক। প্যারিসের সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক্‌" (ধন-বিজ্ঞান পরিষদ) এর খপত্র।* নবেম্বর ১৯২৫। এই সংখ্যার এক প্রবন্ধে জার্ম্মাণির

*গ্রন্থকার এই সোসিয়েতের আজীবন সভ্য। (১৯২০ সন হইতে)।

আর্থিক ক্রমবিকাশ বিবৃত করিয়া দ' গিশে বলিতেছেন, "১৯২২ সনের পর হইতে জার্ম্মাণির শিল্প-কারবার দিন দিন ফুলিয়া উঠিয়াছে। এদিকে জার্ম্মাণিতে চষা জমির এবং চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যারপর নাই কম। অথচ লোক-সংখ্যা বেশ বাড়িতেছে আর মৃত্যুর হারও খুব নামিয়া আসিয়াছে। কাজেই পূর্ব্বদিকে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং পশ্চিম প্রান্তে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মাণির লড়াই একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী।"

ডিসেম্বর ১৯২৫। বিলাতের বেকার-সমস্যা আলোচিত হইয়াছে এক প্রবন্ধে। লেখক রিয়ফ বলিতেছেন,—"১৯২০ হইতে ১৯২৫ সনের বাজার-দর আর মজুরির হার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই দুইয়ের পরস্পর-সম্বন্ধের উপরই বেকার-সংখ্যা নির্ভর করিয়াছে। বাজার-দরের সঙ্গে মজুরির হারের সমতা না থাকাতেই বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ বলা চলে। দরের উঠা-নামা চলিয়াছে আগে-আগে, আর পিছু-পিছু,—যদিও কিছু বিলম্বে,—চলিয়াছে মজুরির হার। এমন এক সময় উপস্থিত হইল যখন বাজার-দর স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ, মুদ্রাসংস্কারের সঙ্গে-সঙ্গে টাকা-কড়ির দাম বাড়িয়া যাওয়ায় বাজার-দর কমিয়াই গেল। কিন্তু এখন মজুরেরা মজুরির হার কমাইতে আর রাজি হইল না। এখন বেকার-সমস্যা মীমাংসার উপায় হইতেছে নিম্নলিখিত দু'য়ের এক। হয়, বাজারদর বাড়াইতে হইবে, কিন্তু মজুরির হার বাড়াইতে হইবে না। অথবা বাজারদর যেরূপ আছে সেরূপই থাকুক, কিন্তু মজুরির হার নামাইতে হইবে।"

১৯২৮ সনে ৮৭ বৎসর সুরু হইল। জানুয়ারি সংখ্যায় আছে, (১) ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের সরকারী আয়ব্যয়ের সমতা (ঈভ্ পীয়ো), (২) রেল-মজুরদের বেতন (রথ্ শিল্ড্), (৩) মরক্কোয় ফরাসী শাসন (সুভির্ঝঁ), (৪) পুঁজিবিষয়ক রপ্তানি নিরোধের আইন-রদ, (৫) দেশ-

বিদেশের মুদ্রায় স্থিতীকরণ, (৬) ফ্রান্সের চেকখালাস-ভবন,—১৯২৭ সনের কারবার, (৭) ইন্দোচীনের বর্ত্তমান অবস্থা (পিয়ের) (৮) প্যারিসের বসতবাড়ী, স্বাস্থ্য ও বাজার-দর, (৯) সাহারায় রেলের প্রস্তাব (ভালো), (১২) ফরাসীরা কুদ্রত্তি মাল আমদানি করে কত আর কারখানা-জাত মাল রপ্তানি করে কত (পুর্প্যা), (১৩) ফ্রান্সের বোলশেভিক-বিপদ (মঁদে), (১৪) অশুল্ক-বাণিজ্য-পরিষদের কাজকর্ম্ম, (১৫) আর্থিক সংবাদ, (১৬) ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষদের মাসিক সভায় জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ ব্যাঙ্ক-ব্যবসাবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা, (১৭) গ্রন্থসমালোচনা, (১৮) আর্থিক ইতিহাসের তথ্য।

"বুলতা দ' লা সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক"

ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষদের পত্রিকা, প্যারিস, ৫ জানুয়ারি ১৯৩৪।

এই পরিষদের সভাপতি সেনেটার রাফায়েল-জর্জ্জ লেভির মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় আশী বৎসর। তিনি রাজস্ব-বিজ্ঞানের ওস্তাদ ছিলেন। ব্যাঙ্ক চালানো তাঁর ব্যবসা ছিল। এই সংখ্যায় পরিষদের এক সভার বৃত্তান্ত আছে। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "ট্যাক্স এড়াইবার জুচ্চুরি"। বক্তা ছিলেন লকার্পাতিয়ে। জুচ্চুরির স্বপক্ষে-বিপক্ষে নানাপ্রকার আলোচনা দেখা যাইতেছে। প্রেসিডেণ্ট ক্রুশি বলিতেছেন :—"গবর্মেণ্টকে ট্যাক্স দেওয়া প্রত্যেক নরনারীরই কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে জুচ্চুরি চালানো উচিত নয়। কিন্তু গবর্মেণ্ট নিজেই যদি জুচ্চুরি চালায় তাহা হইলে জনসাধারণ আত্মরক্ষার জন্য জুচ্চুরি চালাইতে বাধ্য হয়। গবর্মেণ্টের পক্ষে জুচ্চুরি চালানো সম্ভব হয় কি করিয়া?

জনসাধারণের মঙ্গল যখন গবর্মেণ্টের লক্ষ্য না থাকে, তাহার পরিবর্ত্তে রাজনৈতিক মতলব হাঁসিল করা যখন লক্ষ্য হয়, তখন গবর্মেণ্টের খরচপত্রের সঙ্গে জুচ্চুরি মাখানো থাকে বুঝিতে হইবে। গবর্মেণ্ট যদি নিজের দলের ভোটারদেরকে হাতে রাখিবার জন্ম তাহাদের মতলবমাফিক খরচপত্র করে তাহা হইলে দেশে সুবিচার চলিতে পারে না। সেই অবস্থায় জনসাধারণ নিজকে অস্পৃশ্য 'পারিয়া' স্বরূপ বিবেচনা করিতে বাধ্য হয়। তখন তাহার পক্ষে "চাচা আপন বাঁচা" নীতিই স্বাভাবিক। অর্থাৎ জনসাধারণ তখন গবর্মেণ্টকে দেদার ঠকাইতে সুরু করে। যেন-তেন প্রকারেণ ট্যাক্‌স এড়ানো তখন দেশের লোকের স্বধর্ম্মে পরিণত হয়।

"অধিকন্তু গবর্মেণ্ট যদি নিজে 'জোচ্চোর' না হয় তখনও অন্য কারণে জনসাধারণ গবর্মেণ্টকে ঠকাইতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সে আবার কখন? যখন অবুঝের মতন গবর্মেণ্ট অত্যধিক চড়া হারে ট্যাক্‌স বসাইতে লাগিয়া যায়। যা-রয়-সয় সেইরূপ হার সর্ব্বদাই গবর্মেণ্টের মেজাজে থাকা উচিত।

"জুর্ণাল্ দু কোম্যাস"

বাণিজ্য-পত্রিকা, প্যারিস, ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৩। নিম্নলিখিত বিষয়ে রচনা আছে :—

(১) টাকার বিনিময় লইয়া আড়াআড়ি (মাক্‌স্ ইম্যাঁ), (২) স্বদেশী বাজার বাঁচাইবার জন্য বেলজিয়ামের চেষ্টা (বার্জ্যঁ), (৩) দুনিয়ার ইস্পাত ও লৌহশিল্প (বালাঁদ), (৪) ফাশিস্ত সরকারের কৃষি-নীতি (ইতালির বেনিত মুসলিনি), (৫) মধ্য ইয়োরোপের আর্থিক সংগঠন (চেকোস্লোভাকিয়ার ডক্টর বেনেশ), (৬) অটো-

মোবিলের উপর শুল্ক-লোপ, তাহার পরিবর্ত্তে তেলের উপর নয়া শুল্ক (ম্যাঁদ-ফ্রাঁস), (৭) ফরাসী উপনিবেশে ফরাসী মদ রপ্তানি (তুয়ার্শ), (৮) ফ্রান্সের মফস্বল (সংবাদ পত্রের মারফৎ), (৯) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যভবন।

এক রচনায় লেখক বলিতেছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার সকল বহির্ব্বাণিজ্যই সরকারী ভাবে আনিতেছে। সোভিয়েট রুশিয়ার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইতে চলিল। সরকারী দপ্তর আমদানি-রপ্তানির গতিবিধি এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিবে। যে দেশ আমেরিকার মাল আমদানি করিতে রাজি সেই দেশ হইতে এই দপ্তর আমেরিকায় মাল আমদানির সুযোগ সৃষ্টি করিবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষপাতমূলক শুল্ক-নীতির পর দুনিয়ার সকল দেশই এই মার্কিণ কৌশলের দিকে ঝুঁকিতে বাধ্য। মার্কিণ সরকার ইতিমধ্যে বিলাত, ফ্রান্স, আর্জ্জেণ্টিনা, চিলি, পর্ত্তুগাল ইত্যাদি দেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করিয়াছে।

আর এক রচনায় দেখিতেছি যে, "জাপানী আতঙ্কে" ইতালিয়ানরাও হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরস্থিত জনপদের নানা অঞ্চলে ইতালিয়ান মাল জাপানী মালের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিতেছে না। এইবার তাহা হইলে রপ্তানি-লড়াই সুরু হইতে চলিল। জাপানী আতঙ্কে ইয়োরামেরিকার বণিকশিল্পীরা যারপর নাই ব্যতিব্যস্ত।

১১ জানুয়ারি ১৯৩৪ :—(১) ফ্রান্সের ধাতু-শিল্প (১৯২৯-৩৩)। লেখকের নাম বালাঁদ। ১৯৩২ সনে ইস্পাতশিল্পে "যুক্তিযোগ" কায়েম হইয়াছে জবরভাবে। সার-জনপদের ইস্পাত কারখানাও ফরাসী সঙ্ঘের সঙ্গে গাঁথা হইয়াছে। (২) ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের নবীন সমস্যা।

অধ্যাপক কোবু বলিতেছেন যে, দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এই বিশ্বব্যাপী মন্দার যুগে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মে গবর্মেণ্ট খুব জোরের সহিত হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর এক কথা। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ব্যাঙ্কের জিম্মায় টাকা আসিয়া জমিতেছে বিস্তর। অথচ টাকা খাটাইবার সুযোগ খুব অল্প। কোথায় কোন্ ব্যবসায় কত টাকা খাটাইতে হইবে এই সম্বন্ধে গবর্মেণ্টগুলা আজকাল সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর জার্ম্মাণির হিট্‌লার-রাজ এই কর্ম্মকৌশলের প্রবল দৃষ্টান্ত। এই বিশ্বব্যাপী নয়া ব্যাঙ্ক-নীতির বাহিরে কাজ করিতেছে বিলাত ও ফ্রান্স। লেখকের মতে বিলাতে হয়ত ব্যাঙ্কের স্বাধীনতা ভবিষ্যতেও বজায় থাকিবে। কিন্তু ফ্রান্সে সরকারী হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। (৩) ফ্রান্সে বিলাতী ধরণের সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ নীতি (মঁ্যাদ-ফ্রাঁস)।

১৮ জানুয়ারি ১৯৩৪ :—(১) শুল্ক-নীতির নবরূপ (ইমঁা), (২) চিনি-ব্যবসায় ফ্রান্স ও ফরাসী উপনিবেশের সমঝোতা, (৩) মার্কিণ খাজাঞ্চিখানায় টাকার অভাব ও সরকারী কর্জ্জগ্রহণ। টাকা ধার পাইতে হইলে টাকার মূল্য কমাইলে চলিবে না। কেন না তাহা হইলে কর্জ্জ দিবার লোক ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে না। অথচ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট টাকার মূল্য কমাইয়া জিনিষের দাম বাড়াইতে সচেষ্ট। "কাজেই সমস্যা",—বলিতেছেন মার্সেল পেই। শেষ পর্য্যন্ত টাকার দাম কমানো বন্ধ করিয়া তাহাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করাই রুজ-ভেল্টের মুদ্রানীতি থাকিতে বাধ্য। (৩) আমেরিকার মুদ্রা-সংস্কার (জাক ওম্‌সে)। প্রথম ধাপে মার্কিণ গবর্মেণ্ট ডলারের দাম কমাইয়া দিল। দ্বিতীয় ধাপে সোনা কেনা হইতে থাকিল দেদার। তাহার দরুণ জিনিষপত্রের দাম বাড়ানো হইল বেশ-কিছু। এইবার তৃতীয় ধাপ। মার্কিণ মুল্লুকে যতখানি সোনা আছে সবই টানিয়া

আনা হইতেছে খাজাঞ্চিখানায়। আর তার কিম্মৎ ধরা হইবে আসল কিম্মতের শতকরা ৬০ অংশ মাত্র।

২৫ জানুয়ারি ১৯৩৪ :—(১) আন্তর্জ্জাতিক বণিকসঙ্ঘের সেক্রেটারী ভাস্তয়র দুনিয়ার বার্ত্তা সম্বন্ধে আলোচনা চালাইয়া বলিতেছেন যে, দেশ-বিদেশের সঙ্গে পরস্পর বাণিজ্য বাড়াইবার পাঁতি আবিষ্কার করা এক হিসাবে কঠিন নয়। আসল দরকারী জিনিষ হইল সন্তোষজনক বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা। বাণিজ্যনীতিটাও বদলানো আবশ্যক। মাল-চলাচল, লোক-চলাচল, পুঁজি-চলাচল আর মজুর-চলাচল যাহাতে বিনা বাধায় সাধিত হয় তাহার জন্য আয়োজন চাই। এই সকল ক্ষেত্রে যে সমুদয় বাধাবিঘ্ন আছে সেই সব দূর করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টই আমদানির উপর শুল্কের হার কমাইতে অগ্রসর হউন। শুল্ক কমাইবার জন্য সমঝৌতা কায়েম করা যাইতে পারে দুই উপায়ে। প্রথমতঃ, যে-কোনো দুই দেশের ভিতর সন্ধি চালানো সম্ভব। তাহারা বলিবে যে, পরস্পরের পক্ষপাত করা তাহাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধের প্রথম খুঁটা। এই ধরণের দুয়ে-দুয়ে পক্ষপাতমূলক সমঝৌতা কায়েম করা অতি মামুলি জিনিষ। ইহার ভিতর নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে আজকাল এইদিকে জোরসে কাজ হওয়া আবশ্যক। শুল্ক কমাইবার জন্য আর একটা নতুন,—দ্বিতীয় প্রণালী কায়েম করা চলিতে পারে। এই প্রণালীকে ভাস্তয়র যুগান্তর-সাধক অতি-সাহসিক প্রণালী সমঝিতেছেন। কেননা তাহার বিধানে সম্-ঝৌতাগুলা অনেকগুলা দেশের ভিতর ছড়ানো যাইবে। একসঙ্গে বহুসংখ্যক জনপদ পরস্পর-পক্ষপাতের সমঝৌতা কায়েম করিতে অগ্রসর হইলে এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু তাহা সহজে সম্ভবপর নয়। ফ্রান্স আর বিলাতের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য

হইয়াছে, কেননা এই দুই দেশের তাঁবে সাম্রাজ্য চলিতেছে। অন্যান্য দেশের পক্ষে বহুত্বের ভিতর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন, বলাই বাহুল্য।

(২) প্যারিসে অবস্থিত জার্ম্মাণ বণিকসঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট হোফমান বলিতেছেন যে, ফ্রান্সে-জার্ম্মাণিতে যে নতুন বাণিজ্যিক কথাবার্ত্তা চলিতেছে তাহাতে দুই দেশের আমদানি-রপ্তানির বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। (৩) ফ্রান্সে-বেলজিয়ামে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বাড়িতেছে না বরং কমিতেছে,—এই হইল বেলজিয়ান বণিকসঙ্ঘের প্রেসিডেণ্টের বাণী। (৪) অপর দিকে রুশ বণিকসঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট ইগ্‌নাতিয়েফ বলিতেছেন যে, ফ্রান্সের সঙ্গে রুশিয়ার লেনদেন বাড়িয়া যাইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল। (৫) মার্কিণ মতও সেইরূপ। আমেরিকার সঙ্গে ফ্রান্সের সমঝৌতা কায়েম হইয়াছে কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি সম্বন্ধে। (৬) ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সের বন্দোবস্ত এখনও সুবিধাজনক নয়। ইতালিয়ান বণিকসঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট মরান্দি বলিয়াছেন যে, ফ্রান্স যদি ইতালিয়ান মালের আমদানি সুনজরে দেখিতে প্রস্তুত থাকে তাহা হইলে ফ্রান্স-বিরোধী শুল্কসমূহ ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট তুলিয়া দিতে রাজি। (৭) বিলাতী বণিক্‌সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট ওয়েলম্যান বলিতেছেন :—"বিশ্ব-সমঝৌতার বুজরুকি সিঁকায় তুলিয়া রাখা আবশ্যক। তাহার বদলে চাই দেশে-দেশে পরস্পর অভাব-সুযোগ অনুসারে পারস্পরিক পক্ষপাত। তথাকথিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের পাঁতি মুখে মুখে আওড়াইয়া লাভ নাই। প্রত্যেক দেশের জন্য চাই,—যে-জাতির সঙ্গে যে-পাঁতি উভয়ের পক্ষে উপকারী তাহার ব্যবস্থা করা।" ইহাকেই বলে বস্তুনিষ্ঠ শুল্কনীতি।

৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৪ :—(১) ফ্রান্সেও রেল বনাম সড়ক বা সড়ক

বনাম রেল সমস্যা আছে। এই সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়াই গুলতান চলিতেছে। এঞ্জিনিয়ার আঁরি মালে এই দুয়ের সামঞ্জস্য-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা চালাইয়া বলিতেছেন :—"রেল আর সড়ককে ঐক্যবদ্ধ কানুনের তাঁবে আনা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনোপ্রকার কানুন জারি করিবার পূর্ব্বে দুয়ের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ একরূপ হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে রহিয়াছে রেলগুলির বিধিব্যবস্থা সবই প্রায় পূরাপূরি সরকারী নিয়মের অধীন। অপর দিকে সড়কগুলার মা-বাপ কেহই নয়। এইসব একদম ষোলআনা স্বাধীন।"

(২) আমেরিকায় ডলার-পতনের পর হইতে ইয়োরোপের "সোনার সিক্কা"ওয়ালা দেশগুলার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে। অনেকেই বলাবলি করিতেছে,—"ইংরেজ যাহা করিল, ভারত যাহা করিল, জাপান যাহা করিল, আমেরিকা যাহা করিল, এমন কি চেকোশ্লোভাকিয়া যাহা করিল, আমরাই বা তাহা করিব না কেন? সোনার টাকা কি আমরা গিলিয়া খাইতে পারি যে, সোনার দাসত্ব চাই-ই চাই? ফ্রাঁর মূল্য সোনার দরে কমাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে আজ জরুরি। বিলাত, জাপান ও আমেরিকার সঙ্গে বহির্ব্বাণিজ্যে টক্কর দিতে হইলে, ফরাসী মাল বিদেশে বেশী পরিমাণে বেচিবার জন্য, বিশেষতঃ এইসকল দেশের মাল ফরাসী বাজারে রুখিতে হইলে ফরাসী মুদ্রার দাম কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক।" এই ধরণের ফ্রাঁ-পতন বিষয়ক প্রস্তাব আলোচনা করিয়া পিয়ের কোবু বলিতেছেন :—"চেকোশ্লোভাকিয়া নিজ মুদ্রার মূল্য কমাইয়া দিয়াছে শতকরা ১৬ অংশ। এই দেখিয়া ফরাসী বেপারী মহলে ফ্রাঁর মূল্য শতকরা ১৬ অংশ কমাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন রুজু হইয়াছে। অধ্যাপক নোগারোর মতে স্বর্ণমান তুলিয়া দিবার দরকার নাই।

ফ্রাঁর মূল্য কমাইয়া দেওয়া চলিতে পারে।" কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে বিচক্ষণ বেপারী আর বহুসংখ্যক অর্থশাস্ত্রী রায় দিতেছেন। কোবুর প্রবন্ধে দেখিতেছি :—"চেকোস্লোভাকিয়া মুদ্রার মূল্য কমাইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার ফলে জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক বাড়িয়াছে। দেশসুদ্ধু লোক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। এই উত্তেজনা হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য গবর্মেণ্ট জোর জবরদস্তি করিয়া আইনের প্রভাবে মূল্যবৃদ্ধি কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। ফ্রান্সে এইরূপ কাণ্ড ঘটিলে রীতিমত লাল তামাসা সুরু হইয়া যাইবে। ফরাসী গবর্মেণ্টের পক্ষে আইনের একতিয়ার দেখাইতে যাওয়া আহাম্মুকি করার সমান হইবে। সুতরাং ফ্রাঁর মূল্য কমাইয়া জিনিষ-পত্রের দাম বাড়াইতে গেলে বহির্ব্বাণিজ্যে ফ্রান্সের লোকসান ছাড়া লাভ নাই। কেননা আন্তর্জ্জাতিক টক্করে ফরাসী বণিকশিল্পীরা সহজেই পরাস্ত হইবে।"

কেহ কেহ বিলাতী দৃষ্টান্ত দিয়া ফরাসী জাতকে ফ্রাঁর দাম কমাইতে উৎসাহিত করিতেছে। এই সম্বন্ধে কোবু বলিতেছেন :—"ইংরেজ যে-সময়ে পাউণ্ডের মূল্য কমাইয়া দিয়াছিল সেই সময়ে জিনিষপত্রের দাম হুহু করিয়া নামিতেছিল। কাজেই খানিকটা মূল্যবৃদ্ধিতে ইংল্যাণ্ডের ক্ষতি হয় নাই। অধিকন্তু ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজরা যে-সকল দেশ হইতে কুদরত্তি মাল কিনিতে অভ্যস্ত তাহাদের মুদ্রাপতনও ঘটে। কাজেই সেই সকল দেশেও বিলাতী মূল্যবৃদ্ধির সমান-সমান মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। কাজেই বিদেশী মালের প্লাবন ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু ফ্রান্সের অবস্থা বিলাতের অবস্থার মত নয়। ফ্রান্সে মূল্যবৃদ্ধি সুরু হইলে বিদেশী মাল আসিয়া ফরাসী বাজারকে ডুবাইয়া দিতে পারিবে। অপর পক্ষে বিদেশে ফরাসী মালের রপ্তানি কমিবে ছাড়া বাড়িবে না।"

অন্যান্য প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ :—

(৩) রপ্তানি বাড়াইবার কর্ম্মকৌশল (মঁতাঞ), (৪) ইস্পাতের কারবারে সঙ্ঘগঠন। লেখক মোরিস ওলিভিয়ে বলিতেছেন,—"এই সঙ্ঘগঠনে গবর্মেণ্টের কোনো হাত থাকা উচিত নয়। ইস্পাতের কারখানার বেপারীরা স্বাধীনভাবে এইটা গড়িয়া তুলুন।" (৫) বিদেশীরা ফ্রান্সে আসিয়া মজুরি করে। এই সকল বিদেশী মজুরের উপর ট্যাক্স বসাইবার কথা উঠিয়াছে। ফরাসী মজুর-সমিতির সেক্রেটারী বোথ্রো বলিতেছেন—"ফরাসী সমাজের তরফ হইতে বিদেশীর উপর ট্যাক্স চাপানো অন্যায় ও নিরর্থক হইবে। অধিকন্তু এই ট্যাক্স আদায় করিলে সরকারী খাজাঞ্চিখানায় হাঁড়ি-হাঁড়ি টাকা আসিয়া মজুত হইবে না।"

ফরাসী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন আবশ্যক। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন লেভাস্যর। তাঁহার মতে যখনই মন্ত্রিমণ্ডলে গোলযোগ উপস্থিত হয় তখনই "শাঁবর দে দেপুতে" নামক ফরাসী কমন্স-সভার বদল হওয়া আবশ্যক।

জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা

ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান ও অঙ্ক-তালিকা বা সংখ্যা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মর্ত্তারা সম্পাদক।

নবেম্বর ১৯২৬—(১) ইতালিকে আর্থিক হিসাবে স্বাধীন করিবার উপায়। বড় বড় দেশগুলার ভিতর ইতালির মতন পরাধীন দেশ আর একটাও নাই। ইতালিকে স্বাধীন করিতে হইলে প্রথমতঃ আবশ্যক শুল্কনীতির সংস্কার। দ্বিতীয়তঃ চাই টেক্‌নিক্যাল আর যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত উন্নতি (মর্ত্তারা)। (২) মূল্য-সমস্যা (কালি ়।

ফেব্রুয়ারি ১৯২৭—(১) ঝুঁকির অর্থকথা। ঝুঁকি একমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে না। বর্ত্তমানের তথ্যসমূহ আর অতীতের বিকাশ-কথা না জানার দরুণ ও ঝুঁকি-সমস্যা উপস্থিত হয় (কেস্‌মা), (২) বেলজিয়ামের মুদ্রায় স্থিতীকরণ (ফস্‌সাতি), (৩) নেপ্‌লস্‌ বন্দর (মিল্‌নো)। মার্চ ১৯২৭—(১) সঙ্কট-তত্ত্ব (দেল্‌ ভেক্কা), (২) মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস। ইহাতে ইতালির সকল প্রকার সম্পত্তিওয়ালা লোকজনের লাভ হইয়াছে (দনভিত)।

নভেম্বর ১৯২৭ এর সংখ্যায় আছে :—(১) মুদ্রা-সংস্কারের বিভিন্ন ফলাফল তুলনা। লেখক মর্ত্তারা বলিতেছেন যে, মহাযুদ্ধের পর দুনিয়ার নানাদেশেই মুদ্রা-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ইতালির মুদ্রা-সংস্কারে এই হিসাবে কোনো বিশেষত্ব নাই। তবে একটা বিশেষত্ব আছে সংস্কারের মাত্রায়। ইতালির মুদ্রা আজ প্রাগ্‌-যুদ্ধ মুদ্রা-ব্যবস্থার অনুপাতে শতকরা ২৮·২৪ অংশ সোনায় প্রতিষ্ঠিত। যখন ইতালিয়ান লিয়ারের চরম দুর্গতি তখন—অর্থাৎ ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে সোনার পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬·৯৭%। বুঝিতে হইবে যে, মুদ্রা-সংস্কারকেরা শতকরা ১৬·৯৭ হইতে লিয়ারকে ২৮·২৪ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়াছে। অর্থাৎ সংস্কারের মাত্রা শতকরা ৬৬ অংশ। লেখক ২২টা বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-সংস্কারের মাত্রা তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে, ইতালির সমান কোনো বড় দেশে এই উঁচু মাত্রা দেখা যায় না। (২) লড়াইয়ের রাজস্ব-নীতি আর যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের ইতালিয়ান রাজস্ব-ব্যবস্থা (রেপাচি)। (৩) গ্রন্থসমালোচনা (৪০ খানা ইংরেজি, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান বইয়ের ছোট-বড়-মাঝারি খতিয়ান)।

এই পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় আছে,—(১) চেকোস্লোভাকিয়ার মুদ্রা-কথা (ক্রুগিয়ের), (২) যানবাহনে অটোমোবিলের স্থান (বুচ্চেল্লা)

(৩) গ্রন্থসমালোচনা (২৫ খানা বইয়ের পরিচয়), (৪) ১৯২৭ সনের প্রথম আট মাসে ইতালির বিভিন্ন পত্রিকায় যত আর্থিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার সূচীপত্র। সূচীপত্র নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত :—(ক) আর্থিক মতবাদের ইতিহাস, (খ) আর্থিক জীবনের ইতিহাস, (গ) জীবন বৃত্তান্ত, (ঘ) আর্থিক ভূগোল ও লোক-বৃত্তান্ত, (ঙ) আর্থিক তত্ত্ব, (চ) সমাজ-বীমা, (ছ) রাজস্ব, (জ) আর্থিক জীবন। এই বিষয়টা স্বতন্ত্র দশ শাখায় বিভক্ত :—(১) বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থা (২) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক-নীতি, (৩) কৃষিশিল্পবাণিজ্যের শাসন ও পরিচালন, (৪) আর্থিক সঙ্ঘ, (৫) টাকাকড়ি ও বাজার-দর, (৬) যানবাহন, (৭) ঘরবাড়ী, (৮) ভূমি ও বনসম্পদ, (৯) খনি ও ধাতু শিল্প, (১০) তূলা ও অন্যান্য শিল্পের বাজার ও কুদরতী মাল।

"রিভিস্তা ইন্তার্ণাৎস্যনালে দি সিয়েন্ৎসে সচ্যালি"

সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক পত্রিকা; ইতালিয়ান ভাষায় সম্পাদিত। ত্রৈমাসিক। ১৯২৭ সনের তৃতীয় সংখ্যায় রোম শহরের ঘরবাড়ী-সমস্যা সম্বন্ধে রমাণ নামক এক ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত আট বৎসরের কথা বিবৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও লোকেরা পল্লী ছাড়িয়া শহরে আসিতেছে। গৃহ-সমস্যার সনাতন কারণই এই। অপর দিকে গবর্মেণ্ট সকল দেশেই বাড়ীওয়ালাদের উপর খড়্গহস্ত। জনসাধারণের সুখ-দুঃখে দরদী হইয়া গবর্মেণ্ট পুঁজিপতিদের নিকট হইতে ঘরবাড়ী বাবদ চড়া হারে কর আদায় করিতে অভ্যস্ত। কাজেই পুঁজিওয়ালারা আর বাড়ী তৈয়ারীর ব্যবসায় গা করে না। গৃহ-সমস্যার এই গেল দ্বিতীয় সনাতন দফা। তাহা ছাড়া অন্যান্য দেশের

স্তায় ইতালিতেও সমবায়-নিয়ন্ত্রিত গৃহনির্ম্মাণ-সমিতি নামক কতকগুলা কোম্পানী আছে। তাহারা অনেক সময়েই নামে মাত্র সমবায়-ধর্ম্মী। কিন্তু গায়ে সমবায়ের গন্ধ থাকার দরুণ তাহারা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে। ফাঁকতালে কতকগুলা ছুঁদে লোক দু' পয়সা করিয়া লইতেছে। কাজেই মোটের উপর ত্র্যহস্পর্শ। এই তিন দফার আওতা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? লেখক বলিতেছেন,—"ঘরবাড়ীর ব্যবসাটাকে সরকারী আইন-কানুনের বাঁধ হইতে রেহাই দাও। পুঁজিওয়ালারা নিজ স্বার্থের খাতিরেই গণ্ডা-গণ্ডা ডজন-ডজন ইমারত কায়েম করিতে লাগিয়া যাইবে।"

"নুঅভা আন্তলজিয়া"

ইতালিয়ান মাসিক। আঞ্জেল লিখিয়াছেন ১৯২৭ সনে জেনীভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন সম্বন্ধে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ,—(১) দুনিয়ার ধনদৌলত-বিষয়ক তথ্যমূলক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা, (২) আর্থিক দুনিয়ায় আন্তর্জ্জাতিকতার অর্থাৎ ঐক্য বন্ধনের পথ বাৎলাইয়া দেওয়া। সম্মেলনের আলোচনার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে তিনটা,—(১) ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল দেশেই শুল্কের হার কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক, (২) শিল্পকর্ম্মের ক্ষেত্রে মালোৎপাদনের খরচ যাহাতে কমিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা। এইজন্য আবশ্যক "র‍্যাশন্যালিজেশন" অর্থাৎ যুক্তি-যোগ যার অন্যতম মূর্ত্তি হইতেছে সঙ্ঘগঠন। আরও আবশ্যক শিল্প-সঙ্ঘগুলাকে আন্তর্জ্জাতিক ভাবে পরিচালিত করা। (৩) কৃষিকর্ম্মে জোর দেওয়া চাই সমবায় প্রথার উপর। চাষ ও চাষীর জন্য চাই সহজে টাকা কর্জ্জ পাওয়ার ব্যবস্থা। আর চাষের ফসল যাহাতে নির্ব্বিবাদে দেশ হইতে দেশান্তরে চালান হইতে পারে সেই দিকে নজর রাখাও আবশ্যক।

গেরার্খিয়া

এই ইতালিয়ান পত্রিকায় ফেরি জেনীভায় অনুষ্ঠিত উপরোক্ত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন সম্বন্ধে টিপ্পনী মারিয়াছেন। বলিতেছেন :—"দুনিয়ার দেশগুলাকে এক্ষণে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। কতকগুলা শিল্পনিষ্ঠায় উঁচুদরের দেশ। যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কারবারে তাহারা পাকিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দেশগুলা এই বিষয়ে নাবালক। সবে হাতে খড়ি দিতেছে মাত্র। প্রবীণ দেশের লোকেরা একটা তথাকথিত 'উদার' মত, মাল-চলাচলের স্বাধীনতা, বিশ্ব-ব্যবস্থা, আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যবন্ধন ইত্যাদি বোলচালে বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁহাদের এই বোলের পশ্চাতে আন্তরিক মাল নাই এক কাঁচ্চাও। 'স্বাধীন গতিবিধি', অবাধ চলাচল ইত্যাদি শব্দে কি বুঝা উচিত? বুঝা উচিত ধনোৎপাদন-বিষয়ক সকল প্রকার শক্তি ও সরঞ্জামেরই চলাফেরা। কাজেই লোকজনের গতিবিধিও আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে স্বচ্ছন্দ আর বাধাহীন হওয়া আবশ্যক। ইতালিতে লোকসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। লোক-রপ্তানি করা ইতালিয়ানদের স্বার্থ। কিন্তু প্রবীণ দেশে মাতব্বরেরা ইতালি হইতে লোক-আমদানির বিরুদ্ধে কড়া আইন জারি করিয়াছে। অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্য শব্দটা নিজ স্বার্থমাফিক ব্যাখ্যা করা এই সকল যন্ত্রনিষ্ঠ উন্নত দেশের পণ্ডিতদের রেওয়াজ।" ফেরির মত আলোচনা করিবার সময় সমঝিয়া রাখা উচিত যে, ইতালি বাস্তবিক পক্ষে ইয়োরোপের একটা অবনত দেশ। কাজেই ইতালির লোকেরা "প্রবীণদের" কার্য্যনীতিকে যে চোখে দেখে, তাহাতে আমাদের ভারতেও কিছু-কিছু কাজ হাঁসিল করিবার যুক্তি পাওয়া যায়। ইতালির সঙ্গে ভারতের ভাব রাখার যতগুলা কারণ থাকিতে পারে, তাহার ভিতর ইতালির অবনত অবস্থা অন্যতম।

অর্থসাহিত্যের মার্কিণ-জাপানী-বিলাতী পত্রিকা

আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ

মার্কিণ ধনবিজ্ঞান-পরিষদের মুখপত্র। ত্রৈমাসিক, ডিসেম্বর ১৯২৫। কাগজী টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া জার্ম্মাণরা শস্তায় বিদেশী সোনার টাকা কিনিয়াছিল। এই সময়ে জার্ম্মাণিতে বাজার-দর ও যার পর নাই নামিয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে বিদেশীরা জার্ম্মাণ মাল খরিদ করিত বিস্তর। অর্থাৎ বিদেশে জার্ম্মাণ মালের রপ্তানি ফুলিয়া উঠিতেছিল। এই সম্বন্ধে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টাওসিগ বলেন,—"এই ব্যবস্থায় জার্ম্মাণরা বেচিত বেশী আর কিনিত কম। তাহাতে জার্ম্মাণদের লাভ ছাড়া লোকসান হয় নাই।" কিন্তু অধ্যাপক মোল্টন এই মতের বিরুদ্ধে রায় দিয়া বলিতেছেন:—"কিন্তু জার্ম্মাণরা যাহা কিছু আমদানি করিতেছিল তাহার দাম দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। অর্থাৎ রপ্তানি বাড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই জার্ম্মাণির ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়াছিল একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। মার্কের দাম তখন এত কম যে বিদেশী মাল কিনিবার যোগ্যতা জার্ম্মাণিতে যার পর নাই কমিয়া গিয়াছিল।" বুঝিতে হইবে যে, মাল বেচিয়া জার্ম্মাণি যে টাকা পাইতেছিল সেই টাকা দিয়া বেশী মাল কেনা সম্ভবপর হইত না।

সেপ্টেম্বর ১৯২৬। প্রবন্ধ:—(১) ১৯২৬ সনের রেভিনিউ অ্যাক্‌ট (রাজস্ব আইন) (অধ্যাপক ব্লেকী), (২) পরিমাণ-বিশ্লেষণ এবং *ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার ক্রম-বিকাশ* (কর), (৩) মজুরির হার ও যন্ত্রপাতির

ব্যবহার (অধ্যাপক গ্রাহাম), (৪) মজুর-বিষয়ক ধনবিজ্ঞান (অধ্যাপক ব্রিসেন্‌ডেন)।

পত্রিকায় আছে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা। তাহার ভিতর মাত্র ৫০ পৃষ্ঠা গিয়াছে এই চারটা প্রবন্ধে। গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দেওয়া হইয়াছে প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা। বিভিন্ন পত্রিকার সূচী ও সারাংশে লাগিয়াছে পৃষ্ঠা পঁচিশেক।

এই পত্রিকার বিশেষত্বসমূহ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। এইবার একটা নূতন বিশেষত্বের কথা বলিব। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যায় যে সকল ছাত্র পি-এইচ-ডি উপাধি পায় তাহাদিগকে একটা করিয়া "ডিস্সার্টেশ্যন" বা অনুসন্ধান-মূলক প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এই প্রবন্ধ-রচনাই একমাত্র কাজ নয়। পি-এইচ-ডি উপাধি-প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের মতনই কতকগুলা বিষয়ে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষাও দিতে হয়। "ডিস্সার্টেশ্যন" টা অতিরিক্ত। একমাত্র ডিস্সার্টেশ্যনের জোরে আমেরিকায় কেহ "ডক্‌টর" হইতে পারে না। এম্, এ পাশের পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত ইস্কুলে বসিয়া বই মুখস্থ করিবার দরকার হয়। ভারতে এই কথাটা খুব ভাল করিয়া হজম করা আবশ্যক; কেন না আমাদের দেশে বি, এ পাশের পরেই "রীসার্চ" করিতে লাগিয়া যাইবার বাতিক কখনো-কখনো দেখা যায়।

আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক আর "ডক্টর"ও বাহির হয় ঝুড়ী-ঝুড়ী। কাজেই ডিস্সার্টেশ্যনে-ডিস্সার্টেশ্যনে "ধূল-পরিমাণ"। বর্ত্তমান সংখ্যার "রিভিউ"য়ে প্রায় ৩০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিপুল তালিকা দেখিতেছি। আজকাল যে-সকল ডিস্সার্টেশ্যন লেখা হইতেছে অথবা লেখা সম্পূর্ণ হইয়াছে এই তালিকায় সেইগুলার নাম বিভিন্ন বিষয়

অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। গুন্‌তিতে এইগুলা প্রায় ৬০০ হইবে।

ডিস্সার্টেশ্যনের নাম শুনিবামাত্রই আঁতকাইয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই। ডক্টর উপাধির জন্য এই সকল বড়-বড় দেশে যে সব প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি লেখা হইয়া থাকে সেইগুলাকে "ছেলে-ছোকরার কাজ" বিবেচনা করাই ইহাদের দস্তুর। এই সকল রচনা লেখকদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রবেশিকা বা অ, আ, ক, খ মাত্র। আর আমরা ভারতে বোধ হয় এই ধরণের কোনো পরীক্ষায় প্রাইজ-পাওয়া রচনার লেখককে মহাবীর বিবেচনা করিয়া থাকি। অধিকন্তু ঐ ধরণের দু'একখানা রচনার ভারতীয় লেখকও ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত। বিদ্যার রাজ্যে আর চরিত্রের রাজ্যে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের কত নীচে ভারতবর্ষ অবস্থিত তাহা এই সামান্য কথা হইতেই অনেকটা মালুম হইবে। ভারতে চিন্তা-প্রণালীর এবং বিজ্ঞান-গবেষণার মাপ-কাঠি আরও উঁচু করা দরকার। ইহা বুঝিয়াই একটা অপ্রিয় সত্য প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া ফেলা গেল।

"ব্যাঙ্কার্স্ ম্যাগাজিন"

আমেরিকার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ৮০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আশী বৎসর পূর্ণ হইবার উপলক্ষ্যে এক সংখ্যা বাহির হইয়াছে ১৯২৬ সনের জুন মাসে। প্রকাশক ব্যাঙ্কার্স পাব্‌লিশিং কোং, নিউইয়র্ক।

এক ব্যক্তি বলিতেছেন,—"মার্কিণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিষয়ক আইন এখনই পুনর্গঠিত হওয়া আবশ্যক।" আর এক ব্যক্তি বলিতেছেন—"এই আইন পুনর্গঠিত করিবার সময় এখনো আসে নাই।" এক

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় "ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট" অর্থাৎ টাকা খাটাইবার ব্যবসা চালাইবার জন্য ট্রাষ্ট-জাতীয় ব্যাঙ্ক গঠনে আমেরিকার ক্রমবিকাশ। নিউইয়র্ক সেণ্ট্রাল রেলওয়ে তাহার শতবর্ষ পূর্ণ করিল। তদুপলক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আছে। দুনিয়ার নানা দেশে ছোট-বড়-মাঝারি ব্যাঙ্কগুলা বিশালকায় প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত হইতেছে। এইরূপ বহর-বৃদ্ধি আর কতদূর চলিবে তাহার আলোচনা আছে এক প্রবন্ধে।

আমেরিকার বহির্ব্বাণিজ্য পুষ্ট করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পরপর তের বৎসর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। ত্রয়োদশ সম্মেলনের বিবরণ দিয়াছেন পত্রিকার সম্পাদক।

বহির্ব্বাণিজ্যের কাজে মার্কিণ ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ টাকা কোন্ প্রণালীতে দিয়া সাহায্য করে তাহার আলোচনা এক প্রবন্ধে পাইতেছি। আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশগুলা যথা ফ্লরিডা, জর্জ্জিয়া ইত্যাদি মুল্লুকে,—ব্যবসাবাণিজ্য বাড়াইবার উপায় আলোচনা করিয়াছেন একজন। ক্যানাডা দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের লেনদেন এক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বিলাতের সার্ব্বজনিক ধর্ম্মঘট-সম্পর্কিত নানা প্রকার ব্যক্তিসঙ্ঘ-বিষয়ক সচিত্র বিবরণ এক রচনায় পাইতেছি। বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য কর্জ্জের সুযোগ বাড়ানো আবশ্যক কি? এই প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে এক প্রবন্ধে।

১৯২৬ সনের ইয়োরোপ, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক আইনকানুন, দুনিয়ার ধনদৌলত, বিনিময়ের হার ও বাজার-দর বিষয়ক বিশ্লেষণ, বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, নয়া-নয়া মার্কিণ ব্যাঙ্কের ঘরবাড়ী, ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের চলাফেরা, ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন প্রণালী, মার্কিণ ব্যাঙ্ক-

সম্মেলনের অধিবেশন ইত্যাদি নানা বিষয়ে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রচনাও ইহাতে আছে। তাহা ছাড়া গ্রন্থ-সমালোচনা আর গ্রন্থপঞ্জী কাগজের কিয়দংশ অধিকার করিতেছে।

"ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোম্পানী"র সাপ্তাহিক

ফী সপ্তাহে আমরা নিউইয়র্কের "ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোম্পানী" নামক বিপুল মার্কিণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে একখানা নয়-দশ পৃষ্ঠাব্যাপী টাইপ করা চিঠি পাইয়া থাকি। তাহাতে বিবৃত থাকে,—(১) আমেরিকার টাকার বাজার, (২) বিদেশী টাকার দর, (৩) বণ্ডের বাজার, অর্থাৎ মার্কিণ কৃষিশিল্পবাণিজ্যবিষয়ক কোম্পানীগুলা বাজারে ডিবেঞ্চার বা কর্জ্জ লইবার জন্য যে সকল প্রয়াস চালাইতেছে তাহার কিস্মৎ, (৪) বড় বড় শহরের ব্যাঙ্কগুলা কত টাকার কারবার করিল তাহার হিসাব, (৫) আমেরিকার কেনাবেচা ও বাজার-দর, (৬) রেলওয়ের মাল চলাচল।

তাহা ছাড়া এক এক সপ্তাহে এক এক প্রকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-লিখিত প্রবন্ধ থাকে। ১৭ সেপ্টেম্বরের (১৯২৬) চিঠিতে পাইতেছি দেশ-বিদেশের তূলার কারখানা।

"ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব্ নিউইয়র্কে"র মাসিক

নিউইয়র্কের ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক মার্কিণ মুল্লুকের আর একটা জাঁদ্‌রেল ব্যাঙ্ক। এঁদের পরিচালকেরা আমাদের নিকট প্রত্যেক মাসে একখানা করিয়া চিঠি পাঠাইয়া থাকেন। "আর্থিক উন্নতি"র আকারের ছাপানো ৩২ পৃষ্ঠায় চিঠি সম্পূর্ণ। ১৯২৬ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আছে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত,—(১) ব্যবসা-সম্পর্কিত সাধারণ কথা, (২) কৃষিকর্ম্মের

হালচাল, (৩) টাকার বাজারে কৃষির সুবিধা বৃদ্ধি, (৪) কারখানায় লাভের গতিবিধি, (৫) রেলওয়েতে লাভের মাত্রা-হ্রাস, (৬) ঘরবাড়ী তৈয়ারীর ব্যবসা, (৭) লোহা ও ইস্পাতের কারবার, (৮) অটোমোবিলের বাজার, (৯) তামা, সীসা ও দস্তার কারবার, (১০) কাপড়-চোপড়ের বাজার, (১১) চামড়া ও জুতার ব্যবসায় উন্নতি, (১২) কয়লার কাজে হরতাল, (১৩) তেলের কারবার, (১৪) টাকার বাজার, (১৫) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কারবারের প্রভাব, (১৬) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অঙ্গীভূত বারটা ব্যাঙ্কের অবস্থা, (১৭) টাকা খাটানো আর ডিবেঞ্চারের দর, (১৮) সরকারী ডিবেঞ্চারের বাজার, (১৯) বে-সরকারী ডিবেঞ্চারের মূল্যবৃদ্ধি, (২০) রেল-ডিবেঞ্চারের মূল্যবৃদ্ধি, (২১) বিদেশী ডিবেঞ্চারের মূল্য,—অষ্ট্রেলিয়ান ও ফরাসী কর্জ্জ, (২২) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জ্জেণ্টিনা দেশে সোনার টাকায় প্রত্যাবর্ত্তন, (২৩) আন্তর্জ্জাতিক টাকার বাজার, (২৪) ফেডার‍্যাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্ট রেট হ্রাস,—ব্যবসায়ীদের সুযোগ, (২৫) আমেরিকায় বিদেশীরা পুঁজি কর্জ্জ লইতেছে বেশী-বেশী, (২৬) কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক কর্জ্জের বাজার কতটা শাসন করিতে সমর্থ, (২৭) মার্কিণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কারবার সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিদেশী সমালোচনা, (২৮) আমেরিকায় মূল্যহ্রাস ইয়োরোপীয়ানদের পছন্দসই নয়, (২৯) দুনিয়ার লেনদেনে স্থিতিসাম্য।

"ফেডার‍্যাল্ রিজার্ভ বুলেটিন"

ওয়াশিংটন (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)

ডিসেম্বর, ১৯৩৩,—এক রচনায় বুঝিতেছি যে, মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইনের জোরে "গৃহস্থদের হাঁড়ি" হইতে সোনা টানিয়া আনিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত করিয়াছেন। মে হইতে আগষ্ট মাসের ভিতরই

সোনা শুষিয়া আনা হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ মুল্লুকে ব্যবসাব জীবন লহরিতে সুরু হইয়াছে। কাজেই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর আর নবেম্বর এই তিন মাস ধরিয়া ব্যাঙ্ক আবার কিছু-কিছু টাকা বাজারে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে।

আর এক রচনায় বিবৃত দেখিতেছি পুনর্গঠনের সরকারী খরচার ফর্দ্দ। রিকন্‌ষ্ট্রাক্‌শুন ফিনান্স কর্পোরেশুন ১৯৩২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কায়েম হইয়াছে। কৃষিকার্য্য, ব্যাঙ্ক, রেল, বীমা ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যবসায় এই কর্পোরেশুন ১৯৩৩ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ষোল মাসে টাকাকড়ির কাজ করিয়াছে নিম্নরূপ (ডলারে):—

	কাজ	দিয়াছে	দিতে অধিকারী
১।	কর্জ্জ	২,৭৪৫,১৪৪,০০০	৩,৮৬৯,৭৬৫,০০০
২।	দান	৪৮৯,৬৩৬,০০০	১,০৮০,৬৬৬,০০০
		৩,২৩৪,৭৮০,০০০	৪,৯৫০,৪৩১,০০০

সহজে হিসাব করিবার জন্য ডলারকে তিন টাকার সমান ধরিয়া লইলাম। দেখিতেছি যে, সরকারী পুনর্গঠন-দপ্তর ষোল মাসে দেশের "ব্যবসাবাণিজ্য"কে বাঁচাইবার জন্য ঢালিয়াছে প্রায় ৯৭০ কোটি টাকা। কিন্তু এই দপ্তরের ট্যাঁকে ছিল ১,৪৮৫ কোটি টাকা। দরকার হইলে তাহারা এই পরিমাণ পর্য্যন্ত টাকা ঢালিতে প্রস্তুত ছিল। ইহার নাম "ইকনমিক প্ল্যানিং" বা সম্পদ-বৃদ্ধির মোসাবিদা। দু'চারটা কারখানার হিসাব বাহির করা, আর পাটের চাষের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা ইত্যাদি কাজকে "ইকনমিক প্ল্যানিং"এর দৃষ্টান্ত সমঝিয়া রাখা অবিবেচনার কাজ।

কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা

জাপানের কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজি ভাষায় একখানা ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা বাহির হইতেছে। ১৯২৬ সনের জুলাই মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। নাম "কিয়োতো ইউনিভার্সিটি ইকনমিক রিভিউ।" প্রথম সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে:—(১) কার্ল মার্ক্স্-প্রচারিত সামাজিক চেতনার নানারূপ, (২) জাপানে আর্থিক ক্রম-বিকাশের বিশেষত্ব, (৩) জাহাজ-কোম্পানীর সঙ্ঘ-গঠন, (৪) জাপানে আত্মহত্যার শ্রেণীবিভাগ, (৫) জাপান ও কোড়ীয়ার ভূমিবিধান, (৬) ভবিষ্যতের উপনিবেশ-নীতি, (৭) জাপানী মুদ্রা-ব্যবস্থায় সোনার কাগজ ইত্যাদি।

সম্পাদক-সঙ্ঘ বলিতেছেন:—"১৯২০ সন পর্য্যন্ত জাপানী ধনবিজ্ঞান-সেবীদের চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রভাব অত্যধিক ছিল। এই সময়ে জাপানে স্বদেশী ভাব পরিস্ফুট হইতে সুরু করে। বর্ত্তমানে একটা স্বতন্ত্র জাপানী ধনবিজ্ঞান গড়িয়া উঠিতেছে।"

জাপানের "ওরিয়েণ্ট্যাল ইকনমিষ্ট্"

তোকিও হইতে এই মাসিক পত্রিকা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছে (১৮৯৫ সনে প্রতিষ্ঠিত)। জাপানীরা জাপানী ভাষায় যে ধরণের অর্থনৈতিক পত্রিকা চালাইয়া থাকে তাহা দেখিলে তাক্ লাগিয়া যায়। পত্রিকাটা চালাইবার জন্য বহুসংখ্যক অর্থশাস্ত্রী বাহাল আছেন। রীতিমত গবেষণা-সমিতির প্রণালীতে নিয়মিতরূপে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। সরকারী সংখ্যা-দপ্তরের উপর নির্ভর না করিয়াও এই পত্রিকার সম্পাদক-দপ্তর অনেকটা স্বাধীন ভাবে শিল্প-বাণিজ্যের সকল

প্রকার অঙ্ক সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত। জার্ম্মাণির ডয়চে বাঙ্ক, আমেরিকার ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড ইত্যাদি ইয়োরামেরিকান প্রতিষ্ঠান জাপানের এই পত্রিকাদপ্তরকে সংখ্যাসংগ্রহের কারবারে পরাস্ত করিতে পারিবে না।

১৯৩৪ সনে এই পত্রিকার একটা ইংরেজি সংস্করণ বাহির হওয়া স্বরু হইয়াছে। ইংরেজি বিভাগের সম্পাদক ছিলেন অর্থশাস্ত্রী কামেকিচি তাকাহাশি। দ্বিতীয় বর্ষে জাপানী ও ইংরেজি দুই বিভাগেরই সম্পাদক তাঞ্জান ইশিবাশি।

আটান্ন পৃষ্ঠার সব কয়টাই অঙ্কে আর তথ্যে ঠাঁসা। কোথাও এক কাঁচ্চা "বক্তৃতা" পাইতেছি না। গবমের্ণ্টকে অমুক-অমুক কর্ম্মকৌশল বাৎলাইবার দিকে পত্রিকাটার নজর একদম নাই। এমন কি, দেশের লোকের নিকট আথিক উন্নতির বা স্বদেশোদ্ধারের বাণী ঝাড়িবার মেজাজও কোনো লেখকেরই দেখিতেছি না। মজার কথা,—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনো রচনার সঙ্গেই লেখকের নাম পাওয়া যায় না। বাঙালী অর্থশাস্ত্রীরা বাংলা ভাষায় অথবা এমনকি ইংরেজিতে এই জাপানী মাসিকের মত একটা পত্রিকা চালাইবার ক্ষমতা কবে দেখাইতে পারিবে তাহাই ভাবিতেছি।

অবশ্য বলিয়া রাখি যে, বাঙালী জাতির বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নাই। জাপানীরা মগজের জগতে হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। কিন্তু বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের জন্য ভাত-কাপড় জুটাইবার ব্যবস্থা নাই। বড়-বড় বেপারী, ব্যাঙ্ক, কারখানা ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্র বাঙালীর হাড়-মাসে পরিচালিত হইতেছে না। কাজেই আর্থিক জীবনের গতিভঙ্গী বিনা বাগাড়ম্বরে, বস্তুনিষ্ঠ ভাবে, নিরেট রূপে বুঝিবার জন্য মাথা ব্যথা করে না প্রায় কোনো বাঙালীর। আর এই জন্যই "খাঁটি

গবেষণার উদ্দেশ্যে" পয়সা খরচ করিয়া ডজন দেড়েক বা দুয়েক অর্থশাস্ত্রীর মেহনৎ বাঁধিয়া রাখিবার মত খেয়াল কোনো পয়সাওয়ালা বাঙালীর মাথায় গজিয়া উঠে নাই। দেখা যাউক,—আর কতদিন লাগে।

১৯৩৫ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় "ওরিয়েণ্ট্যাল ইকনমিষ্ট" পত্রিকার প্রথম অধ্যায় মাস-সমালোচনা। ইহার ভিতর আছে নিম্নলিখিত তথ্যঃ—(১) ব্যাঙ্ক অব জাপানের নোট-প্রচার আর ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের নোট-প্রচার দুইই বেশ চড়া স্বরে গাঁথা, (২) জাপানী কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের সোণার পুঁজি বাড়িয়াছে, (৩) চার বৎসরে (১৯৩১-৩৫) ব্যাঙ্ক অব জাপানের গতিভঙ্গী কিরূপ তাহার বৃত্তান্ত, (৪) কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের টাকা কোন্ কোন্ ব্যবসাক্ষেত্রে খাটানো হইতেছে তাহার হিসাব, (৫) ১৯২৯ সন হইতে ১৯৩১ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিদেশী মুদ্রার মাপে জাপানী ইয়েনের বিনিময়-হার অত্যধিক ছিল। ১৯৩১ সনের শেষের দিকে ইয়েনের দাম কমাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত ইয়েন-পতনের যুগ চলিয়াছে। এই যুগে ইয়েনের সঙ্গে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ইয়েনের মূল্য "অতি-বেশী" ও নয় "অতি-কম" ও নয়।

এই বিষয়টা বুঝানো হইয়াছে ইয়েনের ক্রয়-শক্তির সঙ্গে পাউণ্ড আর ডলারের ক্রয়শক্তির তুলনা চালাইয়া। "ক্রয়শক্তির সাম্য" (পার্চেজিং পাওয়ার-প্যারিটি) অনুসারে ইয়েনের বিনিময়-হার অতি-উঁচু ছিল। ১৯৩১ সনের ডিসেম্বরে ইয়েনের পতন ঘটাইয়া বিনিময়-হারকে ক্রয়-শক্তির সাম্য মাফিক গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সংখ্যা-তালিকা নিম্নরূপ—

(১)	(২) ক্রয়শক্তির সাম্য (এক ইয়েনে কত পেনী)	(৩) বিনিময়ের হার (এক ইয়েনে কত পেনী)	(৪) (৩)নংএর তুলনায় (২) নং শতকরা কত
জুন ১৯২৯	১৯·০৫	২১·৬২	১১৪·৯%
নবে ১৯৩১	২০·৬০	৩৩·৪৩৭	১৬২·৩
ডিসে ১৯৩২	১৩·৭৮	১৪·৮৭৫	১০৭·৯
,, ১৯৩৩	১৪·৮৫	১৪·৩৭৫	৯৬·৮
মার্চ্চ ১৯৩৪	১৪·৮২	১৪·১২৫	৯৫·৮
জুন ,,	১৪·৫৫	১৪·১৮৭	৯৭ ৫
সেপ্টে ,,	১৩·৭৪	১৪·০৬২	১০২ ৩
ডিসে ,,	১৩·৮৩	১৩·৯৩৭	১০০·৮

দেখা যাইতেছে যে, ১৯২৯ সনে (২) নম্বরে আর (৩) নম্বরে প্রভেদ ছিল বিস্তর (১১৪·৯%)। এই প্রভেদ ১৯৩১ সনে আরও বাড়িয়া যায়,—১৬২·৩% পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকে। কিন্তু তাহার পর হইতে এই দুই হার প্রায় কাছাকাছি চলিয়াছে। কখনো (২) নং কিছু-বেশী, কখনো (৩) নং কিছু বেশী। কিন্তু প্রভেদ একপ্রকার নাই বলা চলিতে পারে।

মাস-সমালোচনার এক অংশ মাঞ্চুকুঅ-বিষয়ক। ইয়োরোপ হইতে মাঞ্চুকুঅ দেশের মালের জন্য চাহিদা বাড়িতেছে। এই জনপদের মূল্যবৃদ্ধি একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য। মাঞ্চুকুঅ বিদেশী মালের আমদানি ও বাড়াইতেছে। চীন বিষয়ক সংবাদ অন্য বিশেষত্ব। শাংহাই অঞ্চলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে।

প্রবন্ধগুলার ভিতর আন্তর্জ্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি বিষয়ক রচনা দেখিতেছি। আমদানি-রপ্তানি বলিলে মালের চলাচল বুঝায়। কিন্তু টাকাকড়ির

চলাচল ও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এক বড় ঘর অধিকার করে। এই কোঠের আমদানি-রপ্তানিকে "অদৃশ্য আমদানি" বা "অদৃশ্য রপ্তানি" বলে। জাপানের রাজস্ববিভাগ হইতে বিগত ছয় বৎসরের তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে একটা রচনা দেখিতেছি। বিজলী-কারখানাগুলার বিদেশী কর্জ্জ একটা প্রবন্ধের মুদ্দা। কাঁচা রেশমের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্বন্ধে আর একটা রচনা আছে।

ষোল-সতরটা উৎরাই-চড়াইয়ের ছবি বা রেখা-তরঙ্গ দিয়া দেশ-বিদেশের বাজার-দর, মাল-উৎপাদন, বিনিময়ের হার, বহির্ব্বাণিজ্য, শেয়ারের মূল্য ইত্যাদির গতিভঙ্গী বুঝানো হইয়াছে। অনেকগুলা সংখ্যা-তালিকার সাহায্যে দেখিতেছি জাপানী ব্যাঙ্কের বহর, ষ্টকের বাজারের উঠানামা, নকৃরির বাজার ইত্যাদি। বেকার-সংখ্যা, জিনিষ-পত্রের দাম ইত্যাদিও পাকড়াও করিতেছি। জাপানী বহির্ব্বাণিজ্যের অঙ্কগুলা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। মাঞ্চুকুঅ এবং চীন সম্বন্ধীয় পাঁচ পৃষ্ঠার ভিতর কেবল সংখ্যার ছড়াছড়ি।

পত্রিকার একটা অধ্যায়ে ষ্টকের বাজার বিশ্লেষিত দেখিতেছি। আর এক অধ্যায়ে কয়েকটা বড়-বড় কোম্পানীর কাগজপত্র বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কাওয়াসাকি ডক কোম্পানী জাপানের এক অতি বড় জাহাজ-তৈয়ারীর কারখানা। তেইকোকু, কুরাশিকি, তোয়ো, আসাহি এবং নিপ্পন এই পাঁচটা নকল রেশমের কারখানা সুপ্রসিদ্ধ। এই সমুদয় কারবারের লাভ-লোকসান অঙ্কের মারফৎ খুলিয়া ধরা হইয়াছে। এক অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় জিনিষ-পত্রের বাজার। বুঝিতেছি যে, তুলার জিনিষের উৎপাদনও বাড়িতেছে আর চাহিদাও বাড়িতেছে। কাঁচা রেশমের বাজার স্থিরভাবে রহিয়াছে। অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট-বাজারে মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে লোকেরা বিশেষ

আশান্বিত নয়। অতি-উৎপাদনের আশঙ্কা আছে। রাসায়নিক সার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইনের প্রভাব কিরূপ হইবে এখনো বুঝা যাইতেছে না।

নৌ-শিল্প এবং সমুদ্রযান সম্বন্ধে অন্যতম অধ্যায় আছে। এই বিভাগে জাপানীদের বাড়্‌তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাতায়াত আর মাল-চলাচল এত বাড়িয়াছে যে, জাহাজের অনটন দেখা যাইতেছে। বিদেশী জাহাজ ভাড়া করিয়া জাপানীরা কাজ চালাইতেছে। নতুন-নতুন আর "উন্নত" শ্রেণীর জাহাজ তৈয়ারি করাইবার মতলবে গবর্মেণ্ট একটা আইন জারি করিয়াছে। ১৯৩৫ সনের ভিতর ৫০,০০০ টন জাহাজ তৈয়াবী হওয়া চাই। সরকার হইতে টন প্রতি ৩০ ইয়েন সাহায্য দেওয়া হইবে,—যদি পুরাণা জাহাজ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার ঠাঁইয়ে নতুন জাহাজ গড়িবার ব্যবস্থা করা হয়। নিপ্পন ইয়ুসেন কাইশা রাজি হইয়াছে এই সর্ত্তে তিনখানা জাহাজ তৈয়ারি করিতে, ওসাকা শোসেন কাইশা দুইখানা আর মিৎসুই বুস্‌সান কাইশা দুই-খানা। এই সাতখানার প্রত্যেকটাই ৭০০০ টনের জাহাজ হইবে। সরকারী সাহায্যে নতুন জাহাজ গড়িবার কায়দা জাপানীরা ইংরেজদের নিকট হইতে শিখিয়াছে।

সাময়িক সংবাদের ভিতর আছে কেইজাই ক্লাবে বক্তৃতার সারমর্ম্ম। ক্লাবটা নামজাদা বণিকশিল্পীদের আড্ডা। বক্তা ছিলেন সরকারী পেটেণ্ট বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা। জাপানী উদ্ভাবন-আবিষ্কারের বৃত্তান্ত পাইতেছি। ১৮৮৭ সনে ৯০৫ টা মাত্র পেটেণ্টের দরখাস্ত পড়িয়াছিল, মঞ্জুর করা হইয়াছিল মাত্র ১০৯টা অর্থাৎ শতকরা ১২টা মাত্র। ১৯৩৩ সনে দরখাস্ত পড়িয়াছিল ১৩,৯০৪, মঞ্জুর করা হইয়াছিল ৫,৫০২ অর্থাৎ শতকরা ৩৯টা। নতুন-নতুন আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে

জাপানীদের বাড়তি উচুঁদরের সন্দেহ নাই। জাপানীরা কোন্‌কোন্ কর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপ আবিষ্কার সাধন করিতেছে তাহার ফিরিস্তি নিম্নে দেওয়া গেল :—

শিল্পক্ষেত্র	দরখাস্তের সংখ্যা	সমগ্রের কত শতকরা	মঞ্জুর সংখ্যা	সমগ্র মঞ্জুরের কত শতকরা
যন্ত্রশিল্প	৬,৩৩৯	৪৮	২,৪৯৬	৪৫
রাসায়নিক শিল্প	৫,২৮২	৩৮	২,০৫২	৩৭
বৈদ্যুতিক ,,	২,০০১	১৪	৯৫৪	১৭
	১৩,৬২২	১০০	৫৫০২	৯৯

দরখাস্তগুলার ভিতর নিম্নলিখিত জিনিষের নাম দেখিতে পাওয়া যায় :—

১। ইণ্টার্ণ্যাল কম্বাশ্‌চ্যান এঞ্জিন ... ৩০১

২। রেলগাড়ী ... ২৮২

৩। মাপজোকের যন্ত্রপাতি ... ২৪২

৪। চিকিৎসা বিষয়ক ,, ... ১৬৯

৫। কৃষি বিষয়ক ,, ... ১৫৩

এই সকল পেটেণ্টের ভিতর বিদেশীদের উদ্ভাবন ও আছে। নিম্নের তালিকায় জাপানী ও অ-জাপানী জাতি-ভেদ দেখানো যাইতেছে :—

জাতিভেদ	দরখাস্ত	সমগ্রের কত শতকরা	মঞ্জুর	সমগ্র মঞ্জুরের কত শতকরা
জাপানী	১২,১১০	৮৬	৪,৩০৬	৭৮
অ-জাপানী	১,৭৯৪	১৩	১,১৯৬	২২
	১৩,৯০৪	৯৯	৫,৫০২	১০০

অ-জাপানী দরখাস্ত ছিল সমগ্রের শতকরা ১৩টা মাত্র। কিন্তু অ-জাপানী পেটেণ্ট মঞ্জুর হইয়াছিল সমগ্র মঞ্জুরের শতকরা ২২টা। বুঝিতে হইবে যে, ১৯৩৩ সনে অ-জাপানী উদ্ভাবন জাপানী উদ্ভাবনের চেয়ে উন্নত শ্রেণীরই ছিল।

এইসঙ্গে একটা বিশেষ চিত্তাকর্ষক তথ্য এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিদেশী পেটেণ্টের শতকরা হিস্যা বেশ-কিছু উঁচু। এই সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক তুলনার জন্য নিম্নের তালিকা দ্রষ্টব্য —

ইতালি—৬৮% বিদেশী পেটেণ্ট জারি
ফ্রান্স—৫২% " " "
বিলাত—৩৭% " " "
জার্ম্মাণি—২৮% " " "
জাপান—২২% " " "
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—১১% " " "

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ইতালিতে আর ফ্রান্সে যে সকল পেটেণ্ট চলে তাহার অর্দ্ধেকের বেশী বিদেশী। আর বিলাত এবং জার্ম্মাণিতেও বিদেশীদের হিস্যা জাপানের চেয়ে বেশী।

বিলাতী "ইকনমিক জার্ণ্যাল"

অর্থনৈতিক পত্রিকা। লণ্ডনের ত্রৈমাসিক। ১৯২৫ সনের মার্চ্চ সংখ্যায় গমের "পুল" (বা সঙ্ঘ) সম্বন্ধে দুইটা প্রবন্ধ আছে। একটায় অধ্যাপক বয়েল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য বিবৃত করিয়াছেন। আর একটায় ক্যানাডার তথ্য পাইতেছি অধ্যাপক ফে'র রচনায়। লড়াইয়ের সময় ক্যানাডার গমের বাজার নবরূপ ধারণ করে। এই সময়ে "বাজার" নামক কোনো বস্তু ছিলনা বলিলেই চলে। বৃটিশ

গবর্মেণ্ট ছিল প্রায় একমাত্র খরিদ্দার। যুদ্ধের পর ক্যানাডার চাষীরা "বাজার" গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। সরকারের তাঁব হইতে উদ্ধার পাওয়া একটা প্রধান লক্ষ্য দেখা যাইতেছে।

তিনটা বিপুল সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯২৪ সনের কথা। সঙ্ঘ তিনটার মধ্যে পরস্পর যোগ আছে। গোটা দেশের গম এই তিন ব্যবসায়ী-কোম্পানীর "ভাণ্ডারে" কেন্দ্রীকৃত। ইহারাই বাজারের রাজা। অষ্ট্রেলিয়ায় ও এইরূপ "পুল" আছে। যুক্তরাষ্ট্রেও আছে। মার্কিণরা এখন দেশের সব কয়টা "পুল"কে একটা "জাতীয়" মহা-ভাণ্ডারের অধীনে ঐক্যগ্রথিত করিতে প্রয়াসী। তাহার সঙ্গে-সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন 'পুলের" সঙ্গে একটা আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতা কায়েম করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। লোহা এবং ইস্পাতের দুনিয়ার যেমন জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে ইয়োরোপীয়ানরা একটা ট্রাষ্ট খাড়া করিয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া ও সেইরূপ একটা গম-ট্রাষ্ট খাড়া করিতে চলিল।

"বার্ক্লেজ ব্যাঙ্ক মান্থলি রিভিউ"

লণ্ডন, ডিসেম্বর, ১৯৩৩—(১) বিলাতী ব্যবসার অবস্থা, (২) আর্থিক দুনিয়ার আরোগ্য-লাভের সঙ্গে বিদেশে পুঁজি-রপ্তানির যোগাযোগ, (৩) বেকার-কানুন (৪) কানাডায় ব্যাঙ্কিং-তদন্ত, (৫) টাকার বাজার, (৬) বিনিময়ের হার।

পুঁজি-রপ্তানি সম্বন্ধে বিলাতের সাউকাররাই অগ্রণী ও সেরা। ১৮৫৬ হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত ফি বৎসর গড়ে ইংরেজরা যত পাউণ্ড বিদেশে রপ্তানি করিত নিম্নে তাহার ফর্দ্দ দেওয়া যাইতেছে :—

সন		পাউণ্ড
১৮৫৬-১৮৭৭	...	৩৪,০০০,০০০
১৮৭৭-১৮৯৭	...	৩৬,০০০,০০০
১৮৯৮-১৯০৬	...	২৩,০০০,০০০
১৯০৭-১৯১৩	...	১৬১,০০০,০০০

বিদেশকে এত টাকা কৰ্জ্জ দেওয়ার মূল্যস্বরূপ ইংরেজরা বিদেশ হইতে বহুবিধ মাল আমদানি করিতে অভ্যস্ত। বস্তুতঃ বিলাত হইতে যত মাল বিদেশে রপ্তানি হইত তাহার চেয়ে বেশী মাল বিলাতে আমদানি হইত। নিম্নে রপ্তানির চেয়ে আমদানি কতটা বেশী দেখানো যাইতেছে :—

সন		পাউণ্ড
১৮৫৫	...	২৭,০০০,০০০
১৮৭৬	...	১১৮,০০০,০০০
১৮৯৭	...	১৫৭,০০০,০০০
১৯০৬	...	১৪৭,০০০,০০০
১৯১৩	...	১৩৪,০০০,০০০

এই ছিল লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার সনাতন বাণিজ্য-কৌশল। সেই কৌশল ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে দুনিয়ার আর্থিক আরোগ্যলাভ

জানুয়ারি, মার্চ্চ ১৯৩৪—বর্ত্তমান বর্ষের জানুয়ারি ও মার্চ্চ সংখ্যায় কয়েকটা বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। তাহাতে মুখ্যতঃ বিলাতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কিন্তু এই আলোচনার মারফৎ বিশ্বদৌলতের হালচালও বেশ-কিছু বুঝা যায়।

কুদ্‌রত্তি মালের আমদানি বিলাতে বাড়তির পথে দেখা যাইতেছে। কুদ্‌রত্তি মালের ভিতর আবার উনিশ-বিশ করা সম্ভব। কাঁচা তূলা, কাঠ, কাঁচা পশম, কাঁচা চামড়া এই কয় জিনিষের আমদানি বৃদ্ধির হারও অনেকটা উঁচু। কাজেই ইংরেজ লেখক বলিতেছেন:— "বিলাতী শিল্পে আরোগ্যলাভ দেখা দিয়াছে বেশ বিস্তৃতরূপেই। বিলাতের নানা প্রকার কারখানায় আর ফ্যাক্টরিতে ও মিলে কাজের পরিমাণ না বাড়িলে এত বিভিন্ন রকমের কুদ্‌রত্তি মাল বেশী-বেশী পরিমাণে ইংরেজরা আমদানি করিতে ঝুঁকিত না।"

বুঝা যাইতেছে যে, কৃষিপ্রধান দেশগুলা হইতে ইংরেজ বেপারীরা বেশী-বেশী মাল কিনিতে সুরু করিয়াছে। ইহাকেই বলিব দুনিয়ার আর্থিক মন্দা হইতে আরোগ্যলাভের প্রারম্ভ।

"আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদকের মতামত বোধ হয় এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। গত বৎসরের প্রথম দিকে বলা হইয়াছিল যে সেই বৎসরই পূজার দিকে মন্দা কাটিবার লক্ষণ কিছু-কিছু মালুম হইবে। অতএব বলিতে হইবে যে, ভবিষ্য-গণনা হাতে হাতে ফলিয়া গেল।

এই গেল গোটা দুনিয়া সম্বন্ধে নব জাগরণের কথা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিরূপ দেখা যাইতেছে? ইংরেজরা যে-সকল কুদ্‌রত্তি মাল বেশী-বেশী কিনিতেছে সেই সবের ভিতর আছে কাঁচা তূলা আর কাঁচা চামড়া। বলা বাহুল্য, কাঁচা তূলা হইল বোম্বাই ইত্যাদি অঞ্চলের মাল আর কাঁচা চামড়া বাঙ্‌লা দেশের। অর্থাৎ ভারতের নানা প্রদেশ হইতেও বিদেশের দিকে কাঁচা মালের গতিবিধি বাড়িয়া গিয়াছে। এই রপ্তানি-বৃদ্ধির ফলে ভারতের বাজারে-বাজারে আরোগ্যলাভের চিহ্নোৎও কিছু-কিছু দেখা যাইতেছে।

অটাওয়া সম্মেলনের মোসাবিদামাফিক শুল্ক-নীতি কায়েম হইবার ফলে ভারতের লাভ অবশ্যম্ভাবী,—এইরূপ ছিল "আর্থিক উন্নতি" সম্পাদকের মত। এই সম্বন্ধেও সম্পাদকের ভবিষ্যবাণী সফল হইয়াছে। বার্ক্‌লেজ ব্যাঙ্ক পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় বিলাতী বাণিজ্যে অটাওয়ার প্রভাব বিশ্লেষিত দেখিতেছি। ১৯৩৩ সনের জানুয়ারি হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসের ভিতর ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানি হইয়াছিল ২৪,৩০৭,০০০ পাউণ্ডের মাল। ১৯৩২ সনের ঐ সময়ের ভিতর রপ্তানি ছিল ২১,৯১৩,০০০ পাউণ্ড আর ১৯৩১ সনে ২৪,৪২৪,০০০ পাউণ্ড। অর্থাৎ আটাওয়া-নীতির যুগে ভারতীয় রপ্তানি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের রপ্তানির চেয়ে বেশী ছিল। শতকরার হিসাবেও ভারতীয় রপ্তানিতে বাড়্‌তি দেখা যায়। ১৯৩৩ সনে ভারত হইতে বিলাতী আমদানি ছিল সমগ্র বিলাতী আমদানির শতকরা ৪·৯৮ অংশ। ১৯৩২ সনে ছিল ৪·২১ অংশ আর ১৯৩১ সনে ৩·৯৩ অংশ মাত্র।

অর্থাৎ অটাওয়ায় প্রবর্ত্তিত সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতের প্রভাবে ভারতবর্ষ বিলাতী বাজারের উপর আগেকার চেয়ে বেশী দখল কায়েম করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভারতীয় চাষীর সম্পদ্ আপেক্ষিক হিসাবে আগেকার চেয়ে বাড়িয়াছে। ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্‌এর মাপজোখের দৌলতে এই যে তথ্যগুলা আজ পাওয়া যাইতেছে সেই সম্বন্ধে 'আর্থিক উন্নতি'র সম্পাদক কর্ত্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল বৎসর দু'এক পূর্ব্বে। তখন দেখানো গিয়াছিল যে, অটাওয়ার ব্যবস্থায় ভারতীয় চাষীর লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

বার্ক্‌লেজ ব্যাঙ্ক পত্রিকার সংখ্যারাশিগুলা ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সরকারী "ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণ্যাল" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার অঙ্করাশিগুলার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝা গেল। ১৯৩৪

সনের মার্চ্চ মাসে ৩০৯,৬৭৪ বস্তা কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৩৩ সনে এই মাসের রপ্তানি ছিল ১৬৬,৩৩১ বস্তা মাত্র, আর ১৯৩২ সনে ২৬৯,১৯৮। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অঙ্কও বেশ চিত্তাকর্ষক। এক বৎসরের ভিতর চায়ের দাম ডবল হইয়াছে। অর্থাৎ মূল্য-হ্রাস নামক মন্দা চায়ের বাজারে বেশ-কিছু কাটিয়া আসিয়াছে। চায়ের এই দর-বৃদ্ধিতে অবশ্য উৎপাদন-সঙ্কোচের প্রভাব দেখিতে হইবে।

"পপিউলেশ্যন"

"লোক বিদ্যা",—লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ইংরেজি ত্রৈমাসিক। ১৯৩৪ সনে প্রবর্ত্তিত। ১৯২৭ সনে জেনীভায় লোকবল, লোকসংখ্যা বা লোকবিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম বিশ্ব-কংগ্রেস বসে। তাহাতে একটা "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ফর দি সায়েণ্টিফিক ইন্‌ভেষ্টিগেশ্যন অব পপিউলেশ্যন প্রবলেম্‌স্" (লোকসমস্যা বিষয়ক গবেষণার আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ) কায়েম করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব অনুসারে ১৯২৮ সনে আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ কায়েম করা হইয়াছে। সেই সঙ্ঘেরই মুখপত্র এই "পপিউলেশ্যন"। অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে। তবে আন্তর্জ্জাতিকতা রক্ষা করিবার জন্য ফরাসী এবং জার্ম্মাণ ভাষায় লেখা প্রবন্ধও গ্রহণ করা হয়। ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হইতেছেন ইংরেজ কর্ণেল চার্ল্‌স্ ক্লোজ এবং সম্পাদক ক্যাপটেন পিট্‌-রিভার্স। পত্রিকা-সম্পাদকও ইংরেজ,—ডক্টর রোড্‌স্।

ভাইস-প্রেসিডেণ্ট রহিয়াছেন মার্কিণ অধ্যাপক প্যর্ল, বেলজিয়ান অধ্যাপক মাহেম্‌, জার্ম্মাণ নৃতত্ত্বশাস্ত্রী অয়গেন ফিশার, ইংরেজ ক্যাপ্‌টেন পিট্‌-রিভার্স, ডাচ সংখ্যাশাস্ত্রী মেঠোষ্ট্‌ এবং ইতালিয়ান অধ্যাপক

কর্‌রাদ জিনি। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য "স্বদেশী" কমিটি গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। বেলজিয়াম্‌, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেন্মার্ক, জার্ম্মাণি, গ্রেটবৃটেন, হল্যাণ্ড, স্পেন, স্থইডেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ কমিটি আছে।

একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। ১৯২৭ সনে জেনীভায় যখন প্রথম বিশ্ব-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তখন উদ্যোক্তাদের আবহাওয়ায় "ব্যর্থ্‌-কণ্ট্রোল" বা জন্মসংযম ও লোকহ্রাস-নীতির স্বপক্ষে মত ছিল জবরদস্ত্‌। ঘটনাচক্রে ১৯২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের" আবহাওয়াও অনেকটা সেইরূপ। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে ফ্রান্স, ইতালি আর জার্ম্মাণি প্রধানতঃ এই তিন দেশের লোকশাস্ত্রী, সংখ্যাশাস্ত্রী, অর্থ-শাস্ত্রী আর রাষ্ট্রশাস্ত্রীরা "ব্যর্থ্‌-কণ্ট্রোলের" বিরোধী ছিলেন। এই তিন দেশেই লোক বাড়াইবার আন্দোলন জবরদস্ত্‌। কাজেই এই সকল দেশের বিজ্ঞানসেবীরা আর-একটা আন্তর্জ্জাতিক সভা বা বিশ্ব-কংগ্রেস ডাকিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মুসলিনি। কংগ্রেস ডাকা হইয়াছিল রোমে,—১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। সভাপতি ছিলেন ইতালিয়ান সরকারী সংখ্যা দপ্তরের প্রেসিডেণ্ট জিনি। এই কংগ্রেসের নামও ছিল "কংগ্রেস্‌স ইন্তার্নাৎসিঅনালে প্যর লি স্তুদি দেই প্রব্‌লেমি দেল্লা পপলাৎসিঅনে"।

দেখা যাইতেছে যে, এই কংগ্রেসের নামে আর জেনীভার পাঁতি মাফিক ১৯২৮ সনে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের নামে বাস্তবিক কোনো প্রভেদ নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জেনীভা-লণ্ডনের বাহিরে রোমে আর একটা কংগ্রেস ডাকা হইয়াছিল! এই কংগ্রেসে বিজ্ঞানসেবীর ভিড়ও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিলাতের প্রতিনিধি বড় একটা নজরে পড়ে নাই। কিন্তু ইয়োরামেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার ত্রিশ

দেশের গবর্মেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল। চারশ'টা প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদক তখন মিউনিকের অতিথি-অধ্যাপক। সেখানে তাঁহার নিকট অন্যতম প্রেসিডেণ্টরূপে নিমন্ত্রণ পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহার রচনা ইতালিয়ান ভাষায় লিখিত। কংগ্রেসের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ (ধনবিজ্ঞান বিষয়ক) খণ্ডে এইটা বাহির হইয়াছে। সেই কংগ্রেসের কার্য্যাবলী ঢাউস-ঢাউস নয় খণ্ডে পাওয়া যায় (রোম ১৯৩২-৩৪)।

ইতালিয়ানদেরকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যাইবে যে, জগতের "সর্ব্বপ্রথম" আন্তর্জ্জাতিক লোকবিদ্যা-বিষয়ক কংগ্রেস জেনীভার কংগ্রেস নয়, রোমের কংগ্রেস। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩৪ সনে ইতালিয়ান করুরাদ জিনি লণ্ডনের "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ইউনিয়নে"র অন্যতম ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট। তবে ইতালিতে এখনো এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য কোনো স্বদেশী কমিটি গঠিত হয় নাই। অপর দিকে দেখিতেছি যে, আজ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের কোনো লোকশাস্ত্রীকে ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট করা হয় নাই। অথবা বোধ হয় কেহ হইতে রাজি হয় নাই। তাহা ছাড়া ফ্রান্সে এখনো কোনো "স্বদেশী" কমিটি নাই। কিন্তু জার্ম্মাণিতে একটা "স্বদেশী" কমিটি "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের" অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আর জার্ম্মাণ নৃতত্ত্বসেবী অয়গেন ফিশার অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেণ্ট রহিয়াছেন। ফিশার রোমের কংগ্রেসেও উপস্থিত ছিলেন এবং প্রবন্ধও পড়িয়াছিলেন।

ইতালিতে আর ফ্রান্সে "স্বদেশী কমিটি" গঠিত হয় নাই বলিতেছি। বুঝিতে হইবে যে, লণ্ডনের "ইণ্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়নের" অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য কোনো কমিটি ইতালিতে এবং ফ্রান্সে এখনো মাথা ঘামাইতেছে না। কিন্তু ফ্রান্সেও লোকবিদ্যাসংক্রান্ত পরিষৎ

আছে আর ইতালিতেও আছে। ইতালির লোকবিদ্যা বিষয়ক পরিষদের নাম "কমিতাত ইতালিয়ান প্যর ল স্তুদিঅ স্থল্লা পপলাৎসিঅনে। "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদককে এই পরিষদের আজীবন সভ্য করা হইয়াছে। জার্ম্মাণিতে একটা "স্বদেশী কমিটি" গঠিত হইয়াছে বলিতেছি। বুঝিতে হইবে যে, এইটা লণ্ডনের "ইণ্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়নে"র অন্তর্ভুক্ত। লোকবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য জার্ম্মাণ বিজ্ঞানসেবীদের অন্যান্য পরিষৎও আছে।

ইয়োরামেরিকার লোকশাস্ত্রীদের ভিতর এতসব গোলযোগ আছে এই কথাটা ভারতবর্ষে জানিয়া রাখা ভাল। লোকবিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশে চর্চ্চা সবে সুরু হইতেছে মাত্র। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে ভারতীয় "ওভার-পপিউলেশন" বা লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আর তাঁহারা "ব্যর্থ্-কণ্ট্রোল" বা জন্মসংযমের পাঁতি ঝাড়িতেছেন। বিশেষতঃ ভারত-গবর্মেণ্টের সেন্সাস-দপ্তরের কর্ম্মকর্ত্তারা এই দুই দিকে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। তাঁহাদের প্রভাবে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের লোকমত গঠিত হইতেছে। অর্থশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগের মত লোকবিদ্যা সম্বন্ধেও "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদকের চিন্তাপ্রণালী বেশ কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। প্রথমতঃ, "অতিবৃদ্ধি" কাহাকে বলে এই সম্বন্ধে কোনো বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নয়। পৃথিবীর কোন্ কোন্ জনপদে অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা কঠিন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এই সমস্যাকে "খোলা প্রশ্ন" বিবেচনা করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ "ব্যর্থ্-কণ্ট্রোল" বা জন্মসংযম "কোনো-কোনো" ভারতীয় পরিবারের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। তাহার জন্য দেশের ভিতর আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়াও কর্ত্তব্য। কিন্তু একটা তথাকথিত অতি-বৃদ্ধির ভয় দেখাইবার

দরকার নাই। "সার্ব্বজনিক" মঙ্গলরূপে জন্মসংযমের স্বপক্ষে ঝাণ্ডা খাড়া করা বিজ্ঞানসেবীর পক্ষে উচিত হইবে না।

যাহা হউক, ভারতের অর্থশাস্ত্রীরা কোনো-কোনো নামজাদা ইয়োরামেরিকান অর্থশাস্ত্রীর মত উদ্ধৃত করিয়া নিজের লোক-নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাঙালী ও অ-বাঙালী ভারতীয় লোকবিদ্যার সেবকদের পক্ষে সর্ব্বদা জানিয়া রাখা দরকার যে, ইয়োরামেরিকার নামজাদা পণ্ডিতদের ভিতর কোনো সর্ব্ববাদিসম্মত, সনাতন, ও সার্ব্বজনিক মত নাই। ইয়োরামেরিকার বাজারে-বাজারে জোরের সহিত নানা মত চলিতেছে। আর নানা পথের পথিকও দেখা যাইতেছে আজকাল বিস্তর। ফ্রান্স, ইতালি আর জার্ম্মাণি জন্মসংযমের যম আর জন্মবৃদ্ধির মা-ষষ্ঠী। এই কথাটা মনে রাখিলেই যখন-তখন যেখানে-সেখানে "ওভার-পপিউলেশন" বা লোক সংখ্যার অতিবৃদ্ধির জুজু দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিতে হইবে না।

খোলা চোখে ইয়োরামেরিকার পত্রিকাগুলা ঘাঁটিতে অভ্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ইংরেজি, ফরাসী, জার্ম্মাণ বা ইতালিয়ান হরপে কতকগুলা মত ছাপা হইয়াছে বলিয়াই সেগুলা বেদান্ত স্বরূপ হজম করিতে বসা আহাম্মুকি। লণ্ডনের "পপিউলেশন" পত্রিকাটা ভারতের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক দেশের অনেক গবেষকের কাজ সহজে ইহার ভিতর পাওয়া যায়। ১৯৩৪ সনের নবেম্বর সংখ্যায় অধ্যাপক ফসেট ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর গ্রেটবৃটেন এই কয়দেশের ঘন বস্তিওয়ালা জনপদের আলোচনা করিয়া দেখাইতেছেন যে, কোনো-কোনো জনপদ অল্পকালের ভিতরই বিলকুল লোকহীন হইয়া পড়িবে। চীনের হঙ্কঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরাভ্যন্তর বিদ্যাবিষয়ক অধ্যাপক রাইড বৃটিশ উত্তর বোর্ণিও দ্বীপে লোক-হ্রাস

সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়াছেন। লোক-হ্রাসের কারণ দেখা যাইতেছে প্রধানতঃ ত্রিবিধ,—(১) পুষ্টিকর খাদ্যের খাঁকৃতি, (২) ব্যাধি এবং (৩) রক্ত-সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা। ফরাসী ভাষায় পোল সিম্ঁ লোকসংখ্যার "ঘনতা" মাপিবার প্রণালী সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন চাহিয়াছেন। জুগোস্লাভিয়া দেশের চাষী সমাজের পারিবারিক কথা আলোচনা করিয়াছেন লজ। প্রাচীন চীনের লোকগণনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ আসিয়াছে নিউইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসওয়েল ব্রিটনের নিকট হইতে। আমেরিকার ওহায়ো প্রদেশে পল্লী হইতে শহরে লোক-চলাচলের ফলে মৃত্যুসংখ্যা কিরূপ দেখা যায় তাহার আলোচনা আছে ডর্ণ-লিখিত প্রবন্ধে। জার্ম্মাণ ভাষায় অধ্যাপক মম্বার্ট লোকসংখ্যার সঙ্গে ধনদৌলতের যোগাযোগ বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে, লোক-হ্রাস ঘটিলেই যে আর্থিক উন্নতিতে বাধা জন্মিবে এমন কথা বলা চলে না।

পোল্যাণ্ডের "স্বদেশী কমিটি" লোকবিদ্যা বিষয়ক গবেষণার জন্য একটা বিষয় বাছিয়া লইয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত অন্যতম প্রবন্ধে দেখিতেছি। পেশা বা জনপদ বা আয় হিসাবে জন্মসংখ্যা কিরূপ এই বিষয় বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল। ১৬,০০০ পরিবার হইতে নির্দ্ধারিত প্রশ্নের জবাব পাওয়া গিয়াছিল। সেই সমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইতেছি সম্পাদক ষ্টেফান স্থল্চের রচনায়। 'আপেক্ষিক প্রসবশক্তি' সম্বন্ধে ভারতবর্ষে আলোচনা হইয়াছে অতি সামান্য। এই দিকে নজর ফেলা আবশ্যক।

"ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

জেনীভা হইতে প্রকাশিত মাসিক আন্তর্জ্জাতিক মজুর পত্রিকা। এই পত্রিকার মাল "আর্থিক উন্নতি"তে হামেশা ব্যবহার করা হইয়া

থাকে। এইবার ১৯৩৩ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত "ফুড্-কন্‌জাম্পশ্যন অব ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলীজ ইন সার্টেন কাণ্ট্রীজ" প্রবন্ধ হইতে সংখ্যাগুলা উদ্ধৃত করিতেছি। পত্রিকাটা ইংরেজি ভাষায় সম্পাদিত। এইজন্য বর্ত্তমান অধ্যায়ে গুঁজিয়া দেওয়া গেল। তেরটা দেশের বৃত্তান্ত আছে। প্রবন্ধ-লেখকের নাম নাই। কারণ প্রবন্ধটা "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল লেবার আফিস" নামক আন্তর্জ্জাতিক মজুর-দপ্তর হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশের সরকারী এবং বড়-বড় বেসরকারী দপ্তর হইতে এই আফিসে হরেক-রকম সংবাদ নিয়মিতরূপে আসিয়া জুটে। সেই সমুদয় সাজাইয়া-গুছাইয়া প্রবন্ধ, পুস্তিকা বা গ্রন্থের আকারে বাহির করা এই আফিসের অন্যতম কাজ। এই জন্য বহুসংখ্যক রচনার সঙ্গে কোনো লেখকের নাম গাঁথা থাকে না।

তের দেশের বৃত্তান্ত আছে বলিতেছি। একসঙ্গে সাজানো আছে বলা বাহুল্য। কিন্তু ধাঁ করিয়া এই গুলার ভিতর তুলনা সাধন করিয়া কোনোটাকে বড়, কোনোটাকে ছোট, কোনোটাকে গরীব, কোনোটাকে ধনী, কোনোটাকে সুখী, কোনোটাকে অসুখী ঠাওরাইতে বসিলে ভুল করা হইবে। কেননা আর্থিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও দেশে-দেশে মাপজোক চালানো অতিশয় জটিল কাণ্ড। এই সকল কথা অন্যত্র ও আলোচনা করা হইয়াছে।

একটা সোজা কথার দিকে প্রথমে নজর ফেলিতেছি। কোনো পরিবারে মাস-মাস অথবা হপ্তায়-হপ্তায় কিম্বা রোজ-রোজ যত খরচ করা হয় তাহার কত হিস্যা যায় একমাত্র খাওয়া-দাওয়ার জন্য। সেই শতকরা হারটা দেখাইয়া তেরটা দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছি। কাল হিসাবে মোটের উপর ১৯২০-৩০ দশকের অবস্থা বুঝিতে হইবে।

পারিবারিক খর্চ্চার আধাআধির বেশী খরচ হইয়াছে খাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত নয় দেশে :—

বেলজিয়াম	৭৪·০ %
ফিনল্যাণ্ড	৬৮·৭ ,,
পোল্যাণ্ড	৬৭·৩ ,,
এস্থোনিয়া	৬০·০ ,,
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫৭·৬ ,,
লাট্ভিয়া	৫৫·০ ,,
নরওয়ে	৫৩·০ ,,
সুইডেন	৫১·৫ ,,
বুল্গেরিয়া	৫১·০ ..

এই তালিকায় দেখা গেল যে, বুল্গেরিয়ায় খাওয়ার জন্য খরচ হইয়াছিল পারিবারিক খর্চ্চার শতকরা ৫১ অংশ আর বেলজিয়ামে শতকরা ৭৪ অংশ। শতকরা পঞ্চাশের কম খরচ হইয়াছিল নিম্নলিখিত চার দেশে,—

অষ্ট্রিয়া	৪৬·৭
জার্ম্মাণি	৪৬ ৪
সুইট্স্যার্ল্যাণ্ড	৪৩·০
ডেন্মার্ক	৩৮·৬

কোনো একদেশের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আয়ের পরিবারে খাওয়া-দাওয়ার খর্চ্চার সঙ্গে অন্যান্য খর্চ্চার অনুপাত দেখিয়া জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে উঁচু-নীচু ঠাওরানো হয়ত,—হয়ত কেন নিশ্চয়ই,—সম্ভব। জার্ম্মাণ সংখ্যাশাস্ত্রী এঙ্গেল্স্ এইরূপ তুলনা সাধন করিয়া গরীব, মধ্যবিত্ত,

সম্পদ্‌বান ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধেই চালানো যায়। কিন্তু কোনো দুই বা তিনদেশে একত্র তুলনা করিলে এইরূপ গরীব-মধ্যবিত্ত-সম্পদ্‌বান্ শ্রেণী বিভাগ চালানো সম্ভবপর হইবে কি? হইবে না। কেন না কোনো দেশে হয়ত ঘরবাড়ীর জন্য, কোনো দেশে হয়ত কাপড়-চোপড়ের জন্য, আবার কোনো দেশে হয়ত খাওয়া-দাওয়ার জন্য অন্যান্য কারণে বেশী খরচ করিতে হয়। এইরূপ কম-বেশী খর্চ্চার জন্য পারিবারিক আয়ের পরিমাণ দায়ী না হইতেও পারে। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিতেছি। সমান গরীব হইয়াও পাঞ্জাবী মজুর বা চাষী বাঙালী মজুর বা চাষীর চেয়ে শীতকালের কাপড়-চোপড়ের জন্য বেশী খরচ করিতে বাধ্য হয়। অপর দিকে বাঙালী মজুর বা চাষীর খাইখরচার পরিমাণ অন্য খরচার চেয়ে আপেক্ষিকরূপে বেশী দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু একই বাঙলাদেশে যদি দেখি যে, কোনো পরিবারে খাইখরচার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম আর কাপড-চোপড়ের জন্য অথবা বাড়ীঘরের জন্য বা খেলা-ধূলার জন্য খরচপত্রের পরিমাণ বেশ উঁচু তখন বুঝিতে হইবে যে, বেশী খাই-খরচা-ওয়ালা পরিবার গরীব বা মধ্যবিত্ত, অন্যান্যেরা কথঞ্চিৎ অথবা বেশ-কিছু বা সত্যসত্যই সচ্ছল বা এমন কি সম্পদ্‌বান্।

যাহা হউক, এইবার তের দেশের হেঁসেল-ঘরে ঢুকিয়া হাঁড়ির খবর লওয়া যাউক। কোন্ দেশের নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়ার জিনিষ কিরূপ তাহার ফিরিস্তি দিতেছি নিম্নের তালিকায়। পুঁথি বড় করিবার দরকার নাই। মাত্র পাঁচ দেশের খাদ্যদ্রব্য বিশ্লেষণ করিতেছি। হিসাবগুলা সর্ব্বত্রই কিলোগ্রামের মাপে বুঝিতে হইবে। 'কিলোগ্রাম' অনেকটা আমাদের সের বিশেষ। ডিমের বেলা বুঝিতে হইবে সংখ্যা। দুধের 'লিটার'কেও বাঙালী সেরের সমান ধরিয়া হইতে পারি। আঠাইশ

প্রকার খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় কোন্‌টা ৩৬৫ দিনে কত পরিমাণে কোথায় কি মজুরের উদরস্থ হয় তাহার হিসাব নিম্নরূপ :—

	জার্ম্মাণি	বুলগেরিয়া	লাট্‌ভিয়া	পোল্যাণ্ড	বেলজিয়াম
১। সাদা রুটি	১৪·৮ }	২১৮·৪৫	৪৬·৫	১৫·৭২ }	২০২·৯৭
২। রাই(কাল)রুটি	৯৯·৩ }		৯৬·৩	১৩৩·৬১ }	
৩। গমের ময়দা	১৪·২	৫২·০৬	১২·৬	২১·০৭	×
৪। ওট্‌সের ,,	×	×	৭·৫	×	×
৫। রাইয়ের ,,	×	×	×	০ ৭৪	×
৬। মাখন (তাজা) বা নোনা	২·৭	০·৫৩	১০·৪	১·৩৮	৯·৭৪
৭। মার্জারিণ	১১·৮	×	×	০·২৬	৬·৪৫
৮। চর্ব্বি	৪·৬	৫ ৭৪	২·২	০·৮৭	৫·৫২
৯। গোমাংস (১ম শ্রেণী)	০·৮ }	১০·৫৭	৪·৭	৯·২৭	১২ ২৬
(২য় শ্রেণী)	৩·১ }		২২·৯		৩·৬৫
১০। ভেড়ার মাংস	০৫	১২ ৮৫	৬·৬	০·১২	×
১১। শূয়রের মাংস	৬ ০	৬·৮৮	১৪·৩	৪·০১	৪·৬৪
১২। বাছুরের ,,	০·৬	×	৪·৩	০·২৩	১·১৮
১৩। সসেজ (শূয়রের মাংসে তৈয়ারী)	৯·৪	×	৩·৩	৯·৮৬	৪ ২২
১৪। হ্যাম (শূয়রের)	০·২	×	×	১ ৫৭	০·৮০
১৫। বেকন ,,	২·৩	×	২·৪	৪·২০	৬·৮০
১৬। আলু	১৪৭·৮	১৯·৬৫	৯৫·৭	১৭৫·১৪	২১২·৫০
১৭। চিনি	১৪·১	৯·৬০	৩০ ৯	১৩·৮০	১১·৭৮

	জার্ম্মাণি	বুলগেরিয়া	লাট্‌ভিয়া	পোল্যাণ্ড	বেলজিয়াম
১৮। কাফি	০'৬	০'৩০	০'১	০'১৩	৪'৬৮
১৯। চা	০'১	০'০৬	০'২	০'১৭	×
২০। কোকো	০'৫	×	×	০'০৪	×
২১। পনির	৩'৬	৬'০১	১'৩	১ ৮২	৩'৬৩
২২। দুধ (লিটার)	১০৬'৯	২৬'৬৯	১৭২'৩	৪৩'৬৫	১১৪'৬৮
২৩। ডিম (সংখ্যা)	৭৮'০	৭১'৯৩	১২৬'০	২৭'১৩	১১১'৬৫
২৪। চাউল	২'২	৫'০৯	২'০	৩'৬২	×
২৫। কড়াইশুটি	২'৯	×	৩'৪		২'০৮
(শুক্‌না)				৪'৪৯	
২৬। শিম		৪'৮৪	০'৭		×
২৭। মাছ (তাজা)	৩'১		১০'০	০ ৮৫	×
		৩'৯৫			
২৮। মাছ (অন্যান্য)	৬'১		৫'০	৫ ৫৭	৮'২৫

প্রথমেই একটা কথা সকলের নজরে পড়িতেছে। আন্তর্জ্জাতিক মজুর-পরিষদের দপ্তরে কোনো দেশ হইতেই শাকসব্জী, তরী-তরকারী, ফল-মূল ইত্যাদির হিসাব আসে নাই! কিন্তু ইয়োরোপের লোকেরা যতই "ষাঁড়ের ডালনা" খাউক না কেন, তাহারা শাকসব্জী ইত্যাদি বস্তু খাইতে অভ্যস্ত। এই হিসাবটা নাই বলিয়া মজুর-দপ্তর কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ডায়েটারি" বা খাদ্যতালিকা পূরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রবন্ধের ভিতর একটা বড় গলদ রহিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের খুঁটি-নাটি এই যাত্রায় আলোচনা করিব না। দেখা যাউক ইয়োরোপের জার্ম্মাণ, বুলগার, লাট্, পোল ও বেল-জিয়ান মজুর "ষাঁড়ের ডাল্‌না" কতটা খায়। বুঝিতে হইবে মাংসের

কথা বলিতেছি,—"ডায়েটারির" ৯ নং হইতে ১৫ নং এই সাত দফা ইহার অন্তর্গত। তবে ২৭ ও ২৮ নং দুইটার মাছ ও ইহার সামিল করিয়া লইতেছি।

বৎসরে জনপ্রতি কতখানি মাংস ও মাছ পড়ে তাহার হিসাব দেখানো যাইতেছে। নিম্নের তালিকায় পাঁচ দেশের বৃত্তান্ত পাইতেছি যথা :—

	মাংস	মাছ	মোট
জার্ম্মাণি	২২'৯	+৬ ২	=২৯'১
বুলগেরিয়া	৩০'০	+৩'৯৫	=৩৪ ২৫
লাট্‌ভিয়া	৪৮'৬	+১৫'০	=৬৩'৬
পোল্যাণ্ড	২৯'২৬	+৬'৪২	=৩৫'৬৮
বেলজিয়াম	৩৩'৫৫	+৮'২৫	=৪১'৮০

দেখিতেছি যে, লাট্‌ভিয়ায় সব চেয়ে বেশী মাংস ও মাছ খাওয়া হয়। বৎসরে ৬৩'৬ কিলো বা সের হইলে গড়পড়তা রোজ পড়ে তিন ছটাক। সব চেয়ে কম পাইতেছি জার্ম্মাণিতে —২৯'১ কিলো বা সের। তাহাতে রোজ দাঁড়ায় সওয়া ছটাক অর্থাৎ হপ্তায় প্রায় আধ সের। বুঝিতে হইবে যে, লাট্‌ভিয়ার মজুর হপ্তায় রোজই একবেলা করিয়া তিন ছটাক মাছ-মাংস পায়। আর জার্ম্মাণ মজুর পায় হপ্তায় দুদিনের বেশী নয়,—এক এক বেলা পোয়াটেক করিয়া।

আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে, "পশ্চিমারা" জবরদস্ত পরিমাণে মাংস খাইয়া থাকে। এই ধারণার ভিতর গল্‌তি যে প্রচুর এই বিশ্লেষণে বুঝা গেল। মাত্র পাঁচ দেশের বৃত্তান্তেই এইরূপ দেখিতেছি। অন্যান্য দেশের খবর বিশ্লেষণ করিলেও ইয়োরোপ সম্বন্ধে ভারতবাসীর ভুল ধারণাগুলা সংশোধন করা যাইতে পারে।

কোন্ মজুরের কত আয় সেই সব কথা সম্প্রতি দেখানো হইল না। কতগুলা মজুরের খাদ্যতালিকার উপর এইরূপ বিশ্লেষণ চালানো হইয়াছে সেই দিকেও নজর ফেলা গেল না। আমিষ-নিরামিষের মামলায় যাঁহারা মাথা ঘামাইয়া থাকেন, অথবা যাঁহারা একালের "ভিটামিন" বা খাদ্যসার এবং "ক্যালরি" বা খাদ্যতাপ ইত্যাদির গবেষণায় সময় দিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ইয়োরোপীয় নরনারীর খাদ্যতালিকাগুলা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া তলাইয়া-মজাইয়া দেখা দরকার। সম্প্রতি এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে। বস্তুতঃ এই সঙ্গে জাপানী খাদ্য-তালিকায় "ষাঁড়ের ডাল্‌নার" ঠাঁই কতটুকু তাহাও খতাইয়া দেখা আবশ্যক। তাহা হইলে বাঙালীর বা অন্যান্য ভারতবাসীর খাদ্যতালিকায় মাংসের হিস্সা কিছু কম বলিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতার তরফ হইতে আঁৎকাইয়া উঠিবার কারণ পাওয়া যাইবে না।

জার্ম্মাণ পত্রিকায় ধনবিজ্ঞান

"শ্‌মোল্লার্স্‌ ইয়ারবুখ"

শ্‌মোল্লারের পঞ্জিকা। বিখ্যাত জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রী শ্‌মোল্লার এই "বর্ষপঞ্জী" স্থাপন করিয়া যান ১৮৭৬ সনে। তাঁহার নামে কাগজটা আজকাল পরিচিত। ত্রৈমাসিক,—প্রকাশিত হয় ব্যাভেরিয়ার মিউনিক হইতে। রাইণল্যাণ্ডের বন্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্পীঠোফ বর্ত্তমান সম্পাদক। পূর্ব্বে সম্পাদক ছিলেন বার্লিনের শুমাখার। পত্রিকার উদ্দেশ্য জার্ম্মাণির আইন-কানুন, দেশ-শাসন এবং আর্থিক জীবন সম্বন্ধে সকল প্রকার আলোচনা প্রকাশ করা। ১৯২৪ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় আছে—(১) বিশ্বরাষ্ট্র পরিষদের মূল সমস্যা,—আইনের তরফ হইতে তথ্য-বিশ্লেষণ (কার্ল্‌ শ্‌মিট), (২) ক্ষতিপূরণসমিতির বিশেষজ্ঞ-প্রণীত রিপোর্টের সমালোচনা (লট্‌স্‌), (৩) সমাজতত্ত্ববিৎ যোহান বেখার,—সপ্তদশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ দার্শনিক (এমিল কাউডার), (৪) সুদের হার এবং মার্কের উত্থান-পতন নিবারণ (প্রিয়োন), (৫) শস্যের দেশী ও বিদেশী বাজার-দর (বেখমান), (৬) আর্থিক সঙ্কটে গির্জ্জার অবস্থা (মেন), (৭) সমাজ-বিজ্ঞানের আধুনিক ক্রমবিকাশ (রুম্‌ফ্‌), (৮) সার্ব্বজনীন লোকমত (ষ্টোল্‌টেনব্যর্গ্‌), (৯) রাজস্ব-আইন বিষয়ক সাহিত্য (হেন্‌জেল), (১০) জার্ম্মাণ লড়াই-ঋণের সমালোচনা।

ৎসাইটশ্রিফ্‌ট্‌ ফ্যির ফোল্‌ক্‌স্‌ ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌ উন্ড্‌ সোৎসিয়াল-পোলিটিক

ধনবিজ্ঞান এবং সমাজনীতিপত্রিকা। ত্রৈমাসিক (ভিয়েনা)। ১৯২৬ সনের দ্বিতীয় সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য :—(১) মুদ্রার দেশী ও বিদেশী

দাম। গবর্মেণ্টের আর্থিক রাজনীতির উপর এই দুই প্রকার দাম কতটা নির্ভর করে তাহার আলোচনা (এডুয়ার্ড লুকাস), (২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতি। ১৯২০ সনের মুদ্রাসঙ্কটের পরবর্ত্তী অবস্থা (হায়েক)। (৩) ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রী পারেত:—অষ্ট্রিয়ান মতের ধনবিজ্ঞানধারায় পারেত'র দান (বুস্‌কে), (৪) ব্যবসা-কলেজে সংখ্যা-তালিকাবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা,—দেশের কথা এবং বিদেশী নজির (ব্রাইস্‌কি)।

"য়ারবি্যথর ফি্যর নাট্‌সিওনাল-য়েকোনোমী উণ্ড ষ্টাটিষ্টিক"

ধনবিজ্ঞান ও সংখ্যাবিজ্ঞান-বিষয়ক বর্ষপঞ্জী,—জার্ম্মাণির অন্যতম অর্থনৈতিক মাসিক পত্রিকা। নবেম্বর ১৯২৬,—(১) সামাজিক ধন-তত্ত্বের প্রকৃতি (গেক), (২) মালোৎপাদনের মার্কিণ রীতি, গ্রাণ্ট, টেলার ও ফোর্ড-প্রবর্ত্তিত তিন প্রণালী। ইয়োরোপে প্রথম দুই প্রণালীর চলন সম্ভবপর (ফোগেল), (৩) কারখানায় শান্তি সমিতি সমূহের কার্য্য-ফল (আপোলণ্টে), (৪) বিলাতের মজুর-সঙ্ঘ (ফেনিঙ্গার), (৫) মাদকতার তালিকা প্রকাশ (শ্‌ম্যোন্‌ডার্স)। ডিসেম্বর ১৯২৬,—(১) ফোন ভীজারের মূল্য-তত্ত্ব, রাজস্বতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব (হায়েক), (২) মজুর-পরিদর্শকদের বার্ষিক বিবরণী সম্বন্ধে সমালোচনা (ফ্রিগ্‌), (৩) বিলাতের মজুরি ও দৈনিক কার্য্যকাল (ফেনিঙ্গার), (৪) সুইট্‌-সার্ল্যাণ্ডে গমের সরকারী শাসন (স্প্যার্ণিখ্‌)।

জানুয়ারী ১৯২৭,—(১) মুদ্রা, কর্জ্জ ও চক্র। ডিস্কাউণ্টনীতির দ্বারা আর্থিক চক্র পুরাপুরি নিবারণ করা অসম্ভব। টাকার মূল্য আর দ্রব্যের মূল্য দুইই স্বাধীনভাবে উঠা-নামা করিতে পারে। কাজেই চক্র-তত্ত্বের উপর মুদ্রা-তত্ত্বের প্রভাব কতটা তাহা বিশ্লেষণ করা

অনেক সময়েই সহজ নয়। ১৯২৩-২৬ সনের অষ্ট্রিয়ান আর্থিক ক্রম-বিকাশ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে (টাঙ্কার)। (২) বিলাতী কয়লার খাদে সঙ্কট (হায়ার), (৩) ১৯২৬ সনের জাহাজ-দুনিয়া (হেন্নিগ), (৪) মার্কিণ মজুর-সঙ্ঘ (ফেনিঙ্গার), (১) ধনোৎপাদন ও সামাজিক সুবিচার (হোনেগ্‌গার), (২) প্রাচীন গ্রীসের ধনোৎপাদন-ব্যবস্থা (রাইখার্ট), (৩) বিজলী সম্বন্ধে নয়া বিলাতী আইন (হায়ার), (৪) বার্লিনে রুটির দর ও খাই খরচ,—১৯২৬ সনের কথা (গুবাৎসে) (৫) নরওয়ে দেশে সরকারী গম-শাসন (স্প্যার্ণিথ)।

মার্চ্চ ১৯২৭,—(১) প্রাচীন গ্রীসের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা (রাইখার্ট), (২) জার্ম্মাণির আর্থিক আইন অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯২৬, (৩) ট্রাষ্ট গড়নের তত্ত্বকথা ও সংখ্যা-তত্ত্ব (লেওন্‌টীফ ভাসিলি)।

ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌স্‌-ডীনৃষ্ট্‌

"আর্থিকজীবন বিষয়ক সংবাদ-সেবা"। জার্ম্মাণ সাপ্তাহিক (হাম্বুর্গ)। ২৭ নবেম্বর ১৯২৫। ক্রেমার জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—"দেশের ভিতরকার আর্থিক চলাচল বা লেনদেন সমূহের পূরাপূরি খতিয়ান করিতে হইলে কোন্ কোন্ তথ্যের হিসাব করা আবশ্যক? জবাব,—(১) রাইখ্‌সবাঙ্ক নামক নোটব্যাঙ্কের নোট এবং টাকাকড়ির চলাচল, (২) ডাকঘরের টাকাকড়ির লেনাদেনা, (৩) হুণ্ডি এবং অন্যান্য বাণিজ্য-পত্রের ঘুরাফিরা, (৪) মজুরি-বিতরণ, (৫) কারবারের সংখ্যা, (৬) রেল-জাহাজে মালের গতিবিধি।

ৎসাইটশ্রিফ্‌ট ফ্যির ব্রেটীব্‌স্‌-ভির্ট্‌শাফ্‌ট্

শিল্পবাণিজ্যের কর্ম্ম-পরিচালনা বিষয়ক পত্রিকা, মাসিক,—তিন বৎসর

ধরিয়া চলিতেছে। বার্লিন এবং ভিয়েনা হইতে প্রকাশিত। ১৯২৬ সনের প্রথম দুই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য :—(১) পরিচালনা-বিজ্ঞান (লীফমান), (২) কর্ম্মকেন্দ্রের উদ্বর্ত্তপত্র (পোলাক), (৩) মাল-চলাচলের ব্যবসায় হিসাব রক্ষা করা, (৪) কর্ম্মকেন্দ্রে কর্ম্মের পরিমাণ এবং পরিচালনা-বিজ্ঞান (হ্যারমান এবং মাউরিট্স্)। এই সকল বিষয় সাধারণতঃ ভারতে আলোচিতই হয় না।

ভেল্ট্‌ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌লিখেস্ আর্খিফ্‌

"আর্থিক দুনিয়ার গ্রন্থালয়"। জার্ম্মাণির য়েনা শহরে গুষ্টাফ্‌ ফিশার কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ণার্ড হার্মস্ সম্পাদক। ত্রৈমাসিক।

১৯২৬ জুলাই—প্রথম ১৬৪ পৃষ্ঠায় আছে নিম্নলিখিত ছয় প্রবন্ধ :—(১) আর্থিক কারবারের প্রকৃতি ও লক্ষ্য (ৎসীগ্‌লার), (২) আফ্রিকার আর্থিক ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (অধ্যাপক মেণ্ডেল্‌সোন), (৩) অশুল্ক বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতি,—এই দুই বাণিজ্য-ব্যবস্থার সঙ্গে মুদ্রা-বিজ্ঞান ও মুদ্রা-নীতির সম্বন্ধ, (৪) ঐতিহাসিক প্রণালীর ধনবিজ্ঞানবিদ্যার ভুলচুক এবং অসম্পূর্ণতা (অধ্যাপক ভিলব্রাণ্ট্‌), (৫) ধনবিজ্ঞান বিদ্যার অন্যতম জন্মদাতা ফরাসী চিকিৎসক কেনে "তাব্‌ল্য একনমিক" (দুনিয়ার আর্থিক চিত্র) গ্রন্থে "ফিজিঅক্র্যাট"তত্ত্ব (প্রকৃতি-তত্ত্ব) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই "চিত্রে" সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞান-মূলক সমালোচনা দেখিতেছি এক প্রবন্ধে। লেখক হইতেছেন অধ্যাপক প্লেঙ্গে। (৬) আমেরিকার আর্থিক শ্রেষ্ঠতা আর তাহার সঙ্গে জার্ম্মাণির টক্কর দিবার সুযোগ-সম্ভাবনা (অধ্যাপক হির্শ্‌)।

পত্রিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ইতিহাস বিবৃত হয়। এই জন্য গিয়াছে ২৫৭ পৃষ্ঠা। তেরটা রচনা এই ঐতিহাসিক অংশের অন্তর্গত। (১) ধনোৎপাদনের বিভিন্ন প্রণালী (অধ্যাপক সোম্বার্ট), (২) রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া এবং লাটভিয়া এই চার দেশের ইহুদি সমাজের আর্থিক জীবন (লেস্‌চিন্‌স্কি), (৩) লোক-সংখ্যার রাষ্ট্রনীতি (অধ্যাপক গ্যিণ্টার), (৪) দুনিয়ার অর্ণব-বাণিজ্যে জাহাজের অতি-জোগান (অধ্যাপক হেলাণ্ডার), (৫) তুরস্কে জার্ম্মাণ রেল,—১৮৮৮-১৯১৪ সনের কর্ম্মবৃত্তান্ত (ম্যিলমান), (৬) জার্ম্মাণির আকাশযান সম্বন্ধে নতুন বিধিব্যবস্থা (হাস্‌লিঙ্গার), (৭) ডাক ও রেলের আন্তর্জ্জাতিক বিধান (রোশার), (৮) হাঙ্গারির সঙ্গে দেশ-বিদেশের আর্থিক লেনদেনের হিসাব—১৯২৩-২৪ সনের তথ্য সমালোচনা (হাদ্রিক), (৯) সোনা, রূপা, তামা, সীসা, দস্তা ও টিন, এই ছয় ধাতুর উৎপত্তি এবং আমদানি-রপ্তানি,—১৯২৪-২৫ সনের বাজার-বিশ্লেষণ (আর্ংসেট,), (১০) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনায় আর্থিক উন্নতি ও বিদেশী পুঁজির সদ্ব্যবহার, (১১) ফ্রান্সে রাজস্ব-সমস্যা (অধ্যাপক লাণ্ডমান), (১২) খোলা দুয়ারের দেশ। পারস্য, চীন হইতে সুরু করিয়া দুনিয়ার সর্ব্বত্র যে-সকল নিম্-স্বাধীন দেশ আছে তাহাদের সঙ্গে ১৯২৫ সনে স্বাধীন দেশ সমূহের লেন-দেন কিরূপ চলিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত। আইনের তরফ হইতেই এই বৃত্তান্ত প্রধানতঃ সঙ্কলিত হইয়াছে (অধ্যাপক শিন্ডার)। (১৩) মজুর, মজুরি, বেকার-সমস্যা, সমাজ-বীমা ইত্যাদি "সামাজিক" জীবন বিষয়ক হালচাল সম্বন্ধে ১৯২১ সন হইতে যাহা-কিছু আন্তর্জ্জাতিক বিধিব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত (ফেনিঙ্গার)।

"বাঘা"-"বাঘা" গবেষকদের ধরণ-ধারণ

এই তেবটা রচনার প্রত্যেকটাই হয় এক-একখানা বিপুল গ্রন্থ বিশেষ, না হয় কোনো গ্রন্থের এক অতি-বৃহৎ অধ্যায়। লেখকেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ে বহুকাল ধরিয়া অনুসন্ধান চালাইতেছেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁহারা এখান-ওখান-সেখান হইতে "আর্থিক সংবাদ" সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত। এই সকল সংবাদ লইয়া মাঝে-মাঝে দৈনিকে-সাপ্তাহিকে-মাসিকে লিখিবার রেওয়াজও তাঁহাদের আছে। বিদেশী ভাষা হইতে তর্জ্জমায় এবং সঙ্কলনেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নন। তাহা ছাড়া মাল যখন বহরে বেশ পুরু হইয়া উঠে তখন তাঁহারা বিশ্বকোষ-সদৃশ ঢাউস ত্রৈমাসিকের শরণাপন্ন হন। তাহার পরেই "কপালে যদি থাকে" ত গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা। "বাঘা"-"বাঘা" প্রায় সকল পণ্ডিতের দস্তুরই এইরূপ।

এই ধরণের "নিয়মিত" আর্থিক গবেষণার দৃষ্টান্ত গোটা ভারতে আমাদের নজরে একপ্রকার পড়ে না বলিলে হয়ত অত্যুক্তি করা হইবে কি না সন্দেহ। এখানে কি স্বদেশী তথ্য ও তত্ত্ব, কি বিদেশী তথ্য ও তত্ত্ব দুই তরফের কথাই বলিতেছি। এইরূপ "নিয়মিত" গবেষণার জন্য বিদ্যার সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক দৃঢ়তা এবং চরিত্রবত্তা আর কর্ত্তব্য-বোধও লাগে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুবক ভারতের আমরা টক্কর দিতে ছুটিয়াছি। এই জন্য দুনিয়ার মাপকাঠিটা,—দুনিয়ার পণ্ডিতদের পরিশ্রম-প্রিয়তা, কর্ম্মদক্ষতা এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠা সর্ব্বদাই আমাদের স্বদেশ-সেবকদের চোখের সম্মুখে রাখা আবশ্যক।

উচ্চতর কর্ম্মপ্রণালীর এবং চিন্তাপ্রণালীর সংস্পর্শে না আসিলে

ভারতের পণ্ডিতেরা যখন-তখন যেখানে-সেখানে "আঙুল ফুলে কলাগাছ" হইয়া পড়িতে পারেন, এইরূপ সন্দেহ করিবার কারণ যে নাই তা নয়। আর তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্যও দেশের "সমঝ্‌দারেরা" হয়ত "ধন্য ধন্য" করিতে থাকিবেন। ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার মহলে দেশকে এইরূপ লজ্জাকর দুরবস্থা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে,—এইটুকু মাত্র বলা ছাড়া সম্প্রতি "আর্থিক উন্নতি"র সুযোগ এবং শক্তি আর বেশী নাই।

তবে একথাও বলা আবশ্যক যে, আমাদের এই দুরবস্থা সম্বন্ধে সজ্ঞান হইবার চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত বাঙালী সমাজে, এবং উচ্চতম শিক্ষিত মহলেও বড় একটা দেখিতে পাইতেছি না। বিদ্যাচর্চ্চায় আমাদের যথার্থ উন্নতি সাধন এখনও দূর ভবিষ্যতের কথা। পূরাপূরি এইরূপ বুঝিয়াই ধীর ও সহিষ্ণুভাবে কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে।

"আর্খিফে"র তৃতীয় অধ্যায় হইতেছে সমালোচনা। তাহার জন্য বর্ত্তমান সংখ্যায় আছে ১৩০ পৃষ্ঠা। ৩৮ খানা গ্রন্থ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত বিবরণ ছাপা হইয়াছে। আর ছোট-খাটো গ্রন্থ-পরিচয় গুন্‌তিতে ১০০০ হইবে। এই পরিচয়ের ভিতর দেশী-বিদেশী ধনবিজ্ঞানবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ-বিষয়ক পত্রিকার সূচীও বিবৃত আছে। এই অধ্যায়ের বড়-বড় সমালোচনার লেখক ৩৮ জন। তাঁহারা প্রত্যেকেই "বাঘা"-"বাঘা" ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত। বড় বড় সমালোচনা বলিলে রয়্যাল অক্‌টেভো আকারের এক, দেড়, দুই, আড়াই-পৃষ্ঠা বুঝিতে হইবে। ক্বচিৎ কথনো তিন চার পৃষ্ঠায়ও গিয়া ঠেকে। অন্যান্য সমলোচকের সংখ্যা শ'দেড়েকের কম নয়। তাঁহারা সকলেই অধ্যাপক শ্রেণীরই লোক। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে "বাঘা"-"বাঘা"ও বটে। ঐ সকল দেশে নামজাদা পণ্ডিতেরাও দেশী-বিদেশী বই বা কাগজ-

পত্রের রচনা সম্বন্ধে দুই-চার লইনের সমালোচনা লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না। এই সদ্‌গুণ ভারতে অনুকরণযোগ্য।

এপ্রিল ১৯২৬:—১) এক প্রবন্ধে ইয়োরোপের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া লেখক ফ্রেঙ্কেণ বলিতেছেন,—"আমেরিকা হইতে পুঁজি না পাইলে ইয়োরোপের দেশগুলা আর্থিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। অধিকন্তু মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা ইত্যাদি জনপদে ইয়োরোপীয়ান উপনিবেশ কায়েম হওয়া আবশ্যক। ইয়োরোপের সঙ্গে এই সকল নব ভূখণ্ডের আমদানি-রপ্তানি না বাড়িলে ইয়োরোপ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। (২) আর এক প্রবন্ধে হান্তোস বলিতেছেন:—"ইয়োরোপ রাষ্ট্রিক হিসাবে নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর্থিক হিসাবে এইগুলাকে একটা ইয়োরোপীয় শুল্ক-সঙ্ঘের তাঁবে ঐক্যগ্রথিত করা আবশ্যক।"

"গেও-পোলিটিক"

মিউনিকের অধ্যাপক কার্ল্ হাউসহোফার কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্র। প্রকাশ-স্থান বার্লিন। ১৯৩৪ সনের জানুয়ারী মাসে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করার উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা বাহির করা হইয়াছে।

"গেও-পোলিটিক" শব্দটা হউসহোফারের মার্কামারা পারিভাষিক। ইহার বাংলা প্রতিশব্দ "ভূমি-নীতি" বা 'ভূমি-রাষ্ট্রনীতি'। ইহাতে জমিজমার কথা বুঝিতে হইবে না। চাষ, আবাদ, প্রজা, রাইয়ত, জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি কিছুই এই ভূমি-নীতি বা ভূমি-রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত নয়। হাউসহোফার নৃতত্ত্ববিৎ। তাঁহার ব্যবসা মানুষ লইয়া কারবার করা,—মানুষ গড়া। মানুষের উন্নতি-অবনতি, মানুষের বাড়তি-ঘাটতি ইত্যাদি বস্তুর সঙ্গে মানুষের বাস্তুভিটার, মানুষের

আবেষ্টনের, মানুষের জন্মনিকেতনের, মানুষের স্বদেশের যোগাযোগ আলোচনা করা তাঁহার উদ্ভাবিত গেও-পোলিটিক বিজ্ঞানের পেশা। কথাটা শুনিবামাত্র মানুষের উপর জলবায়ুর প্রভাব, নদী-পর্ব্বতের প্রভাব, অথবা খাদ্যদ্রব্যের প্রভাব ইত্যাদি প্রভাবগুলা সম্বন্ধে চাঙ্গা হইয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই। হাউসহোফার জলবায়ুতত্ত্ব সম্বন্ধে সজাগ বটে। কিন্তু ইহাই তাঁহার "গেও-নীতি"র বড় বা আসল কথা নয়।

হাউসহোফার বুঝিয়াছেন যে, দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের সঙ্গেই তাহার আশ-পাশের দেশগুলার একটা অতি-নিবিড় সম্বন্ধ আছে। লোক-চলাচল, মাল-চলাচল, রোগ-চলাচল, আদর্শ-চলাচল ইত্যাদি নানাপ্রকার চলাচলের দরুণ প্রত্যেক দেশ অর্থাৎ ভূমিই প্রতিমুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হইতেছে। এই সূত্রে যতগুলা রূপান্তর-সাধন বা পুনর্গঠন ঘটিতেছে সেইদিকে বিজ্ঞানসেবীদের নজর টানিয়া আনা "ভূমি-নীতি"র লক্ষ্য। হাউসহোফারের বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, গ্রন্থে আর এই মাসিকে দেখিতে পাই আর্থিক কথা, সামাজিক কথা, আইন-কানুনের কথা, রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের কথা। ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবই "গেও"-সাধনায় ঠাঁই পায়। তবে সর্ব্বত্রই চলাচল, গতিবিধি, উঠানামা, উৎরাই-চড়াই অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন, দেশে-দেশে যোগাযোগ,—এক কথায় দুনিয়া-নিষ্ঠা। বর্ত্তমান ভারত, চীন ও জাপান সম্বন্ধে হাউসহোফার জার্ম্মাণির অন্যতম বিশেষজ্ঞ।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আছে :—

(১) চাই দুনিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ও জীবনধারণের জন্য যথোচিত ঠাঁই আর আন্তর্জ্জাতিক সাম্য (কার্ল্ হাউসহোফার, (২) জার্ম্মাণ জাতির চৌহদ্দি (ট্রাম্প্লার), (৩) আট্‌লাণ্টিক দুনিয়ার সংবাদ (আলব্রেখ্‌ট্ হাউসহোফার),—ইহাতে আছে উত্তর ও দক্ষিণ

আমেরিকার বস্তুনিষ্ঠ মাসিক ইতিহাস, (৪) ভারত-প্রশান্ত-সাগরীয় দুনিয়ার মাসিক সংবাদ (কার্ল হাউস্‌হোফার)।

"ড্যর মাশিনেন-শাডেন"

(যন্ত্রপাতির আপদ্‌-বিপদ্‌), মাসিক, বার্লিন

ডিসেম্বর, ১৯৩৩,—আমাদের দেশে যন্ত্রনিষ্ঠার অ, আ, ক, খ সুরু হইয়াছে মাত্র। কিন্তু যাঁহারাই যন্ত্রপাতি লইয়া ঘঁটাঘাঁটি করেন তাঁহারাই জানেন যে, কলকব্জা, যন্ত্র, হাতিয়ার ইত্যাদিরও ব্যায়রাম হয়। এই সবেরও ওষুধপত্র লাগে। মেরামতের দরকার ত হয়ই। এইসকল বিষয় সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ভাষায় যতগুলা সচিত্র মাসিক বাহির হয়, তাহার ভিতর "ড্যর মাশিনেন-শাডেন" অন্যতম। একালের ধনদৌলত যন্ত্রপাতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই আর্থিক উন্নতির অন্যতম আত্মিক বনিয়াদ যন্ত্রপাতির ব্যাধি-বিষয়ক সাহিত্য। বর্ত্তমান সংখ্যায় যে সকল কথা আলোচিত দেখিতেছি তাহার কোনোটায়ই যন্ত্রশাস্ত্রী এঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কাহারও পক্ষে দন্তস্ফুট করা সম্ভব নয়। একটা প্রবন্ধের নাম :—কয়লার উননের ছাই উঠাইবার সময় যাহাতে ধূলা ও গন্ধ বাহির না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য যন্ত্রপাতি। আর এক প্রবন্ধে আছে মরিচা-পড়া নিবারণ ও মেরামতের জন্য ফসফোরাস-ঘটিত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা। তৃতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য কথা হইতেছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জখম-অবস্থা ও তাহার হিকমত ব্যবস্থা।

"অ্যার, টে, আ নাখ্‌রিখ্‌টেন"

(যন্ত্রপাতি-ও-বিজ্ঞান-পরিষৎ পত্রিকা), বার্লিন

জার্ম্মাণির হিট্‌লার-রাজ জার্ম্মাণ জাতকে যন্ত্রনিষ্ঠায় দিগ্‌বিজয়ী

করিবার ভার লইয়াছে। জার্ম্মাণরা ত স্বভাবতই গোদা-গোদা সঙ্ঘ, সঙ্ঘের সঙ্ঘের সঙ্ঘ, অতি-সঙ্ঘ, মহাসঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কায়েম করিতে অভ্যস্ত। ১৯৩৩ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যন্ত্রপাতি, শিল্পনিষ্ঠা ও বিজ্ঞান-গবেষণা সম্বন্ধে এইরূপ সভাসমিতি, সঙ্ঘ, পরিষৎ ইত্যাদি নামক প্রতিষ্ঠান ছিলও বিস্তর। কিন্তু এইগুলার প্রায় প্রত্যেকটাতেই একাধিক সঙ্ঘের বা পরিষদের এলাকাধীন অনুসন্ধান-গবেষণা চালানো হইত। কাজেই কখনো-কখনো একই কাজ হয়ত পাঁচ সাত জায়গায় অনুষ্ঠিত হইত। বলা বাহুল্য ইহা অপব্যয়ের বা অতি-ব্যয়ের নামান্তর মাত্র। হিট্‌লার মসনদে বসিবা মাত্র "বাঘা-বাঘা" সব কয়টা পরিষৎকে একত্রে ডাকিয়া বলিলেন—"চালাও যুক্তিযোগ। গোদা-গোদা সঙ্ঘ গণ্ডা-গণ্ডা রাখিয়া দরকার নাই। আর যদিই বা রাখা দরকার হয়, তাহা হইলেও সব কয়টাকে এক তাঁবে আনিয়া ফেল। গোটা জার্ম্মাণির শিল্প-গবেষণা, যন্ত্র-গবেষণা, বিজ্ঞান-গবেষণা একমেবাদ্বিতীয়ং পরিষদের কব্‌জায় শাসিত হইতে থাকুক।"

এই বিধানে যে অতিকায় পরিষৎ বা মহা-পরিষৎ গড়িয়া উঠিল তাহার নাম "রাইখ্‌স্ গেমাইন শাফ্‌ট্ ড্যর টেখ্‌নিশ-ভিস্‌সেনশাফ্‌ট্-লিখেন আর্‌বাইট্" (যন্ত্রপাতি-ও-বিজ্ঞান বিষয়ক কার্য্যাবলীর কেন্দ্র-পরিষৎ)। এই মহাপরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে নিম্নলিখিত সঙ্ঘ-গুলা:—(১) জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার সঙ্ঘ (২) জার্ম্মাণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রশিল্প সঙ্ঘ, (৩) জার্ম্মাণ লৌহখনি-শিল্প-সঙ্ঘ, (৪) জার্ম্মাণ বাস্তুশিল্পি-সঙ্ঘ, (৫) জার্ম্মাণ জাহাজ শিল্পি-সঙ্ঘ, (৬) জার্ম্মাণ খনি ও ধাতু-শিল্পি-সঙ্ঘ, (৭) জার্ম্মাণ ধাতুতত্ত্ব সঙ্ঘ, (৮) জার্ম্মাণ অটোমোবিল ও উড়ো জাহাজ সঙ্ঘ, (৯) জার্ম্মাণ গড়নশিল্প সঙ্ঘ, (১০) জার্ম্মাণ যান্ত্রিক

দ্রব্য পরীক্ষা সঙ্ঘ, (১১) জার্ম্মাণ শিল্পশিক্ষা-সঙ্ঘ, (১২) জার্ম্মাণ মজুরির সময় নির্দ্ধারণ বিষয়ক সঙ্ঘ।

এই সকল বিষয়ে তিনটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে "অ্যার, টে, আ নাখ্ রিখ্টেন" পত্রিকার ৩রা জানুয়ারি (১৯৩৪) সংখ্যায়। লেখকেরা তিনজনেই এঞ্জিনিয়ার (গার্বোট্স্, শুল্ট্ এবং ন্যেগেল)। নগর-নির্ম্মাণ ও পল্লী সংস্কারের কাজে জার্ম্মাণ জাতির ঠাঁই কোথায় এই বিষয়ে লিখিয়াছেন অধ্যাপক এস্কার্ট। গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে এক লেখক বলিতেছেন যে, কোটি কোটি টাকা বাঁচানো সম্ভব গবেষকদের কাজের ফলে। গবেষণার দৌলতে ইতিমধ্যেই হিট্লার-রাজ বিদেশী খাদ্যদ্রব্যের আমদানি অনেক পরিমাণে কমাইতে পারিয়াছে। আজও জার্ম্মাণ জাতির যতটা খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক হয় তাহার শতকরা ২০ অংশ আসে বিদেশ হইতে। গবেষণার দ্বারা এই অংশ আরও কমানো যাইতে পারে।

প্রত্যেক প্রবন্ধেই দেখা যাইতেছে যে, লেখকেরা মজুর, মজুরি, মজুরের মেহনৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ নজর দিয়াছেন। "সমগ্র জার্ম্মাণ নরনারীর" উন্নতি, মঙ্গল বা সেবা ইত্যাদি শব্দ সর্ব্বত্রই ছড়ানো দেখিতেছি। বুঝিতে হইবে,—ইহাই হিট্লারি দস্তুর। হিট্লারের পাল্লায় পড়িয়া জার্ম্মাণির এঞ্জিনিয়ারগুলাও বেশ-কিছু মজুরপন্থী সোশ্যালিষ্টপন্থী বোলচাল আওড়াইতে সুরু করিয়াছে।

"হাম্বুর্গার নাখ্রিখ্টেন"

(হাম্বুর্গ-পত্রিকা),—জার্ম্মাণ দৈনিক, ১৪২ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।

১০ জানুয়ারি ১৯৩৪—(১) অতীতের সঙ্গে লড়াই (ডক্টর এস্সার)। লেখক বলিতেছেন যে, ফরাসী জাতি আজও মধ্যযুগের বিজিগীষা-প্রিয়তায় মজিয়া রহিয়াছে। তাহাকে অতীতের চাপ হইতে উদ্ধার না.

করিলে ইয়োরোপের পুনর্গঠন অসম্ভব। (২) ফ্রান্সের দশ শর্ত্ত, (৩) জার্ম্মাণ সমুদ্র-কানুন-পরিষদের সম্মেলন, (৪) সার-জনপদে মার্ক্‌স্‌পন্থী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে ফ্রান্সের হামদর্দ্দি, (৫) জার্ম্মাণিতে প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টিয়ানদের সামঞ্জস্যবিধান ও ঐক্যবন্ধন হিটলার-রাজের অন্যতম কীর্ত্তি, (৬) মহানগরী নরনারীর পক্ষে কেওরাতলা বিশেষ, (৭) আকাশযানের ত্রিশ বৎসর, (৮) কোনো-কোনো মার্কিণ আইনে ১৪ বৎসরের বালকের সঙ্গে ১২ বৎসরের বালিকার বিবাহ ঘটিতে পারে (মেরিল্যাণ্ড, কলরাডো, ফ্লরিডা, ইডাহো, মেইন, নিউজার্সী ইত্যাদি রাষ্ট্রে), (৯) নাৎসি-নীতির শান্তিনিষ্ঠা, (১০) জার্ম্মাণ নারীর কৃতিত্ব (ডক্টর ক্রুমাখার), (১১) ধ্বংসের পথে উৎকর্ষশীল পরিবার (ডক্টর হার্ট্‌নাকে), (১২) বিদেশী রাষ্ট্রে জার্ম্মাণ নরনারীর অবস্থা, (১৩) ফরাসী জোচ্চোর স্তাভিস্কির সঙ্গে ১৮০ জন নামজাদা ফরাসী মন্ত্রী, নগর-শাসক, জজ, উকিল, ব্যাঙ্কার ইত্যাদির যোগাযোগ, (১৪) ১৯৩৩ সনে জার্ম্মাণিতে আর্থিক আরোগ্যলাভের সূত্রপাত। জার্ম্মাণির মতন বিলাত ও বৃটিশ সাম্রাজ্য, পাউণ্ডের দুনিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর জাপান ইত্যাদি দেশেও এই আরোগ্যলাভের পরিচয় পাওয়া যায়। আরোগ্যলাভের প্রধান কারণ,—সরকারী সাহায্য-নীতির বিপুল প্রয়োগ। প্রত্যেক জনপদেই আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের উপর নির্ভর না করিয়া স্বদেশী বাজারের লেনদেন বাড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এই স্বদেশী বাজার যারপরনাই বিপুল। কেন না একে ত সাম্রাজ্য তাহার উপর পাউণ্ডের দুনিয়া।

১৭ জানুয়ারি ১৯৩৪:—(১) সমাজ-গৌরবে জার্ম্মাণ মজুরের বাড়্‌তি (ডক্টর এস্‌সার), (২) সার-প্রদেশ সম্বন্ধে কোনো তর্কাতর্কি চলিবে না, (৩) প্রসিদ্ধ পরিবারসমূহের সন্তান-সম্পদ।

"ফ্যোলিকশার বেওবাখ্‌টার"

(জনগণের প্রদর্শক), বার্লিন

২৫ জানুয়ারি ১৯৩৪ :—(১) হিট্‌লার-রাজের প্রথম বর্ষ, (২) আড়াই কোটি মার্ক (মার্ক ভারতীয় টাকার প্রায় সমান) সরকারী দান (খাওয়া-পরার জন্য আর কয়লার জন্য), (৩) মজুর ও কেরাণীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি, (৪) প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার জার্ম্মাণরা "এক তরকারী" খাইতে বাধ্য। এই জন্য তাহারা আধা মার্কের বেশী খরচ করিতে অধিকারী নয়। অথচ নিয়মিত খাইতে হইলে তাহাদের পড়ে সাধারণতঃ এক বা দেড় বা আড়াই মার্ক। গবর্মেণ্ট এই উপরি মার্কগুলা নিজের পকেটস্থ করে। পরে এই টাকা গরীবদের খাওয়াপরা আর কয়লার জন্য খরচ করা হয়। এই "এক তরকারী"-ব্যবস্থায় প্রতিমাসে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট প্রায় ৪০ লাখ টাকা।

টেখ্‌নিক উণ্ড্‌ ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌

(যন্ত্রনিষ্ঠা ও আর্থিক ব্যবস্থা)

বার্লিন হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্র। ১৯৩৪ জানুয়ারি। এই সংখ্যায় সপ্তবিংশতিতম বর্ষ সুরু হইয়াছে।

১। এঞ্জিনিয়ার ব্রেট্‌ লিখিয়াছেন "আর্থিক ব্যবস্থার চাষ" সম্বন্ধে। এই আলোচনায় আছে প্রথমতঃ উন্নতি ও নেতৃত্বের কথা, দ্বিতীয়তঃ আর্থিক ব্যবস্থার সংগঠন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ, আর তৃতীয়তঃ পেশা, আর্থিক জীবন ও জনসাধারণ বিষয়ক গবেষণা।

২। ভ্যের্ণার লিখিয়াছেন জার্ম্মাণ "ৎসোল-ফারাইণ" বা শুল্ক-সঙ্ঘের শতবার্ষিকী সম্বন্ধে প্রবন্ধ। ১৮৩৩ সনে জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মাণ শুল্ক-সঙ্ঘ কায়েম হয়। তাহার ব্যবস্থায় সেকালের স্বত্বপ্রধান পরস্পর-

টক্করশীল জার্ম্মাণ দেশগুলা ঐক্যবদ্ধ শুল্কনীতির তাঁবে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে অ-জার্ম্মাণ দেশের শিল্পদ্রব্য হইতে জার্ম্মাণরা আত্মরক্ষার জন্য সংরক্ষণ-নীতির ব্যবস্থা করে। এই সকল কাজের আধ্যাত্মিক মন্ত্রদাতা ছিলেন অর্থশাস্ত্রের অন্যতম জগদ্‌গুরু ফ্রীড্‌রিশ লিষ্ট। বর্ত্তমান গ্রন্থকারের হাতে লিষ্ট-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা বাহির হইয়াছে "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি" নামে।

১৯৩৩ সনে শুল্ক-সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্ণ হইল। সেই উপলক্ষ্যে ভ্যের্ণার জার্ম্মাণির বাণিজ্যনীতি বিষয়ক ইতিহাস-মূলক রচনা তৈয়ারি করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্রই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে সমঝৌতা নীতি কায়েম হইতেছে। যে-কোনো দুই দেশের সমঝৌতার ভিতর অন্যান্য সকল দেশকে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ" প্রদান করিবার শক্তি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কিন্তু এই শক্তির বিরুদ্ধে সর্ব্বত্রই মেজাজ গড়িয়া উঠিতেছে। ভের্ণ্যারও সেই নীতির তীব্র সমালোচক। এই নীতির পরিবর্ত্তে লোকেরা একালে চাহিতেছে "পক্ষপাত" অর্থাৎ কাহাকে-কাহাকেও আদর করা আর অন্যান্যকে কলা দেখানো। বৃটিশ সাম্রাজ্য অটাওয়ার ব্যবস্থা অনুসারে এইরূপ পক্ষপাত কায়েম করিয়াছে। জার্ম্মাণিকে এইরূপ পাঁতি দিয়া ভ্যের্ণার প্রবন্ধ খতম করিয়াছেন।

৩। কার্টেল বা কোম্পানী-সঙ্ঘ বিষয়ক আলোচনা এই পত্রিকার বিশেষত্ব। এই জন্য একটা অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট করা আছে।

"আল্‌গেমাইনেস্‌ ষ্টাটিষ্টিশেস আর্খিফ্‌"

য়েনার গুষ্টাফ্‌ ফিশার কোম্পানী "আল্‌গেমাইনেস্‌ ষ্টাটিষ্টিশেস্‌ আর্খিফ্‌" *("সাধারণ সংখ্যা দপ্তর")* নামে একটা সংখ্যাবিজ্ঞান বিষয়ক

পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। সম্পাদক হইতেছেন ব্যাভেরিয়ার ষ্টাটিষ্টিশেস্ লাণ্ডেস্-আম্ট্ বা প্রাদেশিক সংখ্যা-দপ্তরের প্রেসিডেণ্ট ফ্রীড্রিশ্ ৎসান। ইনি মিউনিকের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টারিও করিয়া থাকেন।

একালের অন্যান্য সংখ্যাশাস্ত্রীদের মতন ৎসানও লোকবল সম্বন্ধে গবেষণায় যথেষ্ট সময় দিতে অভ্যস্ত। জার্ম্মাণির লোকসংখ্যা বাড়াইবার দিকে যুক্তি দেখানো এবং এই সম্বন্ধে উপায় বাৎলানো তাঁহার অর্থশাস্ত্র-গবেষণার অন্যতম বড় কথা। তাঁহার হাতে টেক্‌ষ্টবুক জাতীয় বই বাহির হইয়াছে কিনা সন্দেহ। পত্রিকায় আর বিশ্বকোষে প্রবন্ধ রচনাই তাঁহার চিন্তাসম্পদের সাক্ষী। এখানে-ওখানে বক্তৃতা দিবার জন্যও তাঁহাকে প্রবন্ধাদি লিখিতে হইয়াছে।

১৯৩১ সনের ১৭ নবেম্বর তারিখে জার্ম্মাণিতে "সমাজ-বীমা" ব্যবস্থার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই উপলক্ষ্যে মিউনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটা জুবিলি অনুষ্ঠিত হয়। এই জুবিলি-উৎসবে অন্যতম বক্তা ছিলেন ৎসান। বক্তৃতাটা আল্‌গেমাইনেস ষ্টাটিষ্টিশেস্ আর্খিফ্ পত্রিকার ১৯৩২ সনের অন্যতম সংখ্যায় বাহির হইয়াছে।

ৎসান বলিতেছেন যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮১ সনের ১৭ নবেম্বর তারিখে বিসমার্ক রাইখ্‌ষ্টাগ্ সভায় বাদশা প্রথম ভিল্‌হেল্মের "বাণী" পাঠ করেন। সেই বাণীতে ছিল নতুন সমাজ-নীতির সূত্রপাত। তাহাতে জার্ম্মাণ সমাজে যুগান্তর সৃষ্ট হইয়াছে। সেই বাণীতেই পরবর্ত্তী কালের (১৮৮৩-১৮৮৯) সমাজবীমা-বিষয়ক আইনের গোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান কালে জার্ম্মাণ সমাজে কত লোক তিন প্রকার বীমার অন্তর্গত নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

	১৯১৩	১৯৩০
ব্যাধি বীমা	১৭,০০০,০০০	২২,০০০,০০০
দৈব বীমা	২৬,০০০,০০০	২৩,৭০০,০০০
বার্দ্ধক্য বীমা	২৬,৩০০,০০০	২৩,০০০,০০০

ৎসান বলিতেছেন যে ২৫,০০০,০০০ নরনারী সমাজ-বীমার ফল ভোগ করে। ইহাদের পরিবারের লোকজনও সমাজ-বীমার আইন অনুসারে বীমার ফলভোগে অধিকারী। অতএব সব সুদ্ধ প্রায় ৪৪,০০০,০০০ নরনারী সমাজ-বীমার অন্তর্গত। দেশের লোকসংখ্যা ৬৪,০০০,০০০। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, প্রায় দশ আনা লোক সমাজ-বীমার আইন মাফিক বীমা করিতে অধিকারী। বীমা-সমিতির সংখ্যা প্রায় ৮,০০০ হইবে।

তিন প্রকার বীমার ব্যবস্থায় বীমা-ভাণ্ডার হইতে যত খরচ করা হইয়াছে তাহার ফিরিস্তি নিম্নরূপ (সবই রাইখ্‌স্-মার্কে বুঝিতে হইবে):—

	১৯১৩	১৯৩০
ব্যাধি বীমা	৪৮৮,০০০০০০	১,৮৩০,০০০,০০০
দৈব বীমা	১৮০,০০০,০০০	৩৬৪,০০০,০০০
বার্দ্ধক্য বীমা	৭৭৭,০০০,০০০	১,৮৩৮,০০০,০০০
মোট	১,৪৪৫,০০০,০০০	৪,০৩২,০০০,০০০

এক রাইখ্‌স্-মার্কের দাম সহজে বার আনা ধরিলে ১৯৩০ সনে ৩,০০০,০০০,০০০ টাকার কিছু বেশী খরচ হইয়াছিল। এই সঙ্গে বেকার-বীমার ভাতা জুড়িলে ছয় মিলিয়ার্ড (৬,০০০,০০০,০০০) রাইখস্-মার্ক অর্থাৎ প্রায় ৪৫০ কোটী টাকা খরচের হিসাব পাওয়া যায়।

ৎসান বলিতেছেন যে, জার্ম্মাণির দেখাদেখি পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্পনিষ্ঠ দেশেই সমাজ-বীমার আইন জারি হইয়াছে। তাহার ফলে জার্ম্মাণ মালিক, পুঁজিপতি ও গবর্মেণ্টের মতন অন্যান্য দেশের মালিক, পুঁজিপতি ও গবর্মেণ্ট মজুরদের দেওয়া বীমা-চাঁদার ভাণ্ডারে নিজ-নিজ দান জোগাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

ইহাতে তুনিয়ার সকল দেশের মজুরেরা অল্পবিস্তর স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্বেগহীনতার সুফল ভোগ করিতে পারিতেছে। অধিকন্তু জার্ম্মাণ বণিক-শিল্পীদের. তরফ হইতে একটা রেহাইয়ের কথাও আছে। কেন না মালোৎপাদনের কাজে আর বাজারে মাল-ফেলার ব্যবসায় জার্ম্মাণদের মতনই অন্যান্যেরাও কিছু-কিছু ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক টক্করে জার্ম্মাণিকে অপেক্ষাকৃত অতি-বেশী অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে না।

যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির ধনসম্পদ বাড়িতেছিল। সমাজবীমার জন্য পুঁজিপতিরা মজুরদের চাঁদা-ভাণ্ডারে সাহায্য করার ব্যবস্থায় পশ্চাৎপদ ছিল না। কিন্তু লড়াইয়ের আর তাহার পরবর্ত্তী যুগের অবস্থায় গোলযোগ হাজির হইয়াছে। মজুরদের. দেওয়া চাঁদার পরিমাণ কমিয়া আসিয়ায়ছ। অথচ বীমার সুফল-ভোগকারীদের সংখ্যা এবং আকার-প্রকার বাড়িয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে এই যুগে জার্ম্মাণির শিল্পবাণিজ্যও সচ্ছল নয়। অর্থাৎ ধনসম্পদ যে-যুগে খানিকটা এবং বেশ-কিছু সঙ্কুচিত সেই যুগে সমাজবীমার আইন অনুসারে বেশী-বেশী মজুর-কেরাণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিতে হইতেছে। অধিকন্তু প্রত্যেক মজুর-কেরাণীর জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা ও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সোজা কথায় মজুর-কেরাণী কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রিমিয়াম বা চাঁদার পরিমাণের সঙ্গে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট-করা খাওয়া-পরা-চিকিৎসা

ইত্যাদির ব্যবস্থার আর-কোনো যোগ দেখা যাইতেছে না। এই ব্যবস্থাকে আর "বীমা" বলা চলে না। প্রকারান্তরে ইহাকে সরকারী বা "মহাজনিক" দান-খৈরাত, সাহায্য, সেবা, মঙ্গল-বিধান ইত্যাদি বলা কর্ত্তব্য।

"ইন্‌ফ্লেশ্যন" (মুদ্রার অতি-জোগান) বা মুদ্রাপতনের যুগে (১৯২১-২৩) সমাজবীমার ক্ষেত্রে যেসকল দুরবস্থা দেখা গিয়াছিল তাহার পরেও সেই সমুদয় রহিয়া গিয়াছে। কেননা রোজই এমন আইন জারি করা হইয়াছে যাহাতে বীমাভোগীদের বহর বাড়্‌তির পথে চলিয়াছে। কাজেই মজুর-কেরাণী আর মালিক এই দুই পক্ষের উপর চাঁদার ভারও বাড়্‌তির পথেই চলিয়াছে। বেশী-বেশী হারে চাঁদা দেওয়া সম্ভব যদি মজুরদের নকরি থাকে আর মালিকদের ব্যবসা চলে। কিন্তু ১৯২৯ সনের পর হইতে বিশ্বব্যাপী মন্দার ঠেলায় জার্ম্মাণ শিল্প-বাণিজ্যও কুপোকাৎ। কাজেই সমাজবীমার ব্যবস্থায় দেনা, দেনা আর দেনা! অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের ঘাড়ে ঝুঁকি-বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু দেখা যাইতেছে না।

ৎসান হিসাব করিয়া দেখিতেছেন যে, জার্ম্মাণ সমাজে বালক-বালিকা ও জোয়ানদের হিস্যা কমিতেছে। অপর দিকে প্রবীণ আর বুড়াদের হিস্যা বাড়িতেছে। ত্রিশ বৎসরের নীচে যাহাদের বয়স তাহাদিগকে জোয়ান ও বালক-বালিকা ধরা হইয়াছে। ত্রিশ হইতে ষাট বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের নরনারীকে প্রবীণ বলা হইয়াছে। আর ষাট বৎসরের বেশী যাহারা তাহারা বুড়া।

১৮৮৫,১৯২৫ আর ১৯৩০ এই তিন সনের জার্ম্মাণ লোকসংখ্যা বয়স হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণী গোটা সমাজের শতকরা কত অংশ তাহা বুঝাইবার জন্য ৎসান নিম্নের তালিকা তৈয়ারি করিয়াছেন :—

	১৮৮৫	১৯২৫	১৯৩০
৩০ বৎসরের নীচে	৬০.৯	৫৪.৭	৫২.৩
৩০ হইতে ৬০ বৎসরের	৩১.০	৩৬.১	৩৭.৫
৬০ বৎসরের উপর	৮.১	৯.২	১০.২
	১০০	১০০	১০০

দেখা যাইতেছে যে, ৩০ বৎসরের নীচে যাহাদের বয়স তাহারা ১৮৮৫ সনে ছিল সমগ্র সমাজের শতকরা ৬০.৯। ১৯৩০ সনে তাহারা শতকরা ৫২.৩ অংশে নামিয়া আসিয়াছে। কাজেই বেশী-বয়সের নরনারীর শতকরা হার বাড়িয়াছে।

সমাজ-বীমার তরফ হইতে বয়সের অনুপাত-পরিবর্ত্তনটা গুরুতর সমস্যা উপস্থিত করিতেছে। যে-যে বয়সের লোক হইতে বীমার চাঁদা বেশী-বেশী এবং নিয়মিতরূপে আদায় হওয়া সম্ভব সেই-সেই বয়সের লোক-সংখ্যায় ঘাট্‌তি দেখা যাইতেছে। অপর দিকে যে-যে বয়সে নরনারীরা বীমা-ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পায়, সাহায্যের আশা করে এবং পেন্‌শ্যন-যোগ্য বিবেচিত হয় সেই-সব বয়সের লোক-সংখ্যা বাড়তির পথে চলিয়াছে। অর্থাৎ সমাজ-বীমার কর্ত্তৃপক্ষকে আয়ের সঙ্কোচ আর খর্চ্চার প্রসার এই দুই বিপদজনক অবস্থার ভিতর পড়িতে হইয়াছে।

এই বোঝার কথা মনে রাখিয়াও ৎসান বলিতেছেন—"ইহাতে ভয় পাইলে অথবা ব্যতিব্যস্ত হইলে চলিবে না। এত সব খরচপত্র করার ফলে লাভ কম হইয়াছে কি? লাভ মাপিবার সময় একমাত্র কোম্পানী বা ব্যক্তিবিশেষের খাতাপত্র দেখিলে চলিবে না। সমাজ-বীমার আইন মাফিক মজুর-কেরাণীদের জন্য চাঁদা দিতে গিয়া বণিক-

শিল্পীরা মালসৃষ্টির কাজে বেশী খরচ করিতে বাধ্য হইতেছে। কাজেই নিট লাভের বেলায় অঙ্ক দেখা যাইতেছে অল্প অথবা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়ত লাভ দেখা যাইতেছেই না। কিন্তু সোনারূপা, টাকাকড়ি ইত্যাদি বস্তু কোনো দেশের আর্থিক বনিয়াদ নয়। ধনসম্পদের আসল বনিয়াদ দেখিতে হইবে মজুর-কেরাণীর শারীরিক স্বাস্থ্যে ও কর্ম্মক্ষমতায় আর মানসিক শক্তিযোগে ও উদ্বেগহীনতায়। জার্ম্মাণ নরনারীর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিয়াছে। তাহাদের কর্ম্মদক্ষতা বাড়িয়াছে। তাহারা নিরুদ্বেগে আনন্দের সহিত জীবনযাত্রা চালাইবার পথে অগ্রসর হইতেছে। সমাজের এইরূপ পুষ্টিসাধন করিতে পারিয়াছে বলিয়া সমাজবীমার আইনকে যথার্থরূপে সার্থক বলিতে হইবে।”

অর্থশাস্ত্রে লীগ অব নেশ্যন্‌স্‌

লীগ অব নেশ্যন্‌স্‌ ও বাঙালী অর্থশাস্ত্রী

জেনীভার লীগ্‌ অব নেশ্যন্‌স্‌ (বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত বইগুলা "আর্থিক উন্নতি"র বিভিন্ন অধ্যায় আর প্রবন্ধের জন্য হামেশা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সব ছাড়া বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবষকেরা এক পা ও চলিতে পারে না। বস্তুতঃ এম এ, বি এল পাশের পর যে-সকল বাঙালী যুবা ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে হাতে খড়ি দিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে দেশী-বিদেশী অর্থনৈতিক "পত্রিকা"সমূহ যেমন জরুরি খোরাক, লীগ অব নেশ্যন্‌সের গ্রন্থাবলীও সেইরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক খাদ্য-দ্রব্য। বৎসর তিনেক এইসকল বই ঘাঁটাঘাঁটি করিলে আমাদের এম-এ, বি-এল উপাধিধারী যুবারা "বস্তুনিষ্ঠ" আর "দুনিয়া-নিষ্ঠ" অর্থশাস্ত্রের বনিয়াদগুলা পাকড়াও করিতে পারিবেন। যাঁহারা এই সকল বইয়ের নাম শুনেন নাই অথবা শুনিয়া থাকিলে বইগুলার পাতা উল্টাইবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা একটু গা করিয়া বইগুলার সঙ্গে মোলাকাৎ চালাইবার ব্যবস্থা করুন।

১৯২৬ সনে যখন "আর্থিক উন্নতি" কায়েম হয় তখনও বাঙলা দেশে আর বাস্তবিক পক্ষে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই ধরণের সাহিত্যের দিকে অর্থশাস্ত্রীদের নজর একপ্রকার ছিল না। বিগত সাত-আট বৎসরের ভিতর কিছু-কিছু নজর পড়িয়াছে। কিন্তু আজও এই সকল গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটির নিরেট পরিচয় বাঙালীর আর অন্যান্য ভারত-সন্তানের প্রকাশিত গবেষণায় বেশী পাওয়া যায় না। আর সময় নষ্ট

করা চলিতে পারে না। শুভস্য শীঘ্রং। ১৯৩৪ সন চলিতেছে। এখন হইতে তিন বৎসরের ভিতর বাঙালী অর্থশাস্ত্রীরা দলে দলে লীগ্ অব নেশ্তন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত বইগুলাকে টেক্‌স্ট্ বুকের মতন দখল করিতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলে ১৯৪০ সনের পূর্ব্বেই বাঙালী অর্থশাস্ত্রীরা পাকা মাথায় ধনদৌলত চর্চ্চা করিতে সমর্থ হইবেন।

এই সংখ্যায় কয়েকখানা বইয়ের সূচীপত্র দেখাইতেছি।

আর্থিক দুর্য্যোগের আকার-প্রকার

১৯২৯ সনের চতুর্থ পাদে এবারকার বিশ্বব্যাপী "মন্দা" সুরু হইয়াছে। মন্দা কাটিতে সুরু করিয়াছে আজ এত দিনে। প্রায় সাড়ে চার বৎসর গেল। এই সাড়ে চার বৎসরের আর্থিক দুনিয়া অনেক হিসাবেই বিচিত্র। ইহার বৈচিত্র্য কোথায় তাহা আলোচনা করিবার জন্য "দি কোর্স্ অ্যাণ্ড ফেজেজ্ অব দি ওয়াল্‌র্ড ইকনমিক ডিপ্রেশ্তন" প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত অর্থাৎ "মন্দার" প্রথম দুই বৎসরের ঘটনাগুলা বিবৃত আছে।

প্রথমেই আছে লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগের অর্থাৎ ১৯১৯ হইতে ১৯২৯ পর্য্যন্ত বৎসর দশেকের ঘটনা-বিশ্লেষণ। দেখা যাইতেছে যে, লড়াইয়ের পূর্ব্বে লোকেরা যে সকল জিনিষ কিনিত আজকাল তাহার পরিবর্ত্তে দুনিয়ায় অনেক নতুন ঢঙের জিনিষপত্রের চাহিদা গজিয়াছে। পুঁজি-চলাচলও আর "সাবেক" কালের প্রথায় সাধিত হয় না।

এই সকল পরিবর্ত্তন বুঝাইবার জন্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে:—(১) খাদ্যদ্রব্য বিষয়ক শিল্প, (২) কুদ্‌রত্তি মালোৎপাদনের শিল্প, ৩) দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা ইত্যাদি। জিনিষপত্রের দাম আর মজুরি বিষয়ক ওঠানামাও বিবৃত হইয়াছে। উৎরাই-চড়াইয়ের রেখাগুলা

বেশ স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে। উৎরাইয়ের অবস্থায় দুর্য্যোগ-সূচক চিহ্নোৎগুলা একে-একে খুলিয়া ধরা হইয়াছে। মালোৎ-পাদন, ঘরবাড়ী তৈয়ারি, বস্তুভোগ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে "মন্দা।" মূল্য-পতন, মজুরি-হ্রাস আর লভ্যাংশে ঘাট্‌তিও এই যুগের লক্ষণ।

মূল্য-পতন সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা আছে। বইটা আগাগোড়া অঙ্কে ভরা। অঙ্কগুলার ব্যাখ্যা ছাড়া বইয়ের ভিতর আর কিছু নাই। এইরূপই স্বাভাবিক্‌, কেননা উৎরাই-চড়াই একমাত্র অঙ্কেরই মামলা। পরিশিষ্টে কতকগুলা অঙ্ক-তালিকা আছে। কয়েকটার নাম উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—

১। বিদেশে খাটাইবার জন্য বিলাতে আর আমেরিকায় কর্জ্জের ব্যবস্থা (১৯২৪-৩০)।

২। গমের উপর আমদানি-শুল্ক (জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রীস, ইতালি, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইট্‌স্যার্ল্যাণ্ড, চেকোস্লো-ভাকিয়া), ১৯১৩ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত।

৩। বাড়ী তৈয়ারির তালিকা (১৯২২-৩০), জার্ম্মাণি, বিলাত, অষ্ট্রিয়া, ডেন্মার্ক, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হাঙ্গারি, ইতালি, পোল্যাণ্ড, সুইট্‌স্যার্ল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া।

৪। মালোৎপাদনের সূচীসংখ্যা (১৯২৮-৩১), জার্ম্মাণি, কানাডা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, বিলাত, সুইডেন।

এই ধরণের অঙ্ক-তালিকায় যাঁহাদের দখল নাই তাঁহারা একালের দুনিয়ায় বিচক্ষণভাবে চলাফেরা করিতে অসমর্থ।

আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা

আমদানি-রপ্তানি বলিলে বুঝা যায় মালগুলার গতিবিধি। কিন্তু

মাল ছাড়া অন্যান্য জিনিষও ছুনিয়ায় চলাফেরা করে। এই সম্বন্ধে ১৯৩০ সনের বৃত্তান্ত ছাপা হইয়াছে "ব্যাল্যান্সেজ অব্ পেমেণ্ট্স্" (দেনাপাওনার শোধবোধ) নামে (১৯৩২)।

প্রত্যেক দেশই অপরাপর দেশ হইতে বহুবিধ মাল আমদানি করে। আবার প্রত্যেক দেশই অপরাপর দেশ হইতে টাকাও আমদানি করে। রপ্তানিও চলে এই ছুই বস্তুরই। কিন্তু মাল আবার নানা নামে নানা আকারে দেখা দেয়। টাকার আকার-প্রকারও বহুবিধ। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে হিসাব লিখিতে হইলে জমার ২৩ খাতে মাল উল্লেখ করা আবশ্যক। আবার খরচের ঘরেও ২৩ খাতে মাল উল্লেখ করিতে হইবে।

টাকার জমা খরচ চলিতে পারে ১৩ খাতে। এই ৩৬ দফাকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে নিম্নরূপ দেখায় :—

মাল :—

১। মাল—৩ দফা

২। সুদ—৪ দফা

৩। অন্যান্য বাবদ দেনা পাওনা—১৪ দফা

৪। সোনা—২ দফা

পুঁজি :—

১। লম্বা মেয়াদের দেনাপাওনা—১১ দফা

২। সম্পত্তি কেনা বেচা—৪ দফা

৩। বিদেশে টাকা খাটানো—৪ দফা

৪। অল্প মেয়াদের দেনাপাওনা—২ দফা

এই সকল আলোচনায় ধরা পড়ে কোন্ কোন্ দেশ টাকা কৰ্জ্জ দেয় আর কোন্ কোন্ দেশ কৰ্জ্জ নেয়। পুঁজি-চলাচলের প্রভাবে

বিভিন্ন দেশে মূল্যের ওঠানামা সাধিত হয়। যেসকল দেশ টাকা কর্জ্জ লইতে অভ্যস্ত তাহারা টাকা কর্জ্জ না পাইলে বেশী-বেশী মাল রপ্তানি করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে তাহাদের মালের দাম যারপর নাই পড়িয়া যায়।

বিদেশে টাকা ধার দিয়া সুদ খায় নিম্নলিখিত দেশগুলা—বিলাত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, সুইটস্যার্ল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, আইরিশ ফ্রীষ্টেট, এবং সুইডেন। বিদেশী কর্জ্জের উপর সুদ যোগাইতে অভ্যস্ত নিম্নলিখিত দেশগুলা :—ভারত, মেক্সিকো, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জ্জেণ্টিনা, জার্ম্মাণি ও কানাডা। ইহাদেরই জুড়িদার হইল ব্রেজিল, কিউবা, চিলি, বোলিভিয়া ও চীন।

প্রবাসীরা স্বদেশে বিস্তর টাকা পাঠায়। এইরূপে ধনী হয় চীন ও ইতালি। অপরদিকে বিদেশীরাও পর্য্যটক হিসাবে বিস্তর টাকা পর্য্যটনক্ষেত্রে ঢালিয়া থাকে। ১৯৩০ সনে ইয়োরোপে বেড়াইতে আসিয়া পর্য্যটকেরা প্রায় ১১৪ কোটি টাকা খরচ করিয়াছিল।

বিশ্ববাণিজ্য

১৯৩২ সনে বিশ্ববাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বুঝাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে "রিভিউ অব ওয়ার্ল্ড-ট্রেড" (১৯৩৩)। ১৯২৯ সনের পর বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য কিরূপ কমিয়াছে প্রথমেই তাহা দেখানো হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী মূল্য-পতন ঘটিয়াছে কৃষিজাত দ্রব্যে আর কুদরত্তি মালে। শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস ঘটিয়াছে,—কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প হারে।

আমদানি-রপ্তানির উৎরাই বিবৃত হইয়াছে ১৯২৯ হইতে। সমগ্র দুনিয়ার অবস্থা এক সঙ্গে দেখা পাইতেছি। ভারতবর্ষকে নেহাৎ একাকী পাইতেছি না। তাহার অবস্থায় রহিয়াছে বহুসংখ্যক দেশ। চীনের অবস্থা ভারতের চেয়েও শোচনীয়।

গোটা জগতে আমদানির স্থচীসংখ্যা আসিয়া ঠেকিয়াছে ৩৯এ (১৯২৯=১০০)। ভারতের আমদানির সূচী-সংখ্যা ৩৮'৭। ইহার চেয়ে খাটো ছিল ইতালি (৩৭'১), জার্ম্মাণি (৩৪'৭), মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (৩০'৭), অষ্ট্রেলিয়া (২৬'৪), ইত্যাদি। দুনিয়ার রপ্তানির সূচী ছিল ৩৮'৫। ভারতের ছিল ৩০'৪। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ছিল ৩০'৬ আর চীনের ২৪'৭।

সাধারণভাবে গোটা দুনিয়ার অবস্থা বিশ্লেষণের পর দেখানো হইয়াছে নিম্নলিখিত দেশগুলার অবস্থা—(১) বিলাত, (২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, (৩) জার্ম্মাণি (৪) ফ্রান্স (৫) জাপান, (৬) ইতালি, (৭) অন্যান্য শিল্প-প্রধান ইয়োরোপীয় দেশ (যথা, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, হল্যাণ্ড, স্থইডেন ও স্থইট্স্যারল্যাণ্ড), (৮) ইয়োরোপের কৃষিপ্রধান দেশসমূহ (যথা, রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারি, রুমাণিয়া, বুলগেরিয়া, জুগোশ্লাভিয়া), (৯) অন্যান্য মহাদেশের কৃষিপ্রধান দেশসমূহ (যথা, কানাডা, আর্জ্জেণ্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ব্রেজিল, ভারত, ঈজিপ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, ইত্যাদি)।

ধনদৌলতের বিশ্বরূপ

আাট বৎসর ধরিয়া "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ বাংলা ভাষায় ধনদৌলতের বিশ্বরূপ দেখানো হইতেছে। বিশ্বরূপ দেখিতে হইলে লাগে দুনিয়ার বহু সংখ্যক ভাষায় দখল। কিন্তু ঘটনাচক্রে আজকাল গণ্ডা-গণ্ডা ভাষায় অধিকারী না হইয়াও দুনিয়ার ধনদৌলত সম্বন্ধে ওয়াকিব্হাল হওয়া সম্ভব। "আর্থিক উন্নতি"র অঙ্গে ফরাসী, ইতালিয়ান আর জার্ম্মাণ ভাষার আঁচড় সর্ব্বদাই অল্পবিস্তর দেখা যায় বটে। কিন্তু পাঠকেরা দেখিয়াছেন যে, অনেক সময়ে এইসকল ভাষায়

লেখা বই বা প্রবন্ধের সঙ্গে মোলাকাৎ না করিয়াও ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্ম্মাণ ইত্যাদি সমাজের আর্থিক গতিভঙ্গী বুঝিতে পারা যায়। একমাত্র ইংরেজি ভাষার দৌলতেও এই কাণ্ড সম্ভবপর হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজ আর মার্কিণ নরনারী নিজ মাতৃভাষায় দুনিয়ার সকল দেশের আর্থিক উঠানামার সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করে। তাহার উপর আসিয়া জুটিয়াছে একালে জেনীভার লীগ অব নেশ্যন্‌স্।

লীগ অব নেশ্যন্‌সের পেশাই হইল গোটা জগতের আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক গড়নটাকে এক লেপের মুড়িতে আনিয়া ফেলা। ইহাদের আফিসে পারৎপক্ষে কোনো দেশের কোনো কোণের তথ্য বা অঙ্ক বাদ পড়িবার নয়। ছোট-বড়-মাঝারি প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক খুঁটিনাটি লীগের তদবিরে একত্রে সংগৃহীত হয়। আর এই সংগ্রহগুলা নিয়মিত-রূপে ফরাসী ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় প্রচার করা হয়। কাজেই ইংরেজির দৌলতে আজকাল ভারতবাসীর পক্ষে দুনিয়ানিষ্ঠ হওয়া মুড়ি-মুড়্‌কির মতন সহজ কথা।

"আর্থিক উন্নতি"কে প্রথম হইতেই দুনিয়া-নিষ্ঠার বাহনরূপে গড়িয়া তোলা হইতেছে বলা বাহুল্য। তবে এক "আর্থিক উন্নতি"র ঘাড়ে অনেক বোঝা চাপাইলে বেশী ফললাভ হইতে পারে না। আর্থিক উন্নতি"র কর্ম্মপ্রণালী অনুসারে বাংলাভাষায় গণ্ডা-গণ্ডা "দুনিয়ানিষ্ঠ" দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক কায়েম হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে বাঙালী জাতির অভাব এত বে যে, অনেক গুলা দুনিয়ানিষ্ঠ পত্রিকা না থাকিলে আমাদের কাজ চলিতে পারে না।

অধম-তারণ লীগ অব নেশ্যন্‌স্

"আর্থিক উন্নতি" যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আশা ছিল যে, পাঁচ-সাত বৎসরের ভিতর হয়ত ফরাসী-জান্তা, ইতালিয়ান-জান্তা, জার্ম্মাণ-জান্তা ইত্যাদি বিদেশী ভাষায় জ্ঞানশীল বাঙালী অর্থ-শাস্ত্রী কয়েকজন দাঁড়াইয়া যাইবে। ঘটনাচক্রে সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। তবে আরও কয়েক বৎসরের ভিতর সেই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে "আর্থিক উন্নতি"র প্রবর্ত্তিত গবেষণা-প্রণালীর ফলে দেশের ভিতর ছুনিয়ানিষ্ঠা কিছু কিছু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আজকাল অর্থশাস্ত্রী মহলে বিদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার একটা ঝোক দেখা যাইতেছে। দৃষ্টান্তগুলা উল্লেখ করিবার সময় অনেক সময়েই হয়ত বাঙলাদেশের সঙ্গে অথবা ভারতবর্ষের সঙ্গে উল্লিখিত দেশগুলার তুলনা করা উচিত কিনা সমঝিয়া দেখা হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একাধিক দেশের আর্থিক অবস্থা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিবার রেওয়াজ আজকাল সুরু হইয়াছে। ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে।

বাঙালী জাতির অন্যান্য বাড়্‌তির সঙ্গে চিন্তা-প্রণালীর এইরূপ বাড়তিও সর্ব্বথা উল্লেখযোগ্য। এই বাড়্‌তির কাজে সাহায্য করিতেছে অধম-তারণ লীগ অব নেশ্যন্‌স্। লীগের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি বা সমাজ-নীতি বাঙালী জাতির অথবা অন্যান্য ভারত-সন্তানের হয়ত পছন্দসই নয়। এশিয়ার অনেক দেশেই লীগকে লোকেরা পছন্দ করে না। জাপান ত ইতিমধ্যে কলা দেখাইয়াছেই। এমন কি ইয়োরামেরিকায়ও লীগ অনেক মুল্লুকেই কল্কে পায় না। জার্ম্মাণি কলা দেখাইতে কসুর করে নাই। আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ত আফিসী কায়দায় লীগকে আজ পর্য্যন্ত স্বীকারই করিল না। কিন্তু

ম্বজার কথা, লীগ হইতে মণ-মণ ছাপাছাপি বাহির হয়। সেইগুলাকে বয়কট করার মেজাজ কোথাও দেখিতে পাই না। ধরাখানাকে একটা ছোটখাটো সরার ভিতর পাকড়াও করিবার ফন্দী লীগ-প্রকাশিত এই বইগুলার ভিতর পাওয়া যায়। ইহার ভিতর প্রধান বা আসল কথা অঙ্ক। অন্য এক প্রধান কথা চার্ট্‌ বা রেখা-তরঙ্গের ছবি। ইহার ভিতর প্রবন্ধের আকারে যাহা কিছু থাকে তাহা এই অঙ্কগুলার আর চার্ট্‌ বা ছবিগুলার বিশদ ব্যাখ্যামাত্র। কাজেই এইগুলা বয়কট করিবার দিকে কোনো দেশের কোনো লোকেরই মেজাজ বড়-বেশী খেলে না। বাঙালী অর্থশাস্ত্রীরা, সমাজশাস্ত্রীরা আর রাষ্ট্রশাস্ত্রীরা এইসকল লীগ-গ্রন্থাবলীর ভিতর দলে-দলে প্রবেশ করুন। দুজন-একজনের সঙ্গে এইসকল বইয়ের মোলাকাৎ ঘটিলে কাজ চলিবে না। নানা চোখে, নানা মতলবে, নানা অভিজ্ঞতার আওতায় এই সব অঙ্ক ও ছবির পরখ্‌ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে একই তথ্য ও অঙ্ক হইতে একাধিক ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী পাওয়া যাইবে। এইরূপ বহুত্বের দৌলতে বাঙালী জাতির অর্থশাস্ত্র সম্পদশালী হইয়া উঠিতে পারিবে।

মালোৎপাদন ও মূল্য

লীগ-প্রকাশিত একখানা বইয়ের সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় থাকা আবশ্যক। ইহার ভিতর আছে ১৯২৫ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত সাত-আট বৎসরের হাল-চাল। প্রধানতঃ দ্রব্য-সৃষ্টি আর দ্রব্য-মূল্য এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। বইটার নাম "ওয়াল্‌র্ড্‌-প্রোডাকৃশুন অ্যাণ্ড প্রাইসেজ"। বইটার ভিতর প্রথমে দেখানো হইয়াছে দুনিয়ার উৎপাদন-"সূচী" তৈয়ারি করিবার কায়দা। তাহার পর সাধারণভাবে

অধম-তারণ লীগ অব নেশ্যন্‌স্‌

"আর্থিক উন্নতি" যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আশা ছিল যে, পাঁচ-সাত বৎসরের ভিতর হয়ত ফরাসী-জান্তা, ইতালিয়ান-জান্তা, জার্ম্মাণ-জান্তা ইত্যাদি বিদেশী ভাষায় জ্ঞানশীল বাঙালী অর্থ-শাস্ত্রী কয়েকজন দাঁড়াইয়া যাইবে। ঘটনাচক্রে সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। তবে আরও কয়েক বৎসরের ভিতর সেই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে "আর্থিক উন্নতি"র প্রবর্ত্তিত গবেষণা-প্রণালীর ফলে দেশের ভিতর দুনিয়ানিষ্ঠা কিছু কিছু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আজকাল অর্থশাস্ত্রী মহলে বিদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার একটা ঝোক দেখা যাইতেছে। দৃষ্টান্তগুলা উল্লেখ করিবার সময় অনেক সময়েই হয়ত বাঙলাদেশের সঙ্গে অথবা ভারতবর্ষের সঙ্গে উল্লিখিত দেশগুলার তুলনা করা উচিত কিনা সমঝিয়া দেখা হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একাধিক দেশের আর্থিক অবস্থা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিবার রেওয়াজ আজকাল সুরু হইয়াছে। ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে।

বাঙালী জাতির অন্যান্য বাড়্‌তির সঙ্গে চিন্তা-প্রণালীর এইরূপ বাড়তিও সর্ব্বথা উল্লেখযোগ্য। এই বাড়্‌তির কাজে সাহায্য করিতেছে অধম-তারণ লীগ অব নেশ্যন্‌স্‌। লীগের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি বা সমাজ-নীতি বাঙালী জাতির অথবা অন্যান্য ভারত-সন্তানের হয়ত পছন্দসই নয়। এশিয়ার অনেক দেশেই লীগকে লোকেরা পছন্দ করে না। জাপান ত ইতিমধ্যে কলা দেখাইয়াছেই। এমন কি ইয়োরামেরিকায়ও লীগ অনেক মুল্লুকেই কল্কে পায় না। জার্ম্মাণি কলা দেখাইতে কসুর করে নাই। আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ত আফিসী কায়দায় লীগকে আজ পর্য্যন্ত স্বীকারই করিল না। কিন্তু

মজার কথা, লীগ হইতে মণ-মণ ছাপাছাপি বাহির হয়। সেইগুলাকে বয়কট করার মেজাজ কোথাও দেখিতে পাই না। ধরাখানাকে একটা ছোটখাটো সরার ভিতর পাকড়াও করিবার ফন্দী লীগ-প্রকাশিত এই বইগুলার ভিতর পাওয়া যায়। ইহার ভিতর প্রধান বা আসল কথা অঙ্ক। অন্য এক প্রধান কথা চার্ট্‌ বা রেখা-তরঙ্গের ছবি। ইহার ভিতর প্রবন্ধের আকারে যাহা কিছু থাকে তাহা এই অঙ্কগুলার আর চার্ট্‌ বা ছবিগুলার বিশদ ব্যাখ্যামাত্র। কাজেই এইগুলা বয়কট করিবার দিকে কোনো দেশের কোনো লোকেরই মেজাজ বড়-বেশী খেলে না। বাঙালী অর্থশাস্ত্রীরা, সমাজশাস্ত্রীরা আর রাষ্ট্রশাস্ত্রীরা এইসকল লীগ-গ্রন্থাবলীর ভিতর দলে-দলে প্রবেশ করুন। দুজন-একজনের সঙ্গে এইসকল বইয়ের মোলাকাৎ ঘটিলে কাজ চলিবে না। নানা চোখে, নানা মতলবে, নানা অভিজ্ঞতার আওতায় এই সব অঙ্ক ও ছবির পরখ্‌ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে একই তথ্য ও অঙ্ক হইতে একাধিক ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী পাওয়া যাইবে। এইরূপ বহুত্বের দৌলতে বাঙালী জাতির অর্থশাস্ত্র সম্পদশালী হইয়া উঠিতে পারিবে।

মালোৎপাদন ও মূল্য

লীগ-প্রকাশিত একখানা বইয়ের সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় থাকা আবশ্যক। ইহার ভিতর আছে ১৯২৫ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত সাত-আট বৎসরের হাল-চাল। প্রধানতঃ দ্রব্য-সৃষ্টি আর দ্রব্য-মূল্য এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। বইটার নাম "ওয়ার্ল্‌ড্‌-প্রোডাক্শুন অ্যাণ্ড প্রাইসেজ"। বইটার ভিতর প্রথমে দেখানো হইয়াছে দুনিয়ার উৎপাদন-"সূচী" তৈয়ারি করিবার কায়দা। তাহার পর সাধারণভাবে

আলোচিত হইয়াছে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন। পরে ঠাঁই পাইয়াছে শিল্প-বিষয়ক কুদরত্তি মালের উৎপাদন-বৃত্তান্ত। অবশেষে বস্তুগুলাকে গোত্রে বা বর্গে বিভক্ত করিয়া দেখানো হইয়াছে।

বর্গগুলা নিম্নরূপ :—(১) গম, রাই, যব, ওট্‌স্ ও ভূট্টা, (২) ধান, আলু ও চিনি, (৩) মাংস, (৪) আঙুরের মদ ও হপ্‌ফল, (৫) কাফি, চা ও কোকো, (৬) তামাক, (৭) তেলের বীচি, (৮) তুলা, শণ, পাট, পশম, রেশম, নকল রেশম, (৯) রবার, (১০) কাঠের শাঁস (কাগজ তৈয়ারিতে কাজে লাগে), (১১) কয়লা ও পেট্রল, (১২) বিজলী, (১৩) লোহা, ইস্পাত, নিকেল, তামা, টিন, (১৪) সিমেণ্ট, অ্যাস্‌বেষ্টস্, লবণ, (১৫) ফস্‌ফেট, সোডা-নাইট্রেট, আমোনিয়া-সালফেট ইত্যাদি কৃত্রিম রাসায়নিক সার।

এইসকল দ্রব্য মজুত রহিয়াছে কোথায় কত তাহার হিসাব দেখিতেছি। পরে আলোচিত হইয়াছে দুনিয়ার আন্তর্জ্জাতিক বণিজ্যের গতি-পরিবর্ত্তনের কথা।

এই পর্য্যন্ত গেল প্রাথমিক দ্রব্য-বিষয়ক আলোচনা। তাহার পর আছে শিল্পদ্রব্যের আলোচনা। এই আলোচনায়ও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রণালীই গৃহীত হইয়াছে। দুনিয়ার শিল্প-দ্রব্যের "সূচী" দেখিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হিসাবে শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদন দেখিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনও স্বতন্ত্রভাবে দেখিতেছি। শিল্পজাত দ্রব্য কোথায় কিরূপ মজুত রহিয়াছে তাহার আলোচনাও বাদ যায় নাই। অবশেষে আছে গোত্র বা বর্গ হিসাবে কতকগুলা শিল্পের বিশ্লেষণ। বর্গগুলা নিম্নরূপ—(১) লোহা, (২) যন্ত্রপাতি, (৩) মালবাহী জাহাজ তৈয়ারী, (৪) জাহাজ চলাচলের পরিমাণ, (৫) মোটর গাড়ী, (৬) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, (৭) ঘরবাড়ী তৈয়ারী, (৮) কাঠের ব্যবসা, (৯) কাগজ ও

ছাপাছাপি, (১০) চামড়া ও জুতার কারখানা, (১১) বয়নশিল্প :—তুলা, পশম, রেশম, নকল রেশম, শণ, লিনেন, পাট, (১২) রবারের জিনিষ।

তৃতীয় অধ্যায়ে আছে মূল্যের গতিভঙ্গী আলোচনা। প্রথমে দেখিতেছি পাইকারী দরের ওঠানামা। তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের ওঠানামা। বুঝা যাইতেছে যে, মূল্যের ওঠানামা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন। এই অসাম্য দেখানো হইয়াছে নানাভাবে—(১) কুদরত্তি মালের সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায়, (২) কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায়, (৩) সঙ্ঘনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায়, (৪) পাইকারি দরের সঙ্গে খুচরা দরের তুলনায়, (৫) ভোগ্য দ্রব্যের সঙ্গে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দ্রব্যের তুলনায়। এইসকল আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গেই অঙ্ক-তালিকা আর রেখা-তরঙ্গ ত আছেই। তাহার পর পরিশিষ্টে কতকগুলা অঙ্ক স্বতন্ত্রভাবে এক সঙ্গে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

এই ধরণের একখানা বইয়ের সঙ্গে যাঁহাদের নিবিড়ভাবে মোলাকাৎ হইবে তাঁহারা মামুলি ধনবিজ্ঞানের নিয়ম বা সূত্রগুলার তোয়াক্কা রাখিতে প্রলুব্ধ হইবেন না। তাঁহারা তথ্যের ভিতর হইতে আপনা-আপনি নতুন-নতুন নিয়ম ও শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন।

লীগ-প্রবর্ত্তিত গবেষণা-প্রণালী

লীগ-প্রকাশিত বইগুলার নাম দেখিয়া তাহার ভিতর ঠিক কিরূপ তথ্য আছে অনেক সময় ঠাওরানো অসম্ভব। লীগের নিকট গোটা জগৎ হইতে অঙ্কগুলা আসিয়া হাজির হয়। দপ্তরের "কেরাণীরা"—সকলেই লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক—অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত মানুষ,—অঙ্কের পাহাড় সাজাইয়া রাখে। তাহার পর যোগ-বিযোগ, গুণ-ভাগ, ভগ্নাংশ,

ত্রৈরাশিক ইত্যাদি বিদ্যা ফলানো হয়। যাঁহারা ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স বিদ্যার নামে ভয় পান তাঁহাদের জানিয়া রাখা ভাল,—অবশ্য অনেকবার এই কথা বলিয়াছি,—ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর সরকারী খাজাঞ্চিখানার দপ্তরে যে ধরণের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ সাধারণতঃ আবশ্যক হয় তাহার জন্য ম্যাট্রি-কুলেশনের পাটীগণিতের বেশী লাগে না। যাহা হউক, অঙ্কগুলা লইয়া আঁক-কষার পর ফলসমূহ নানা কেতাবে বাহির করা হয়। একটা বই হইল নিছক অঙ্কের বই। তাহাকে অঙ্ক-বার্ষিকী বলা যাইতে পারে। তাহার ভিতর প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও দুচার লাইন প্রবন্ধ-রচনা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু প্রবন্ধ-রচনার জন্য অসংখ্য বই আছে। কোনোটা উৎপাদন বিষয়ক, কোনটা বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি। বলা বাহুল্য অনেক সময়ে যেসকল অঙ্ক উৎপাদনের বইয়ে ছাপা আবশ্যক সেইসকল অঙ্কই আবার বাণিজ্যের বইয়েও ছাপিতে হয়। কাজেই লীগ-প্রকাশিত বইগুলার ভিতর দেখিতে পাই—মাঝে-মাঝে পরস্পর-পরস্পরের নকল।

পূর্ব্বে কয়েকখানা বইয়ের আকার-প্রকার দেখিয়াছি। এইবার আর একখানা বইয়ের ভিতর প্রবেশ করা যাউক। নাম "ওয়ার্ল্ড্ ইকনমিক সার্ভে।" ইহার ভিতর আছে ১৯৩২-৩৩ সনের আর্থিক দুনিয়া বিষয়ক সমালোচনা। একটা মজার কথা এই যে, আগেকার দিনে কোনো দেশের অঙ্কমূলক, তথ্যমূলক, আর্থিক বৃত্তান্ত পাইতে হইলে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত। যদিই বা পাওয়া যাইত তাহার জন্য আবশ্যক হইত হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ, গবেষণা, "রিসার্চ্" ইত্যাদি লম্বা-লম্বা ব্যাপার। আর এত সব রিসার্চের পর যাহা-কিছু ছাপা হইত তাহার ভিতর দেখা যাইত যে, না আছে সন্তোষজনক অঙ্ক, না আছে খাঁটি তথ্য। সংখ্যা জুটিত অল্প-স্বল্প আর তথ্যের নামে পাওয়া

যাইত "প্রধানতঃ" অনুমান, কল্পনা, ব্যাখ্যার চেষ্টা ইত্যাদি। অধিকন্তু তখনকার দিনে রিসার্চ বলিলে বুঝা যাইত মান্ধাতার আমলের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে লেখাপড়া করা। কম্‌সে-কম একশ'-দেড়শ' বৎসরের পুরাণা যুগ না হইলে লোকেরা গবেষণায় মাতিতই না। "একাল" সম্বন্ধে আলোচনা করা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না।

আর আজ দেখিতেছি কি না ১৯৩২-৩৩ সনের আর্থিক ইতিহাস বাহির হইয়া গেল ১৯৩৩ সনে! আর বইটা লিখিতেছে কে? কোনো একজনের নাম্ নাই। কেন না বাস্তবিক পক্ষে লেখক হইতেছে একটা আফিস বা দপ্তর। অর্থাৎ দপ্তরের ভিতর কয়েক গণ্ডা লোক অঙ্কগুলা সাজাইবার গুছাইবার কাজে বাহাল আছে। আর তাহারা অঙ্কগুলা পাইতেছে ফি ডাকে দেশ-বিদেশ হইতে। দেশ-বিদেশের সরকারী দপ্তর হইতে কেরাণীরা, বাবুরা, ডিরেক্টররা অঙ্কগুলা পাঠাইয়া দিতে অভ্যস্ত। এতগুলা লোক একসঙ্গে বসিয়া তথ্য জোগাইতেছে। বইটার ভাষায়ও অনেক সময়ে এইরূপ বহুত্ব লক্ষ্য করা সম্ভব। অবশ্য শেষ বইটার বিভিন্ন অধ্যায়গুলা কোনো এক জনের হাতে থাকে বটে। কিন্তু প্রত্যেক লেখকই সম্পাদক হিসাবে তাঁহার দপ্তরের আর দেশবিদেশের দপ্তরের ব্যবহার-করা ভাষা কিছু-কিছু আত্মস্থ করিতে বাধ্য হয়।

বস্তুতঃ "রিসার্চ" বলিলে দশ-বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে এক অতি-কিছু সমঝা হইত তাহা আর একালে নাই। ডাকঘর, খাজাঞ্চির আফিস, মুন্‌সেফি আদালত ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্রের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ যেমন কেরাণী, ডিরেক্টর, হাকিম ইত্যাদির নিকট ডালভাত বিশেষ, লীগ অব নেশুনসের ব্যবস্থায় আর্থিক, রাষ্ট্রিক আর সামাজিক গবেষণা বা রিসার্চ বস্তুও একদম সেইরূপ মামুলি ডালভাতে পরিণত হইয়াছে। এই কথাটা জানিয়া রাখিলে বাঙালী অর্থশাস্ত্রীদের উপকার হইবে।

বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় অনেক সাহায্য পাওয়া যাইবে। বাঙলা দেশেও আফিসী কায়দায় আর্থিক গবেষণার ব্যবস্থা করিতে হইবে—, আজ, না হয় কাল, না হয় পরশু।

আর্থিক বিশ্ব-সমালোচনা

বইটার সূচীপত্র নিম্নরূপ :

১। গোলমেলে বৎসর, শারদীয় আরোগ্যলাভ,—গতি তবুও নীচের দিকে।

২। মূল্যের ব্যবস্থায় হ য ব র ল। এই অধ্যায়ের অনেক কিছুই পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের ভিতর পাওয়া যায়।

৩। মালোৎপাদনেব বিশৃঙ্খলা। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে ঘাট্‌তি। এই অধ্যায়ের সূচীও পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

৪। মজুরি ও "সমাজ"-নীতি,—মজুরির ঘাট্‌তি, বেকার-উদ্ধার, কার্য্যকালের ঘাট্‌তি।

৫। ব্যবসার মুনাফা :—পুঁজির বাজার, মন্দার পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্প বিষয়ক পুজির পরিমাণ—মন্দার ফলে ব্যবসায় লাভালাভের অবস্থা—কৃষিকর্ম্মের শোচনীয় অবস্থা।

৬। সরকারী রাজস্বের উপর চাপ :—জাতীয় আয়ের পতন—রাজস্বের ঘাট্‌তি—সরকারী ব্যয়ের পুনর্গঠন—দেশ-রক্ষার খরচা—সরকারী কর্জ্জের জন্য খরচা—খাজাঞ্চিখানার তুমুখ রক্ষা।

৭। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যনীতি :—শুল্ক-লড়াই,—বাণিজ্য-প্রতিরোধক আইনকানুন—নয়া বাণিজ্য-নীতির ক্রমবিকাশ—১৯৩২-৩৩ সনের আমদানি-রপ্তানি।

৮। মুদ্রা ও কর্জ্জনীতি :—বিনিময়ের অস্থিরতা,—মন্দার যুগে

মামুলি ব্যাঙ্কগুলার হালচাল—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কসঙ্কট—জগতের সর্ব্বত্র কেন্দ্রব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা লাভ।

৯। দুনিয়ায় কর্জ্জসমস্যা—আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সাম্য, গবর্মেণ্টে-গবর্মেণ্টে কর্জ্জ—আন্তর্জ্জাতিক ঋণের পরিমাণ—দেনার ব্যবস্থায় পুনর্গঠন।

১০। আন্তর্জ্জাতিক দেনাপাওনায় সাম্য বিধান:—মালের আমদানি-রপ্তানি—পুঁজির আমদানি-রপ্তানি—১৯৩২ সনে সোনার গতিবিধি।

১১। জুলাই ১৯৩৩ সনে আর্থিক দুনিয়ার অবস্থা:—লণ্ডনের আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা ও আর্থিক সম্মেলন,—মার্কিণ মুল্লুকে নবীন কর্ম্ম-কৌশল,—আর্থিক আরোগ্যলাভের চিহ্নোৎ।

সূচীপত্রেই বুঝা যাইতেছে যে, এই বইয়ের মাল হজম না করিতে পারিলে বর্ত্তমান জগৎ আর "একাল" সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করা অসম্ভব।

স্বাস্থ্য ও অর্থসেবায় লীগ-নীতি

আজকাল লীগের (বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের) বিরুদ্ধে অনেক কথাই শুনা যায়। আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলি ত লীগকে একেবারে অন্তঃসারশূন্য প্রতিষ্ঠানরূপেই প্রতিনিয়ত প্রচার করিতেছে। তাহা হইলে, বাস্তবিকই কি বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের কোনো সার্থকতা নাই? এই প্রশ্ন সকলের মনে উঠিতেছে। ওসব রাজনৈতিক প্রচারকার্য্যের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিরুদ্ধে দু'টো কথা বলিতেই হইবে, এই মনোভাব লইয়াই কাগজগুলি প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালাইয়া থাকে। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই নহে। মানবজাতির মঙ্গল-সাধনের জন্য এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানটা নানাপ্রকার কাজ করিতেছে।

এই সঙ্ঘের মানব-সেবার দিক্‌টা ভুলিলে উহার প্রতি অবিচারই করা হইবে।

লীগ ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগে কাজ করিবার জন্য কমিটি কায়েম করিয়াছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কেও এইরূপ একটা কমিটা আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে প্যারিস সহরে এই কমিটির এবং আন্তর্জ্জাতিক মজুর দপ্তরের চেষ্টায় স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের একটা কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। আর্থিক দুর্য্যোগের ফলে আজকাল জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেশী টাকা খরচ করিবার উপায় নাই। এইরূপ অবস্থায় লোকের স্বাস্থ্যমঙ্গলের জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে কন্‌ফারেন্সে তাহার আলোচনা করা হয়। কন্‌ফারেন্স শেষ হওয়ার পর একটা রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। অল্প খর্চ্চায় সর্ব্বোচ্চ ফললাভ কিভাবে হইতে পারে তাহার *হদিসই নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।*

স্বাস্থ্য-কমিটি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গবেষণা করা ছাড়া আরও অন্যান্য কাজ করিয়া থাকে। আহারের সহিত স্বাস্থ্য এবং জীবনী শক্তির নিগূঢ় সম্বন্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আহার নির্ব্বাচনে কেহই বিশেষ মনোযোগী নয়। কোন্ কোন্ আহার্য্য বস্তু গ্রহণে দেহের সম্যক্ পরিপুষ্টি হয় এবং বলবীর্য্য বাড়িতে পারে, সে সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য স্বাস্থ্য-কমিটি আন্তর্জ্জাতিক মজুর-দপ্তরের সহযোগে বার্লিনে বিশেষজ্ঞদের একটী কন্‌ফারেন্স আহ্বান করে। বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটা আহারের দোষে দুর্ব্বল এবং শক্তিহীন মানুষকে লইয়া পরীক্ষা করে এবং আহার্য্য সম্পর্কে একটী তথ্যপূর্ণ বিবরণী প্রকাশ করে। বিবরণীতে ডাক্তারী পরীক্ষা এবং সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী সুচিন্তিত কর্ম্মপ্রণালীও বাৎলানো হইয়াছে এবং ঐ কর্ম্মপ্রণালী বা মোসাবিদা অনুসারে অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী,

নেদারল্যাণ্ডস্‌, পোলাণ্ড এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-কমিটি আরও বহু মানবহিতকর কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। চীনগবর্ণমেণ্ট ডাক্তারি শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য লীগের নিকট আবেদন করেন। সেই অনুসারে বিশদভাবে তথ্যাদি সংগৃহীত হয় এবং ১৯৩২ সনে ঐ সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তারি শিক্ষার বর্ত্তমান হালচাল সম্বন্ধে একটা বিবরণী প্রকাশ করা হয়। স্বাস্থ্য-কমিটির বিগত অধিবেশনে বিবরণী দাখিল করিবার পর উহা ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিকিৎসা-সমিতিসমূহের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া রুমেনিয়া দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের সহায়তায় ইউটেরিন্‌ ক্যান্সারের রেডিও-চিকিৎসা এবং উপদংশ ব্যাধির চিকিৎসা সম্বন্ধেও অনুসন্ধানাদি করা হইয়াছে। ১৯৩০ সনের পর হইতে ইউটেরিন ক্যান্সার ব্যাধির রেডিও-চিকিৎসার যতদূর উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার খোঁজ-খবর লওয়া হইয়াছে ২৮টা দেশের ভিন্ন-ভিন্ন ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ এবং চিকিৎসকদের নিকট হইতে। এই বৎসর জুলাই মাসে জুরিখ্‌ শহরে আন্তর্জ্জাতিক রেডিও কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসিবে সেই অধিবেশনে স্বাস্থ্যকমিটি ইউটেরিন ক্যান্সার নিরাময়ের হদিশ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উত্থাপন করিবে। উপদংশব্যাধি সম্বন্ধে যে আন্তর্জ্জাতিক অনুসন্ধান-গবেষণা চলিতেছে তাহাতে দেখা যায় যে, পাঁচটী দেশের উপদংশ-চিকিৎসালয় সমূহ হইতে ২৬ হাজার কেস লইয়া নাড়াচাড়া করা হইতেছে। এই বৎসরই এই সমস্ত দেশের বিশ্লেষণ শেষ হওয়ার কথা। পরে উপদংশ-বিশেষজ্ঞদের একটা কমিশনর বসাইয়া উপদংশ-চিকিৎসার কিনারা করা হইবে।

ম্যালেরিয়া লইয়াও অনুসন্ধান-গবেষণা চলিতেছে। লীগ এজন্য

রীতিমত ম্যালেরিয়া-কমিশন বসাইয়াছে। কমিশনের চেয়ারম্যান স্বাস্থ্য-কমিটির মারফৎ ১৯৩২ সন হইতে কমিশনের কার্য্যকলাপ সম্পর্কীয় বিবরণীও পেশ করিয়াছে। কমিশন একটা নিজস্ব মোসাবিদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। কুইনাইন অপেক্ষা অল্প খরচে অন্য কোনো ওষুধ পাওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধেও গবেষণা চলিতেছে। এই সমস্ত অনুসন্ধান-গবেষণার বিবরণী স্বাস্থ্য-কমিটির ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশিত হইয়াছে। বুলেটিনে ম্যালেরিয়ার প্রতীকার, ডেল্টা বা ব-দ্বীপসমূহে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ইত্যাদির বিবরণী স্থানলাভ করিয়াছে। কমিটি এই বুলেটিনে প্রকাশিত হদিশ এবং তথ্যাদি অনুসারে কার্য্যপদ্ধতিও অবলম্বন করিয়াছে।

আফিং এবং নানাপ্রকার মাদকদ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধে লীগ খুব চেষ্টা-চরিত্র করিতেছে বলিয়া অনেকদিন হইতেই শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমানে মাদকদ্রব্য নিবারণ সম্বন্ধে লীগের কার্য্যকলাপ নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

আফিং এবং অন্যান্য সাংঘাতিক মাদকদ্রব্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার মানসে লীগ একটা কমিটী গঠন করিয়াছে। গাঁজা আফিং ছাড়া আফিং সহযোগে প্রস্তুত আরও কয়েকটা দ্রব্য এবং আরও অনেক মাদকদ্রব্যের একটা তালিকা করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আজকাল ভিটামিন্ বা খাদ্যপ্রাণের কথা সকলেরই মুখে-মুখে। লীগ এ সম্বন্ধেও বেশ-কিছু কর্ম্মতৎপর। ১৯৩১ সনে যে আন্তর্জ্জাতিক ভিটামিন্-কংগ্রেস বসে, তাহাতে ভিটামিন সমূহের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মাপকাঠি ঠিক করা হয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ডগুলি ঠিক কিনা তাহা দেখিবার জন্য দুই বৎসর সময় লওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ডসমূহ ঠিক কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য এই বৎসর আবার ভিটামিন-কংগ্রেস বসিবে। এই বৎসর সম্ভবতঃ

নিখিলজগৎ বায়োলজিক্যাল কংগ্রেসেরও অধিবেশন বসিবে। এই অধিবেশনে সিরাম, ভ্যাক্‌সিন প্রভৃতি চীজ পরীক্ষা করিয়া ঐ সমস্তের ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থির করা হইবে। স্বাস্থ্য-কমিটি কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিতেছে। ব্রেজিল দেশের রিও-দে-জেনীরোতে ১৯৩৪ সনের মধ্যেই আন্তর্জ্জাতিক কুষ্ঠ-কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হইবে। কুষ্ঠালয়টী ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট এবং ব্রেজিলবাসী জনৈক মহানুভব ব্যক্তির সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বর্ত্তমানে দুনিয়া ব্যাপিয়া চলিয়াছে আর্থিক দুর্য্যোগ আর মন্দার প্রকোপ, যাহার ফলাফল প্রতিনিয়তই আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। এই আর্থিক দুর্য্যোগ নিবারণকল্পে লীগ নিশ্চেষ্ট নয়।

১৯৩৩ সনের গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে অর্থনৈতিক বিশ্ব-সম্মেলন বসিয়াছিল। এই সম্মেলনে আর্থিক দুর্য্যোগ নিবারণকল্পে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রশ্ন খতাইয়া দেখিবার জন্য গত ১৪ই নভেম্বর হইতে ১৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত জেনীভা নগরে ইকনমিক কমিটির অধিবেশন বসে। বর্ত্তমানে দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ বিদেশী মালের আমদানি বন্ধ করিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়াছে। ইহার ফলে আপন-আপন রপ্তানি-বাণিজ্যেরও যে দফা ঠাণ্ডা হইতেছে সেদিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই। রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার উপায় সম্বন্ধে নানারূপ অনুসন্ধানও করা হইতেছে। এই অর্থনৈতিক জাতীয়তা-নিষ্ঠার কুফল হ্রাস করিবার জন্য অর্থনৈতিক কমিটির অধিবেশনে নানারূপ আলোচনা করা হয় এবং কর্ম্মপ্রণালীও নির্দ্ধারণ করা হয়।

লণ্ডনের অর্থনৈতিক বিশ্ব-সম্মেলনের লেজুড় স্বরূপই জেনীভায় ইকনমিক কমিটির অধিবেশন বসিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

লণ্ডন-সম্মেলনে কতকগুলি প্রশ্নের কোনো মীমংসাই হয় নাই। জেনীভায় সেই অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

১৯৩১ সনে গৃহপালিত জীব-জন্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের একটা আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে জীব-জানোয়ার সম্পর্কে তিনটা মোসাবিদার কথা উত্থাপিত হয়, যথা :—(১) *পশুপালনের ব্যবস্থা,* (২) *জীব-জানোয়ার, মাংস ইত্যাদি চালান দেওয়া* এবং (৩) মাংস ও মাংসজাত দ্রব্যাদি ছাড়া পশুজাত অন্যান্য দ্রব্য আমদানি-রপ্তানির সুরাহা করা। লণ্ডন-সম্মেলনে এই মোসাবিদাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করা হয় যে, ১৯৩৪ সনে একটা পশু-সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। লীগের অর্থ নৈতিক কমিটিকেও এই সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। অর্থ-নৈতিক কমিটি মত প্রকাশ করে যে, প্রথমতঃ এমন কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি-বর্গের একটা সম্মেলন ডাকা উচিত, যে সমস্ত দেশের সহযোগিতা ছাড়া এইরূপ সম্মেলন সার্থক হইতেই পারে না। এইরূপ প্রাথমিক সম্মেলনে কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া পরে একটা বিশ্ব-সম্মেলন বা আর্থিক এবং অর্থনৈতিক সম্মেলনের একটা নতুন বৈঠক ডাকা চলিতে পারে।

ইকনমিক কমিটিতে শুল্ক, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং বিক্রয় সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে শুল্ক সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন যে সমস্ত রীতি-নীতি প্রচলিত আছে সেই সমুদয় যতদূর সম্ভব সরল করিয়া একটা সার্ব্বজনীন নীতির মোসাবিদা করা হইয়াছে। আর একটা মোসাবিদায় এক ধরণের বাটখারা এবং প্যাকিংএর একই প্রকার রীতিনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়। লণ্ডন-সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারেই লীগ-দপ্তর হইতে এই দুইটা মোসাবিদা স্থির

করা হয়। অর্থনৈতিক কমিটি মোসাবিদা দুইটা ভিন্ন ভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইবার জন্য এবং এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের একটা সমিতির অধিবেশনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য সম্বন্ধে লণ্ডনের কন্‌ফারেন্স্ রোমস্থ আন্তর্জ্জাতিক কৃষি-প্রতিষ্ঠানকে অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করে। রোম-প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে রিপোর্ট দাখিল করে। রিপোর্টটা ইকনমিক কমিটির নিকট উত্থাপিত করা হয়। ইকনমিক কমিটি এ সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা করিবার জন্য কয়েকটা দেশের প্রতিনিধি ডাকিয়া একটা সম্মেলন বসাইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছে।

কাঠ সম্বন্ধে লণ্ডন সম্মলনে একটা সাবকমিটি নিয়োগ করা হয়; সাবকমিটি আপাততঃ কাজ বন্ধ রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন নরম কাঠ-রপ্তানি-কারী দেশগুলিকে অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য সময় প্রদান করে। ইকনমিক কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছে যে, লণ্ডন-সম্মেলনের সাবকমিটির অধিবেশনের পূর্ব্বে রপ্তানিকারক দেশগুলি বিশেষজ্ঞদের একটা সম্মেলনে আলোচনার ব্যবস্থা করুক।

লণ্ডন-সম্মেলন কয়লা-উৎপাদক দেশগুলিকে আন্তর্জ্জাতিক নীতি অবলম্বন করিয়া কয়লা উৎপাদন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে। লীগ-কাউন্সিলকে এজন্য একটা কনফারেন্স আহ্বান করিতে বলা হয়। বৃটিশ উৎপাদকগণ কিন্তু মত প্রকাশ করিয়াছে যে, বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে কোনোপ্রকার সমঝৌতা সংস্থাপন অসম্ভব ব্যাপার।

তামা উৎপাদনও নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খোঁজ লইয়া দেখা যায় যে, এক মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্রই আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির পক্ষপাতী নহে।

লীগ কর্ত্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত সাবকমিটি বিশ্বজনীন শুল্ক-নামকরণ নির্ণয় করে। শুল্ক-নামকরণের এই মোসাবিদা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তবে অধিকাংশ গবর্ণমেণ্টই উত্তর প্রদান করে নাই। লীগের অর্থনৈতিক কমিটিও উহার সমর্থন করিয়া একটা আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন বসাইয়া ঐ নামকরণের সংশোধন এবং পরিবর্দ্ধনের জন্য সুপারিশ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বেপরোয়া শুল্ক-সংগ্রাম চলিতেছে। লীগ এই অনর্থ দূর করিবার জন্য বেশ-কিছু চেষ্টা-চরিত্র করিয়াছে। বস্তুতঃ এদিকে লীগের নজর আছে যথেষ্ট। ১৯৩৩ সনের মে মাসে বহুৎ তেল পোড়াইয়া আন্তর্জ্জাতিক শুল্ক-সংগ্রামে বিরতি স্থির করা হয়। মজার কথা, গত নভেম্বর মাসে বেলজিয়াম, ব্রেজিল, চীন, ফিনল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, নিকারাগুয়া, নিউজীল্যাণ্ড এবং বিলাত এই সন্ধিপত্র নাকচ করিয়া নোটিশ জারি করিয়াছে। ইতালি অবশ্য সন্ধিপত্র একেবারে নাকচ করে নাই; তবে মত প্রকাশ করিয়াছে যে, ভবিষ্যতে যদি ইতালির স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাহা হইলে শুল্ক-সন্ধির নড়চড় করিতে ইতালিয়ান রাষ্ট্র কোনোরূপ দ্বিধা করিবে না।

যাত্রী-এবং মাল-চলাচল, যানবাহন এবং রাস্তা-সড়কও মানবের মঙ্গল-বিধানের অপরিহার্য্য অংশরূপেই আমরা সমঝিয়া থাকি। এ-সম্বন্ধেও আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টার অভাব নাই।

১৯৩৩ সনের ২৯শে নভেম্বর তারিখে যাত্রী-এবং মাল-চলাচলের পরামর্শ এবং ব্যবহারিক কমিটির অধিবেশন বসে। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তর, আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যটক সমিতি, আন্তর্জ্জাতিক অটো-মোবিল ক্লাব, আন্তর্জ্জাতিক বণিক-সমিতি, আন্তর্জ্জাতিক রেলওয়ে

সমিতি প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ পরামর্শদাতারূপে কমিটির অধিবেশনে যোগদান করে। অধিবেশনে কর্ম্মকর্ত্তাসমূহ নির্ব্বাচিত হয়। ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত কমিটির অধিবেশন চলে। গত ২৭শে নভেম্বর তারিখে, আন্তর্ভৌম নৌচলাচল সম্বন্ধে স্থায়ী কমিটির অধিবেশন বসে। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ কমিটির অধিবেশন বসিবে। উক্ত মূল কমিটির প্রাথমিক কমিটিরূপেই এই স্থায়ী কমিটির অধিবেশন আহূত হয়। স্থায়ী কমিটি মূল কমিটিতে এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে।

দুনিয়ায় আর্থিক দুর্যোগ ও আরোগ্যলাভ *

(ক) বেকার-গ্রস্ত দুনিয়া

প্রশ্ন :—দেশ-বিদেশের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা কিরূপ ?

উত্তর :—প্রথম কথা,—বেকার বলিলে ইয়োরামেরিকায় যে ধরণের নরনারী বুঝা যায় ভারতে আমরা ঠিক সেই ধরণের নরনারী বুঝি না।

প্রঃ—কেন ? বেকার শব্দের ভিতর এমন কি রহস্য আছে ?

উঃ—আলবৎ আছে। যে-কোনো লোকের চাকরি নাই তাহাকেই আমরা ভারতে বলি বেকার। ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর যদি আমি বৎসর দুয়েক বিনা চাকরিতে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে লোকেরা আমাকে বলিবে বেকার। কিন্তু ইয়োরামেরিকার দস্তুর আলাদা।

প্রঃ—তাহা ত কখনও শুনি নাই। তাহা হইলে ঐ সকল দেশে বেকারেরা আবার কিরূপ জীব ?

উঃ—যে সকল লোকের চাকরি আছে তাহাদের নাম-ধাম-সংখ্যা ইত্যাদি সব-কিছুই ঐ সকল দেশে পুরা-দস্তুর জানা থাকে। ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে, সরকারী দপ্তরে, স্বাস্থ্যবীমার দপ্তরে, বেকারবীমার

---

* মোলাকাৎগুলা "আর্থিক উন্নতি"তে বাহির হইয়াছিল (মাঘ ১৩৩৮, পৌষ ১৩৪০, বৈশাখ ১৩৪১), জানুয়ারি ১৯৩২—এপ্রিল ১৯৩৪। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ সরকার, সুধাকান্ত দে, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, মণীন্দ্রমোহন মৌলিক, কামাখ্যা চরণ বসু ইত্যাদি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণের সঙ্গে বিভিন্ন কথাবার্তার বৃত্তান্ত। সংখ্যাগুলা লীগ-প্রকাশিত পত্রিকা হইতে সংগৃহীত।

দপ্তরে তঙ্খাভোগী নরনারীর বৃত্তান্ত ঠিকঠাক জানিতে পারা যায়। এই সকল লোকের ভিতর কোনো লোক যদি চাকরী হারাইয়া বসে, তখন তাহাকে বলে বেকার। বুঝিতে হইবে যে, এ হইতেছে আইনের শব্দ, পারিভাষিক শব্দ। যখন-তখন যে-কোনো অর্থে ব্যবহার করিলে গোলে পড়িতে হইবে।

প্রঃ—তবে কি বলিতে হইবে যে, ঐ ধরণের বেকার বাঙ্‌লা দেশে একপ্রকার নাই অথবা খুবই কম?

উঃ—জবাব দেওয়া কঠিন। কেননা আগে ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে কোন্ কোন্ সরকারী ও বেসরকারী আফিসে কতগুলা কেরাণীর চাকরি ছিল, কোন্ কোন্ কারখানায় কতগুলা মজুরের নকরি ছিল, ইত্যাদি। তাহার পর সেই সকল আফিস হইতে আবার খোঁজ লইতে হইবে কতগুলা কেরাণীর আর মজুরের নকৃরি গিয়াছে। সেই সকল "বরখাস্ত-করা" নরনারীকে বলা যাইবে বেকার,—একালের ধনবিজ্ঞান-মাফিক পারিভাষিক অনুসারে।

প্রঃ—যদি কোনো ব্যক্তিগত দোষের দরুণ কোনো কেরাণীর বা মজুরের নকৃরি যায় তাহা হইলে তাহাকে বেকার বলা হইবে কি?

উঃ—না। যদি আফিসের, দপ্তরের বা কারখানার কাজ কমিয়া যাইবার ফলে কেরাণী-মজুরের কাজ ছাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলেই বেকার-সমস্যার মাম্‌লায় আসিয়া পড়া যাইবে। তাহা না হইলে নয়।

প্রঃ—তবে ত দেখিতেছি যে, এতদিন বিলাতী, মার্কিণ বা জার্ম্মাণ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট হইতে প্রকাশিত বেকারের সংখ্যাগুলা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

উঃ—কাণ্ডকারখানা সেইরূপই বটে। বিদেশী পারিভাষিক শব্দগুলা

স্বদেশী কাজকর্ম্মের অভিজ্ঞতার ভিতর আমদানি করিতে গেলে অনেক সময়েই ভুলচুক করিবার সম্ভাবনা। বিজ্ঞানালোচনার অন্যান্য বহুক্ষেত্রেই এইরূপ দেখা গিয়াছে। বেকারসমস্যা সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিতেছে। বিশেষতঃ বাঙলা দেশে আমরা অধিকাংশ লোকই অভাবগ্রস্ত লোক। প্রত্যেক পরিবারেই অন্নকষ্ট বস্ত্রকষ্ট বেশ-কিছু বর্ত্তমান। তবে বৎসর পঞ্চাশেক পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে বাঙালীর আর্থিক অবস্থা খারাপ এরূপ সপ্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক যুগেই ভাত-কাপড়ের অভাব কোনো-না-কোনো শ্রেণীর লোকের ভিতর থাকিতে বাধ্য। এক হিসাবে দারিদ্র্য সনাতন বা চিরস্থায়ী। ভাত-কাপড়ের অভাবে কষ্ট পাওয়া অল্পবিস্তর প্রত্যেক যুগেই অবশ্যম্ভাবী।

প্রঃ—বেকার-সমস্যার আলোচনায় সনাতন দারিদ্র্যের কথা তুলিতেছেন কেন?

উঃ—যুক্তিনিষ্ঠ প্রণালীতে বেকার বা অন্য-কিছু আলোচনা করিতে বসা হাভাতে হাঘরে লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা প্রতিমূহূর্ত্তে না খাইতে পাইয়া কষ্ট পাইতেছি। অভাবের তাড়নায় মাথা ঠিক রাখিয়া দেশ-বিদেশের আর্থিক অবস্থা জরীপ করিতে বসা অসম্ভব। অথবা একপুরুষ বা দেড় পুরুষ পূর্ব্বে বাঙালী জাতির অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার তুলনায় একালের বাঙালীর অবস্থা উন্নত কি অবনত তাহার বিশ্লেষণ করাও একপ্রকার অসাধ্য হইয়া পড়ে। বাঙলা-দেশে দারিদ্র্য পূর্ব্বেও ছিল, আজও আছে। সেকালের তুলনায় একালের দারিদ্র্য কম কি বেশী তাহা হয়ত অঙ্কের দৌলতে, ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের জোরে খানিকটা নিরেট ভাবে বুঝিতে পারা আর লোক-জনকে নির্ভুলরূপে বুঝাইতে পারা অসম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ "বুঝিয়া" বা বুঝাইয়া লাভ নাই। কেননা তাহাতে পেট ভরিবে

না। কাজেই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বেকার-সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বাঙালী আর অন্যান্য ভারতীয় অর্থশাস্ত্রী মহলে আজও একপ্রকার ঘটিয়া উঠে নাই।

প্রঃ—এইবার তাহা হইলে অন্যান্য দেশের বেকারগুলা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—বর্ত্তমানে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া যে আর্থিক দুর্য্যোগ চলিয়াছে আর তার জন্য সর্ব্বত্র যে বাণিজ্য-হ্রাস ঘটিয়াছে তাহার কুফল ভোগ করিতেছে তরুণ-তরুণীরা খুব জবর ভাবে। যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা বাস্তবিকই মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। ১৯৩২ সনে জার্ম্মাণিতে মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ৭,০০০,০০০ জন, এর মধ্যে ২৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক বেকারের সংখ্যা ১,৭৫০,০০০ জন অর্থাৎ মোট বেকারের প্রায় ২৫%। ১৯৩৩ সনের মে মাসে ডেন্মার্কের মোট বেকারের সংখ্যা ১২৯,৩০৭ জন; এর মধ্যে ২৫ বৎসরের কম বয়স্ক বেকারের সংখ্যা ৩৬,০০০, এবং ১৮ থেকে ২২ বৎসরের বেকারের সংখ্যা ১৯,০০০ জন। তবে মার্কিণ মুল্লুকে ১৮ বৎসরের নীচের বেকার নরনারীর সংখ্যা ১৯২০ সনে ২,৭০০,০০০ জন হইতে ১৯৩০ সনে ২,১০০,০০০ জন পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ১৪ হইতে ১৮ বৎসরের ইংরেজ বেকারের সংখ্যা ১৪০,০০০ জনেরও অধিক। ইতালিতে দেখা যায়, ১৯৩২ সনে ১২ হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বেকারের সংখ্যা ২৫০,০০০ জন। ১৯৩৩ সনের প্রারম্ভে নরওয়ে দেশে ১৮ থেকে ২৪ বৎসরের বেকারের সংখ্যা মোট ৭৫,০০০ জন বেকারের মধ্যে ২০,০০০ জন। এর ৭০০০ জন কখনও স্থায়ী চাকুরী লাভ করে নাই। ১৯৩৩ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সুইডেনের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, মোট

১৭৯,৫০৭ বেকারের মধ্যে ১৮ হইতে ২৪ বৎসরের বেকারের সংখ্যা ৫৯,৩১৭ অর্থাৎ ৩৩%।

প্রঃ—পেশা হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের বেকার-সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন কি ?

উঃ—আর্থিক দুর্য্যোগের ধাক্কা ডাক্তার-উকিলদের উপরেও লাগিয়াছে। জার্ম্মাণিতে প্রত্যেক বৎসর ১,৭২০ জন ডাক্তারী পাশ করে কিন্তু কাজ পায় ১,১০০ জন। অষ্ট্রিয়ায় ৩৫০ পাশ করার মধ্যে ১৫০ জন কাজে লাগে। ফ্রান্সে ১০০০ নূতন ডাক্তারের মধ্যে ৫০০ জন কাজ পায়, নরওয়েতে ১০০ জনের মধ্যে ৫০ জন, সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডে ১৫০ জনের মধ্যে ৮০ জন, জুগোশ্লোভিয়ায় ৩৫০ জনের মধ্যে ২০০ জন কাজ পায়, কেবল মাত্র সুইডেনে ৬০ জন বেকার হইয়া বসিয়া থাকে। এই সব হইল "পারিভাষিক" বেকারের বহির্ভূত।

জার্ম্মাণিতে ৭০০ জন নূতন দন্ত-চিকিৎসকের মধ্যে ৪০০ জনের জন্য কাজের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আর্জ্জেন্টিনায় ১৫০ জনকে ডিপ্লোমা দেওয়া হয় কিন্তু কাজে মোতায়েন করা হয় ১০০ জনকে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক সনে ২৫,০০০ নূতন নার্স্ বাহির হয়; এর মধ্যে সিকি বরাদ্দের কাজ মিলে। গ্রীস দেশে সামান্য কয়েকজন নার্সের প্রয়োজন; কিন্তু ডিপ্লোমা দেওয়া হয় ৪৩ জনকে। ১৯৩০ সনে অষ্ট্রিয়ায় ৬২৮ জন নার্স্‌কে ডিপ্লোমা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু চাকুরী পাইয়াছিল ৩০০টীর বেশী নহে।

যে সমস্ত কাজে ডিপ্লোমার দরকার নাই সেখানেও একইরূপ অবস্থা। সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, সাংবাদিক, অভিনেতা প্রভৃতির অবস্থা প্রায় ডাক্তারদের মত।

পোল্যাণ্ড দেশে ১৫%, জার্ম্মাণিতে ১০%, চেকোশ্লোভাকিয়ায়

৫% সাংবাদিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। তবে ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড্স্ এবং ডেন্মার্কে বেকার সাংবাদিক ২%এর বেশী নয়।

সবচেয়ে বেকার হইয়াছে অভিনেতারা। ফ্রান্সে অভিনেতার সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ জন। এর ৬,০০০ জন আর্টিষ্ট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ জানা-শুনা অভিনেতা। ১৯৩২ সনে মাত্র ১,৫০০ অভিনেতা কাজ পাইয়াছে।

প্রঃ—এইরূপ বেকার-বৃদ্ধির কারণ খতাইয়া দেখিয়াছেন কি?

উঃ—দুইটী কারণে পেশাদারদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে। অযথা সংখ্যা-বৃদ্ধি। গতর খাটাইবার কাজের প্রতি ঘৃণা এবং ঐ ধরণের কাজে বেকার-বৃদ্ধির জন্য অনেকেই "পেশা" অবলম্বন করিয়াছে। দ্বিতীয় কারণ যুক্তিযোগ-নীতি (র‍্যাশন্যালিজেশন্)।

প্রঃ—জাহাজী ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক-কিছু আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন কি?

উঃ—বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী সাধারণ ব্যবসাবাণিজ্যে যে মন্দা উপস্থিত হইয়াছে জাহাজী ব্যবসায় দুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহারও পূর্ব্ব হইতে। সওদাগরী জাহাজের সংখ্যা এবং আয়তন দুই-ই বৃদ্ধি পাইবার জন্য জাহাজ-ব্যবসার দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ১৯২৯ সনে সওদাগরী জাহাজের মোট টনেজের পরিমাণ লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার অপেক্ষা বার আনা বৃদ্ধি পায়। একে তো জাহাজের টনেজ-বৃদ্ধি তাহর উপর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস। দু'য়ে মিলিত হইয়া জাহাজের মাশুল অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছে। তিন বৎসরের মধ্যে গোটা দুনিয়ার বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ২৬-২৭ ভাগ। জাহাজের মাশুল লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার চেয়েও কমিয়াছে।

১৮৯৮-১৯১৩ সনে জাহাজ-মাশুলের যে গড় হার ছিল ১৯৩২ সনে সেই হারের ৮৭·৭% মাত্র মাশুল মিলিয়াছে।

যাত্রী-চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে দুইটী কারণ বশতঃ। ইমিগ্রেশন বা লোক-আমদানি বিষয়ক আইনের কড়াক্কড়ি এবং অর্থনৈতিক দুর্য্যোগ। ইয়োরোপ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথে ঔপনিবেশিক এবং সাধারণ যাত্রী দুই-ই কমিয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। ১৯২৯ সনে এই সংখ্যা ছিল ৫৫০,৮৩৭ জন, ১৯৩২ সনে মাত্র ২৬৯,৫৫৭ জন। ১৯৩৩ সনের প্রথম নয় মাসের সংখ্যাও আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই যদিও ভাড়া অত্যন্ত কমানো হইয়াছে।

প্রঃ—এই বাণিজ্য-ঘাটতির দৃষ্টান্ত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে পাওয়া যায় কি?

উঃ—সুয়েজখালের পথে জাহাজ-চলাচলের অবস্থা ভাল নয়। ১৯২০ সনের মাঝামাঝি হইতে ১৯৩২ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই পথে গমনাগমনকারী জাহাজসমূহের টনেজ কমিয়াছে ২৫% এবং বোঝাই মাল কমিয়াছে ৪০%। ১৯৩২ সনের শেষের দিকে অবস্থার উন্নতি সাধিত হয় এবং ১৯৩৩ সনের প্রথম আট মাস পর্য্যন্ত এইরূপ চলে।

পানামা খালে মাল-চলাচলও তথৈব চ, বরং আরও খারাপ। ১৯২৯ সনে এই খাল-অতিক্রমকারী টনেজের পরিমাণ ছিল ৩০,৩৫৩,০০০ নেট টন, ১৯৩২ সনে দাঁড়ায় ২২,৬৩৬,০০০ টন। মাল চালান যায় ১৯২৯ সনে ৩১,৪৫০,০০০ লং-টন, ১৯৩২ সনে ১৮,০৯৯,০০০ লং-টন। ১৯৩৩ সনের দ্বিতীয়পাদে মাল-চালান বাড়ে ৭%, টনেজ্ বাড়ে ৩৩%।

ইয়োরোপের বড় বড় বন্দরে—হাম্বুর্গ, রটার্ডাম, এবং আমষ্টার্ডাম—

১৯৩২ সনে মোট মাল-চলাচলের পরিমাণ ৫৭,৯০৬,০০০ মেট্রিক টন। ১৯২৯ সনে ৯২,৬১৯,৬৩৪ মেট্রিক টন।

উত্তর আমেরিকায় সণ্ট্ সেণ্ট্ মেরি ক্যানাল দিয়া যে সমস্ত জাহাজ গতায়াত করিয়াছে তাহাদের হিসাবপত্র লইয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯২৯ সনে মালের পরিমাণ ছিল ৯২,৬২২,০১৭ টন, ১৯৩২ সনে তাহা দাঁড়ায় মাত্র ২০,৪৮১,০৪৭ টন। ১৯৩২ সনে "ওর" চালান যায় ৩,৬০৭,০০০ টন, কিন্তু ১৯২৯ সনে চালান হইয়াছিল ৬৪,৯১৭,০০০ টন।

তেল চালান দেওয়ার জন্য যে সমস্ত স্বতন্ত্র জাহাজ আছে তাহাদের মধ্যে ৩,২৫০,০০০ টনের ৩৫৫ খানি জাহাজ ১৯৩২ সনে অলস ভাবে পড়িয়া থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্য খুব কমিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মাশুলও কমিয়াছে। এই দুই কারণ বশতঃ অনেক জাহাজ-কোম্পানীর টিঁকিয়া থাকাই দায়। এই জন্য জাহাজ-নির্ম্মাণ শিল্প এবং আনুষঙ্গিক আরও দুপাঁচটা শিল্পের অবস্থা কাহিল।

প্রঃ—শুনিতে পাই যে, কোনো-কোনো দেশে নাকি জাহাজগুলা ভাঙিয়া ফেলা হইতেছে।

উঃ—সত্যই তাই। ইহারই নাম "যুক্তিযোগ"। জাহাজ-শিল্পের এবং জাহাজ-ব্যবসার দুর্দ্দশার-দরুণ তিনটা দেশে রীতিমত আইন করিয়া জাহাজ ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। ইতালি ভাঙিয়াছে তিনবার, প্রত্যেকবারে ২০০,০০০ টন হিসাবে, জার্ম্মাণি ৪০০,০০০ টন, জাপান ৪০০,০০০ টন। মার্কিণ শিপিং বোর্ড ৭০০,০০০ টনের ১২৫ খানি জাহাজ ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। অন্যান্য দেশে,—যেখানে গবর্ণমেণ্ট কড়াক্কড়ি করে নাই, সেখানেও বহু পুরাতন জাহাজ কিম্বা সেকেলে ধরণের জাহাজ হয় ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা বিদেশে বিক্রি

করিয়া ফেলা হইয়াছে। ১৯৩২ সনের ৩০শে জুন তারিখে দুনিয়ার সাগরে-সাগরে যে সমস্ত জাহাজ ভাসিতেছিল তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে, দুনিয়ায় সওদাগরী জাহাজের অবস্থা ১৯২৯ সনের অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। কেবল মাত্র রুশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড এবং পানামার জাহাজ বাড়িয়াছে।

প্রঃ—জাহাজ-ব্যবসায় মন্দার দরুণ খালাসীদের অবস্থা কিরূপ?

উঃ—বুঝাই যাইতেছে। লীগ অব্‌ নেশ্যন্‌স্‌ হইতে প্রকাশিত দলিল তাহার সাক্ষী। প্রত্যেক দেশেই বাণিজ্য-জাহাজের দুরবস্থা, কাজেই খালাসীদের দুরবস্থাও সর্ব্বত্র। এদের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। জার্ম্মাণিতে ১৯৩২ সনে এক-তৃতীয়াংশ জাহাজ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়াছিল। সুতরাং যেখানে জাহাজসমূহে ৫৮,০০০ লোক কাজে নিযুক্ত হইতে পারিত, সেখানে সারা বৎসর মাত্র ৩৮,১০৫ জন অর্থাৎ ৬৫·৪% কাজ পাইয়াছে। বিলাতে ১৯৩৩ সনের ১লা অক্টোবর তারিখে ১,৫৭২,৫০০ টন জাহাজ নিষ্কর্ম্মা ছিল, ফলে বীমাকারী ৪৮,২৪৪ জন অর্থাৎ ২৯·৯% নাবিক বেকার হইয়াছিল। ইতালিতে ১৯৩২ সনের শেষে রেজেষ্টারী করা বেকার নাবিকের সংখ্যা ৩৮,০০০। ফ্রান্সে ১৯৩১ সনের শেষে বেকার নাবিক ১২,০০০ জন, ১৯৩৩ সনের নভেম্বর মাসে ১৫,০০০ জন। নরওয়ে দেশে ১৯৩৩ সনের এপ্রিল মাসে রেজেষ্টারি-করা বেকার নাবিকের সংখ্যা ৭,১৩১ জন; সুতরাং মোট বেকারের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হইবে। ডেন্মার্কে ১৯৩৩ সনের প্রথম আট মাসে মোট টনেজের ১৪·২% অকর্ম্মা হইয়াছিল, বীমাকারী নাবিক বেকার হইয়াছিল ৩০%, সুইডেনে ১৯৩২ সনে গড়ে প্রতি মাসে বেকার নাবিকের সংখ্যা ৫,৯৭৪ জন, ১৯২৭ সনের মাসিক গড় ২,৯৩৬।

১৯৩৩ সনের প্রথম আট মাস পর্য্যন্ত নাবিক এবং সামুদ্রিক জেলেদের মধ্যে প্রত্যেক ১০০টী কর্ম্মখালির জন্য ৪৯৩ খানি হিসাবে দরখাস্ত পড়িয়াছিল। নেদারল্যাণ্ডে ১৯৩২ সনের শেষে ১৭%-এরও বেশী এঞ্জিনিয়ার-কর্ম্মচারী এবং ১৫% এর বেশী ডেকের কর্ম্মচারী বেকার হইয়াছিল। বেলজিয়ামে ১৯৩০ সন হইতে ১৯৩২ সনের মধ্যে নাবিক বেকার হইয়া পড়িয়াছিল ৪০%। ১৯৩৩ সনের প্রথম আট মাসের মধ্যে জাহাজ নিষ্কর্ম্মা হইয়াছে ৪৩%; এঞ্জিনিয়ার-অফিসার বেকার ২৫%, বেতার-অপারেটার ৩৫%; অন্যান্য মাল্লা ২,৬০০ জন। গ্রীসের জাহাজগুলিতে ২০,০০০ নাবিকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে, কিন্তু ১৯৩৩ সনের প্রথম ৭ মাসে ৪,০০০ নাবিক বেকার ছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯৩০ সনের ৩০শে জুন তারিখে নিষ্কর্ম্মা জাহাজ ১৩৩,০০০ টন, নাবিক বেকার ৩,৩৯০ জন। কানাডায় ১৯৩০ সনের জুন হইতে ১৯৩১ সনের জুন পর্য্যন্ত ৩২·৯% নাবিক কাজের সময় হারাইয়াছে, এবং নষ্ট সময়ের পরিমাণ প্রত্যেকের ২৫ সপ্তাহ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনের মধ্যে ১২%নাবিক বেকার হইয়াছিল। ১৯৩১ সনের ৩০শে জুন বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭·৪%, এবং ১৯৩২ সনের ৩০শে জুন ২৫·৫%। আর্জ্জেন্টিনা সমুদ্র এবং দেশের মধ্যস্থ জলপথে বেকার নাবিকের সংখ্যা ১৯৩২ সনের আগষ্ট মাসে মোট ২,৪৩৩ জন।

প্রঃ—নতুন-নতুন কল আবিষ্কারের ফলে খালাসীদের তুঃখ বাড়ে নাই কি?

উঃ—আলবৎ। জাহাজ নিষ্কর্ম্মা হওয়ার জন্যই যে কেবল খালাসীদের সংখ্যা কমিয়াছে তাহা নহে। জাহাজে তরল ইন্ধনের ব্যবহার বাড়িয়াছে। আর উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতিও কায়েম হইয়াছে।

এই দুই কারণে নাবিকের সংখ্যা কমিয়াছে। পূর্ব্বে একজন ফায়ারম্যান কয়লাপোড়ানো-জাহাজে ৩ হইতে ৪টা ফার্ণেসের তত্ত্বাবধান করিত; তেলপোড়ানো জাহাজে এক একজন ফায়ারম্যান ৯টা হইতে ১২টা ফার্ণেসের তদারক করিতে পারে। ইণ্টার্ণাল কম-বাশ্চ্যন এঞ্জিনের রেওয়াজ খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৩ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ১৯১৪ সনের তুলনায় এই ধরণের জাহাজ বাড়িয়াছে ৪৬ গুণ, ২২০,০০০ টন হইতে একেবারে ১ কোটী টন। বিদেশগামী মোটর-জাহাজসমূহ এঞ্জিনঘরগুলিতে ৬৩৬ জন লোক নিয়োগ করে, কিন্তু বাষ্পচালিত জাহাজের এঞ্জিন ঘরে ১০০০ জন লোকের দরকার। ফ্রান্সে বাণিজ্যজাহাজ এবং মাছ-ধরা জাহাজের যন্ত্রপাতি বদল করিবার জন্য ৫০০০ জন অতিরিক্ত লোক লাগান হইয়াছে। কিন্তু নতুন ব্যবস্থার ফলে ডেকের কর্ম্মচারী হ্রাস করিতে হইয়াছে উহার তিনগুণ। মোট কথা ১৯২৩ সনের তুলনায় ১৯৩১ সনে ফ্রান্সে ১০% কম মাঝি-মাল্লার দরকার হইয়াছে; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ফরাসী মুল্লুকে মোট টনেজ বাড়িয়াছে ৪৮%।

প্রঃ—দুনিয়ার চাষীদের অবস্থা কিরূপ?

উঃ—এই যে বিশ্বব্যাপী মন্দা চলিতেছে তাহার প্রভাব চাষী মহলে মজুর মহলের চেয়ে কম নয়। ১৯২৯ সনের পর হইতে যে আর্থিক দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহার কুফল কৃষি-মজুরদের উপরেও পড়িয়াছে। একে ত কৃষিমজুরদের মজুরি কমিয়াছে তার উপর আবার বেকারও বাড়িয়াছে দলে দলে।

জার্ম্মাণিতে আইন করিয়া কৃষি-মজুরি ১০% হইতে ১৫% পর্য্যন্ত কমাইয়া ১৯২৭ সনের অবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে। ১৯৩২ সনে মজুরি নামিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিকার্য্যে মজুরি-সূচী (লড়াইয়ের পূর্ব্বের সূচী = ১০০) ১৯২৪ সনের ১৯৪ হইতে ১৯৩১ সনে ১৬৭, ১৯৩২ সনে ১৫৫, ১৯৩৩ সনের মার্চ্চ মাসে ১৫১তে পরিণত হইয়াছে।

কানাডায় ১৯২৫ সন হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত পুরুষ মজুরদের মাসিক মজুরির হার ছিল খাওয়া থাকা বাদ ৪০ ডলার, মেয়েদের ২৩,২৪ ডলার। ১৯৩১ সনে মজুরি দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫ আর ১৮ ডলার; ১৯৩৩ সনে ১৯ আর ১৫ ডলার।

ডেন্মার্কে ১৯৩১-৩২ সনের শীতকালে মজুরি হ্রাস ১২% হইতে ১৪%। ১৯৩২ সনের বসন্তে মজুরি আরও কম হইয়াছে। মিশরে ১৯৩৩ সনের নভেম্বরে কৃষি-মজুরির হার ৩।৪ তুর্কী পিয়াস্তার। ভাল সময়ে মজুরি ছিল ৬·৮ পিয়াস্তার। মার্কিণ মুল্লুকে কৃষি-মজুরির সূচী (যুদ্ধের পূর্ব্বে ১০০) ১৯২৯ সনের ১৭১ হইতে ১৯৩০ সনে ১৪৭,১৯৩২ সনের অক্টোবরে ৮৪, ১৯৩৩ সনের জানুয়ারীতে একেবারে ৭৪-এ নামিয়াছে। ১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে অবশ্য সূচী ৭৮ হইয়াছে। ফিনল্যাণ্ডে পুরুষদের মজুরি কমিয়াছে ২০%। ফ্রান্সেও মজুরি কমিয়াছে। বিলাতে গত ২॥০ বৎসরের মধ্যে কৃষি-মজুরি কমিয়াছে ৩১ শিঃ ৮ পেঃ হইতে ৩০ শিঃ ৭॥ পেঃ পর্য্যন্ত। হাঙ্গারিতে চার বৎসরের মধ্যে কৃষি-মজুরির হ্রাস ৪০%। আইরিশ ফ্রি ষ্টেটে সূচী-সংখ্যার হ্রাস ১৯২৫ সনের ১০০ হইতে ১৯৩২ সনে ৯০ পর্য্যন্ত, ইতালিতে কৃষিমজুররা ১৯২৯ সনে যে মজুরি পাইয়াছে ১৯৩৩ সনের শেষে তাহার বার আনা মজুরি পাইয়াছে। ল্যাটভিয়ায় ১৯২৯-৩০ সনের মজুরির তুলনায় ১৯৩২-৩৩ সনে মজুরি ২।৩ অংশ মাত্র। নিউ জীল্যাণ্ডে ১৯৩০ সনের সূচীসংখ্যা ১৭৯, ১৯৩৩ সনে ১১৫। পোলাণ্ডে ১৯৩২ সনে মজুরি কমিয়াছে শতকরা

১০।১১, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশেও কৃষিমজুরি কমিয়াছে।

কৃষি-মজুরদের দুর্দ্দশা ঘটিবার কারণ নানা প্রকার। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস এবং উন্নতধরণের কৃষিযন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তন ছাড়াও অন্যান্য কারণ আছে। পূর্ব্বে পল্লী অঞ্চল হইতে সহর অঞ্চলে যে হারে মজুররা কারখানায় কাজ করিতে ছুটিত তাহা বন্ধ হইয়াছে। এমন কি অনেক মজুর সহর হইতে আবার পাড়াগাঁয়ে ফিরিয়া আসিতেছে। এইজন্য কৃষিমজুরদের মধ্যে বেকার-সমস্যা বাস্তবিকই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রঃ—কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস সম্বন্ধে খাঁটি অঙ্ক পাওরা যায় কি?

উঃ—মন্দার যুগে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম কমিয়াছে দুনিয়ার সর্ব্বত্র। কিন্তু এই কম্‌তির হার নানা দেশে নানা রকম। কোন্ দেশে কি হারে কমিয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেওয়া যাইতেছে। সূচী-সংখ্যার (ইণ্ডেক্‌স্-নাম্বারের) সাহায্যে বিষয়টা সহজে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক যেন প্রত্যেক দেশেই ১৯৩১ সনে কতকগুলা বড়-বড় জিনিষের দর সমবেতভাবে ছিল ১০০। ১৯৩৩ সনের মার্চ্চ মাসে প্রত্যেক দেশে সেইসকল জিনিষের দর এই ১০০ এর তুলনায় কত তাহাই দেখানো হইতেছে। সূচী সংখ্যার তালিকা নিম্নরূপ—

১।	নরওয়ে	...	৯৫·২
২।	বম্বে	...	৮৮·১
৩।	কলিকাতা	...	৮৬·৪
৪।	হাঙ্গারি	...	৮৫ ৫
৫।	ইংল্যাণ্ড-ওয়েল্‌স্	...	৮৫·০
৬।	পোল্যাণ্ড	...	৮৪·০

৭।	ইতালি	...	৮৪'৫
৮।	নিউজীল্যাণ্ড	...	৮৩ ৪
৯।	আর্জেণ্টিনা (দক্ষিণ আমেরিকা)	...	৮২'৪
১০।	হল্যাণ্ড	...	৮০'৭
১১।	জার্ম্মাণি	...	৮০'০
১২।	কানাডা	...	৭৯'৪
১৩।	এস্থোনিয়া	...	৭৬ ৩
১৪।	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	...	৬২'৫
১৫।	জুগোশ্লাভিয়া	...	৫৯'৯

দেখিতেছি যে, মূল্য কমিয়াছিল সবচেয়ে কম নরওয়ে দেশে আর সব চেয়ে বেশী জুগোশ্লাভিয়ায়। বিলাতে মূল্য কমিয়াছিল ভারতের চেয়ে বেশী। বম্বে আর কলিকাতায় দর ছিল ৮৮'১ আর ৮৬'৪ অর্থাৎ ১৯৩১ এর দরের কাছা-কাছি। বুঝিতে হইবে যে, ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের দর অত্যধিক কমে নাই। এস্থোনিয়া, জুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে যে হারে মূল্য কমিয়াছিল সেই হারে ভারতে মূল্য কমিলে ভারতবাসীর দুর্গতি আরও বাড়িত। ঘটনাচক্রে সেই দুর্ভাগ্য হইতে রেহাই পাওয়া গিয়াছে।

প্রঃ—বিশ্বব্যাপী মন্দার যুগে মুদ্রা বিষয়ক স্বর্ণমান শুনিতেছি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই কথা কতটা সত্য ?

উঃ—১৯৩৩ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত অনেক দেশের সিক্কা স্বর্ণমানেই বজায় ছিল। এইসকল দেশে সিক্কার দর সোনার মাপে কিছুই কমে নাই। আর কমিয়া থাকিলেও অতি সামান্য মাত্র কমিয়াছিল। দেশগুলির নাম আর সোনার মাপে সিক্কার শতকরা দাম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

১।	স্থইট্সার্ল্যাণ্ড	...	১০০'৫১
২।	হল্যাণ্ড	...	১০০'৪৬
৩।	বেলজিয়াম	...	১০০'৩৭
৪।	চেকোশ্লোভাকিয়া	...	১০০'৩৭
৫।	জার্ম্মাণি	...	১০০'২৫
৬।	পোল্যাণ্ড	...	১০০'২৩
৭।	ইতালি	...	১০০'২২
৮।	ফ্রান্স	...	১০০'০০
৯।	বুল্‌গারিয়া	...	৯৯'৭৮
১০।	রুশিয়া	...	৯৯'৫৯
১১।	রুমানিয়া	...	৯৯'৫৪
১২।	মেক্‌সিকো	...	৯৯'২৭
১৩।	লিথুয়ানিয়া	...	৯৯'১৪
১৪।	লাট্‌ভিয়া	...	৯৪'০১

এই চৌদ্দটা দেশের ভিতর সাতটায় সিক্কার মূল্য সোনার হিসাবে কিছু অতিরিক্ত ছিল। তালিকার অন্তর্গত স্থইট্সার্ল্যাণ্ড হইতে ইতালি পর্য্যন্ত দেশগুলার অবস্থা এইরূপ। অর্থাৎ আইনতঃ সিক্কার পরিবর্ত্তে যতখানি সোনা পাওয়ার কথা তাহার চেয়ে কিছু বেশী সোনা পাওয়া যাইত। ফ্রান্সে সিক্কায় আর সোনায় সম্বন্ধ আইন মাফিক সমান ছিল। বুল্‌গেরিয়া হইতে লাট্‌ভিয়া পর্য্যন্ত ছয়টা দেশে সিক্কার দর সামান্য মাত্র নামিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সোনার সঙ্গে সিক্কার সম্বন্ধে কোনো গোলযোগ বাধে নাই।

প্রঃ—যে সকল দেশ স্বর্ণমান ছাড়িয়া দিয়াছে তাহারা সকলেই কি একহারে মুদ্রা কমাইয়াছে?

উঃ—টাকার দর কমিয়াছে অধিকাংশ দেশেই। কিন্তু কম্‌তির হারে বিভিন্নতা আছে। ১৯৩৩ সনের অক্টোবর মাসে শতকরা ৬৫—৮০ অংশ সোনা ছিল নিম্নলিখিত দেশের সিকায় :—

১।	অষ্ট্রিয়া	...	৭৭·৯৫
২।	জুগোশ্লাভিয়া	...	৭৬·৯৭
৩।	হাঙ্গারি	...	৭২·৩৬
৪।	পর্ত্তুগাল	...	৬৮·২০
৫।	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	...	৬৬·৪৫
৬।	কানাডা	...	৬৫·৪৩
৭।	ঈজিপ্ট	...	৬৫·০৯
৮।	ইংল্যাণ্ড	...	৬৫·০৯
৯।	আয়র্ল্যাণ্ড	...	৬৫ ০৯
১০।	এস্থোনিয়া	...	৬৫·০৬
১১।	ভারতবর্ষ	...	৬৫·০৫

অষ্ট্রিয়া হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এগার দেশের সিকায় সোনার পরিমাণ বেশ পুরু ছিল, অর্থাৎ এই সকল দেশে সিকার দর সোনার মাপে বড়-বেশী কমে নাই।

নিম্নলিখিত দেশগুলায় স্বর্ণমানের মাত্রা আরও কম ছিল (শতকরা ৫০-৬৫) :—

১।	সুইডেন	...	৬১·১১
২।	আর্জেন্টিনা (দক্ষিণ আমেরিকা)	...	৫৯·৯০
৩।	নরওয়ে	...	৫৯·৫০
৪।	ফিনল্যাণ্ড	...	৫৫·৫৪
৫।	ডেন্মার্ক	...	৫২·৪৮

সিক্কার দাম অন্যান্য কয়েক দেশে আরও বেশী কমিয়াছিল। স্বর্ণমান শতকরা ৩৫-৫০ অংশে ঠেকিয়াছিল। নিম্নলিখিত দেশগুলায়ঃ—

১।	কলম্বিয়া (দঃ আমেরিকা)	...	৪৮.৩০
২।	ব্রেজিল (দঃ আমেরিকা)	...	৪৬.১৮
৩।	গ্রীস	...	৪৪.০৮
৪।	স্পেন	...	৪৩.৩৯
৫।	জাপান	...	৩৮.২৮

দুনিয়ার সকল দেশের চেয়ে বেশী কমিয়াছিল জাপানের সিক্কা। ইয়েনের দাম ছিল শতকরা ৩৮.২৮ অংশ মাত্র।

(খ) "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব"

প্রঃ—বর্ত্তমান দুনিয়ায় যে আর্থিক সঙ্কট দেখা যাইতেছে তার আসল কারণ কি ?

উঃ—আর্থিক জগতে মোটামুটি একটা নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তর উত্থান-পতন ঘটিয়া থাকে। যখন লাভের আশা বেশী থাকে উৎপাদকরা উৎপাদন করিয়া যায় বেশী-বেশী। তারপর যখন উৎপাদন চাহিদাকে ছাড়াইয়া উঠে, তখন বিক্রী কমিয়া যায়, কারখানাগুলা অল্প-বিস্তর বন্ধ হয়, গুদামে মাল পচিতে থাকে, চারিদিকে একটা নৈরাশ্যের আবহাওয়া দেখা দেয়, উৎপাদনের পরিমাণও কমাইয়া দেওয়া হয়। আবার যখন দেখা যায় যে, চাহিদা উৎপাদনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন কল-

কারখানাওয়ালাদের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়, এবং তারা উৎসাহের সহিত উৎপাদনের কাজে হাত দেয়। এই রকমের ওঠা-পড়া দুনিয়ার আর্থিক ইতিহাসের একটা প্রধান বস্তু। বর্ত্তমানে সারা দুনিয়ায় যে মন্দাটা দেখা দিয়াছে, এটা ঐ চক্রগতিতে ওঠা-পড়ারই একটা অঙ্গ। সুতরাং এ একটা সাময়িক কাণ্ড।

প্রঃ—আপনি বর্ত্তমান সঙ্কটের অন্য একটা ব্যাখ্যাও অন্যত্র দিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে দুনিয়ায় একটা আর্থিক যুগ-পরিবর্ত্তন চলিতেছে, এবং সেটাও বর্ত্তমান সঙ্কটের জন্য অংশতঃ দায়ী। এ কথার মানে কি ?

উঃ—দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় কয়েকটা দেশে—যেমন বিলাত, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতিতে শিল্প-বিপ্লব হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে। বিলাত অবশ্য অগ্রণী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকেই এখানে বিপ্লব দেখা দেয়। সেই শিল্প-বিপ্লবের মানে হচ্ছে—উৎপাদনে যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং উৎপাদনের কার্য্যে কয়লার নিয়োগ,—অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের কারখানা-শিল্পের আবির্ভাব। এই ধরণের শিল্প-বিপ্লব শীর্ষস্থানীয় দেশগুলায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভারত, চীন প্রভৃতি পশ্চাৎপদ দেশগুলায় সেই শিল্প-বিপ্লব কিছু-কিছু সুরু হইয়াছে। অপর দিকে, অগ্রবর্ত্তী দেশগুলা আর একটা নতুন শিল্প-বিপ্লবের ভিতর দিয়া যাইতেছে। এই "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের" বিশেষত্ব হইতেছে —ট্রাষ্টের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার, যুক্তি-যোগের প্রয়োগ এবং শিল্পের কেন্দ্র-বদ্ধতা। ট্রাষ্ট-প্রতিষ্ঠা ও কেন্দ্রবদ্ধতা প্রায় একই জিনিষ বোঝায়। কিন্তু আধুনিক দুনিয়ায় শিল্পগুলা কেবল ট্রাষ্টের অধীনে কেন্দ্রবদ্ধ হইতেছে তা নয়, রাষ্ট্রের অধীনেও কেন্দ্রবদ্ধ হইতে

চলিয়াছে। এই জন্য কেন্দ্রবদ্ধতা কথাটা রাষ্ট্রাধীনতা হইতে পৃথকভাবে বলিতে চাই।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চান যে, বর্ত্তমান দুনিয়ায় অগ্রবর্ত্তী দেশগুলার মধ্যে দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব ও পশ্চাৎপদ দেশগুলার মধ্যে প্রথম শিল্প-বিপ্লব এই দুই প্রকার শিল্প-বিপ্লবের একত্র আবির্ভাবই বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের জন্য অনেকটা দায়ী ?

উঃ—হাঁ, এই দুই ধরণের শিল্প-বিপ্লব সারা দুনিয়ায় একই সঙ্গে চলিতেছে বলিয়া একটা বিরাট ওলট-পালটের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ওলট্-পালট্ বর্ত্তমান আর্থিক মন্দার একটা বিশেষ কারণও বটে। বস্ত্র-শিল্প বিলাতের একটা প্রধান শিল্প। চীন, ভারত ইত্যাদি দেশ ইংরেজের তৈরী কাপড়ের বড় খদ্দের ছিল। কিন্তু, চীন, ভারত ইত্যাদি দেশ মিল খাড়া করিয়া কাপড় সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতেছে। তার ফলে ল্যাঙ্কাশিয়ারের ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ইংরেজরা জাত্‌কে জাত্ রসাতলে গেল। একদিকে যেমন ল্যাঙ্কাশিয়ারের সর্ব্বনাশ বা আংশিক নাশ হইতেছে অপরদিকে বার্মিংহাম বেশ জোরে চাঁড়িয়া উঠিতেছে। চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে ফ্যাক্টরী গড়িতে হইলে যন্ত্রপাতি চাই ত? আর বার্মিংহাম বিলাতের যন্ত্রপাতি তৈরীর একটা প্রধান কেন্দ্র। কাজেই, ইংরেজের আর্থিক জীবন বর্ত্তমানে একটা ওলট-পালটের মধ্য দিয়া যাইতেছে। তারা যে সমস্ত শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া ধনী হইয়াছিল সেগুলা কিছু-কিছু করিয়া ছাড়িতেছে, আর এমন সব নতুন-নতুন শিল্প ধরিতেছে, যাতে এরূপ পটুতা দরকার হয় যা পশ্চাৎপদ্ দেশগুলার মধ্যে সম্প্রতি নাই। আর এক কথা। পুরাণা শিল্পগুলাতে উন্নততর প্রণালীর প্রয়োগ, উৎপাদনের খরচা কমানো ইত্যাদি চেষ্টাও বিলাতের একটা নয়া আর্থিক

লক্ষণ। যেমন বিলাত, তেমনি জার্ম্মাণিও ঐরূপ আর্থিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ বোধ হয় বিলাতের চেয়ে জার্ম্মাণি আর আমেরিকাই এই দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে বেশী দূর আগাইয়া গিয়াছে।

প্রঃ—বর্ত্তমানের আথিক সঙ্কট ছনিয়ার অমঙ্গলের সূচক কিনা এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কিরূপ ?

উঃ—বর্ত্তমানে আর্থিক সঙ্কট ছনিয়ার ক্রমোন্নতিরই একটা ধাপ। যে ওলটপালট বর্ত্তমানে চলিতেছে, তা আপাতত কষ্টকর হইলেও ইহার ফলে, যেমন অগ্রগামী জাতিগুলার, তেমনি পশ্চাৎপদ জাতিগুলারও সমৃদ্ধি বাড়িবে, জীবনযাত্রা-প্রণালী সর্ব্বদাই আরও উন্নত হইবে। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় নৈরাশ্যে দিশাহারা হইবার কারণ নেই।

প্রঃ—ছনিয়ার নানাদেশে আজ সংরক্ষণশুল্কের দেয়াল উঠিতেছে। তার ফলে দেশ-দেশান্তরে মালপত্রের অবাধ আসাযাওয়া বিশেষ বিঘ্ন পাইতেছে। শুধু যে নানাদেশে সংরক্ষণশুল্কের দেয়াল আছে তা নয়, দেয়ালগুলা ক্রমেই উঁচু হইতে আরও উঁচু হইতেছে। সংরক্ষণশুল্কের দেয়ালগুলা ছনিয়ার আথিক দুর্দ্দশার জন্য কতটা দায়ী বলিয়া আপনি মনে করেন ?

উঃ—বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার জন্য সংরক্ষণশুল্ক যে কিছু দায়ী তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এ দায়িত্ব যে খুব বেশী তা মনে হয় না। সংরক্ষণ-শুল্ক না থাকিলে আমদানি-রপ্তানি যতটা হইতে পারিবে তার চেয়ে খুব বেশী কমিয়াছে তা মোটেই নয়। বরং শুল্ক-দেয়ালগুলা থাকা সত্ত্বেও দেয়াল টপকাইয়া মাল বেশ আসাযাওয়া করিতেছে। এইটা বুঝা দরকার যে, শুল্কগুলার উদ্দেশ্য সকল প্রকার আমদানি-রপ্তানি

একেবারে বন্ধ করা নয়, বিশেষ-বিশেষ শ্রেণীর আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করা, অথবা একখাতের মাল আর একখাতে চালাইয়া দেওয়া।

প্রঃ—আপনার মতের ঠিক উল্টা কথাই এত জায়গায় পড়িয়াছি যে, আপনার মতটা চট্ করিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছি না। এ সম্বন্ধে কোনো বস্তু-নিষ্ঠ প্রমাণ দিতে পারেন কি?

উঃ—এ সম্বন্ধে কতকগুলা সংখ্যা দেখাইতেছি। বিলাত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও লুকসেমবুর্গ এবং জাপান ১৯২৪ হইতে ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত প্রতি বছরে যা আমদদানি করিয়াছে, তার মধ্যে কারখানাজাত মালের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ তা নীচের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে :—

	বিলাত	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	জার্ম্মাণি	ফ্রান্স	বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ	জাপান
১৯২৪	১৭ ২	২৩.৮	১৯.০	১৪.২	২৩.৭	৩২.২
১৯২৫	১৮.৫	২১.৮	১৬ ২	১২.২	২১.৮	২১.৩
১৯২৬	১৮.৫	২৩.০	১৩.৬	১৩ ২	২১.৯	২২.০
১৯২৭	১৯.৯	২৫.০	১৭.৮	১৩.৯	২২.৭	২২.৭
১৯২৮	২০.৯	২৫.৬	১৭.৫	১৮.৮	২৬.৩	২৪.৫
১৯২৯	২১.২	২৬.০	১৬.৯	২০.২	১৭.১	২৪.০
১৯৩০ (৬ মাস)	২২.০	২৫.৭	১৭.২	২৩.৮	৩০.৯	২১.৮

লণ্ডনের মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্র হইতে অঙ্ক-গুলা উদ্ধৃত করা গেল। উপরের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে যে, বিলাত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম-লুক্সেমবুর্গ এই চার দেশে মোট আমদানির মধ্যে কারখানাজাত পণ্যের অংশটা

বাড়িয়াছে। এই কয়টি দেশই কারখানাশিল্পে প্রধান, এবং এই কয়টি দেশই নিজ-নিজ কারখানাশিল্প উন্নত করিবার জন্য সংরক্ষণশুল্কের সাহায্য নিতে দ্বিধা করে নাই। তা সত্ত্বেও, ইহাদের আমদানির মধ্যে কারখানাজাত মালের অংশটা কমে নাই। ১৯২৫ হইতে জরীপ করা সুরু করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৩০ সনের প্রথম ছয় মাস পর্য্যন্ত এমন কি জার্ম্মাণি আর জাপানেও এই অনুপাত ক্রমাগত বাড়্তির দিকে রহিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, সংরক্ষণশুল্ককে বাণিজ্যের বাধা বলিয়া যতটা প্রচার করা হয়, কথাটা তত সত্য নয়।

প্রঃ—সংরক্ষণ-শুল্ককে দুনিয়ার আর্থিক স্বার্থের পরিপন্থী মনে করেন কি?

উঃ—দুনিয়ার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা দেখিয়া আমি তা মনে করি না। দুনিয়ার আর্থিক উন্নতির মানেই প্রত্যেক দেশের সমৃদ্ধি, অর্থাৎ ধনোৎপাদন-ক্ষমতা আর ধনভোগের ক্ষমতা বাড়ানো। আর তা অনেক সময়েই অসম্ভব, যদি না সংরক্ষণশুল্ক অবলম্বন করা হয়। যেমন ধরা যাউক্ বিলাত। কারখানা-শিল্পের অভ্যুদয় হইল ঐ দেশে দুনিয়ায় প্রথম। আজকাল যেমন ভারত, চীন, বল্কান অঞ্চল, রুশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ইত্যাদি, তখনকার দিনে তেমন ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ কৃষিপ্রধান ছিল। কাজেই বিলাত তখন সারা দুনিয়ায় কারখানাজাত মাল জোগাইয়া ধনী হইতেছিল। পরে, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া এমন কি বিলাতের উৎপাদন-প্রণালী পর্য্যন্ত, সৎ ও অসদুপায়ে জানিয়াও আয়ত্ত করিয়া বিলাতের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। বিলাতে যে শিল্প-বিপ্লব ১৮৩০-৪০ সনে সম্পূর্ণ হইয়াছিল ঐ সব দেশে তা সুরু হ'ল প্রায় ঐ সময়ে আর সম্পূর্ণ হইল ১৮৭০-৮৫ সনের কাছাকাছি।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করার সুযোগ ছিল না। সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করার ক্ষমতা তখন এদেশের লোকের ছিল না। এদেশে সংরক্ষণ-নীতি প্রথম অবলম্বিত হয় ১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের মারফতে। ১৯২০ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই আন্দোলন জোরে চলিতেছে। তাহা ছাড়া, গভর্ণমেণ্ট নিজেই টারিফ বোর্ডের সাহায্যে সংরক্ষণ-নীতি চালাইতেছে। এই সব কার্য্য-কলাপের ফলে ভারত এখন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "প্রথম শিল্প-বিপ্লবে"র মধ্য দিয়া চলিতেছে। আশা করা যায় যে, ১৯৫৫-৬০ সনের মধ্যে ভারতেও প্রথম শিল্পবিপ্লব অনেকটা সম্পূর্ণ হইবে।

প্রঃ—বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার আর একটা কারণ বলিয়াছেন—কৃষি-জাত মালের দাম কমা। কৃষি-জাত মালগুলার দাম কমিল কেন?

উঃ—প্রথমতঃ বছর কয়েক ধরিয়া দুনিয়ার সর্ব্বত্রই কৃষি-জাত মালের অত্যধিক উৎপাদন হইয়াছে। ভারতে যেমন প্রচুর ধান ও পাট জন্মিয়াছে, তেমনি ইতালিতে আঙুর এবং যুক্তরাষ্ট্রে গম ও তূলা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছিল। কেন যে বেশী জন্মালো, ইহার কোনো কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না একথা বলা চলিবে না। খানিকটা এটা প্রকৃতির একটা খেয়াল বলা চলে। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিতে যুক্তিযোগ অর্থাৎ কৃষিজাত মাল উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি ও উন্নততর প্রণালীর প্রয়োগ হইয়াছে। এ কথাটা প্রধানতঃ অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেই খাটে।

প্রঃ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে দুনিয়ার সোনার অনেকটা অংশ জড় হইয়াছে। অন্য দেশগুলাতে সোনার পরিমাণ কমাতে, মুদ্রার পরিমাণ কমিয়াছে, তার ফলে দরের হ্রাস হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দশার

এইরূপ একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ব্যাখ্যাটা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন?

উঃ—যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে সোনা জড় হওয়াকে আমি বর্ত্তমান দুর্দ্দশার খুব বড় কারণ বলিয়া মনে করি না। এই কারণটা বড় করিয়া দেখা হয় জার্ম্মাণ আন্দোলনের ফলে। জার্ম্মাণরা ক্ষতিপূরণ হইতে রেহাই পাইবার জন্য এই আন্দোলন তুলিয়াছে। এই আন্দোলন আমার মতে প্রধানতঃ আর মুখ্যতঃ রাষ্ট্রনৈতিক। ক্ষতি পূরণের টাকা দেওয়াকে যুবক জার্ম্মাণি (আর জার্ম্মাণির জনসাধারণ) নিন্দাসূচক ও অপমানজনক গোলামির চিহ্ন বিবেচনা করে। তাহা যেন তেন প্রকারেণ রদ করা জার্ম্মাণ জাতির জবর স্বার্থ। তবে রদ হইলে অবশ্য আমেরিকায় আর ফ্রান্সে কাঁচা টাকা অত বেশী জমিতে পারিবে না। তাহাতে ইংল্যাণ্ডের আর জার্ম্মাণির টাকার বাজারও খানিকটা হাল্কা হইতে পারিবে।

প্রঃ—আপনি এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান দুর্দ্দশা সত্ত্বেও ইয়োরামেরিকার মজুরদের "প্রকৃত" মাহিনা, অর্থাৎ তাদের খাওয়া-পরা-থাকার সংস্থান, কাজের সুখ-সুবিধা ইত্যাদি কমে নাই। এ কথা কি প্রমাণ করা সম্ভব?

উঃ—হাঁ, এটা প্রমাণ করা সম্ভব। "প্রকৃত" মাহিনা যে কমে নাই তা বলিতেছি কেন? কারণ, মজুর-সঙ্ঘগুলা মজুরদের মাহিনা সম্বন্ধে খুবই সজাগ। যখনই মাহিনার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তখনই তারা মাহিনার হারের সঙ্গে জিনিযপত্রের দরের তুলনা করিয়া দেখিয়াছে, তাদের "প্রকৃত" মাহিনা কমিতেছে না বাড়িতেছে। যদি দেখে কমিতেছে, তাহা হইলে তারা তা না বাড়া পর্য্যন্ত মনিব-পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখে।

প্রঃ—দারিদ্র্য-সমস্যা একেবারে দূরীভূত করা সম্ভব মনে করেন কি ?

উঃ—না, দুনিয়ায় দারিদ্র্য চিরকাল আছে ও থাকিবে।

প্রঃ—তার মানে কি ? দুনিয়ায় এমন কি কোনো সময়ই আসিতে পারে না, যখন সারা দুনিয়ায় সকলেরই খাওয়া-পরা-থাকার সংস্থান হইতে পারে ? আর, যদি জগতের সকলেরই খাওয়া-পরা-থাকার সংস্থান হয়, তখনও কি বলিতে হইবে যে, জগতে দারিদ্র্য আছে ?

উঃ—দারিদ্র্য জিনিষটা চিরকালই আপেক্ষিক। ১৮৫৭ সনে লোকেরা সন্তুষ্ট হইতে পারিত, যদি দিন ১৪-১৫ ঘণ্টা খাটিয়া দু'বেলা দু'মুঠা খাইতে পাইত। এখন কিন্তু লোকে ঠিক ঐ রকম আর্থিক জীবনে সন্তুষ্ট হইবে না। বরং, ঐ রকম জীবনকে দারিদ্র্যের জীবন বলিয়া বিবৃত করিবে। এখন লোকে চাইবে বড় জোর দৈনিক ৭।৮ ঘণ্টা খাটুনি। প্রতি হপ্তায় একদিন ছুটী, হপ্তায় দু এক দিন সিনেমা দেখা, গান শোনা, বই, খবরের কাগজ, মাসিক প্রভৃতি পড়া ইত্যাদি। যতদিন না লোকে ঠিক এই ধরণের জীবন-যাত্রা-প্রণালী পাইবে, ততদিন তারা নিজেদেরকে দরিদ্র বলিয়া মনে করিবে। ধরা যাউক সুইট্‌সারল্যাণ্ড। এই দেশের সম্পদ্ জন-প্রতি ২০০ ফ্রাঁ, অর্থাৎ প্রায় ১২০৲ টাকা ধরা যাক্। এটা ভারতীয় সম্পদের তুলনায় বেশী। কাজেই, আমাদের তুলনায় তারা ধনী বটে। কিন্তু, সুইটসারল্যাণ্ডে হয়ত ১০,০০০ লোক যক্ষ্মায় ভুগিতেছে। তাদের চিকিৎসার জন্য রেডিয়াম প্রয়োগ দরকার, অথচ অর্থাভাবে অনেক রোগীই তা করিতে পারিতেছে না। কাজেই, সুইটসারল্যাণ্ড আমাদের চোখে ধনী হইলেও, ঐ দিক্ হইতে তাদের নিজের মাপে দরিদ্র বটে।

এটাও ভাবিতে হইবে যে, এমন কোনো প্রকারের "ধন-বিতরণ"

নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, যাতে ধনের ভাগাভাগি চিরকালই সমান থাকিবে। ধন-বিতরণের যে প্রণালীই অবলম্বিত হোক্ না কেন, জাতিতে-জাতিতে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে ও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ধনের পার্থক্য, সুতরাং আপেক্ষিক দারিদ্র্য দেখা দিবেই দিবে। এই জন্য বলিয়াছি, দারিদ্র্য-সমস্যা চিরন্তন সমস্যা।

এই দারিদ্র্য সমস্যা যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। কৃষি-প্রধান দেশে ইহার মূর্ত্তি এক প্রকার। শিল্প-প্রধান দেশে এর মূর্ত্তি অন্য প্রকার। কৃষি-প্রধান দেশে দারিদ্র্য দেখা দেয়—দুভিক্ষরূপে। শিল্প-প্রধান দেশে দেখা দেয়—বেকারের মূর্ত্তিতে। কিন্তু দুভিক্ষই বল আর বেকারই বল, সমস্যা একই প্রকারের—মানুষ তার অভাব মিটাইতে যতটা সম্পদ্ চাহিতেছে ততটা পাইতেছে না।

প্রঃ—তাহা হইলে কি আপনি বলিতে চান যে, মানুষের নিতান্ত আবশ্যক জিনিষ কোন্‌গুলা, তার ধারণা মানুষের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই বদ্‌লাইবে ?

উঃ—হাঁ, তাই। পঞ্চাশ বছর আগে যে সব জিনিষের অভাবকে দারিদ্র্য বলা যাইত, এখন মানুষ তার চেয়েও অনেক বেশী জিনিষ চায়, যার অভাবে সে নিজেকে দরিদ্র মনে করে। আজ যা পাইলে মানুষ নিজেকে দরিদ্র মনে করে না ভবিষ্যতের মানুষ তাহা পাইয়াও সন্তুষ্ট থাকিবে না। কাজেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা-বৃদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির উপায়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কি-কি জিনিষ না পাইলে একজন মানুষকে গরীব বলা হইবে, তার তালিকাও ক্রমাগত বদ্‌লাইতে থাকিবে।

প্রঃ—বেকার-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ভবিষ্যতে কি রকম রূপ লইবে মনে হয় ?

উঃ—শিল্প ও যন্ত্রপাতির ক্রমাগত পরিবর্ত্তন আর উন্নতি হইতেছে ও

হইবে। তার ফলে আজ যারা চাকরীতে আছে, কাল তারা চাকরী হারাইবে। কিন্তু দিন কতক বাদে হয়তো তাদের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ জুটিয়া যাইবে। সুতরাং, শিল্প-জীবনের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সঙ্গে বেকার-সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই জন্য, ভবিষ্যতে প্রত্যেক দেশই বেকারদের কষ্ট-নিবারণ করা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলিয়া মানিয়া লইবে। বেকার-সমস্যার সকল কথা বিশদরূপে বুঝিবার জন্য প্রত্যেক গভর্মেণ্টই একটি বিশেষ শাসন-বিভাগ খুলিতে বাধ্য হইবে এবং সেই বিভাগ এক বেকার-মন্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। বেকার-মন্ত্রীর কর্ত্তব্য হইবে সমসাময়িক অবস্থা বুঝিয়া বেকার-সমস্যার সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য "প্ল্যান" বা কর্ম্ম-কৌশল তৈরী করা, আর সেই "প্ল্যান" কার্য্যে পরিণত করা।

প্রঃ—যতদূর বুঝিতেছি আপনার ত' মত এই যে, পশ্চাদ্‌পদ্‌ দেশগুলায় বর্ত্তমানে যে শিল্প-বিপ্লব চলিতেছে, তার ফলে জার্ম্মাণি বিলাত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ পশ্চাৎপদ্‌ দেশগুলাতে ফ্যাক্টরী খাড়া করিবার জন্য যন্ত্রপাতি তৈরী করিবে, অথবা যে সব মাল উৎপাদনে এমন পটুতা দরকার যা পশ্চাৎপদ দেশগুলার নাই, সেই সব মাল উৎপন্ন করিবে। কিন্তু এমন একদিন ত' আসিবেই যখন পশ্চাৎপদ্‌ দেশগুলাও কল-কারখানা আর যন্ত্রপাতি নিজ নিজ দেশে তৈরী করিতে পারিবে, উচ্চ শ্রেণীর ভোগ্য-দ্রব্যও নিজ-নিজ দেশে তৈরী করিবে। তখন অগ্রবর্ত্তী ও পশ্চাৎপদ্‌ দেশগুলার আর্থিক সম্বন্ধ কেমন দাঁড়াইবে ?

উঃ—আমার মনে হয়, ততদিনে, যে-সব দেশ আজ দুনিয়ায় সব চেয়ে অগ্রসর, তারা আরও এক ধাপ আগাইয়া যাইবে। কাজেই,

দুনিয়ায় অগ্রগামী ও পশ্চাৎপদ্ দেশগুলা আজ যতটা আগু-পিছু আছে,—ভবিষ্যতে প্রত্যেক শ্রেণীর দেশগুলাই অধিকতর উন্নত হইলেও তাদের এই আগু-পিছু সম্বন্ধ মোটামুটি যে-কে-সেই থাকিয়া যাইবে। ব্যতিরেকও অসম্ভব নয়। যথা, জাপান হয়ত কোনো-কোনো অগ্রগামী দেশের সমান হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু মোটের উপর দুই শ্রেণীর দেশের আপেক্ষিক প্রভেদ লুপ্ত হইবে না। কিন্তু, এমনই যদি হয় যে, পশ্চাৎপদ্ দেশগুলা দুনিয়ার বর্ত্তমান শীর্ষস্থানীয় দেশগুলার নাগাল ধরে,—তা হইলেও, দুনিয়ার আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তান্বিত হইবার কোনো কারণ নাই। দুনিয়ার সব দেশগুলা একই আর্থিক ধাপে যদি বা উন্নীত হয়, তাহা হইলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশগুলার কৃষি-শিল্পের অধিকতর উন্নতি হইবে এবং প্রত্যেকেরই কিনিবার ও বেচিবার শক্তি অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং, দুনিয়ার আমদানি-রপ্তানির পরিমাণও ঢের বাড়িবে। এটা বিলাত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণি—এই তিন পয়লা নম্বরের দেশের উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। এই তিনটা দেশ আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের হিসাবে প্রায় একই ধাপে অবস্থিত। তা সত্ত্বেও, এই কয়টা দেশ আর্থিক হিসাবে মোটেই স্বাবলম্বী নয়। এদের প্রত্যেকটাই অপরটার মাল যথেষ্ট পরিমাণে হজম করে, আর এইরূপ বিদেশী মালের পরিমাণ কম্‌তির দিকে নয় বাড়্‌তির দিকেই আছে। এই দেশ তিনটা যার পর নাই পরস্পর-সাপেক্ষ। আর এই পরস্পর-সাপেক্ষতা ৫০।৭৫ বৎসর ধরিয়া হামেশা বাড়িয়াই চলিয়াছে। *খাঁটি* আর্থিক স্বাধীনতা কাহারও নাই। তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বহরে নেহাৎ জাম্ভূমান বলিয়া এই মুল্লুকে পরনির্ভরতা খানিকটা কম।

প্রঃ—তাহা হইলে আজকালকার পশ্চাৎপদ্ দেশগুলা যদি আর্থিক

হিসাবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশগুলার সমকক্ষ হয়, তবে তাদের ভয় করিবার কিছু নাই ?

উঃ—তাহাতে অগ্রবর্ত্তী দেশগুলার ভয়ের কারণ ত নাইই, বরং তাহাদের পক্ষে এই অবস্থা পরম আনন্দের কথা। কারণ, পশ্চাৎপদ্ দেশগুলা গরীব বলিয়াই অগ্রবর্ত্তী দেশগুলা নিজ নিজ সমৃদ্ধি আরও বাড়াইতে পারিতেছে না। যদি পশ্চাৎপদ্ দেশগুলা আরও ধনী হয় তবেই অগ্রগামী দেশগুলা পশ্চাৎপদ্ দেশগুলাতে আরও বেশী মাল বেচিতে পারিবে ও তার ফলে আরও ধনী হইতে পারিবে। সুতরাং অগ্রগামী দেশগুলা নিজদের স্বার্থ-পুষ্টির জন্যই পশ্চাৎপদ্ দেশগুলাকে আরও ধনী করিয়া তুলিতে বাধ্য হইবে।

প্রঃ—রুশিয়ার বর্ত্তমান আর্থিক নীতি সম্বন্ধে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রুশিয়া বর্ত্তমানে পাঁচ বছরের "প্ল্যান" করিয়া দেশটাকে যে রাতারাতি শিল্প-প্রধান করিয়া তুলিতেছে তার ফলে অন্যান্য দেশের স্বার্থে বিশেষ আঘাত লাগিবে মনে হয় কি ?

উঃ—না। এই কথাটা ভাল করিয়া বোঝা দরকার যে, ভারতে, চীনে, বল্কান অঞ্চলে, দক্ষিণ আমেরিকায় যে ধরণের শিল্প-বিপ্লব চলিতেছে, রুশিয়াতেও ঠিক সেই ধরণের শিল্প-বিপ্লবই "বর্ষ-পঞ্চকে"র মারফৎ অর্থাৎ পাঁচ বছরের "প্ল্যানে"র ভিতর দিয়া অত্যন্ত দ্রুতভাবে চালানো হইতেছে। তা ছাড়া, ভারত চীন ইত্যাদিতে শিল্প-বিপ্লব চলিতেছে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ও বেসরকারী চেষ্টার ফলে, কিন্তু রুশিয়ার আর্থিক পরিবর্ত্তন চলিতেছে রাষ্ট্রশক্তির প্রবল উদ্যমের ফলে। তবে উন্নতির গতি-বেগ এবং প্রধান চেষ্টার উৎস বিভিন্ন হইলেও, উন্নতির পথটা এবং যাত্রার লক্ষ্য একই। রুশিয়া, ভারত, চীন—কোনো দেশই আর কৃষিপ্রধান থাকিতে চায় না। সকলেই শিল্পপ্রধান হইতে চায়।

বিলাত, জার্ম্মাণি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবে প্রবেশ করিয়াছে, ভারত ও চীনের মতন রুশিয়াতেও প্রথম শিল্প-বিপ্লব চলিতেছে। দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় দেশগুলা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যই, আরও জোরের সহিত দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে। কাজেই রুশিয়ার শিল্প-বিপ্লব মানেই যে অন্য দেশগুলার স্বার্থের সঙ্গে আঘাত তা মোটেই নয়। বরং, রুশিয়ার উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িলে রুশিয়া আরও বেশী মাল-পত্র কিনিবে। এখনই দেখা যাইতেছে যে, রুশিয়া খুব মোটা টাকার কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করিতেছে আর সারা দুনিয়া ছাঁকিয়া বড়-বড় ওস্তাদদের মোটা-মোটা মাহিয়ানা দিয়া রুশিয়াতে মোতায়েন করিতেছে।

প্রঃ—গ্রিন্‌কো (ইনি রুশিয়ার "গস্ প্ল্যানে"র সহকারী সভাপতি) তাঁহার "ফাইভ্-ইয়ার প্ল্যান" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, রুশিয়াকে মালপত্র সম্বন্ধে কোনো দেশের উপরই যেন নির্ভর করিতে না হয় এই লক্ষ্য মাফিক তাহার আর্থিক জীবন গড়িয়া তোলা হইতেছে। রুশিয়া তাহার আর্থিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে অথবা অনেকটা স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবে। এটা কি সম্ভব ?

উঃ—না। একটা কথা দিয়া বুঝাইতেছি। ভারতেও "স্বদেশী" যুগ হইতে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা চলিতেছে। তাহা সত্ত্বেও, ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাড়িয়া গিয়াছে এবং ভারত আর্থিক হিসাবে আরও পর-নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। তেমনি, রুশিয়াতে যে আর্থিক হিসাবে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা চলিতেছে তাহার অর্থ উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানো। আর তার মানেই বাহির হইতে মাল কিনিবার ক্ষমতা, সুতরাং মাল-কেনা বাড়ানো। বিলাত, জার্ম্মাণি ও আমেরিকার বাণিজ্য-সম্বন্ধটা আবার স্মরণ করা আবশ্যক। আর্থিক হিসাবে

স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টাটা আদর্শ হিসাবে ভাল,—কারণ তার ফলে আর্থিক উন্নতি আরও দ্রুত হয়। তবে ঐ স্বাবলম্বনের দর্শন বা আদর্শ ই প্রত্যেক দেশকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য। একটা দেশ যতই স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করে, ততই অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার আর্থিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর ও নিবিড়তর হইয়া ওঠে। আগেই বলিয়াছি, বিলাত, জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশেও এইরূপ পর-নির্ভরতা হামেশা বাড়িয়া চলিয়াছে। চীন, ভারত, রুশিয়া ইত্যাদি দেশেও সেই পর-নির্ভরতাই বাড়িয়া চলিয়াছে ও চলিবে। আর্থিক জীবনে কোনো দেশের কপালেই স্বাবলম্বন আর স্বাধীনতা নাই। আছে সর্ব্বত্র পরস্পর-সাপেক্ষতা। ইহাকেই আমি বলি "ওয়ার্ল্ড্-ইকনমি" বা বিশ্ব-দৌলতের ব্যবস্থা।

(গ) আর্থিক পুনর্গঠন ও লক্ষ্য মাফিক মোসাবিদা

প্রঃ—দুনিয়াব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগ কাটিবার সম্ভাবনা কিরূপ দেখিতেছেন? দুনিয়ায় "আরোগ্য" লাভ সুরু হইবে কবে?

উঃ—এই বৎসর (১৯৩৩) মার্চ্চ মাসে বলিয়াছিলাম যে, এই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে ইয়োরোপে মন্দা কাটিতে সুরু করিবে,—অর্থাৎ মূল্য-বৃদ্ধির সূত্রপাত দেখা যাইবে। আর আগামী পূজায় (১৯৩৪) বাংলাদেশের পাটের দরবৃদ্ধি আশা করা যায়। তাহার কিছু-কিছু আভাষ এই বৎসরের শীতকালেই পাওয়া যাইবে।

দেখিতে দেখিতে এই ভবিষ্য-বাণী ফলিতে চলিল। ইয়োরোপের

নানা দেশে মূল্যবৃদ্ধি সুরু হইয়াছে। এমন কি ভারতেও কৃষিজাত ও অন্যান্য দ্রব্যের দাম বাড়তির পথে চলিতেছে। জার্ম্মাণির হিসাব দেখাইতেছি। ১৯৩৩ সনের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত নানা সূচী-সংখ্যা প্রকাশ করা যাইতেছে। ১৯১৩ সনের সূচীকে ১০০ ধরিলে ১৯৩৩ সনের বিভিন্ন মাসে সূচী কতখানি ছিল তাহাই দেখাইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে মাসের পর মাস সূচীটা কতখানি উঠিতেছে বুঝা যাইবে। ছয় প্রকার সূচী দেখানো গেল—

	সকল জিনিষের সংহত পাইকারী দর	কৃষিজাত দ্রব্যের দর	শিল্পের জন্য কুদরতি মালের দর	শিল্পজাত দ্রব্যের দর	যন্ত্রপাতির দর	ভোগ্য দ্রব্যের দর
এপ্রিল	৯০'৭	৮১'৮	৮৭'০	১১১'৩	১১৪'১	১০৯ ২
মে	৯১'৯	৮৪'২	৮৭'৮	১১১'৬	১১৩'৯	১০৯'৯
জুন	৯২'৯	৮৫'১	৮৯'২	১১২'১	১১৩'৯	১১০'৮
জুলাই	৯৩'৯	৮৬'৬	৮৯'৯	১১৩'০	১১৪'০	১১২'২
আগষ্ট	৯৪'২	৮৭'৭	৮৯'৬	১১৩'৪	১১৪'১	১১২'৮
সেপ্টেম্বর	৯৪'৯	৮৯'৯	৮৯'২	১১৩'৬	১১৪'১	১১৩'২
অক্টোবর	৯৫'৭	৯২'৭	৮৮ ৯	১১৩'৮	১১৪'০	১১৩'৭

দেখা যাইতেছে যে, সকল খাতেই সূচী-সংখ্যা অল্পবিস্তর বাড়িতেছে। একটা মজার কথা এই যে, জার্ম্মাণিতে স্বর্ণমান পূরাপূরি বজায় আছে। পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ টাকার দর সোণার মাপে বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। অর্থাৎ সিক্কার দর না কমাইয়াও

জিনিষের দর বাড়ানো অসম্ভব নয়। ইতালি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশেও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অথচ ঐ সকল দেশেও সিক্কার দর কমে নাই।

প্রঃ—আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য মার্কিণ সরকার কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছে?

উঃ—এই মন্দা কাটাইয়া উঠিবার জন্য ১৯৩২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রিকন্‌ষ্ট্র্যাক্‌শ্যন ফিনান্স কর্পোরেশ্যন (পুনর্গঠন পুঁজি-প্রতিষ্ঠান) কায়েম করে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ দেশের বিভিন্ন কৃষিশিল্পবাণিজ্যের কারবারে টাকা সাহায্য করা। ১৯৩৩ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ নানা কারবারে যত টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে নিম্নে তাহার ফিরিস্তি দেওয়া হইল:—

ক। পুনর্গঠন-পুঁজি প্রতিষ্ঠান বিষয়ক আইনের পঞ্চম ধারা অনুসারে প্রদত্ত কর্জ্জ	কত পরিমাণ কর্জ্জ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে	কত পরিমাণ কর্জ্জ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক দেওয়া হইয়াছে
	(ডলার)	(ডলার)
১। ব্যাঙ্ক ও ট্রাষ্ট কোম্পানী	১,২৩৯,৩৯২,২২৩	১,০৩৫,০৮০,৪১৮
২। গৃহনির্ম্মাণ কোম্পানী	১১০,০৭৩,৬৩৬	১০৪,০৬৬,২৯১
৩। বীমা কোম্পানী	৯২,৮২৮,০৬৩	৭৮,৯৩৫,৬৩১
৪। বন্ধকি কর্জ্জ কোম্পানী	১৩৩,৫৬০,৪৩৭	১২৮,৮২৯,১৭৪

৫।	কর্জ্জ সঙ্ঘ	৪৯২,০০১	৪৪৯,৬৫৩
৬।	ফেডার‍্যাল ভূমি ব্যাঙ্ক	৩০,৫০০,০০০	১৮,৮০০,০০০
৭।	জয়েণ্টষ্টক ভূমি ব্যাঙ্ক	১১,২৯২,৮২৩	৫,৩২২,৯৭৪
৮।	ফেডার‍্যাল দীর্ঘ কর্জ্জ প্রতিষ্ঠান	৯,২৫০,০০০	৯,২৫০,০০০
৯।	কৃষি কর্জ্জ প্রতিষ্ঠান	৪,৪০৪,৩০৭	৩,৮৫৯,৯৫০
১০।	মফঃস্বলের কৃষি কর্জ্জ প্রতিষ্ঠান	৬৫,০৯৭,৫৯৬	৫৮,৬১৪,৬২৯
১১।	পশু কর্জ্জ প্রতিষ্ঠান	১৩,৩১৩,৩০৩	১১,৯২৮,৫৩৯
১১।	রেল পথ	৩৬৫,৭৮২,৮৪৩	৩৩১,১৯৭,৮৮৮
	মোট	২,০৭৫,৯৮৬,৮৩১	১,৭৮৫,৩১৫,১২০

খ। ১৯৩২ সনের
জরুরি সাহায্য
বিষয়ক আইন
অনুসারে প্রদত্ত

১।	২০১ ধারা মাফিক সাহায্যের ব্যবস্থা	১৯৭,৯৭৮,৪১৫	২০,৬৮৪,০০০
২।	কৃষিজাত দ্রব্য ও পশুপালন	৫৫,৫৫৫,৭২৩	১,৬৫১,৫৯৭

৩। বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য সাহায্য	২৪২,৪৯১,২০০	২০১,৩৭৪,১৯২
মোট	৪৯৬,০২৫,৩৩৮	২২৩,৭০৯,৭৭৮
গ। ১৯৩৩ সনের ৯ মার্চ্চ তারিখের জরুরি ব্যাঙ্ক-বিষয়ক আইন অনুসারে প্রদত্ত কর্জ্জ		
১। ব্যাঙ্ক ও ট্রাষ্ট কোম্পানীর পক্ষপাতমূলক পুঁজির উপর কর্জ্জ	১,২৫০,০০০	২৫০,০০০
২। ব্যাঙ্ক ও ট্রাষ্ট কোম্পানীর পক্ষপাতমূলক পুঁজির জন্য চাঁদা	১৩,৬৮২,৫০০	১২,৫০০,০০০
মোট	১৪,৯৩২,৫০০	১২,৭৫০,০০০
ক, খ ও গ মোট	২,৫৮৬,৯৪৪,৬৬৯	২,০২১,৭৭৪,৮৯৮

দেখিতেছি যে, আমেরিকায় আর্থিক মন্দা কাটাইয়া উঠিবার জন্য গবর্মেণ্টের তহবিল হইতে চোদ্দ মাসে ২,০২১,৭৭৪,৮৯৮ ডলার কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছিল। তখনকার সিক্কার হিসাবে (এক ডলারে প্রায় ২৷০) ৪,৫০০,০০০,০০০৲। প্রায় ৪৫০ কোটি ভারতীয় টাকা গবর্মেণ্ট দেশের নানা কারবারে ঢালিয়াছিল। আরও ঢালিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ইহার নাম "আর্থিক পুনর্গঠনের" তোড়জোড়। মন্তরের জোরে মন্দা কাটে না। লক্ষ্য মাফিক আর্থিক ব্যবস্থা বা মোসাবিদা ("ইকনমিক প্ল্যানিং") পয়সার খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকন্তু এই খেলাটা সরকারী টাকার তোড়া লইয়া লুফালুফি করা। ইহার ভিতর বক্তৃতা বা "পরিকল্পনা"র আধ কাঁচ্চাও নাই। আছে নিরেট সরকারী শাসন আর সরকারী পয়সা। সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বা কমিউনিজ্‌মের এ এক নয়া মূর্ত্তি।

প্রঃ—বিলাতী ব্যবসাবাণিজ্যেও সরকারী সাহায্য কিছু আছে কি?

উঃ—বিলাতে বেকার-সংখ্যা কমাইবার জন্য সরকারী খাজাঞ্চিখানা খোলা রহিয়াছে। যত উপায়ে সম্ভব বিলাতী শিল্প-বাণিজ্যে টাকা সাহায্য করা একালের বিলাতী গবর্মেণ্টের অন্যতম বড় ধান্ধা। সরকারী টাকা খরচ করা হইয়াছেও বিস্তর। নীচে কিছু হিসাব দেওয়া যাইতেছে।

১৯২৯ সনে "ডেভেলপমেণ্ট অ্যাক্‌ট" বা শিল্পবাণিজ্যের পুষ্টিসাধন বিষয়ক আইন পাশ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে কারবারগুলা যাহাতে বাজারে কর্জ্জ পায় তাহার ব্যবস্থা করা, আর প্রয়োজন হইলে এই কর্জ্জের জন্য জামিন থাকা গবর্মেণ্টের এক বড় কাজ। তাহা ছাড়া কারবারগুলাকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করাও অন্যতম কাজ। এই আইন দুই অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে কত খরচ হইয়াছে তাহার একটা হিসাব দেওয়া যাইতেছে।

ক সার্ব্বজনিক হিত বিষয়ক কারবার	আনুমানিক খরচের পরিমাণ	গবর্মেণ্টের মঞ্জুর করা কর্জ্জের পরিমাণ
	পাঃ	পাঃ
১। রেলওয়ে কোম্পানী	৭,০৩৪,৯৫৩	২,২১৩,৯৫৬
২। গ্যাস কোম্পানী	৫৮৬,৩৩৯	১২৬,৬৩৫
৩। জলের কল	২৩,৪২২	৭,৯৭০
মোট	৭,৬৪৪,৭১৪	২,৩৪৮,৫৬১

খ। বেকারনিবারণের জন্য সাহায্য। যে সকল কারবারে বার মাসের বেশীকাল ধরিয়া শতকরা দশজন লোক বেকার, সেই সকল কারবার এই আইন অনুসারে সাহায্য পাইবার যোগ্য।

কারবারের নাম	আনুমানিক খরচ	গবর্মেণ্টের মঞ্জুর করা কর্জ্জ
১। যে সকল কারবারে অন্য কারবার হইতে লোক চালান হইবার সম্ভাবনা :—		
	(পাঃ)	(পাঃ)
ক। লাভ জনক	৪,৬২৮,৯০৮	২,০৩৯,০০০
খ। লাভালাভ নিরপেক্ষ	১,৮৮৭,০০১	১,৯৩৭,০০০
২। যে সকল কারবারে অন্য কারবার হইতে লোক চালান হইবার সম্ভাবনা নাই :—		
ক। লাভ জনক	২,৫৫৯,৪৬৩	৮৫৭,০০০

খ। লাভালাভ নিরপেক্ষ		৩,১৪৭,৮৯০	২,০২০,০০০
৩। যে সকল কারবারের জন্য বিনা কর্জ্জে পুঁজি সংগৃহীত হয়		২৫০,৫২৫	১১৬,০০০
	মোট	১২,৪৭৩,৭৯০	৬,৯৬৯,০০০

"কলোনিয়াল ডেভেলপমেণ্ট অ্যাক্ট" নামে একটা আইন জারি হইয়াছে (১৯২৯)। তাহার বিধানে "কলনি", বিজিত দেশ আর লীগ অব নেশুন্‌সের "তদবিরে" পরিচালিত বৃটিশ জনপদসমূহকে ইংরেজের সরকারী টাকায় পরিপুষ্ট করা হইতেছে। এই জন্য বিলাতী গবর্ণমেণ্ট ফী বৎসর ১,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিতে অধিকারী। কলনি-সম্পর্কিত যে-কোনো ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য এই তহবিল হইতে কর্জ্জ পাওয়া যাইতে পারে।

সড়ক নির্ম্মাণ সম্বন্ধে দুইটা বড় মোসাবিদা আছে। একটাতে ৯,৫০০,০০০ পাউণ্ডের বরাদ্দ। আর একটায় ২৭,৫০০,০০০ পাউণ্ড খরচ হইবার কথা। পাঁচ বৎসরে এই পরিমাণ টাকা খরচ হইবে।

বিলাতী গবর্ণমেণ্ট আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজের গাঁট হইতে টাকা ছাড়িয়া কৃষিশিল্পবাণিজ্যের সহায় হইয়াছে। যেটুকু হিসাব দেওয়া হইল তাহাতেই দেখিতেছি প্রায় ৪৫,০০০,০০০ পাউণ্ডের ফর্দ্দ। অর্থাৎ প্রায় ৬০ কোটি ভারতীয় টাকার মামলা। মন্দা কাটাইয়া উঠিতে হইলে নুন-তেল বেশ-কিছু খরচ হয়। ইহাই হইল একালের "ইকনমিক প্ল্যানিং" এর অ, আ, ক, খ।

সমাজ-তন্ত্র, পুঁজিনিষ্ঠা ও দেশোন্নতি*

প্রঃ—সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে নানা আপত্তির কথা তোলা হ'য়ে থাকে। তার মধ্যে একটা বিশেষ আপত্তি হচ্ছে এই যে, এটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী,—অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রমূলক সমাজে যতটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, সোশ্যালিজ্‌ম্‌-ও কমিউনিজ্‌ম্‌-শাসিত সমাজে ততটা সম্ভব নয়। এই কথাটা কতদূর সত্য?

বিশ্বব্যাপী সমাজ-তন্ত্র

উঃ—এই প্রশ্নের উত্তর অনেকটা নির্ভর করছে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ও কমিউনিজ্‌ম্‌ বল্‌তে কি বুঝা যায় তার ওপর। সমাজতন্ত্রবাদ বল্‌লে নানা প্রকার সরকারী আইন-কানুনের সাহায্যে দেশের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য নরনারীর আর্থিক জীবনকে "শাসন" করা বোঝাতে পারে। অথবা রাষ্ট্র বা সমাজ যে দেশের ধনসম্পদের "মালিক" তাও বোঝাতে পারে। যদি সমাজ-তন্ত্রবাদ মানে প্রথম অর্থটাই ধরা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে যে, আধুনিক পুঁজিতন্ত্র-শাসিত নানা দেশেও অসংখ্য আইনকানুন জারি হয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্ব করা। কাজেই এই দিক্‌ থেকে দেখ্‌লে স্বীকার কর্‌তে হবে যে, সমাজতন্ত্র-নীতির প্রভাব তথা-কথিত

*"আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত মোলাকাৎ (ফাল্গুন ১৩৪০, ভাদ্র ১৩৪১, ফেব্রুয়ারী ও আগষ্ট ১৯৩৪),। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রমোহন মৌলিক ইত্যাদি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ও "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ-"পরিষদের গবেষকগণের সঙ্গে নানা আলোচনার সারমর্ম্ম।

পুঁজিতন্ত্রশাসিত দেশেও যথেষ্ট। আর যদি সমাজতন্ত্রকে দ্বিতীয় অর্থে ধরা যায়, তা হ'লে এই ধরণের সমাজতন্ত্রবাদ দেখা যায় "খানিকটা" একমাত্র রুশিয়ায়। কিন্তু সেখানেও কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খুব বেশী খর্ব্ব করা হয়েছে? রুশিয়াতে ফ্যাক্টরীগুলা সরকারী সম্পত্তি বটে। কিন্তু রুশিয়া এখনও কৃষি-প্রধান দেশ, কাজেই কলকারখানা বা ফ্যাক্টরী রুশিয়ার মোট ধনসম্পদের কতটুকু অংশ? চাষীদের জমি সরকারী সম্পত্তি করে ফেলবার চেষ্টা হয়েছিল বটে। কিন্তু, চাষীদের জমিতে হাত দেওয়া মানেই,—ভীমরুলের চাকে কাঠি দেওয়া। সেই জন্য রুশিয়াতে জমি এখনও চাষীদেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

প্রঃ—কিন্তু রুশিয়াতে সরকারী কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা ও বহর বাড়্ছে না কি?

উঃ—তা সত্য। কিন্তু তা থেকে এই বুঝ্লে চল্বে না যে, চাষীদের সমস্ত জমিকে সরকারী জাতীয় সম্পত্তি করা হয়েছে। বরং,চাষীদের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তারা যাতে সমবায়-প্রণালীর সাহায্যে চাষের কাজে কলকারখানার সাহায্য নিতে পারে তার ব্যবস্থা বাড়্ছে। রুশিয়াতে সরকারের নিজ তাঁবে অনেক কৃষিক্ষেত্র আছে এবং তার বহর বাড়্ছে একথা সত্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, চাষীদের জমির উপর যে ব্যক্তিগত অধিকার আছে, তা লোপ করা হয়েছে। জার্ম্মাণির বার্লিন সহরে যত ক্ষেত-বাগান-বাগিচা আছে, তা জগতে কোন জমিদারের আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু, তার জন্য কি বল্তে হবে যে বার্লিনের "সকল" জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা হয়েছে?

প্রঃ—আচ্ছা ধ'রে নেওয়া গেল যে, রুশিয়ায় নরনারীর সমগ্র ধনসম্পদ্ সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হয় নি। সেখানে দেশের সমস্ত জমিও যে

সরকারের অধিকারে আসে নি, তাও মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু, তার সঙ্গে-সঙ্গে কি এটাও মানা চলে যে, সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব হয় নি, অথবা পুঁজিতন্ত্রশাসিত দেশে যতটা স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তা সেখানে পাওয়া যায়?

উঃ—রুশিয়াতে যখন সমগ্র ধন-সম্পদ্ জাতির সম্পত্তিতে পরিণত হয় নি, ব্যক্তিগত সম্পত্তিও যখন সেখানে রয়েছে তখনই বুঝ্‌তে হবে যে, সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও অবকাশ আছে। বস্তুত, ১৯৩৪ সনে,—প্রথম "বর্ষ-পঞ্চকে"র পর,—স্তালিনের ব্যবস্থায় পুঁজি-তন্ত্রশীল দেশের অনেক-কিছুই সোভিয়েট রুশিয়ায় মজুত দেখ্‌তে পাচ্ছি। অপর দিকে, আগেই বলেছি, পুঁজিতন্ত্রশাসিত দেশগুলাতেও দেশের মঙ্গলের জন্য এমন সব আইনকানুন সকল সময়েই তৈরী হচ্ছে যার ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়।

আধুনিক আর্থিক জীবনে "র‍্যাশন্যালিজেশন" বা যুক্তি-যোগ একটা বড় কথা। এর মানে হচ্ছে, বিভিন্ন ফ্যাক্টরীকে বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিষ উৎপাদনে নিযুক্ত করা, অথবা যেগুলা নিতান্ত অনুপযুক্ত সেগুলাকে বন্ধ ক'রে দেওয়া, উন্নততর কলকব্জার প্রয়োগ করা, মাল কেনা-বেচার উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করা,—এই রকমে নানা উপায়ে খরচ কমানো। এই "র‍্যাশন্যালিজেশন" যেমন পুঁজিতন্ত্রশাসিত দেশে দেখা দিয়েছে, তেমন সমাজতন্ত্রবাদের দেশ রুশিয়াতেও দেখা দিয়েছে। আর "র‍্যাশনালিজেশনের" অর্থই হচ্ছে ফ্যাক্টরী বা ফার্ম্মগুলার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,—কমই হোক্ বা বেশীই হোক্,—লোপ করা। এ দিক থেকে দেখ্‌লেও বোঝা যাবে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হ্রাস বা লোপের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই। সকল প্রকার "তন্ত্রে"ই যুক্তি-যোগ চল্‌ছে। আজকাল "ইকনমিক প্ল্যানিং"

(বা লক্ষ্যমাফিক আর্থিক মোসাবিদা) কথাটার রেওয়াজ বেশ বেড়েছে। এর ভিতরকার কথা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপ সাধন। আর এই ধরণের মোসাবিদায় "সোশ্যালিষ্ট", "ক্যাপিট্যালিষ্ট" ইত্যাদি সকল মিঞাই সমান অগ্রসর।

আর এই সম্পর্কে আর একটা কথাটাও জানা দরকার যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এমন একটা-কিছু বড় জিনিষ নয় যে, যদি কখনও তার খর্ব্বতা সাধন করতেই হয়, তার জন্য বিশেষ দুঃখিত হতে হবে। যে-সব জিনিষ সমাজের মঙ্গলের জন্য দরকার, তা যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছু খর্ব্ব করেও করতে হয়, তাতে ত' বিশেষ কিছু আপত্তির কথা দেখি না।

ওয়েন, সাঁ-সিমোঁ ও মার্ক্স্

প্রঃ—সমাজতন্ত্রনীতির প্রচারে দুনিয়ায় অগ্রণী কারা?

উঃ—এই সম্পর্কে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ইংরেজ রবার্ট ওয়েন ও ফরাসী সাঁ-সিমোঁ। প্রত্যেক দেশেই দেখতে পাই যে ধনীদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁদের প্রাণ গরীবের দুঃখে কাঁদে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকব্জা ও বাষ্পের সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালনার ব্যবস্থা হ'লো। তার ফলে ফ্যাক্টরীর আবির্ভাব। প্রথম যুগের ফ্যাক্টরী-পতিরা নিজ-নিজ লাভের লোভে গরীব মজুরদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করত ও নির্দ্দয়ভাবে তাদের খাটাত। এইসব গরীবদের দেখে ওয়েন ও সাঁসিমোঁর প্রাণ কেঁদেছিল। তাঁরা সেই দুঃখে যে-সব মতামত প্রচার করেন সেও একপ্রকার সমাজতন্ত্রবাদ বটে। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারায় ভাবুকতাই ছিল প্রচুর। "বৈজ্ঞানিকতা"র ভাগ যুক্তির হিস্যা কথঞ্চিৎ কম ছিল। এই জন্য তাঁদের মতবাদকে একালে

আখ্যা দেওয়া হয়েছে "রোমান্টিক সোশ্যালিজম্" অর্থাৎ ভাবনিষ্ঠ সমাজতন্ত্র। শব্দটা অবশ্য কার্ল্ মার্কসের গড়া।

প্রঃ—এঁদের মতে আর কার্ল মার্ক্সের মতে পার্থক্য কি?

উঃ—কার্ল মার্ক্স্ও গরীবদের প্রতি অপার সহানুভূতি নিয়ে জন্মে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুড়োটা রবার্ট ওয়েন ও সাঁ-সিমোঁ হ'তে বিভিন্ন ধাতুতে গড়া। গরীবদের অবস্থার উন্নতি আবশ্যক, কিন্তু তার জন্য তারা ধনীর সাহায্যে বা সহানুভূতির দিকে চেয়ে থাক্‌বে,—এটা তাঁর কাছে অসহ্য হ'লো। তিনি চাইলেন যে গরীবরা নিজেদেরই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠুক। গরীবদের মধ্যে এই স্বাবলম্বনের ভাব জাগাবার জন্য তিনি একটা সুযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ সৃষ্টি করবার জন্য উঠে প'ড়ে লাগলেন। আধুনিক ধনোৎপাদন ও ধনবিতরণ প্রণালীর বিশ্লেষণ ক'রে তিনি কয়েকটা সূত্র বার করলেন। প্রথমতঃ, তিনি বল্‌লেন যে, যা কিছু উৎপন্ন হয় তা মজুরদেরই শ্রমের নামান্তর। এটাকে বলা হয় "লেবার থিওরি অব্ ভ্যালিউ"। দ্বিতীয়তঃ তিনি বল্‌লেন যে, মজুরেরা নিজ মেহনতের মূল্যস্বরূপ যা পায় তার চেয়েও খানিকটা বেশী মাল উৎপন্ন হয়। একে বলা হয় 'থিওরি অব্ সারপ্লাস ভ্যালিউ।' তৃতীয়তঃ তিনি বল্‌লেন যে বর্ত্তমানের ধন-বিতরণের প্রণালীই এমন যে, যারা প্রকৃত ধনোৎপাদক তারা তাদের মেহনতের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের খুব কম অংশই পায়, আর যারা জমিজমা কলকব্জা বা টাকাকড়ি থাকার জন্য মজুরদের ওপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌ছে তারাই মজুরদের শ্রমের অধিকাংশ ফলটা ভোগ করছে। সুতরাং তাঁর মতটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সমাজে দুই শ্রেণীর লোক আছে। তার মধ্যে এক-দল খেটে ধনসম্পদ্ উৎপন্ন করছে আর এক দল তার ফলভোগ ক'রছে। প্রথমোক্ত দলকে বলা হয় মজুর, অপর দল হচ্ছে পুঁজিপতি প্রভৃতি

সম্পত্তিওয়ালাদের দল। মার্ক্সের মতে এই দুই শ্রেণীর লোক পরস্পরের চিরশত্রু। ব্যক্তি হিসাবে এরা যতই ভাল হ'ক্, বর্ত্তমান ধন-বিতরণের প্রণালীটাই এত জঘন্য যে, এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ঘট্‌তে বাধ্য। এরই মানে হচ্ছে "ক্লাস-ওয়ার" (বা শ্রেণী-বিবাদ) অর্থাৎ জাতে-জাতে লড়াই।

প্রঃ—বর্ত্তমানের এই অবস্থার প্রতীকার সম্বন্ধে মার্ক্স কি বলেন?

উঃ—এ সম্বন্ধে মার্ক্সের মতামত বুঝতে হ'লে রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর মনোভাব বুঝ্‌তে হবে। আমরা রাষ্ট্র বল্‌তে কোনো দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বুঝে থাকি। মার্ক্সের রাষ্ট্র কিন্তু অন্য চীজ। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রটা সম্পত্তিয়ালা লোকদের বৈঠকখানা বিশেষ অথবা মনিব-শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমান ধনগত অসাম্যের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের শক্তি। রাষ্ট্রই এই অসাম্যটাকে বজায় রাখতে সাহায্য করছে। এইজন্য তিনি চান যে মজুরশ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে রাষ্ট্রটাকে দখল করুক। রাষ্ট্রটা মজুরদের হস্তগত হলেই ধনসাম্য বজায় রাখবার খুঁটি হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আর থাক্‌বে না। রাষ্ট্র তখন আপনা-আপনি শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যাবে। ইংরেজিতে ইহাকে বলে "দি ষ্টেট উইল উইদার এওয়ে।" এই সম্পর্কে মার্ক্স ঠিক "উইদার" কথাটির জার্ম্মাণ প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। এই হ'ল খাঁটি কমিউনিজ্‌ম বা "বিজ্ঞানসম্মত" সোশ্যালিজ্‌মের চরম মূর্ত্তি।

ফরাসী সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্

প্রঃ—"সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্" কথাটায় কিরূপ সমাজতন্ত্র বোঝায়?

উঃ—ফ্রান্সে মজুরসঙ্ঘগুলাকে বলা হয় "সঁ্যাদিকা"। সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ কথাটা "সঁ্যাদিকা" হ'তে উৎপন্ন। সিণ্ডিক্যালিজম্ ফরাসী-

দেরই নিজস্ব আবিষ্কার। সিণ্ডিক্যালিজমের মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, মজুর-মনিবের স্বার্থের দ্বন্দ্ব এত বেশী যে, মনিব-শ্রেণী মজুরদের অবস্থা ভাল কর্‌বে না, এবং কর্‌তে পারে না। সুতরাং সিণ্ডিক্যালিষ্টরা চায় মজুর-মনিবের প্রভেদ উঠিয়ে দিতে এবং মজুরদের দ্বারা মনিবদের সম্পত্তি দখল করাতে। এর জন্যে তারা প্রধানতঃ দুই পন্থা অবলম্বন করে। একটা হচ্ছে "সাবোতাজ", অর্থাৎ মনিবদের যন্ত্রপাতি কলকব্জা সাজ-সরঞ্জাম আসবাবপত্র ভেঙ্গেচুরে মনিবদেরকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করা। দ্বিতীয়টা হচ্ছে "জেনার‍্যাল্ ষ্ট্রাইক্" অর্থাৎ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, দেশের সঙ্ঘবদ্ধ মজুররা একই সঙ্গে একই দিনে ধর্ম্মঘট ক'রে দেশের আর্থিক জীবনকে কাবু ক'রে দেবে এবং তার ফলেই মনিবের দল মজুরদের কাছে জোড়-হাত হতে বাধ্য হবে।

প্রঃ—'সিণ্ডিক্যালিজ্‌মে' ত' তা হ'লে দেখছি কেবল ভাঙ্গা-চুরার ব্যবস্থা। মনিবদেরকে কি করে' জব্দ করা যায় এইটা বাৎলানোই দেখছি 'সিণ্ডিক্যালিজমের' প্রধান কথা। কিন্তু ভবিষ্যতের সমাজ কিরূপ হবে, তার আর্থিক বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা কি রকম থাকবে, সে সম্বন্ধে তাদের মতামত কেমন?

উঃ—ভবিষ্যতে সমাজের গড়ন কি রকম হবে, সে সম্বন্ধে 'সিণ্ডি-ক্যালিষ্ট'রা কোনো দর্শন গ'ড়ে তোলে নি। তারা নিছক বর্ত্তমানপন্থী ও বস্তুনিষ্ঠ। খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা কি ক'রে উন্নত করা যায়, এইটাই তাদের মাথায় খেলে, আর এই জন্যই তারা নানা উপায়ে মনিবের দলকে কাবু ক'রতে উদ্যত। 'শ্রেণীবিরোধ' অর্থাৎ মজুর-মনিবের লড়াই কথাটা তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এই জন্যই তারা সু বা কু, যে-কোনো উপায়েই হোক্, মনিবদের কাছ থেকে তাদের অধিকার আদায় কর্‌তে সচেষ্ট। তারা প্রধানতঃ ধ্বংসবাদী।

তাদের বিশ্বাস যে, সমাজে ঐরূপ মতবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাদের মতে মজুরমহলে সিণ্ডিক্যালিষ্টদের মত 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব না থাক্‌লে, তারা তাদের অবস্থা সহজে উন্নত ক'রতে পারবে না।

প্রঃ—রাষ্ট্রের প্রতি "সিণ্ডিক্যালিষ্টদের" মনোভাব কি রকম?

উঃ—"সিণ্ডিক্যালিজম্" নিছক আর্থিক মতবাদ। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় চিন্তার স্থান নেই। রাষ্ট্র আছে কি না সে বিষয়ে সিণ্ডিক্যালিষ্টদের মগজ খেলে না। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় শক্তির ওপর ওরা ত' নির্ভর করতে চায়ই না, বরং রাষ্ট্রকে ওরা গালাগাল দেয়, এমন কি ধ্বংসও ক'রতে চায়। রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চায় বটে, কিন্তু সেই ধ্বংসের পর ভবিষ্যতে কোনো বিশিষ্ট রকম রাষ্ট্র এরা গ'ড়ে তুলতে চায় না। মজুরদের আর্থিক উন্নতি এদের লক্ষ্য, আর তার জন্য এরা 'জেনার‍্যাল ষ্ট্রাইক', 'সাবোতাজ' প্রভৃতি অস্ত্র প্রয়োগ ক'রতে চায়। খাঁটি "সিণ্ডিক্যা-লিজ্‌ম্" রাষ্ট্র, রাষ্ট্রিক চিন্তা বা রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় কোন কারবারে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে আজকাল ফ্রান্সে একদল সিণ্ডিক্যালিষ্ট দেখা যাচ্ছে যারা "শাঁবর দ্য দেপুতে"তে ঢুকেছে। এ এক নতুন লক্ষণ। এই দল দেশের কলকারখানাগুলাকে রাষ্ট্রের বা নগর-সভার শাসনে আনবার চেষ্টা করছে।

জার্ম্মাণ ষ্টেট্-সোশ্যালিজ্‌মের দিগ্‌বিজয়

প্রঃ—ষ্টেট-সোশ্যালিজম্ বল্‌তে কি বোঝায়?

উঃ—কাল´ মার্ক্স´ যখন সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে নিজ মত জারি করলেন, তাঁর শিক্ষা পেয়ে জার্ম্মাণির মজুররা যখন হৈ চৈ সুরু করলে, তখন চতুর-চুড়ামণি বিসমার্ক ভাবলেন মহাবিপদ, এদের থামানো যায় কি করে? বিস্‌মার্কের মুড়ো থেকে একটা ফন্দি বেরুল,—

যাতে গরীবদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়, আর তারা বিপ্লবীদের দলে যোগ না দেয়। সেই ফন্দিটা কি? ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব প্রভৃতির সরকারী বীমা-ব্যবস্থা। এইরূপ বীমার ব্যবস্থা দুনিয়ায় প্রথম জাগে বিস্‌মার্কের মগজে। দুনিয়াতে হাজার বছর ধ'রে যা কোনো জাতের বা ব্যক্তির মাথা থেকে বেরোয় নি, তা হঠাৎ বিস্‌মার্কের মাথা থেকে কেন বেরুলো, তা বলা শক্ত। তবে, এইটুকু বলা যেতে পারে যে, কার্ল মার্ক্সের ও মজুরদের চাপই বিস্‌মার্ককে ভাবিয়ে তুলেছিল, আর তার জন্যই তাঁর মাথা থেকে ঐরূপ সমাজ-বীমার কথা বেরোয়। বারে বারে বিস্‌মার্ক বিসমার্ক বক্‌ছি। অবশ্য তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ মুড়োওয়ালা জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীদের সহযোগিতা এই ক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক। যাই হোক্, ষ্টেট্-সোশ্যালিজ্‌মের নানা অনুষ্ঠান এই রকমে বিস্‌মার্কের চেষ্টা থেকেই উৎপন্ন। রাষ্ট্রের সাহায্যে সমাজের আর্থিক উন্নতির চেষ্টাকেই ষ্টেট্-সোশ্যালিজম্ বলে। একে খাঁটি সোশ্যালিজম্ বলা চলতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ উঠতে পারে। কারণ এর প্রধান চেষ্টা হচ্ছে গরীবদের অবস্থা কিছু উন্নত করে' তাদের ভুলিয়ে রাখা। যাতে তারা বেশী লাফালাফি দাপাদাপি না করে সেই দিকেই ষ্টেট্-সোশ্যালিষ্ট্‌দের আসল নজর। মার্ক্‌স্-পন্থী সোশ্যালিষ্টরা ষ্টেট্-সোশ্যালিজম্‌কে এইরূপেই বিবৃত করে' থাকে।

বিস্‌মার্ক-প্রবর্ত্তিত পথেই এ কালের জার্ম্মাণ রাষ্ট্র,—মায় হিট্‌লারের গড়া "নাৎসি"-রাজও চল্‌ছে। বাস্তবিক পক্ষে আজকালকার বিলাতী রাষ্ট্র, জাপানী রাষ্ট্র, ইতালিয়ান রাষ্ট্র ইত্যাদি "বাঘা-বাঘা" রাষ্ট্রগুলাও মোটের উপর ষ্টেট্-সোশ্যালিজ্‌মের পথেই চালিত হচ্ছে। এমন কি ফরাসী রাষ্ট্রের আইন-কানুনও এই পথেরই পথিক। নানা নামে দুনিয়ায় চল্‌ছে আজকাল জার্ম্মাণ ষ্টেট্-সোশ্যালিজ্‌মেরই দিগ্‌বিজয়। অবশ্য

একালের "ফাশি"-ধর্ম্ম আর "নাৎসি"-ধর্ম্ম পূরাপূরি বিসমার্ক-নীতি নয়। প্রভেদও আছে গুরুতর।

বিলাতী গিল্ড-সোশ্যালিজ্‌ম্

প্রঃ—"গিল্ড-সোশ্যালিজ্‌ম্" জিনিষটা আবার কি ?

উঃ—কমিউনিজ্‌ম্ যেমন জার্ম্মাণির, সিণ্ডিকালিজ্‌ম্ যেমন ফ্রান্সের, গিল্ড-সোশ্যালিজম্ তেমনি ইংল্যাণ্ডের সৃষ্টি। সিণ্ডিক্যালিজম্ যেমন বর্ত্তমান-নিষ্ঠ ও বস্তু-তান্ত্রিক, গিল্ড-সোশ্যালিজ্‌ম্ তেমনি ভবিষ্য-নিষ্ঠ আদর্শবাদী। ভবিষ্য-সমাজের আর্থিক গড়ন কি রকম হ'তে পারে সে বিষয়ে এই "ইজ্‌ম্" এক নতুন আদর্শ প্রচার করেছে। এই মত-ওয়ালাদের ধারণা নিম্নরূপ :—প্রত্যেক ফ্যাক্টরী তার মজুরদের দ্বারা শাসিত হবে। এক একটি শিল্পের অন্তর্গত সবগুলা ফ্যাক্টরী এক একটা "গিল্ড" নামক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুল্‌বে। প্রত্যেক গিল্ড এক একটা শিল্পের অন্তর্গত ফ্যাক্টরীগুলার সাধারণ কাজ চালাবে। তারপর দেশের সব শিল্পগুলা একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধীনে সঙ্ঘ-বদ্ধ হবে। তার নাম হবে দি ন্যাশন্যাল গিল্ড অব্ প্রোডিউসাস (অর্থাৎ উৎপাদকদের জাতীয় গিল্ড)। এই "ন্যাশন্যাল গিল্ড" বিভিন্ন গিল্ডের পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপিত কর্‌বে। সমাজ কিন্তু কেবল উৎ-পাদকদের নিয়েই নয়, তার মধ্যে খাদক বা ভোক্তাও আছে। ভোক্তাদের স্বার্থ ও উৎপাদকদের স্বার্থ সকল ক্ষেত্রে একরূপ নয়। এই জন্য ভোক্তা হিসাবেও সমাজের একটা প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক। এই কারণে গিল্ড-সোশ্যালিষ্টরা এটাও চায় যে, ভোক্তারা স্থানে স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হোক্, এবং এইরূপ ভোক্তা-সঙ্ঘগুলার প্রতিনিধিরা একটা "জাতীয় ভোক্তা সঙ্ঘ" (দি ন্যাশন্যাল্ গিল্ড অব্ কনজিউমার্স)

কায়েম করুক। কিন্তু, ভোক্তা-সজ্ঘ ও উৎপাদক-সজ্ঘ এই দুই সজ্ঘের মধ্যেও ত' ঝগড়া-বিবাদ বাঁধতে পারে। সেটা থামাবে কে? তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কোন্ প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করবে। এর জন্য চাই একটা জয়েণ্ট কমিটি (যুক্ত-সভা)। এই সভায় জাতীয় ভোক্তা-সজ্ঘ' ও জাতীয় উৎপাদক-সজ্ঘ এই দুই সজ্ঘেরই প্রতিনিধি স্থান পাবে। উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ সুরক্ষিত হ'য়ে জাতির বা সমাজের আর্থিক উন্নতি যাতে বাড়ে, তার চেষ্টা ঐ জয়েণ্ট কমিটি কর্‌বে।

প্রঃ—গিল্ড-সোশ্যালিষ্টরা দেখছি একটা নতুন ধরণের রাষ্ট্র গড়ে তুল্‌তে চায়?

উঃ—ঠিক তাই। তারা রাষ্ট্রের বর্ত্তমান গড়ন বদ্‌লে ফেলে' একে একদম নয়া আকারে গড়ে' ফেল্‌তে চায়। কিন্তু মজার কথা এই যে, তারা রাষ্ট্রকে অন্য ছাঁচে গড়তে চাইলেও, তারা তা স্বীকার ক'রতে রাজী নয়। তারা বলে যে, তাদের মত অনুসারে কাজ হ'লে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাক্‌বে না।

প্রঃ—গিল্ড সোশ্যালিষ্টদের প্রভাব কিরূপ?

উঃ—এই কথা বুঝ্‌তে হ'লে এটা জানা দরকার যে 'গিল্ড-সোশ্যালিজ্‌ম্' জনসাধারণ বা মজুর-চাষীর শ্রেণী থেকে ওঠে নি। এই মতটা জনকয়েক মাথাওয়ালা ছোক্‌রারই সৃষ্টি। তা ছাড়া, সিণ্ডিক্যালিষ্ট বা কমিউনিষ্টরা যেমন তাদের মতামত সকল সময়েই কাজে পরিণত করবার জন্য অবিরাম চেষ্টা ও সংগ্রাম চালাচ্ছে, গিল্ড-সোশ্যালিষ্টরা তেমন কিছুই ক'রছে না। এরা সমাজের গড়ন সম্বন্ধে একটা মতবাদ তৈরী করেছে, আর তাই কলম পিশে প্রচার ক'রতে চেষ্টা করছে। ব্যস্। এই দিক্ থেকে গিল্ড-সোশ্যালিজ্‌মকে "ফেবিয়ান" সোশ্যালিজ্‌মের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

ফেবিয়ান সোশ্যালিজম্

প্রঃ—"ফেবিয়ান সোশ্যালিজম্" আবার কোন্ জানোয়ার ?

উঃ—"ফেবিয়ান সোশ্যালিজ্‌মে"রও জন্ম বিলাতে। ১৮৮৪ সনে বিলাতে সিড্‌নি ওয়েব "ফেবিয়ান সোসাইটী" স্থাপিত করেন। বার্ণার্ড শ', গ্রাহাম ওয়ালাস্, এইচ্ জি ওয়েলস্, আনি বেসাণ্ট প্রভৃতি লেখকেরা এই সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। এই সমাজে যে শ্রেণীর সমাজতন্ত্র প্রচার করা হয় তাকে বলে "ফেবিয়ান সোশ্যালিজ্‌ম্"। ফেবিয়ান সোশ্যালিষ্টরা রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। এঁদের মত এই যে, মজুররা রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্র অধিকার করুক এবং দেশের আর্থিক জীবনের যতটা সম্ভব রাষ্ট্রের অধীনে ও শাসনে আসুক। কমিউনিষ্ট বা সিণ্ডিকালিষ্টদের মত এঁরা বিপ্লবাদী নন্, বা বে-আইনী কাজের পোষকতা করেন না। এঁরা ক্রমবিবর্ত্তনবাদী। এঁদের মতে সমাজের উন্নতি হয় ধীরে ধীরে। এই জন্য এঁরা জোরজবরদস্তি করে' তাড়াতাড়ি আর্থিক স্বরাজ আনতে স্বচেষ্ট নন্। এঁরা শান্তিময় নিরুদ্রব পথ অবলম্বন করে' আস্তে আস্তে রাষ্ট্র-যন্ত্র এবং দেশের নগর-সভাগুলা হস্তগত করতে চান এবং ঐ সব যন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র দেশের আর্থিক জীবন শাসন ক'রতে চান। রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক এঁরা দেশের শিল্প পরিচালিত করাতে চান ব'লেই এঁদের মতবাদকে বলা হয় "কালেক্‌টিভ" সোশ্যালিজম। প্রাচীন রোমের এক মাতব্বরের নাম ছিল ফেবিয়াস। তিনি খুব আস্তে-আস্তে দেশ উদ্ধারের কাজে অগ্রসর হতেন। এই জন্য ধীরপন্থী সমাজ-সেবকদেরকে বলা হয় ফেবিয়ান।

প্রঃ—গিল্ড-সোশ্যালিজ্‌ম্ ও ফেবিয়ান সোশ্যালিজ্‌মে একটা মিল আছে বল্‌ছিলেন না ? সেটা কোন্ জায়গায় ?

উঃ—মিল এই হিসাবে যে, দুই মতবাদই কয়েকজন মুড়োওয়ালা মধ্য-বিত্তের সৃষ্টি। ফেবিয়ান সোশ্যালিজ্‌মের মতগুলা প্রধানতঃ সৃষ্টি করেছেন সিড্‌নি ওয়েব ও তাঁর স্ত্রী। গিল্ড্‌ সোশ্যালিজ্‌মের প্রধান প্রচারকর্ত্তা হচ্ছেন জি ডি এইচ্‌ কোল্। ফেবিয়ান সোশ্যালিজ্‌ম্ প্রচারের জন্য সিড্‌নি ওয়েব ও তাঁর স্ত্রী এই দুইজনে মণ-মণ বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন। গিল্ড-সোশ্যালিজ্‌মের আর ফেবিয়ান সোশ্যালিজমের মধ্যে একটুকু তফাৎও আছে। সেটা এই যে, ফেবিয়ান সোশ্যালিজমের মত অনুযায়ী অনেক কাজ সরকারী তাঁবে বিলাতে সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই ফেবিয়ান সোশ্যালিজ্‌ম্ আর নিছক মতবাদ নয়। এর অনেকটাই কাজে পরিণত হয়েছে। এক হিসাবে পৃথিবীর সকল দেশেই গবর্মেণ্ট গুলা ফেরিয়ান সমাজতন্ত্র মাফিক কাজ চালাতে অভ্যস্ত।

ইতালিয়ান ফাশিস্ত্‌ ও জার্ম্মান "নাৎসি"

প্রঃ—গিল্ড-সোশ্যালিজ্‌ম প্রচারের ফল কিছুই কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না?

উঃ—একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি ফাশিস্ত্‌ ইতালিতে। অবশ্য তাহাকে বিলাতী মত প্রচারের ফল বলা চলবে না। তবে বিলাতী মতের সঙ্গে ফাশিস্ত পথের মিল আছে এইরূপ বল্‌তে পারি। ইতালিতে পালার্মেণ্টের সভ্যরা এক একটা জনপদের অধিবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হ'য়ে আসে না। তারা আসে এক একটা পেশার প্রতিনিধি হিসাবে। অর্থাৎ, ইতালির পালার্মেণ্ট নানা পেশার প্রতিনিধিদের সভা। গিল্ড-সোশ্যালিষ্টরা চাইছে যে, দেশের উৎপাদক-সঙ্ঘগুলা মিলিত হয়ে' একটা উৎপাদকের জাতীয় সভা গড়ে' তুলুক। এই উৎপাদকদের সভা আর ফ্যাশিস্ত ইতালির পালার্মেণ্টের মধ্যে অনেকটা মিল আছে।

কারণ দুইয়েরই উদ্দেশ্য দেশের বিভিন্ন আর্থিক স্বার্থকে আর্থিক স্বার্থ হিসাবেই জাতীর সভায় স্থান দেওয়া। আজকাল জার্মাণিতে হিট্‌লার-রাজ কায়েম হওয়ার পর ন্যাশন্যাল-সোশ্যালিষ্ট (নাৎসি) দলও অনেকটা এই ধরণের গিল্ড-রাষ্ট্র কায়েম করতে অগ্রসর হচ্ছে। তবে গিল্ড্-সোশ্যালিষ্ট্‌রা যে 'ভোক্তা-সভা' ও 'যুক্ত সভা'র কথা ভাবেন, ইতালির মুসলিনি-রাজে অথবা জার্ম্মাণির হিট্‌লার-রাজে তার কোনো ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি।

প্রঃ—বিস্‌মার্কের কথা বল্‌তে বল্‌তে আপনি মুসলিনি আর হিট্‌লারের প্রভেদ উল্লেখ কর্‌ছিলেন না ?

উঃ—ফাশি-নীতি আর নাৎসি-নীতি দুই নীতির ভিতরই মজুর-নিষ্ঠার প্রভাব জবরদস্ত। বিস্‌মার্কের মেজাজে মনিব-নিষ্ঠার প্রভাবই ছিল বেশী। মুসলিনি আর হিট্‌লার পুঁজিপতিদেরকে তোয়াজ করা নিজ স্বধর্ম্ম বিবেচনা করে না। পুঁজিপতিদেরকে বাঁচাইয়া চলা তাহাদের নীতির অন্তর্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু মজুরদের স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্য তাহারা পুঁজিপতিদের ঘাড় ভাঙিতেও পুরাপুরি অভ্যস্ত। এই জন্য যাঁহারা মুসলিনি ও হিট্‌লারকে মামুলি "ন্যাশন্যালিষ্ট" সম্‌ঝে' থাকেন তাঁহারা ভুল করেন। বিস্‌মার্কের স্বদেশনিষ্ঠাকে একালের মজুরনিষ্ঠা দিয়া গুণ কর্‌লে যে ফল দাঁড়ায় তাহাকেই আমি বলি "নাৎসি"-ধর্ম্ম বা "ফাশি-ধর্ম্ম।

অ্যানার্কিজ্‌ম্

প্রঃ—অ্যানার্কিজম্‌টা কিরূপ জানোয়ার ? সোশ্যালিজ্‌মের সঙ্গে তার মিল আর পার্থক্যই বা কোন্ জায়গায় ?

উঃ—সোশ্যালিজ্‌ম্ জিনিষটা প্রধানতঃ অথবা গোড়ায় অর্থনৈতিক।

মজুরদের দুঃখ নিবারণের উপায় হিসাবেই এর জন্ম। শেষ পর্য্যন্ত এটা দাঁড়িয়ে গেছে প্রায় নিছক রাষ্ট্রিক কর্ম্মকৌশলের অন্যতম হিসাবে। কিন্তু অ্যানার্কিজ্‌ম্ বস্তুতঃ কোনো অর্থ-নৈতিক মতবাদ নয়। এটা একটা দার্শনিক মতবাদ-বিশেষ। একে কবি-কল্পনাও বলা যেতে পারে। অ্যানার্কিষ্টদের প্রধান কথা হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র বা কোনো প্রকার শাসনের ব্যবস্থা থাকা মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তারা বলে যে, রাষ্ট্র বা শাসন-যন্ত্র মানুষের উন্নতির সহায়ক নয়, বরং বাধা। এই জন্যই অ্যানার্কিষ্টদের মতে রাষ্ট্রের ধ্বংস অথবা তিরোভাব আবশ্যক। অ্যানার্কিষ্টদের মধ্যে অনেকে বল প্রয়োগ করে' শাসন-যন্ত্র ধ্বংস করতে চায়। রুশিয়ার বাকুনিন এই শ্রেণীর অ্যানার্কিষ্ট। অনেকে আবার অ্যানার্কিষ্ট হ'লেও শাসন-যন্ত্র ধ্বংসের জন্য বলপ্রয়োগের বিরোধী। টলষ্টয় এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বিলাতের কবি শেলী, দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার এঁরাও অ্যানার্কিষ্ট। ভারতেও অনেক চিন্তাশীল লোক সরকারী সাহায্য না নিয়ে স্বাধীন-ভাবে এবং স্ব-চেষ্টায় দেশের উন্নতি করতে চান। সুতরাং তাঁদেরকে "দার্শনিক" হিসাবে "অনেকটা" অ্যানার্কিষ্ট গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বুঝতে হবে যে, সব সময় অ্যানার্কিষ্ট শব্দের অর্থ অরাজকতা, বা মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা, রক্তারক্তি ইত্যাদি বস্তু নয়। গোড়ায় এ হচ্ছে ব্যক্তিনিষ্ঠ রাষ্ট্রহীন সমাজ-ব্যবস্থার দর্শন। আগেই বলেছি কবি-কল্পনা। দুনিয়ায় আজকাল যে সব বড়-বড় মুড়োওয়ালা পণ্ডিত আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সরকারী চেষ্টা বা সাহায্যের উপর নির্ভর করতে নারাজ। তাঁরা স্বাধীন বে-সরকারী চেষ্টার পক্ষপাতী। এ হিসাবে দুনিয়ার অনেক শ্রেষ্ঠ সুধী অ্যানার্কিষ্ট। এঁদের মধ্যে ফরাসী রম্যাঁ রলাঁর নাম করা যেতে পারে। কিন্তু আসল কথা এই চিন্তা-

বীরদের পথে দুনিয়া চল্‌ছে না। জগতের সর্ব্বত্র রাষ্ট্রের ক্ষমতা হু হু করে' বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ অ্যানার্কিজ্‌মের উল্টা ব্যবস্থার দিগ্‌বিজয়ই সর্ব্বত্র দেখা যাচ্ছে। অ্যানার্কিজ্‌মকে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকদের গোলাপী নেশা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। আজকালকার "ইকনমিক প্ল্যানিং" বা লক্ষ্যমাফিক মোসাবিদার ভিতর অ্যানার্কিজ্‌মের বিলকুল উল্টা পথই চরম আকারে দেখা যাচ্ছে।

প্রঃ—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি বল্‌ছেন যে, চিন্তা-বীরদের কেহ-কেহ অ্যানার্কিষ্ট আখ্যারই অন্তর্গত হবার যোগ্য। কিন্তু এঁরা কি মনুষ্যের জীবন থেকে সরকারী শাসন একেবারে উঠিয়ে দিতে চান? হার্ব্বার্ট স্পেনসারের কথা বলি। তিনি ত শাসন-তন্ত্রকে একে-বারে ধ্বংস ক'রতে চান না, বরং শাসন-যন্ত্র তার নিজস্ব কাজে,—যেমন শান্তি রক্ষা করা, দেশ সুরক্ষিত রাখা, কেউ চুক্তি ভঙ্গ না করে বা পরের সম্পত্তি না কাড়ে এই সব দেখা—এই সব কাজেই লিপ্ত থাকে এইটা ত' তিনি চান?

উঃ—ঠিক খাঁটি অ্যানার্কিষ্ট, অর্থাৎ যাঁরা মনুষের জীবন থেকে সরকারী শাসন পুরাপুরি উঠিয়ে দিতে চান, তাঁদের সংখ্যা দুনিয়ায় খুব কম। ফরাসী প্রুদঁ, রুশ বাকুনিন ও জার্ম্মাণ ষ্টির্ণার ছাড়া খাঁটি অ্যানার্কিষ্ট আর ত দেখি না। আর যাঁদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা খাটি অ্যানার্কিষ্ট না হলেও অ্যানার্কিষ্ট-ঘেঁষা বটে।

চাই বাঙ্‌লায় বিলাতী-জার্ম্মাণ মজুর-কানুন

প্রঃ—মানুষের উন্নতিতে সোশ্যালিজ্‌ম্ বা কমিউনিজ্‌ম্ কতটা সহায়ক ব'লে মনে করেন?

উঃ—আমি কোনো বিষয়েই অদ্বৈতবাদী নই। গণ্ডা-গণ্ডা

ডজন-ডজন দেবদেবীর পূজা করা আমার স্বধর্ম্ম। দুনিয়ার ইতিহাসে মানুষের উন্নতি কোনো একটা বিশেষ প্রভাবের জোরে ঘটে নি। দেশ-বিদেশের কর্ম্মধারা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, একই সঙ্গে পাঁচশ'টা প্রভাব অর্থাৎ পাঁচশ' প্রকার 'ইজ্‌ম্' বা চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালী মানুষকে তার বর্ত্তমান অবস্থায় এনে খাড়া করেছে। কাজেই যদি কেউ বলে যে, মানুষের উন্নতির জন্য সোশ্যালিজ্‌ম্ বা কমিউনিজ্‌ম্ (সমাজতন্ত্র) না হ'লে চল্‌বে না, অথবা 'ক্যাপিট্যা-লিজ্‌ম্' (পুঁজিতন্ত্র) তার উন্নতির পরিপন্থী, আমি তার কথা মান্‌তে রাজী নই। তবে, বর্ত্তমান যুগের কলকারখানা-প্রধান সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মজুর। এই মজুরেরাই ট্রেড্ ইউ-নিয়নের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে একালের বড়-বড় দেশগুলাকে চালাচ্ছে। বিলাতে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য যা-কিছু আইন পাশ করা হয়েছে তার প্রায় সবই এই সঙ্ঘবদ্ধ মজুরদের অথবা মজুর-সহায়ক পুঁজিপতি বা মস্তিষ্ক-জীবীদের চাপে। জার্ম্মাণিতে মজুরদের চাপে পড়ে' বিসমার্ক ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব বীমার জন্য সরকারী ব্যবস্থা ক'রতে বাধ্য হয়ে-ছিল। এই মজুর-শক্তি হচ্ছে বর্ত্তমান দুনিয়ার একটা প্রধান অধ্যাত্ম-শক্তি। বর্ত্তমান দুনিয়ায় কোন্ দেশ কতটা অগ্রসর, তা আমি সঙ্ঘবদ্ধ মজুরদের সংখ্যা দিয়ে বিচার করে' থাকি।

প্রঃ—বর্ত্তমান বাঙালী সমাজের জন্য আপনার পাঁতি কিরূপ ?

উঃ—বাঙ্‌লাদেশে আসল "মজুরের" সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য। কয়েক লাখ মাত্র। লাখ পাঁচেকের বেশী নয়,—কম। অথচ দেশের লোক-সংখ্যা পাঁচ কোটি দশ লাখ। অর্থাৎ মজুরেরা নাকগুন্‌তিতে ধর্ত্তব্যের ভিতরই নয়। তবে মজুরেরা নতুন যন্ত্র-শক্তির প্রতিমূর্ত্তি, নতুন শিল্প-

কারখানার প্রতিনিধি। সংখ্যায় অল্প হ'লেও নয়া বাঙলা গড়ে' তুলবার কাজে তাদের কৃতিত্ব খুব বেশী। এই জন্য মজুর-সম্প্রদায় আমার নিকট শ্রদ্ধাযোগ্য। কাজেই আজকালকার বিলাত ও জার্ম্মাণিতে মজুরদের আর্থিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি উন্নত করিবার জন্য যত প্রকার আইন কায়েম ও সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে, সেই সবকে আমি বাঙালী সমাজে আমদানি করতে পারলে খুসী হব। কিন্তু জার্ম্মাণরা আর ইংরেজরা মজুর-মঙ্গলে এত বেশী উন্নত যে, তাদের নাগাল পাওয়া আমাদের পক্ষে বহুদিন পর্য্যন্ত সম্ভবপর নয়। তবে "আদর্শের" কথাটা বলে' রাখা গেল মাত্র।

বাঙালী চাষী ও "চাষ-মজুর"

প্রঃ—মজুরসংখ্যা যদি এত কম হ'ল তবে কমিউনিজ্‌ম্ বা সোশ্যালিজ্‌মের ঠাঁই বাঙ্‌লাদেশে কতটুকু ?

উঃ—আগেই বলেছি আমি কোনো "ইজ্‌মে"র ভক্ত নই। দুনিয়ার বাজারে-বাজারে যত রকমের মতামত চল্‌ছে তার সবই আলোচনা করে' দেখা ভাল। তাতে মাথাটা পেকে উঠ্‌তে পারে। এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তার অনেক-কিছুই কাজে লাগানো সম্ভবপর নয়। হাজার বার হাজার জায়গায় বলেছি যে, "দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের" দেশগুলায় যে সব "এলাহি কারখানা" চল্‌ছে তার কোনো-কিছুই ভারতের মতন "প্রথম শিল্পবিপ্লবে"র মুল্লুকে কায়েম করা অসম্ভব। আমার কাছে বাঙ্‌লা দেশ হল প্রধানতঃ চাষীর দেশ। বাঙালী জাতির এক কোটি ষাট লাখ "উপার্জ্জনকারীর" ভিতর সত্তর লাখ নরনারী হ'ল চাষী, আর লাখ ত্রিশেক হ'ল "চাষ-মজুর"। এই এক কোটি হল বাঙালী সমাজের বনিয়াদ। চাষীদের জমি-ভোগ

যাতে নিষ্কণ্টক, নিরাপদ ও স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয় আর "চাষ-মজুর"দের মজুরির সর্ত্ত যাতে সন্তোষজনক হয় এই দিকে সকলকে মনোযোগী হতে হবে। আর সঙ্গে-সঙ্গে এই সকল শ্রেণীর খাওয়াপরা, বাড়ীঘর, লেখা-পড়া, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির মাপকাঠি যাতে উন্নত হয় তার চেষ্টা করাও স্বদেশসেবার বড় কাজ।

বাঙলা দেশ চাষীর দেশ বটে। কিন্তু অ-চাষীরাও ফেলিতব্য নয়। আমি সমাজে এক সঙ্গে পাঁচশ' শক্তির কাজ দেখ্‌তে চাই। কাজেই পাঁচশ' শক্তির সম্বর্দ্ধনা করা আমার দস্তুর। তেত্রিশ কোটি দেবদেবী পূজা করতে অভ্যস্ত হিন্দুর পক্ষে চাষী-শক্তির সঙ্গে-সঙ্গে কারিগর-শক্তি, তাঁতী-শক্তি, চুনিয়া-শক্তি, মুনিয়া-শক্তি, মিস্ত্রী-শক্তি, দোকানদার-শক্তি, বেপারী-শক্তি, ব্যাঙ্কার-শক্তি, মাষ্টার-শক্তি, উকিল-শক্তি, ডাক্তার-শক্তি, এঞ্জিনীয়ার-শক্তি, জমিদার-শক্তি, কেরাণী-শক্তি ইত্যাদি আরও অন্যান্য শক্তির চাষ চালানো অতি স্বাভাবিক। এক সঙ্গে হাজার দিকে চাষ চালাতে পার্‌লে আমি সন্তুষ্ট থাকি। একপেশে, একচোখো বা একবগ্‌গা হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বাঙালী জাতিকে জগদ্‌বরেণ্য করে' তুলবার জন্য আমি চাই আমাদের যে যেখানে আছে তাদের প্রত্যেকের স্বার্থ রক্ষা করা আর তার সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মূলক সমবেত কর্ম্মের আন্দোলন। অধিকন্তু এই সকল স্বার্থরক্ষা আর চাষী-জমিদার-মজুর-পুঁজিপতি-সমন্বিত কর্ম্মের আন্দোলনে রাষ্ট্রও মস্ত সহায়ক। কাজেই রাষ্ট্র-বিবর্জ্জিত সমাজ-গঠন আমার কল্পনায় ঠাঁই পেতে পারে না। দেশের নরনারীর আর্থিক ও অন্যান্য মঙ্গলসাধনের জন্য রাষ্ট্রকে যন্ত্রস্বরূপ কাজে লাগানো স্বদেশ-সেবার আসল কর্ম্মকৌশল।

বাঙালী জাতির পুঁজিশক্তি

প্রঃ—পুঁজিপতি বা ধনিক শ্রেণী সম্বন্ধে আপনার তা'হলে কি মত ?

উঃ—আগেই বলেছি। যা-হ'ক আবার বলি। "সকল" শ্রেণীর সমবেত কাজে দুনিয়ার সমাজগুলা বেড়ে উঠ্‌ছে। পুঁজিপতিরা সমাজ হ'তে বহিষ্কারযোগ্য নয়। বাঙলাদেশে আজকাল যতপ্রকার ধনিক আছে তাদের প্রত্যেকের সাহায্যে আমাদের উন্নতি হচ্ছে। পুঁজিপতিদের ক্ষতি হ'লে দেশের আর্থিক বা আর কোনো উন্নতি হবে এরূপ ভাবা আহাম্মুকি।

বাস্তবিক পক্ষে, বাঙ্‌লাদেশে পুঁজিপতি বা ধনিক কারা ? কোনো এক জাতের বা এক পেশার লোক তারা নয়। আজকালকার দিনে বাঙালী চাষীরা সমবায়-প্রথায় লেনাদেনা করে। সমবায়-নিয়ন্ত্রিত ধনভাণ্ডারের আংশিক "মালিক" হিসাবে চাষীরা নিজেই পুঁজিশীল ধনিক-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

বাঙালী জাতির দ্বিতীয় ধনিক হচ্ছে মধ্যবিত্ত কেরাণী আর মজুর। ইহারা ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখ্‌তে অভ্যস্ত। তাহা ছাড়া যে সকল বাঙালী ক্যাশ সার্টিফিকেট খরিদ করে তাহার ভিতর মজুর ও কেরাণী নগণ্য নয়।

আমাদের তৃতীয় ধনিক হল মহাজন বানিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক। ইহাদের পুঁজি হতে কর্জ্জ পায় বলে' চাষীরা অনেক সময়ে চাষ চালাতে সমর্থ হয়। সুদের হার সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু বল্‌ছি না। তবে যখন-তখন যেখানে-সেখানে মহাজনদেরকে চাষীর শত্রু বিবেচনা করা ঠিক নয়।

আজকালকার বাংলাদেশে লোন আফিস নামক "কুটির-ব্যাঙ্ক"-

গুলা বেশ গুলজার। এই সকল ব্যাঙ্কে দেশের আপামর জনসাধারণের কোটি কোটি টাকা এসে জমেছে পুঁজি হিসাবে। অর্থাৎ বাঙালী সমাজের নানা গলিঘোঁচে অনেক ছোট-বড়-মাঝারি পুঁজিপতি দেখা দিয়েছে। মন্দার যুগে লোন-অফিসগুলা চিৎ হয়ে পড়েছে। সে কথা সম্প্রতি আলোচ্য নয়।

তারপর জমিদার সম্প্রদায়। ইহাদের অনেকে ধনিক বা পুঁজিপতি ত বটেই। জমিদারদের টাকা সবই ঘরের হাঁড়িতে গাড়া থাকে এরূপ সমঝে' রাখা ভুল। জমিদারদের টাকায় ইস্কুল হয়, ডিস্‌পেন্সারী হয়, পুকুর কাটা হয়, কারখানা খোলা হয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, জাপান, আমেরিকা, বিলাত, জার্ম্মাণি, ইতালি ইত্যাদি দেশবিদেশে লোক পাঠিয়ে নানা শিল্পবাণিজ্যের ওস্তাদ তৈরী করে' আনা হয়, ব্যাঙ্ক কায়েম করা হয়, বীমার আফিস চালানো হয়, সাহিত্য প্রচার করা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই অন্যান্য পুঁজিশীল সম্প্রদায়ের মতনই জমিদারেরাও বাঙালী সমাজের এক জবর আর্থিক ও আত্মিক শক্তি। এই সম্বন্ধে মাথার ভিতর গোঁজামিল রাখা অবিবেচনার কার্য্য।

পুঁজিশক্তি আর পুঁজিনিষ্ঠা সমাজের সর্ব্বত্র অল্পবিস্তর ছড়িয়ে রয়েছে। কোনো শক্তি-কেন্দ্রকেই উপেক্ষা করা চল্‌বে না। প্রত্যেক শক্তিকে নিজ-নিজ কোঠের ভিতর বাড়িয়ে তোলাই হ'ল সমঝদার স্বদেশ-সেবকের কর্ত্তব্য। কোনো-কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর পুঁজিশীল লোককে একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করা সম্ভব। সেই সকল কর্ম্মক্ষেত্রের পুষ্টিসাধনেও স্বদেশসেবকের যত্নবান হওয়া আবশ্যক। চাই একসঙ্গে সকল শক্তির আরাধনা আর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিযোগ।

দেশ ও দুনিয়া

প্র :—সারা দুনিয়াটা একই রাষ্ট্রের অধীনে শাসিত হবে, অর্থাৎ একটা দুনিয়া-রাষ্ট্র (ওয়ার্লড্-ষ্টেট) স্থাপিত হবে, এটা কখনও সম্ভব মনে করেন কি ?

উ :—হাঁ, তা, আশ্চর্য্য নয়। কল্পনা করা সম্ভব। যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রকারান্তরে একটা দুনিয়া-রাষ্ট্র। এই ধরণের কোনো ওয়ার্ল্ড-ষ্টেট দ্বারা সারা দুনিয়া অথবা দুনিয়ার খুব বড় অংশ শাসিত হওয়া একদম অসম্ভব নয়।

প্র :—আপনি আমার প্রশ্নটা বুঝলেন কিনা ধরতে পারছি না। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় এমন একটা রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়া কি সম্ভব নয়, যা নানা দেশ-রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত হবে ? ধরুন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে দেশ-রাষ্ট্রগুলা স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও একটা বিশেষ রাষ্ট্রের অন্তর্গত। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে দিয়ে ঠিক ঐ ধরণের ওয়াল্ড্-ষ্টেট্ গড়া কি সম্ভব নয় ?

উ :—দুনিয়ার বিভিন্ন দেশগুলা দিয়ে সারা দুনিয়ায় একটি সমবায়-রাষ্ট্র গঠিত হবে, তার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। কারণ সমবায়-রাষ্ট্র গড়ে' তুল্‌তে হলে, যাদের নিয়ে সমবায়-রাষ্ট্র গড়া হবে, তাদের মধ্যে একটা সাম্য থাকার দরকার। যারা সমান সমান নয়, আর যাদের ভিতর আদর্শের আর লক্ষ্যের ঐক্য নাই তাদের নিয়ে কোনো সমবায়-রাষ্ট্র গড়া সম্ভব নয়। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্রকে কি সভ্যতার একই স্তরে দেখ্‌তে পাই ? এদের ভিতর লক্ষ্যের ঐক্য থাকা বা আনা কি সম্ভব ? তা মোটেই নয়। দুনিয়ার

বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেশশাসনের ক্ষমতার বা যোগ্যতার পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। এশিয়ার দেশগুলা যে শীঘ্র শীঘ্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুল্‌বে তার সম্ভাবনা বেশী দেখ্‌ছি না। চীন দেশের ভবিষ্যৎ যে কি এখনও তা ঠিক ক'রে বলা যায় না। পারস্য, আরব, আফগানিস্তান— এদের স্বাধীনতা কতদিন বা কতটুকু থাক্‌বে তা বলা শক্ত। ইয়োরোপে প্রজাতন্ত্রের সংখ্যা বাড়ছে বটে, কিন্তু এশিয়ায় তা নয়। তারপর, মাওরি, বুশমেন বা নিগ্রোদের কথা। এরা ভবিষ্যতে যে কোনো কালে স্ব-স্ব দেশ-শাসনের ক্ষমতা অর্জ্জন ক'রতে পারবে তা বর্ত্তমানে ভাব্‌তেও পারি না। এই সব কারণে জগতের সর্ব্বত্র অনেকগুলা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গড়ে' উঠ্‌বে, তার কল্পনা কর্‌তে পার্‌ছিনা, স্থতরাং দুনিয়া-ব্যাপী সমবায়-রাষ্ট্রও আমার কল্পনার বাহিরে।

প্র :—কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন, আজ বেতার ও এরোপ্লেনের প্রভাব কতটা বেড়েছে। বর্ত্তমানের দুনিয়া অতীতের দুনিয়ার মত আর বিশাল নয়, অনেক ছোট হ'য়ে গেছে। দুনিয়াকে এখন একটা কোনো বিশেষ কেন্দ্র থেকে শাসন করা অসম্ভব নয়। স্থতরাং একটা দুনিয়া-রাষ্ট্র গড়ে ওঠা অসম্ভব নাও হতে পারে।

উ :—সেই জন্যই ত' বলেছি হয়তো এমন হ'তে পারে যে, একটা কোনো বিশেষ জাত তামাম দুনিয়ার ওপর অথবা দুনিয়ার খুব বড় অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে' একটা দুনিয়া-রাষ্ট্র গড়ে' তুল্‌তে পারে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন জাতের মধ্যে পার্থক্য আর অনৈক্য ও বৈষম্য এত বেশী যে, সব জাতই মিলে একটা রাষ্ট্র গড়ে' তুল্‌বে তার সম্ভাবনা আমি দেখ্‌ছিনা। অতি দূর ভবিষ্যতে মানুষের চরিত্রের, লক্ষ্যের আর কর্ম্মদক্ষতার কতটা বিকাশ দাঁড়াবে তা আজ কল্পনা করা কঠিন।

বিশ্বরাষ্ট্র অসম্ভব

প্র :—বিভিন্ন জাতের যে এই পার্থক্য, অনৈক্য ও বৈষম্য তা কি কোনো কালেই লোপ পাবার নয়?

উ :—এই পার্থক্য, অনৈক্য ও বৈষম্য কোনো কালে লোপ পাবে কিনা তা বলা শক্ত। দুনিয়ায় উত্থান-পতন চিরকাল চল্‌ছে। যেমন কতকগুলি জাত উঠছে, তেমনি কতকগুলি জাত নাম্‌ছে। কাজেই সব জাতগুলা একই সঙ্গে সমান বা কাছকাছি উন্নত হবে, এর সম্ভাবনা খুব কম। আসল কথা, সব জাতের কার্য্য ক্ষমতাও সমান নয়। বিলাতে যখন কারখানা-শিল্প সবে গড়ে' উঠ্‌ছে, তখন জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, পর্ত্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ইতালি, বল্কান অঞ্চল, রুশিয়া প্রভৃতি ত' প্রায় সমান স্তরেই ছিল। অথচ জার্ম্মাণি ও ফ্রান্স প্রথম শ্রেণীর শক্তি হল কি করে'? ইয়োরোপের অন্য দেশগুলা অত পিছিয়ে রইলো কেন? এর কারণ কি এই নয় যে, বিভিন্ন জাতের ক্ষমতা একরূপ নয়, তাদের গুণাগুণের পার্থক্য আছে যথেষ্ট? এই সব কারণেই বলছি যে দুনিয়ায় একটি বিশাল প্রজাতান্ত্রিক সমবায়-রাষ্ট্র স্থাপিত হবে, তার কল্পনাও আমার মনে স্থান পাচ্ছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমি এমন কি ইংরেজকে ফরাসীর গোলামরূপে "কল্পনা" কর্‌তে পারি। হয়ত দুনিয়ার এক অতি-বিপুল অংশ ফরাসীর তাঁবে এসে গেল, আর তার ভিতর পড়্‌তে পড়্‌তে ইংরেজও পড়ে' গেল। কিন্তু ফরাসী আর ইংরেজ দুয়েই স্বাধীন ভাবে একটা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে' তুল্‌ল, দুজনের ভিতর "ভাই ভাই একঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই" মন্তর আওড়ানো চল্‌তে থাক্‌ল, এরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এদের ভিতর ক্ষমতার সাম্য আছে বটে, কিন্তু লক্ষ্যের অনৈক্য জবরদস্ত্‌। সেইরূপ জার্ম্মাণের তাঁবে

ফরাসী আসতে পারে অথবা ফরাসীর তাঁবে জার্ম্মাণ আসতে পারে। এ-ও কল্পনার কথা। কিন্তু জার্ম্মাণ আর ফরাসী দু'জনে স্বাধীনভাবে একটা রাষ্ট্রের প্রজা হবে এরূপ দৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। আর যে ডজন-ডজন, শত-শত জাত রয়েছে তাদের বেলায়ও সেই কথা। তাদের ভিতর প্রথমতঃ ক্ষমতার বা যোগ্যতার অসাম্য, তার ওপর লক্ষ্যের অনৈক্য। বিশ্বরাষ্ট্র বল্‌লে আমি সম্প্রতি কল্পনা করতে পারি বিশ্বব্যাপী, আধাবিশ্ব-ব্যাপী, সিকিবিশ্বব্যাপী, দুআনা বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্র। তবে এই সব "বিশ্ব-রাষ্ট্রের" আসল কর্ত্তা কে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু গোটা দুনিয়ার দুশ' কোটি নরনারী সমানে-সমানে যে আত্মকর্ত্তৃত্বশীল স্বরাজনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের অধীন প্রজা বা কর্ত্তা, সেই বিশ্বরাষ্ট্র আমার বিবেচনায় গাঁজাখুরি মাত্র।

স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র

প্রঃ—ভারতে আমরা ব্যক্তি হিসাবে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করি, অন্য দেশের তুলনায় সেটা কি রকম?

উঃ—এমন কি বিলাতের সঙ্গেই যদি তুলনা করি, বিলাতের লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যতটা, আমাদের দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তার চেয়ে কম নয়। আমাদের দেশ যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে শাসিত হয়, তা অবিকল বিলাতী আইনের নকল, সামান্য এখানে-ওখানে একটু-আধটু অদলবদল থাক্‌তে পারে। এইজন্য ব্যক্তি হিসাবে ইংরেজ বিলাতে যতটা স্বাধীন, ভারত-বাসীও ভারতবর্ষে ততটা স্বাধীন। সামরিক আর রাষ্ট্রিক হিসাবে প্রভেদ আছে। অন্য কোনো আইনে প্রভেদ নাই।

প্র:—ভারতে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যতটা, বিলাতে ইংরেজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি তার চেয়ে বেশী না হয়, তা হ'লে

বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রই ত' ভাল, নতুন ধরণের প্রজাতন্ত্র শাসনের কি দরকার ?

উ :—যখন কোনো দেশের শাসন-যন্ত্র কর্ত্তা-হিসাবে এক জন লোকের দ্বারা চালিত হয়, তাকে মনার্কি বা ডেস্‌পটিজ্‌ম্ বলে। কিন্তু তিনি যদি জনকয়েকের পরামর্শ নিয়ে জনসাধারণের হিতার্থে শাসন করেন, তাকে বেনেভলেণ্ট বা এন্‌লাইটেণ্ড ডেস্‌পটিজম্ বলা যেতে পারে। যখন জনকয়েক ধনী নিজ স্বার্থের জন্য দেশের শাসন চালান, তখন তাকে অলিগার্কি বলে। যখন জনসাধারণ দেশের শাসন কর্ত্তা তখন এই ব্যবস্থাকে ডেমোক্র্যাসী বলে। মনার্কি, অলিগার্কি প্রভৃতির চেয়ে ডেমোক্র্যাসীর শাসন-কাণ্ডটা যে অধিকতর সুচারু হবেই, তা কেউ বল্‌তে পারে না। কিন্তু সমাজহিতের দিক থেকে প্রজাতন্ত্রের একটা বিশেষ উপকারিতা আছে। প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে' দেশের কাজে কর্ত্তৃত্ব করবার ভার জনসাধারণের মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাতে মামুলি লোকের দায়িত্ব জ্ঞান বাড়ে, সুতরাং কাজ করবার ক্ষমতাও বাড়ে। কেবল নিজের স্বার্থের জন্য চিন্তা না করে' পরের জন্যও চিন্তা করতে লোকেরা বাধ্য হয়। তার ফলে দেশের লোকের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি হয়। এই দেখ না, ছোটবেলা নির্ব্বাচনের ব্যাপার ত' দেখেছি। সেটা ছিল নিতান্ত ছেলেখেলা। নির্ব্বাচিত হবার জন্য তখন প্রতিনিধিদের তেমন কিছু একটা বেগ পেতে হত না। কারণ, তখন নির্ব্বাচনের অধিকার খুবই মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। এখন নির্ব্বাচিত হ'তে হ'লে শুধু যে ৮।১০ হাজার টাকা খরচ করতে হয় তা নয়, নির্ব্বাচন-প্রার্থীদেরকে নির্ব্বাচকদের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে ভোট ভিক্ষা ক'রতে হয়, তারা কি করবে না করবে তা বোঝাতে হয়,

তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে তার যে কার্য্যপ্রণালী ভাল তা দেখাতে হয়। নির্ব্বাচকদের জন্য এটা করবে ওটা করবে ব'লে লম্বা-চৌড়া প্রতিজ্ঞা করতে হয়। নির্ব্বাচিত হ'লে অঙ্গীকারগুলা কাজে পরিণত কর্‌তে, অথবা করবার চেষ্টা কর্‌তে হয়। প্রজাতন্ত্র থাক্‌লে এইরূপ নানা উপায়ে দেশের লোকের দায়িত্বের বোঝা ও শিক্ষার সুযোগ বাড়ে, সুতরাং তারা মানুষ হয়।

ইংরেজের স্বাধীনতা-নিষ্ঠা

প্র :—জগতে ইংরেজদের প্রতাপ এত বেশী কেন ?

উঃ—ইংরেজের মত বড় ঔপনিবেশিক জাত আর নেই। ইংরেজ অনেকটা সমঝদারভাবে বিদেশী লোকজনকে শাসন করতে জানে। যখন প্রজাদের মধ্যে অশান্তি দেখে তখন তাদের ক্ষমতা কিছু কিছু বাড়িয়ে দিতেও পেছপাও নয়। প্রজাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েও নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা—এবিষয়ে ইংরেজ ওস্তাদ। ফরাসী আর ওলন্দাজ এই দুকূল রক্ষায় ইংরেজের কাছে দাঁড়াতে পারবে না।

প্র :—এরূপ হবার কারণ কি ?

উঃ—ইংরেজরা পাকা মাথাওয়ালা লোক। ওরা কখনো নিজের খেয়ালগুলা অন্য লোকের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করে না। সকলকে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ সু-কু বেছে নিতে দেয়। অপর লোকেরা নিজ-নিজ সু-কু, উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে কি ভাবে সে সম্বন্ধে ইংরেজরা খোঁজ-খবর নিতে চেষ্টা করে। নিজেদের চিন্তায় বা অভিজ্ঞতায় যে কর্ম্মপ্রণালীটা ভাল ইংরেজ জাত তা চট্ করে' অপরকে গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য করে না। যে দেশেই ওরা রাজা হ'তে যাক্‌না কেন ওরা সে দেশের রীতিনীতি আইনকানুন ইত্যাদি বজায় রেখে চল্‌বার চেষ্টা

করে। ক্রমশঃ সেই দেশের লোকেরা হয়ত নিজেই সেই সব বদ্‌লাবার পথে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনও ইংরেজ দুজন চারজন অতিমাত্রায় সংস্কারপন্থী বা নামজাদা জননায়কের পাল্লায় পড়্‌তে রাজি হয় না। ইংরেজরা এক সঙ্গে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গরীব-ধনী, মামুলি-বনেদি সকল প্রকার লোকের মতিগতি বাজিয়ে দেখ্‌তে চেষ্টা করে। অর্থাৎ নর-নারীর আটপৌরে জীবনে হস্তক্ষেপ করা ইংরেজদের কোষ্ঠীতে লেখা নাই। ওরা কট্টর স্বাধীনতা-নিষ্ঠ জাত। হাজার বছর ধরে' ওরা নিজেদের দেশে এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে। কাজেই ওরা যখন-তখন যেখানে-সেখানে গিয়ে স্থানীয় লোক-জনের স্বাধীনতায় বাধা দেয় না। এত বড় গুণ পৃথিবীর খুব কম জাতের আছে। এই ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠা, ব্যক্তিমাত্রের ইজ্জদ্‌-রক্ষা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সমাদর-প্রবৃত্তি আমার বিবেচনায় মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি।

প্রঃ—কিন্তু অনেকে বলে যে, ইংরেজের ঘরে আজ নানা গণ্ডগোল—মজুর-মনিবে লড়াই, আর্থিক দুরবস্থা ইত্যাদি। ওরা নিজেদের শক্তি আর কতদিন বজায় রাখ্‌তে পারবে?

উঃ—ইংরেজের দেশে আজ যেসব গণ্ডগোল দেখা যায় তা এমন বেশী-কিছু নয়। অন্যান্য দেশেও ওসব রয়েছে। অন্যান্য জাতের মত এরাও নয়া-নয়া ব্যাধির নয়া-নয়া দাওয়াই আবিষ্কার করতে সুপটু। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। এই দেখ না আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ওদের দেনার পরিমাণ বেড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে আসবার আগেই ওরা স্বর্ণমান রদ্ করে' সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠ্‌লো। তারপর ওদের দেশ র‍্যাশনালিজেশনের ধাক্কার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। পুরাণা জাত চট্ করে' নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না। এইজন্য

"যুক্তিযোগে"র ওপর ওদের শিল্প-বাণিজ্যকে স্থাপিত করতে সময় লাগছে। কিন্তু "যুক্তিযোগে"র তোড়জোড়গুলা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল। শীগ্‌গিরই ওরা অন্য দেশগুলাকে ছাড়িয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

প্রঃ—বৃটিশ সাম্রাজ্যের নৌ-বল আজ মার্কিণ নৌবলের চেয়ে বেশী নয়, ঠিক সমান; বৃটিশ সাম্রাজ্যের আকাশ-বল অন্য অনেক দেশের চেয়েও কম; সুতরাং ইংরেজ কি আজ আগেকার ঠাঁইয়ে আছে?

উঃ—মার্কিণদের নৌশক্তি বিলাতের সমান হ'লে কি হয়? ইংরেজের অভিজ্ঞতা, মাথা ও গোঁ মার্কিণের নেই। কাজেই মার্কিণ বিলাতের নাগাল ধরবে' এমন সময় আস্‌তে এখনও ঢের দেরী।

তবে, এই সঙ্গে একটা কথা বলি যে, এককালে বিলাত প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ছিল। এখন সে সময় আর নেই। এখন অন্যান্য কয়েকটি বড় জাতকে তার সমকক্ষ বলে' মান্‌তে সে বাধ্য হচ্ছে। টাকার বাজার হিসাবে লণ্ডনের যে স্থান ছিল, তা-ও গেছে। নিউইয়র্কে একটা আন্তর্জ্জাতিক টাকার বাজার স্থাপিত হয়েছে। কন্টিনেণ্টেও প্যারিস বা বার্লিনের পক্ষে এই রকম লণ্ডনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে' ওঠা আশ্চর্য্য নয়।

প্রঃ—ইংলণ্ডের এই বিপুল শক্তির কারণ কি?

উঃ—এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রী ফ্রীড্‌রিশ লিষ্ট্ আলোচনা করেছেন। আলোচনা করতে করতে শেষকালে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ইংলণ্ডের নসিবই তার আধিপত্যের ও শক্তির কারণ। এই সম্বন্ধে যার যেরূপ মর্জ্জি সে গবেষণা চালিয়ে দেখ্‌তে পারে।

আমি লিষ্ট-প্রণীত বইয়ের তর্জ্জমা করেছি। বলা বাহুল্য আমি কিছু-কিছু তার গুণগ্রাহী সন্দেহ নাই। কিন্তু নেহাৎ বরাত-পন্থী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বরাতের জোরে রাজ্য হাতে আস্‌তে পারে বটে। কিন্তু রাজ্য "রাখা" বরাতের জোরে সম্ভব নয়। তার

জন্য আরও অনেক কিছু আবশ্যক। সেই অনেক-কিছুর একটার কথা আগেই বলেছি। ইংরেজরা বিদেশী আর বিজিত নরনারীর নিত্য-নৈমিত্তিক স্বাধীনতা বাঁচিয়ে চল্‌তে অভ্যস্ত। এই সদ্‌গুণটার দাম লাখ টাকা। বাঙালী চরিত্রে এই গুণের সঙ্গে মোলাকাৎ হয় কিনা গবেষণা করে' দেখা উচিত।

প্রঃ—ইংরেজরা যে দুনিয়ার নানাদেশ শাসন করে' বেড়াচ্ছে, তাতে কি তাদের অবনতি হচ্ছে না? একজন আর একজনকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি শাসন করে, তা হলে তার মনুষ্যত্ব কি খর্ব্ব হয় না?

উঃ—হয়ত কিছু-কিছু হয়। কিন্তু মানুষের চরিত্র এতই বা কি স্বর্গীয় জিনিষ, যে অন্যের ওপর একটু আধিপত্য কর্‌লেই তার অবনতি ঘট্‌বে? তা ছাড়া, আগেই বলেছি, ইংরেজরা সমঝ্‌দার জাত। অন্য লোকের আটপৌরে স্বাধীনতা বাঁচিয়ে তাদের উপর রাজত্ব চালায়। অধিকন্তু যে দেশ তারা শাসন করে সে দেশটা আস্তে-আস্তে "ফেবিয়ান সোশ্যালিষ্ট"দের প্রণালীতে সভ্য ক'রে তুল্‌তে চায়।

প্রঃ—বিলাতে মজুরদের কর্ত্তৃত্ব যদি বাড়ে, ভারতের কি কোনো সুবিধা হ'তে পারে না?

উঃ—না, কারণ ভারতকে প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব দেওয়া মজুরদের স্বার্থেরও বিরুদ্ধে। আজ ত বিলাতের লোকবলের শতকরা ৫০ জন ভোট পেয়েছে। তা সত্ত্বেও কি তারা ভারতকে যথার্থ কর্ত্তৃত্ব দিতে রাজী? মোটেই নয়।

বাঙালী জাত বড় জাত

প্রঃ—আচ্ছা বাঙালী জাতির যোগ্যতা ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উঃ—অনেক দেশ আমি ঘুরেছি। ঘুরে-ঘুরে' আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, চরিত্র-শক্তিতে ও কার্য্যদক্ষতায় বাঙালী দুনিয়ার কোনো জাতের চেয়েই ছোট নয়। কিন্তু আমাদের "রূপচাঁদ" নেই। এই জন্যই আমরা কিছু কর্‌তে পারছি না। একটা কাজের মতন কাজ বাজারে দেখানো যাচ্ছে না। আজ যদি সেই বস্তুটির মুখ দেখা যায়, তা হ'লে বাংলাদেশে একই সঙ্গে দশ-বিশ হাজার কর্ম্মবীর-চিন্তাবীর নানা কর্ম্মক্ষেত্রে-চিন্তাক্ষেত্রে জেগে উঠ্‌তে পারে।

প্রঃ—জাপানী এতটা উন্নতি করেছে, বাঙালী কিছুই কর্‌তে পারছে না। এর কারণ কি? অর্থাভাব ছাড়া আর কিছু কারণ আছে?

উঃ—জাপানীরা বাঙালীর চেয়ে কোনো অংশেই শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু ঐ একটা জিনিষের অভাবেই বাঙালীকে মেরে রেখেছে। মজুর পিছু, চাষী পিছু, কেরাণী পিছু, মাষ্টার পিছু জাপানী পুঁজিপতিরা যতটা "রুধির" ঢালতে পারে তার কাছাকাছি যদি আমরা পারি তাহলে বাঙালী ও এশিয়ার দ্বিতীয় জাপানী বলে দুনিয়ায় পূজা পাবে। বাঙালী জাত বড় জাত। বেশী রুধির ঢালার অন্যতম অর্থ মাথা পিছু বেশী যন্ত্রপাতি প্রয়োগ, বেশী লোহালক্কড় লাগানো, বেশী সঙ্ঘশক্তির সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। জাপানী কায়দায় হাতীঘোড়া কিছু নাই। আছে পুঁজি।

বছর পঁচিশ-ত্রিশ আগে হয়ত অন্য-কিছু বলা দরকার হত। কিন্তু বাঙালী জাতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে' আর অন্যান্য জাতের হাঁড়ির খবর রাখার পর সম্প্রতি ঐ টাকার অভাব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না।

প্র :—কেন? এই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের ভিতর বাঙালী চরিত্রে এমন কি পরিবর্ত্তন বা নতুন লক্ষণ দেখ্‌ছেন?

উ :—বাঙালী জাত যে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় আর স্বার্থত্যাগে দুনিয়ার সকল দেশের সেরা এই ধারণা স্বদেশী আন্দোলনের গৌরবময় যুগেও পূরাপূরি মালুম হয় নি ; তাহার পূর্ব্বে ত এই প্রশ্ন মাথায়ই উঠত না। বাড়তির পথে বাঙালীর অন্যতম লক্ষণ এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আর স্বার্থ-ত্যাগের বাড়্‌তি। অধিকন্তু বাঙালী জাত যে হাতপা'র কাজে আর মাথার কাজে ও খুব ক্ষমতাওয়ালা জাত তাও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বড়-বেশী ধারণা করা সম্ভবপর হয় নি ! কিন্তু এই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের যুবক বাংলা গোটা দুনিয়াকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছেড়েছে যে, যেখানে আমরা একটু-আধটু সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছি সেই খানেই আমরা দুনিয়ার নং ১ শ্রেণীর অন্তর্গত, অর্থাৎ আমরা দিগ্‌বিজয়ী।

রকমারি অর্থশাস্ত্রী

অর্থশাস্ত্রীদের ধরণ-ধারণ

নামজাদা অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর ধনবিজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানের অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন অনেকে। কোনো-কোনো প্রসিদ্ধ গবেষক তিন-তিনটা বিজ্ঞানই আলোচনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইংরেজ পণ্ডিতদের ভিতর আডাম স্মিথ (১৭২৩-৯০) ছিলেন একাধারে দর্শনসেবী এবং ধনবিজ্ঞানসেবী। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওয়াল্টার বেজহট আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) একসঙ্গে অর্থরাষ্ট্র-সমাজশাস্ত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সে ল্যরোআ-ব্যোলিয়্যো (১৮৪৩-১৯১৬) ছিলেন এইরূপ ব্যাপক গবেষণার বড় দৃষ্টান্ত। ইতালির ভিল্‌ফ্রাদ পারেত (১৮৪৮-১৯২৩) ও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। জার্ম্মাণিতে কার্ল্‌মার্ক্‌স্‌ (১৮১৮-১৮৮৩) ছিলেন এই ব্যাপক পথেরই পথিক। জার্ম্মাণ পণ্ডিত-সংসারে এখনো ফ্রান্‌ৎস্‌ ওপ্পেনহাইমার আর অষ্ট্রিয়ায় ওথ্‌মার স্পান সেই ব্যাপকতার ধারা বজায় রাখিয়াছেন।

কিন্তু মোটের উপর একালে একমাত্র ধনবিজ্ঞান, একমাত্র সমাজ-বিজ্ঞান অথবা একমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান লইয়া জীবন কাটানোই গবেষক মহলের দস্তুর। অধিকন্তু ধনবিজ্ঞান বিদ্যার ক্ষেত্র আজকাল এত বিপুল আকারে দেখা দিয়াছে যে, অনেকে এই বিদ্যার দু'একটা মাত্র বিভাগে নিজের অনুসন্ধান-গবেষণা গণ্ডীবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট। তাহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, একমাত্র মুদ্রা, অথবা একমাত্র শুল্ক, অথবা একমাত্র যানবাহন, অথবা একমাত্র মজুরি ইত্যাদি লইয়া জীবন অতিবাহিত

করিয়াছেন এমন লোক বেশী নয়। প্রায় প্রত্যেকেরই গবেষণায় ধন-বিজ্ঞানবিদ্যার দুই, তিন, চার বা এমন কি আরও বেশী বিভাগে পায়চারির রেওয়াজ পরিস্ফুট। ইংরেজ মার্শ্যালকে কোনো এক বিভাগের লোক হিসাবে বাঁধিয়া রাখা চলিবে না। আজকালকার পিগুও নেহাৎ কোনো এক কোঠে আটক হইয়া পড়েন নাই। টাওসিগ, সেলিগম্যান, ফিশার ইত্যাদি মার্কিণ পণ্ডিতদের কাজকর্ম হইতেও এই-রূপই বুঝা যায়। ফ্রান্সে কল্‌সঁ, জিদ্‌, রিস্ত্‌, ক্রুশি, আফ্‌তালিওঁ, উয়ালিদ ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীর রচনায় বহুমুখীনতা দেখিতে পাই। ইতালিতে বেনিনি, মর্ত্তারা, জিনি, গ্রাৎসিয়ানি ইত্যাদি পণ্ডিতেরা নানা ঘরে চেহারা দেখাইয়া থাকেন। আর জার্ম্মাণিতে আডোল্‌ফ ভেবার, মোম্ব্যার্ট, ভিগোজিন্‌স্‌কি, ভাগেমান, সোম্বার্ট, শুমাখার, ভীডেনফেল্ড, ডীল ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীরা বিভিন্ন চিন্তাক্ষেত্রে হাজির থাকিতে অভ্যস্ত।

"ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌" বা সংখ্যাশাস্ত্রকে অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সংখ্যাবিদ্যাকে একটা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বিদ্যার ইজ্জৎ দেওয়া উচিত। কেননা এই বিদ্যা প্রাণতত্ত্বে লাগে, চিকিৎসাশাস্ত্রে লাগে, অপরাধ-বিজ্ঞানে লাগে, আবার চিত্তবিজ্ঞানে লাগে, সমাজবিজ্ঞানে লাগে আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও লাগে। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের বাহিরেও সংখ্যা-বিজ্ঞানের ডাক পড়ে অহরহ। বর্ত্তমানে এইটুকু জানিয়া রাখা দরকার যে, কি ব্যাঙ্ক, কি বীমা, কি মুদ্রা, কি মজুরি, কি লোকবল, কি জমিজমা, কি মূল্য,—সকল ক্ষেত্রেই অঙ্কের তালিকা, ত্রৈরাশিক, "সূচীসংখ্যা" আর শতকরা হিস্যার কথা চোপর দিনরাতই কাজে লাগিতেছে। ধন-বিজ্ঞানের গবেষক মাত্রেই সংখ্যাশাস্ত্রের হিক্‌মৎ করিতে বাধ্য।

উচ্চতর জটিলতর "গণিত"-বিদ্যা ধনবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রায়ই আবশ্যক হয় না। আজ পর্য্যন্ত জগতের ছোট-বড়-মাঝারি দেশে

সরকারী সংখ্যাদপ্তরগুলা যে ধরণের সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে তাহার জন্য ভারতীয় ম্যাট্রিক বিদ্যার বেশী মাপের অঙ্ক লাগে না। দেশ-বিদেশের অর্থশাস্ত্রীরাও যে সমুদয় গবেষণা চালাইতে অভ্যস্ত তাহার জন্যও মামুলি পাটিগণিত পার হইতে হয় না। কাজেই ধনবিজ্ঞান-গবেষকদের পক্ষে সংখ্যা-বিজ্ঞানের নাম শুনিবামাত্র আঁৎকাইয়া উঠিবার দরকার নাই। উচ্চ অঙ্গের গণিত (ক্যাল্‌কুলাস) যে সকল গবেষণায় লাগে সেই সকল গবেষণার সাহায্যে সংখ্যা-বিজ্ঞানের "আলোচনা-প্রণালী" বাড়্‌তির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার ফলে ধনবিজ্ঞানও কথঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর হইতেছে। সেই দিকে আজকালকার পণ্ডিত মহলে দু'এক জন করিয়া সংখ্যাশাস্ত্রীরা ঝুঁকিতেছেন। উচ্চতর "গণিতের" দ্বারা আলোচনা-প্রণালীর সূক্ষ্মতা ও গভীরতা বাড়াইবার চেষ্টায় সংখ্যা-শাস্ত্রীরা ভবিষ্যতে আরও বেশী মোতায়েন থাকিবেন এখনই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া অর্থশাস্ত্রীদের তরফ হইতে "সকলকেই" উচ্চতর গণিত বা উচ্চতর সংখ্যাবিজ্ঞান দখল করিতে চেষ্টা করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। ভারতবর্ষের প্রত্যেক ধনবিজ্ঞান-গবেষকের পক্ষে সংখ্যাশাস্ত্র কিঞ্চিৎ-কিছু চাই-ই-চাই। তবে কোন্ গবেষক সংখ্যা-বিজ্ঞানের কতখানি দখলে আনিবেন তাহা প্রত্যেকের নিজ-নিজ গবেষণাক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিবে।

বক্তৃতা দেওয়া, পুস্তিকা লেখা আর গ্রন্থকার হওয়া অর্থশাস্ত্রীদের অনুসন্ধান-গবেষণার অন্যতম লক্ষণ। আর এক লক্ষণ হইল পত্রিকায়-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা অথবা পুস্তিকা-পত্রিকা-গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সার বা সমালোচনা প্রকাশ করা। বস্তুতঃ প্রত্যেক ধনবিজ্ঞান-গবেষকের আত্মিক জীবনে পত্রিকা-সম্পাদন অথবা পত্রিকার জন্য রচনা তৈয়ারি করা বই-লেখালেখির চেয়েও আকারে-প্রকারে বড় কাজ।

যে সকল অর্থশাস্ত্রী ধনবিজ্ঞান বিষয়ক ঠেক্‌স্ট্‌বুক লিখিয়া থাকেন তাঁহাদের আলোচনা-ক্ষেত্র অতিমাত্রায় বিস্তীর্ণ বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু পাটিগণিতের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করা আর রুল টানিয়া উৎরাই-চড়াইয়ের রেখাতরঙ্গ দেখানো তাঁহাদের পক্ষে ডালভাত বিশেষ।

এই সকল কথা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে যে, অর্থশাস্ত্রীদেরকে কতকগুলা মার্কামারা শ্রেণীর ভিতর বিভক্ত করিলে বেশী লাভবান হওয়া যায় কি না সন্দেহ। কেননা প্রত্যেকের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বহু বিভাগে মোলাকাৎ ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া কোনো দুএকটা বিষয়ে হয়ত একজন অর্থশাস্ত্রীর সঙ্গে আর একজনের মিল আছে। কিন্তু অন্যান্য মতামতের বেলায় তাহারা এত বিভিন্ন যে, শ্রেণীবিভাগের মেহনৎ একপ্রকার নিরর্থক দাঁড়াইয়া যায়। ফরাসী বুস্কে প্রণীত "আর্থিক মতামতের ক্রমবিকাশ" (১৯২৭), ভারতপ্রসিদ্ধ মার্কিণ হেণী-প্রণীত "আর্থিক মতামতের ইতিহাস", ফরাসী জিদ্‌ ও রিস্ত্‌-প্রণীত "অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস", রুশ-মার্কিণ সোরোকিন প্রণীত "আধুনিক সমাজশাস্ত্র" (১৯২৮), অষ্ট্রিয়ান ওথ্‌মার স্পান-প্রণীত "ধন-বিজ্ঞানের মতামত" (১৯১০), ইংরেজ কেনান প্রণীত "আর্থিক মতের খতিয়ান" (১২২৯) আর হাঙ্গারিয়ান পণ্ডিত সুরাণীউঙ্গার-প্রণীত "বিংশ শতাব্দীর অর্থশাস্ত্র" (লণ্ডন ১৯৩২) রকমারি অর্থশাস্ত্রী বিষয়ক রচনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সব দেখিলেই শ্রেণীবিভাগের লাভালাভ বা সুবিধা-অসুবিধা পরিষ্কার হইয়া আসিবে। শ্রেণীবিভাগের দিকে না ঝুঁকিয়া রকমারি অর্থশাস্ত্রীদেরকে ব্যক্তি হিসাবে চিনিয়া রাখিতে চেষ্টা করাই অনেক সময়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

এই হিসাবে ১৯২৮ সনে প্রকাশিত মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী পল হোমান-প্রণীত

"কন্‌টেম্পোরারি ইকনমিক থট্" (সমসাময়িক ধনবিজ্ঞান) বর্ত্তমান লেখকের পছন্দসই। ইহার ভিতর পাঁচজন অর্থশাস্ত্রীর মতামত আলোচিত আছে। জন বেট্‌স্ ক্লার্ক, থর্ষ্টাইন ভেব্‌লেন, আলফ্রেড মার্শ্যাল, জন হব্‌সন এবং ওয়েজ্‌লি মিচেল,—এই পাঁচ জনের ব্যক্তিত্ব খানিকটা স্পষ্টরূপে খুলিয়া ধরিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। মাঝে-মাঝে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের তুলনা সাধিত হইয়াছে। কিন্তু কোনো অর্থশাস্ত্রীকেই নেহাৎ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া কোনো দলের বা শ্রেণীর অন্তর্গত করা হয় নাই। বস্তুত শ্রেণীবিভাগের সার্থকতা সম্বন্ধে হেমান স্বমত পোষণ করেন না।

মতামত অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিতে যাওয়া একদম নিরর্থকও নয়। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে অর্থশাস্ত্রীগুলার কাঠাম আর মতি-গতি সম্বন্ধে নতুন ধরণের ধারণা জন্মিতে পারে। ১৯২৮ সনে মাদ্রাজে প্রকাশিত "পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ্ সিন্স ১৯০৫" (১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী কালের রাষ্ট্রদর্শন) নামক বইয়ে "জাত-পাত" নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছি। এই গ্রন্থের "রাষ্ট্রদর্শন" শব্দে পাঁচপ্রকার দর্শন বুঝিতে হইবে:—(১) শাসন-ব্যবস্থা ও আইনকানুন বিষয়ক মতামত, (২) আর্থিক মঙ্গল ও উন্নতি সাধন বিষয়ক মতামত, (৩) আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন ও বিধিব্যবস্থাবিষয়ক মতামত, (৪) মানব জাতির ক্রম-বিকাশ ও সমাজগঠন বিষয়ক মতামত, (৫) ব্যক্তিত্ব গঠন ও নৈতিক জীবন বিষয়ক মতামত।

এই পাঁচশ্রেণীর মতামতের যে-কোনোটা প্রচার করিলেই যে-কোনো লোক রাষ্ট্রদর্শনের সেবক বিবেচিত হইতে পারে। মতে-মতে ফারাক্ কত তাহা দেখাইবার জন্য ১৯১৯ সনের পরবর্ত্তী আর্থিক উন্নতি বিষয়ক মত-প্রচারকদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে নিম্ন-

রূপ :—(১) হব্‌সন (ইংরেজ), (২) মার্শ্যাল (ইংরেজ), (৩) কোল্‌ (ইংরেজ), (৪) ওয়েব্‌ (ইংরেজ), (৫) স্নোডেন (ইংরেজ), (৬) ওরেজ (ইংরেজ), (৭) চ্যাস্কা (ইতালিয়ান) (৮) শার্ম্‌ (ফরাসী), (৯) লেনিন (রুশ), (১০) হট্রে (ইংরেজ), (১১) কাল্‌ব্যর্ট্‌সন (মার্কিণ), (১২) হাই-নিশ্‌ (অষ্ট্রিয়ান), (১৩) মেলন (মার্কিণ', (১৪) মাইজেল (জার্ম্মাণ), (১৫) ভাগেমান (জার্ম্মাণ), (১৬) লাভ্যার্ণ্‌ (ফরাসী), (১৭) কেইন্‌স (ইংরেজ), (১৮) লাউক্‌ (মাকিণ), (১৯) বত্তাই (ইতালিয়ান), (২০) ওংলে (বেলজিয়ান), (২১) মার্সাল (ফরাসী), (২২। পিগু (ইংরেজ) (২৩) গ্রোসমান (সুইস), (২৪) শাখ্‌ট্‌ (জার্ম্মাণ), (২৫) টাওসিগ (মাকিণ)।

এই সকল অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর কাহারও কাহারও সঙ্গে রাষ্ট্রশাস্ত্রী ও সমাজশাস্ত্রী ইত্যাদি মূর্ত্তিতে ও গ্রন্থের ভিতর মোলাকাতের ব্যবস্থা আছে। যাহা হউক বর্ত্তমান অধ্যায়ের জন্য এই প্রণালী কায়েম করা হইল না। কয়েকজন অর্থশাস্ত্রী সম্বন্ধে কয়েকটা মোটা কথা বলিয়া যাওয়াই বর্ত্তমানে আসল মতলব।

সীমান্তভোগের অর্থশাস্ত্রী ফোন ভীজার

পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ করা উপলক্ষ্যে ভিয়েনার ধনবিজ্ঞাপনাধ্যাপক ফোন ভীজারকে অভিনন্দিত করা হয়। সেই অভিনন্দনের স্মারকরূপে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আরও দুই তিনখানা গ্রন্থ প্রকাশ এই আন্দোলনের অন্তর্গত। সম্পাদক-সঙ্ঘ তিন জন লইয়া গঠিত। ভীজারের পদে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি বাহাল তিনি এই তিনের একজন। তাঁহার নাম হান্‌স্‌ মায়ার। অষ্ট্রিয়ার সরকারী ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাইশ আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ফেট্টার মায়ারের সঙ্গে এই বিষয়ে সতীর্থ-সুহৃৎ। মার্কিণ মুল্লুক হইতে ১৩ জন ধন-বিজ্ঞান-সেবী ভীজার-স্মারক গ্রন্থাবলীতে প্রবন্ধ দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নামজাদা ও প্রবীণ। উইসকন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলি ও কমন্‌স্‌, হার্ভার্ডের কার্ভার, জন্‌স্‌ হপ্‌-কিন্‌সের কেম্মারার, কলাম্বিয়ার সেলিগ্‌ম্যান, জন বেট্‌স ক্লার্ক আর তস্য পুত্র জন মরিস ক্লার্ক ইত্যাদি পণ্ডিতগণ ভারতে অপরিচিত নন। কিন্তু যাঁহার সম্বন্ধে এই স্মারক-গ্রন্থাবলীর প্রচার হইতেছে তাঁহার নাম ও কাম সম্বন্ধে বোধ হয় ভারতে বেশী-কিছু জানা নাই।

ভীজারের মতামত ইংরেজি ধনসাহিত্যে প্রচারিত করেন স্কটল্যাণ্ডের পণ্ডিত স্মার্ট্‌। ধনবিজ্ঞানে অষ্ট্রিয়ান চিন্তা বলিলে যাহা বুঝা যায় ভীজার তাহারই অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। "মার্জিন্যাল ইউটিলিটি" অর্থাৎ কাজ-কর্ম্মের সীমান্ত-ব্যবহার, সীমান্ত-প্রয়োগ, সীমান্ত-সুখ, সীমান্ত-সুযোগ, সীমান্ত লাভালাভ বা সীমান্ত-ভোগ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এই অষ্ট্রিয়ান গবেষণা-প্রণালীর মোটা কথা। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "উর্‌স্প্রুং উণ্ড হাউপট্‌-গেজেট্‌সে ডেস ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌লিখেন ভের্টেস" (আর্থিক মূল্যের উৎপত্তি ও মূলসূত্র) নামে ১৮৮৪ সনে প্রকাশিত হয়। আর একখানা বইয়ের নাম "ড্যর নাট্যিরলিখে ভের্ট্‌" (প্রকৃতিসিদ্ধ মূল্য)। এটা ১৮৮৯ সনে বাহির হয়। ১৯২৬ সনে ভীজারের মৃত্যু হইয়াছে।

"অষ্ট্রিয়ান" রীতির প্রবর্ত্তক ভিয়েনার অর্থশাস্ত্রী কার্ল মেঙ্গারের (১৮৪০-১৯২২) চিন্তাপ্রণালী কোনো-কোনো বিষয়ে ভীজারের গবেষণায় গভীরতর ও বিস্তৃততর হয়। "গ্রেন্‌ৎস্‌-নুট্‌সেন" অর্থাৎ সীমান্তের সুখ বা সুযোগ শব্দটা ভীজারের তৈয়ারি। প্রত্যেক ভোগ-ব্যবহার-প্রয়োগ-কাণ্ড বহুসংখ্যক ছোট-ছোট ভোগ, ব্যবহার বা

প্রয়োগের সমষ্টি। এক গেলাস জল খাওয়ার বেলায় এই কথাটা অতি সহজেই বুঝিতে পারি। প্রথম চুমুক বা ঢোঁক, দ্বিতীয় চুমুক ব ঢোঁক, তৃতীয় চুমুক বা ঢোঁক ইত্যাদি রূপে জলপান-কাণ্ড সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়। আট-দশ ঢোঁকে জল খাওয়া পূর্ণতা লাভ করে। যেই প্রথম চুমুক লওয়া হইল তৎক্ষণাৎ তৃষ্ণা বা চাহিদাও "কিছু" নিবারিত হইল। সেই সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় ঢোঁকের জন্য আগ্রহ বা চাহিদাও কিছু কমিয়া গেল। সেইরূপ দ্বিতীয় ঢোঁকের সঙ্গে-সঙ্গে আগামী তৃতীয় ঢোঁকের জন্য আগ্রহও কমিয়া যায়। যদি অষ্টম ঢোঁকে জল খাওয়া শেষ হয় অর্থাৎ পিপাসা পূরাপূরি নিবারিত হয়, তাহা হইলে অষ্টম ঢোঁককে শেষ ঢোঁক, সীমানার ঢোঁক বা সীমান্তের ঢোঁক বলিতে হইবে। এই ঢোঁকের জন্য আগ্রহ বা চাহিদা সপ্তম ঢোঁকের চেয়ে কম, ষষ্ঠ ঢোঁকের চেয়ে কম ইত্যাদিও বুঝিয়া রাখা দরকার। অর্থাৎ যে-কোনো ভোগ, যে-কোনো ব্যবহার বা যে-কোনো প্রয়োগের কথা ধরি না কেন, সর্ব্বত্রই প্রত্যেকটার ভিতর বহুসংখ্যক ভোগ-ব্যবহার-প্রয়োগের ধারা এবং সমষ্টি দেখিতে হইবে। আর সংখ্যা হিসাবে শেষ প্রয়োগ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়োগের চেয়ে কম জরুরি অর্থাৎ কম দামের জিনিষ। এই গেল অতি সহজে সীমান্ত-সুখের তত্ত্বকথা। ইংরেজ মার্শ্যালের চেলা হিসাবে ভারত-সন্তানের পক্ষে এই তত্ত্ব সুপরিচিত। দেখা যাইতেছে যে, এই গবেষণা-প্রণালীর ভিতর খানিকটা চিত্তের কথা আছে, আকাঙ্ক্ষার এবং আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির কথা আছে। সঙ্গে-সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার "পরিমাণে"র কথা, নিবৃত্তির পরিমাণের কথা, ভোগের "মাত্রা"র কথা, সুখের মাত্রার কথা, ইত্যাদি অঙ্কমূলক বিশ্লেষণও আছে।

কোনো বাজারে হাজির হইলে দেখা যায় যে, একটা জিনিষের জন্য পাঁচটা খরিদ্দার খাড়া আছে। প্রত্যেকেই দর যাচাই করিতেছে।

কিন্তু জিনিষটা হইতে ভিন্ন ভিন্ন খরিদ্দার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের সীমান্ত-সুখ আশা করিতেছে। সীমান্ত-সুখ এত বিভিন্ন বলিয়া ভিন্ন-ভিন্ন খরিদ্দারের নিকট জিনিষটার জন্য আগ্রহ ভিন্ন-ভিন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেকে ঠিক একই দাম দিতে প্রস্তুত নয়। ভিন্ন-ভিন্ন দামের প্রস্তাব আসিতেছে। দাম বলিবার সময় খরিদ্দারেরা নিজ নিজ সীমান্ত-সুখের পরিমাণ ছাড়া আর কিছু ভাবিতেছে না। সীমান্ত-সুখের পরিমাণ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ভিন্ন-ভিন্ন হইবার কারণ অতি সোজা। তাহাদের প্রত্যেকেরই ঘরে বা ভাণ্ডারে ঐ ধরণের আরও জিনিষ অল্প-বিস্তর আছে বলিয়া। কার ভাণ্ডারে কত "ঢোঁক" বা চুমুক ঐ মালটা আছে তাহা বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকে বাজারের ঐ "ঢোঁক"টা সম্বন্ধে আগ্রহ বা চাহিদা অর্থাৎ মূল্য দেওয়ার প্রবৃত্তি প্রকাশ করে।

ভীজার পূরাপূরি চিত্ত-নিষ্ঠ। মার্শ্যালও চিত্তনিষ্ঠ সন্দেহ নাই,—কিন্তু মার্শ্যালের গবেষণা বস্তুনিষ্ঠা বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নয়। এই জন্য দেখি যে, মূল্য-নির্দ্ধারণের কাণ্ডে তিনি মালটা তৈয়ারি করিতে কত মেহনৎ বা কত খরচ পড়িয়াছে তাহাও খতাইয়া দেখিতেছেন। একদিকে সীমান্ত-সুখ, অপর দিকে উৎপাদনের খরচ,—এই দুই দিকে নজর রাখিয়া চলা মার্শ্যালের দস্তুর।

গণিতনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্রী লেঅঁ ভালরা

সুইস-ফরাসী অর্থশাস্ত্রী লেঅঁ ভালরা সুইট্‌সাল্যাণ্ডের লোজান-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান বলিলে সাধারণতঃ ভালরার নামই করা হইয়া থাকে। অর্থশাস্ত্রের গণিতনিষ্ঠাকে ইয়োরোপে "লোজান-রীতি"ও বলা হয়।

লেঅঁ ভালরার ধনবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী তিন খণ্ডে বিভক্ত :—

(১) "এল্ম্যাঁ দেকোনোমী পোলিটিক প্যুর" (অমিশ্র ধনবিজ্ঞান)। এই খণ্ডের অপর নাম "তেওরী দ্য লা রিশেস্ সোসিয়াল" (সামাজিক সম্পদের তত্ত্বকথা) (১৮৭৪)।

(২) "এত্যিদ দেকোনোমী সোসিয়াল" (সামাজিক ধনবিজ্ঞান বা সমাজের অর্থকথা)। সম্পত্তি ও রাজস্ব বিষয়ক আইনকানুনের প্রভাবে ধনসম্পদের বিতরণ বা বণ্টন কিরূপ আকার ধারণ করে তাহা এই খণ্ডের আলোচিত বিষয়। (১৮৯৬)।

(৩) "এত্যিদ্ দেকোনোমী পোলিটিক আপ্লিকে" (ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড), কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক সম্পদ সৃষ্টির তত্ত্বকথা (১৮৯৮)।

"অমিশ্র ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে (১৯০০) নিম্নলিখিত বিষয়গুলা ঠাঁই পাইয়াছে,—

১। ধনবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও শাখা।

২। দুই বস্তুর বিনিময় বিষয়ক তত্ত্বকথা।

৩। বহু বস্তুর বিনিময় বিষয়ক তত্ত্বকথা।

৪। মালোৎপাদনের তত্ত্বকথা।

৫। পুঁজিগঠন ও কর্জ্জ-ব্যবস্থার তত্ত্বকথা।

৬। ধন-চলাচল ও মুদ্রাবিষয়ক তত্ত্বকথা।

৭। আর্থিক উন্নতির কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ। মূল্য, কর ও সুদ বিষয়ক বিলাতী মত খণ্ডন এই অধ্যায়ের অন্তর্গত।

৮। শুল্ক, একচেটিয়া ব্যবস্থা ও রাজস্ব।

পরিশিষ্ট :—(ক) মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে জ্যামিতির প্রয়োগ। (খ) মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ পণ্ডিত আউস্পিট্স্ ও লীবেন প্রচারিত মত সমালোচনা।

অধ্যায়গুলা সবই যেন বীজগণিতের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ বিশেষ। পাটি-

গণিতের ১, ২, ৩, ৪ ভাল্রার আলোচনা-প্রণালীতে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে বইয়ের ভিতর জ্যামিতিক রেখা-তরঙ্গের ঠাঁই আছে বিস্তর।

ধনবিজ্ঞানের মোটা কথাগুলা ভাল্রার বিচারে নিম্নরূপ।

"লেকোনোমী পোলিটিক প্যির" অর্থাৎ অমিশ্র ধনবিজ্ঞান বলিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃ মূল্য নির্দ্ধারণের তত্ত্বকথা আলোচনা করা হইতেছে। আর দ্বিতীয়তঃ, ষোল আনা স্বাধীন টক্কর চলিতেছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যে সকল জিনিষের :মূল্য থাকা সম্ভব সেই সবই "রিশেস্ সোসিয়াল" বা সামাজিক সম্পদের সামিল। জিনিষ-গুলা বৈষয়িক কি আত্মিক তাহাতে যায় আসে না। সেই সবের মূল্য থাকিলেই হইল। কোনো জিনিষের মূল্য থাকার অর্থ এই যে, প্রথমতঃ এইগুলার দ্বারা কোনো না কোনো আকাঙ্ক্ষা বা অভাব পূরণ করা সম্ভব। আর দ্বিতীয়তঃ সেইসব "বিরল" অর্থাৎ পরিমাণে এই সমুদয়ের সীমা আছে। কাজেই মূল্যতত্ত্ব হিসাবে অমিশ্র অর্থশাস্ত্রকে সামাজিক সম্পদের বিজ্ঞানও বলা যাইতে পারে।

মূল্যতত্ত্বের গোড়ার কথা বিনিময়। পুঁজিগঠন-কাণ্ডেও বিনিময় বা মূল্যতত্ত্বের খেলাই দেখিতে হইবে। যে-কোনো আর্থিক কার-বারই দেখিনা কেন সর্ব্বত্রই স্থিতি-সাম্য আসল কথা। এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্র আর্থিক কাণ্ডে দুইটা ঘটনা ঘটে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিনিময়-সাধক, বেপারী বা বাজারের লোক তাহার চরম সুখ-সুযোগ, অভাব-পূরণ বা আনন্দ-ভোগ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে-পরিমাণ জিনিষের জন্য চাহিদা ছিল আর যে-পরিমাণ জিনিষের জোগান দেওয়া হইয়াছে এই দুইয়ে সমতা উৎপন্ন হয়।

পুঁজিগঠন আর কর্জ্জ-ব্যবস্থার বিশ্লেষণেও মূল্যতত্ত্বের :আলোচনাই

প্রধান কথা। দেখা যাউক টাকা জমানো কাহাকে বলে। লোকেরা টাকা দিয়া মাল অথবা মজুরের বা অন্যান্য লোকের মেহনৎ খরিদ করিতে পারে। কিন্তু হয়ত তাহারা এই সব চায় না। তাহাদের চাহিদা অন্যরূপ হওয়া সম্ভব। তাহারা টাকা দিয়া নতুন টাকা চায় অর্থাৎ পুরাণা পুঁজির ব্যবহার করিয়া নূতন পুঁজি ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। অপর দিকে সংসারে এমন লোকও আছে যাহারা "কুদরতি" মাল অথবা "পাকা" মাল প্রস্তুত করিতে চায় না। তাহারা হয়ত নয়া পুঁজি তৈয়ারি করিবার কাজে মোতায়েন আছে। বাজারের একদিকে পুরাণা পুঁজি মজুত রহিয়াছে, অপর দিকে নয়া পুঁজি সৃষ্ট হইতেছে। এই নয়া পুঁজির দাম হইবে কি রূপ? নয়া পুঁজির স্রষ্টারা যদি দেখে যে তাহাদের খর্চ্চার চেয়ে বিক্রীর দর বেশী তাহা হইলে তাহারা প্রচুর পরিমাণে নয়া পুঁজির সৃষ্টিতে লাগিয়া যাইবে। আবার যদি দেখে যে বিক্রীর দর খর্চ্চার চেয়ে কম তাহা হইলে তাহারা হাত গুটাইয়া বসিবে। মামুলি মাল তৈয়ারির কারবারে যে ব্যবসা-প্রণালী দেখা যায় সেই ব্যবসা-প্রণালীই নয়া পুঁজি তৈয়ারির কারবারে ও পরিস্ফুট। সর্ব্বত্রই চলিতেছে টক্কর। এই টক্করের প্রভাবে পুরাণা পুঁজির আয় নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায় আর নয়া পুঁজির দরও নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়ে।

ধনবিজ্ঞানের মূল্যতত্ত্ব বা বিনিময়-তত্ত্ব "চরম" অভাব-পূরণ বা "গরিষ্ঠ" সুখ-ভোগের কথা ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকন্তু চাহিদায় আর জোগানে সমতা বা সাম্য সম্বন্ধ মূল্যতত্ত্বের বনিয়াদ। "পরিমাণে"র কম-বেশী আর সমতা লইয়া আলোচনা করিতে বসার অর্থই মাপা-জোকা বা গণনার দিকে আসা। কাজেই গণিতশাস্ত্র ধনবিজ্ঞানের

ভিত্তিরূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ ভাল্‌রার মতে গণিত ছাড়া ধনবিজ্ঞান বিদ্যা জন্মিতেই পারে না।

ভাল্‌রা বলিতেছেন যে, ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী জেভন্‌স্ তাঁহার "থিয়োরি অব পোলিটিক্যাল ইকনমি" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) প্রচার করিয়াছেন যে,—"সীমান্ত-সুখের নিয়মানুসারে মালের মূল্য নিরূপিত হইবা মাত্র মালোৎপাদনে সাহায্যকারী মেহনৎ আর বস্তুগুলার মূল্য ও নিরূপিত হইয়া যায়। অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে কোনো বাজারে জিনিষের দাম নির্দ্ধারিত হয় সেই মুহূর্ত্তেই তাহা তৈয়ারি করিবার জন্য যে মজুর লাগিয়াছে, তাহার মজুরি, যে পুঁজি লাগিয়াছে তাহার মূল্য বা সুদ, আর যে জমি লাগিয়াছে তাহার ভাড়া এই তিনেরই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইতে বাধ্য। কেন না ষোল আনা টক্করের ব্যবস্থায় মালের বিক্রয়-মূল্যে আর মালোৎপাদনের খরচ-মূল্যে সমতা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মালের দাম জানা থাকিলে তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য কত খরচ পড়িয়াছে তাহাও জানা হইয়া যায়। জেভন্‌স্ খোলাখুলি বলিয়াছেন যে, এই মত রিকার্ডো আর মিল প্রচারিত মতের বিলকুল উল্টা। কেন না তাঁহারা মালোৎপাদনের খর্চ্চা হইতে মালের বিক্রয়-মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে অভ্যস্ত।"

জেভন্‌সের এই মত স্বাধীন ভাবে মেঙ্গার ইত্যাদি অষ্ট্রিয়ার অর্থ-শাস্ত্রীরাও প্রচার করিয়াছেন। ভাল্‌রা বলিতেছেন,—"দুঃখের কথা, ইংরেজ অর্থশাস্ত্রীরা জেভন্‌স্‌কে অগ্রাহ্য করিয়াছে। তাহারা রিকার্ডো-প্রচারিত উৎপাদনের খর্চ্চা ভুলিতে রাজী নয়।" অপর দিকে ফ্রান্সের "আকাদেমী দে সিআঁস্ মরাল্‌জএ পোলিটিক" বা নীতিশাস্ত্রপরিষৎ ও ভাল্‌রার অমিশ্র ধনবিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল। এই কথা ভাল্‌রা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। তবে তাঁহার মত যে স্বাধীনভাবে

প্রতিষ্ঠিত এবং মেঙ্গার আর জেভন্‌সের মতের সঙ্গে যে তাঁহার মতের মিল আছে সেই বিষয়ে তিনি কোনো সন্দেহ রাখেন নাই।

মেঙ্গার-প্রণীত "গ্রুণ্ড্রিস্ ড্যর ফোল্ক্‌স্-ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌স্‌লেরে" অর্থাৎ ধনবিজ্ঞানের মূলসূত্র গ্রন্থকে (১৮৭২) তিনি জেভন্সের বইয়ের (১৮৭১) মতনই নিজ গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে বিবৃত করিয়াছেন। তবে ১৮৭৪ সনে তাঁহার বইয়ের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হয় তখন তিনি এই দুইটার কোনটারই খবর পান নাই।

যাহা হউক, ভাল্‌রা বলিতেছেন,—"মেঙ্গার অবরোহ-পদ্ধতির যুক্তিশাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন। তিনি গণিতের প্রয়োগ করেন নাই। অবশ্য চাহিদা বা জোগান বুঝাইবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে অঙ্করাশির সাহায্য লইয়াছেন। কিন্তু মেঙ্গার আর ভীজার ও ব্যেম্-বাভার্ক্ ইত্যাদি মেঙ্গার-পন্থীরা গণিত-প্রয়োগ সম্বন্ধে নারাজ বলিয়া একটা মূলবোন্ চিন্তাপ্রণালী হইতে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। বিশেষতঃ যে বিষয়টা মুখ্যতঃ গণিতের মামলা, সেই বিষয়ের বিশ্লেষণে গণিতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। যাহা হউক, অসম্পূর্ণ আলোচনা-প্রণালী ও অপর্য্যাপ্ত ভাষার সাহায্যেও তাঁহারা বিনিময়-তত্ত্বের গোড়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারিত গ্রেন্‌ৎস্-নুট্‌সেন বা সীমান্ত-সুখ জগতের অর্থশাস্ত্রীদের নজর টানিয়া লইতে পারিয়াছে।

১৯০০ সনে ভাল্‌রার গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয়। তখনও গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অর্থশাস্ত্রীদের বিদ্বেষ বেশ জবররূপে দেখা যাইত। গণিত-বিদ্বেষীদের মত ছিল নিম্নরূপ :—"লা লিব্যার্তে ইম্যেন ন্য স্য লেস্ প্যা মেৎর্ আন্ একোয়াসিওঁ", অর্থাৎ মানুষের স্বাধীনতাকে সাম্যসম্বন্ধের ভিতর বাঁধিয়া রাখা যায় না। অর্থশাস্ত্রে

গণিত-প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাঁহারা অন্যান্য কারণেও আপত্তি তুলিতেন। তাঁহাদের বিবেচনায় সব কয়টা নীতিশাস্ত্রই বিচিত্র ধরণের জটিল লেনদেন, পরস্পর-বিরোধ, বেখাপ্পা সম্বন্ধ ইত্যাদি সামঞ্জস্যহীন অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত। এই সকল বেখাপ্পা-বেসুরো সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া গণিতশাস্ত্রীরা মন-গড়া সাম্য, সমতা, শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য খাড়া করিতে অগ্রসর।

ভাল্‌রা গণিতনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতেন। তাঁহার বাণী নিম্নরূপ:—"কেপ্লার-প্রবর্ত্তিত জ্যোতিষবিদ্যাকে আর গালিলেও-প্রবর্ত্তিত যন্ত্রবিদ্যাকে নিউটন ও লাপ্লাসের জ্যোতিষ-বিদ্যায় আর দালেঁবেয়ার ও লাগ্রাঁজের যন্ত্র-বিদ্যায় রূপান্তারিত করিতে লাগিয়াছে বৎসর শ'দেড়-দুই'। আডাম স্মিথের (১৭৭৬) পর কুর্নো (১৮৩৮) গস্‌সেন (১৮৫৪), জেভন্‌স্ (১৮৭১) আর আমার রচনা (১৮৭৪) পর্য্যন্ত বৎসর শয়েক মাত্র গেল। দেখা যাইতেছে যে, আমরা আমাদের খুঁটায় মোতায়েন ছিলাম আর আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিও। উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্স বিজ্ঞানবিদ্যায় আর সমাজ-বিদ্যায় কোনো প্রকার যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখে নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এমন কি ফরাসীরাও এই যোগাযোগ কায়েম করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবে। তখন গণিত-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান গণিতনিষ্ঠ জ্যোতিষ আর গণিতনিষ্ঠ যন্ত্রবিদ্যার পাশেই আসন পাইবে। আর সেই দিনই জুস্তিস্ সু সেরা রাঁদ্যু অর্থাৎ আমাদের প্রতিও সুবিচার করা হইবে।"

বুঝিতে হইবে যে, ১৯০০ সনেও গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান "জাতে উঠে" নাই। তখনও ইহাকে অর্থশাস্ত্রীদের আখ্‌ড়ায় ভদ্রলোকের "পাতে" দেওয়া চলিত না। সেই আবহাওয়ায়ই ভাল্‌রার "অমিশ্র ধনবিজ্ঞান"-

গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত। ভাল্‌রার পক্ষে চরম আপশোষের কথা এই যে, চতুর্থ সংস্করণের যুগেও প্যারিসের "আকাদেমী দে সিয়ঁাস্ মরাল্‌জএ পোলিটিক" তাঁহার গণিত-নিষ্ঠা সম্বন্ধে মত বদলাইতে রাজি হইল না!

স্বাধীনতার অর্থশাস্ত্রী কাস্‌সেল

লড়াইয়ের যুগে (১৯১৪-১৮) দেশ-বিদেশের মুদ্রা সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা চালাইয়া সুইডেনের অর্থশাস্ত্রী গুষ্টাভ্ কাস্‌সেল নামজাদা হন। ১৯২০ সনে ব্রুসেল্‌সের আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-সম্মেলনের মারফৎ তাঁহার মতামত জগতে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতে ও কাস্‌সেল-প্রচারিত "ক্রয়-শক্তির সাম্য" (পৃঃ ১৯৯) বিষয়ক সূত্র প্রবেশ লাভ করে। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত মুদ্রানীতি সম্বন্ধে কোথাও কথা উঠিলে কাস্‌সেলের তলব আসে।

অষ্ট্রিয়ান (জার্ম্মাণ) অর্থশাস্ত্রী কার্ল্ মেঙ্গার (১৮৪০-১৯২১) ঐতিহাসিক ধনবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। ১৮৮৩ সনে তিনি ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী আলোচনা করিয়া অবরোহ (ডিডাকৃটিভ) পদ্ধতির স্বপক্ষে রায় দেন। তাহার ফলে পুরাণা "ক্লাসিক" আলোচনা প্রণালী নবযুগ লাভ করে। অর্থাৎ এক কথায় রিকার্ডো পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে এই আলোচনা-প্রণালীকে "অষ্ট্রিয়ান" প্রণালী বলে। এই পদ্ধতির স্বপক্ষে অনেক অর্থশাস্ত্রীর মেজাজ খেলিতেছে। গুষ্টাভ কাস্‌সেল তাঁহাদের অন্যতম। তবে কাস্‌সেল "সীমান্ত-সুখ"-তত্ত্বের পক্ষপাতী নন। অর্থাৎ অষ্ট্রিয়ান ধনবিজ্ঞানের এক মস্ত কথাই তিনি স্বীকার করেন না। তথাপি তাঁহাকে অষ্ট্রিয়ান প্রণালীর অথবা "নবীনীকৃত রিকার্ডো" প্রণালীর মহত্বপূর্ণ প্রতিনিধি বলিতে হইবে।

কাস্‌সেলের মতে কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা, অভাব বা চাহিদা মাপা অসম্ভব। এই সব মাপিবার কোনো যন্ত্র নাই। কাজেই আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদাগুলার ভিতর তুলনা সাধন করাও অসম্ভব। ব্যক্তিগত চাহিদা সমূহই যখন এইরূপ, তখন দলগত বা জাতিগত আকাঙ্ক্ষাসমূহের অবস্থা অন্যরূপ হইবে কি করিয়া? দলে-দলে বা সঙ্ঘে-সঙ্ঘে আকাঙ্ক্ষার তুলনা চালানো অসম্ভব। এই সকল কারণে কাস্‌সেল সীমান্ত-সুখ বা সুযোগ বিষয়ক তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী।

এইখানে জানিয়া রাখা ভাল যে, ক্রয়-শক্তির সমতা বিষয়ক কাস্‌সেল-প্রচারিত মতটা শেষ পর্য্যন্ত রিকার্ডো-প্রবর্ত্তিত মুদ্রার পরিমাণ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রিকার্ডো-পন্থীরা স্বাধীনতাবাদী টক্কর-নিষ্ঠ লোক। কাস্‌সেল অর্থ-শাস্ত্রের গবেষণায় সেই "স্বাধীনতা" বা "উদারতা" চাহিতেছেন। তাঁহার পক্ষে "প্রোটেক্‌শন" (সংরক্ষণ-নীতি) যেমন বিষ বিশেষ, "প্ল্যান্‌ড্‌-ইকনমি"ও সেইরূপ। ১৯৩৪ সনের মে মাসে তাঁহাকে কব্‌ডেন মেমোরিয়্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তদবিরে লণ্ডনে একটা বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। তাহাতে দেখিতে পাই যে, তিনি আর্থিক দুনিয়াকে এই দুই বিষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে যার পর নাই চেষ্টিত।

আজকাল "প্ল্যান্‌ড্‌ ইকনমি" (শাসন-নিয়ন্ত্রিত বা শাসনাধীন বা মোসাবিদা-মাফিক বা লক্ষ্যবদ্ধ আর্থিক ব্যবস্থা) আর "ইকনমিক প্ল্যানিং" (আর্থিক মোসাবিদা বা লক্ষ্য বা শাসন বা নিয়ন্ত্রণ) ইত্যাদি শব্দ দুনিয়ার কেজো মহলে আর লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে হরদম ব্যবহৃত হইতেছে। কাস্‌সেলের মতে এইরূপ চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালীর পশ্চাতে রহিয়াছে লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক দুর্গতি। পৃথিবীর সকল দেশেই আর্থিক দুর্গতি নিবারণের জন্য সংরক্ষণ-শুল্কের

রেওয়াজ খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ শুল্কনীতির আবহাওয়ায় আর্থিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লোকেরা সরকারের শাসন, ইঙ্গিত, পরিচালনা, সাহায্য, হুকুম, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্ম্মকৌশল হজম করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই ব্যাপক ও সর্ব্বগ্রাসী সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বা মোসাবিদা-মাফিক আর্থিক-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক সূত্র বা চিন্তা প্রচার করা অতি স্বাভাবিক। সকলেই কোনো এক কেন্দ্র অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে গবর্মেণ্টের অধীনে আর্থিক খুঁটিনাটির সব-কিছুই ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছে। এক হিসাবে অতিমাত্রায় সংরক্ষণ-নীতি কায়েম করাও যা,—প্ল্যান্‌ড-ইকনমি বা শাসন-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থার স্বপক্ষে পাঁতি দেওয়া বা তাহার অধীনস্থ হইয়া কাজকর্ম্ম চালানোও তা। এই দুই আর্থিক নীতি বা কর্ম্মকৌশল মোটের উপর একার্থক।

কাস্‌সেল বলিতেছেন,—অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা মোসাবিদা-মাফিক কাজকর্ম্ম চালানো সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত একমাত্র নাম-লেখানো সোশ্যালিষ্টরা গলাবাজি করিতে অভ্যস্ত ছিল। আজকাল কিন্তু এমন সব লোক ইহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে যাহারা সোশ্যালিজ্‌ম্‌কে বিষ বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। মনে রাখিতে হইবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে "মার্কাণ্টাইল" (বাণিজ্য-নিষ্ঠ) মতের অর্থ-কৌশল জারি ছিল। তাহার বিধানে গবর্মেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থা দুনিয়ার পক্ষে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইত। এই "মার্ক্যাণ্টিলিজম"এর (বাণিজ্য-নিষ্ঠার) বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অর্থশাস্ত্রীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে উনবিংশ শতাব্দীতে "স্বাধীনতা"র, প্রতিযোগিতার, স্বাধীন টক্করের অর্থনীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। "বাণিজ্যনিষ্ঠ" মতের বিরোধী মতকে সহজে "লিবার্যাল" (উদার) মত বলা হয়। উদার-

পন্থী টঙ্করনিষ্ঠ স্বাধীনতাপন্থীদের চিন্তায় সমাজমঙ্গলের আসল উপায় হইতেছে বাজার-দরের অবাধ বা স্বাধীন গতিবিধি। উদারপন্থীদের যুক্তি বা মত নিম্নরূপ,—"জোগান আর চাহিদা এই দুই শক্তির খেলায় বাহির হইতে অথবা উপর হইতে কোনো নতুন শক্তি চাপাইয়া দেওয়া অন্যায়। জিনিষপত্রের দাম এই দুই শক্তির প্রভাবে,—দর-কষাকষির ঠেলায় আপনা-আপনি যেখানে গিয়া ঠেকে সেইখানেই তাহার থাকা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ধনোৎপাদনের সকলপ্রকার রসদ, সরঞ্জাম বা মালমশলা সমাজের অভাব পূরণ করিবার কাজে স্বাভাবিক প্রণালীতেই প্রযুক্ত হইতে পারিবে। সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর আপনা-আপনিই প্রত্যেক মাল আর মাল প্রস্তুত করিবার প্রত্যেক সরঞ্জাম নিজ নিজ ঠাঁই দখল করিতে সমর্থ হইবে। আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক জিনিষের দামও সহজেই স্বাভাবিক আকারে দেখা .দিবে।" এইরূপ ছিল মার্ক্যান্টিলিজম্-বিরোধী উদারপন্থী অর্থশাস্ত্রীদের মূল্য-বিষয়ক আর আর্থিক ব্যবস্থা বিষয়ক ধারণা। এই ধারণার উপরই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা এক কথায় বর্ত্তমান জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে।

আজ কিন্তু বর্ত্তমান জগতের বনিয়াদের বিরুদ্ধেই অর্থশাস্ত্রীদের এবং রাষ্ট্রনায়কদেরও মত আর কর্ম্ম প্রযুক্ত হইতেছে। "প্ল্যান্‌ড-ইকনমি"-ওয়ালারা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণপন্থীরা উদারপন্থীদের গোড়ার কথাগুলাই একদম লোপাট করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীন মূল্য-গঠনের বিরুদ্ধে তাঁহারা ব্রতবদ্ধ।

নিয়ন্ত্রণ-পন্থীরা বা মোসাবিদা-বাদীরা নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার জোরে সকল প্রকার দ্রব্যের ও নক্‌রির দাম বাঁধিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন। তাঁহারা প্রকৃতির উপর বিশ্বাস রাখেন না। কিন্তু প্রতি-পদেই তাঁহারা গণ্ডা-গণ্ডা ভুল করিয়া বসিতেছেন আর ভুলগুলা

শুধরাইতে গিয়াও নতুন-নতুন ভুল ডাকিয়া আনিতেছেন। কিছুদিন ধরিয়া জগতের নানা স্থানে চাষ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে রাষ্ট্র-নায়কেরা মোসাবিদা-পন্থী রূপে কাজ করিতেছেন। চাষের পরিমাণ বাড়াইবার দিকে অথবা কমাইবার দিকে "ইকনমিক-প্ল্যানিং"-ওয়ালাদের মস্ত ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই চাষ-নিয়ন্ত্রণ কাণ্ডে বহুসংখ্যক গলদ ধরা পড়িয়াছে। এই সব দেখিয়া লক্ষ্যমাফিক আর্থিক শাসনের স্বপক্ষে পাঁতি দেওয়া বর্ত্তমানে আর সাজে না।

স্বাধীন টক্করশীল আর্থিক ব্যবস্থার যুগে ইয়োরামেরিকার দেশগুলার আয়ের ভোগ, প্রয়োগ বা ব্যবহারের অতিরিক্ত জিনিষ বাঁচাইবার ব্যবস্থা ছিল। ভোগ আর উদ্বৃত্ত এই দুইয়ের সম্বন্ধ আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিত। ফি বৎসর আয় শতকরা ৩৲ টাকা হারে উদ্বর্ত্তরূপে বাঁচিত। আয় স্বভাবতই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িত:— (১) পুঁজি-দ্রব্য, অর্থাৎ নতুন ধনদৌলত স্থষ্টি করিবার সরঞ্জাম রূপে উদ্বর্ত্ত, ২) ভোগ্য-দ্রব্য।

আয়ের শতকরা ৩৲ টাকা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার কর্ম্মকৌশল নিয়ন্ত্রণপন্থীদের মগজে এখনো আসে নাই। বস্তুতঃ তাঁহারা এই সম্বন্ধে এখনো মাথার ঘী খরচ করিতে শিখেন নাই। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রথম বর্ষপঞ্চক (১৯২৮-৩৩) বিশ্লেষণ করিলে কি দেখিতে পাই? তাঁহারা আয় হইতে পুঁজি-দ্রব্য এমন জোরসে বাঁচাইয়াছেন যে, ভোগ্য-দ্রব্য একদম কিছুই ছিল না। দুনিয়ার কোথাও কখনো যে-হারে উদ্বর্ত্ত থাকার কথা শুনা যায় নাই রুশিয়ার রাষ্ট্রনায়কেরা সেই হারে আয় হইতে পুজি বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ পুঁজিনিষ্ঠ দেশের প্রণালীতে একদিকে সোভিয়েট রুশিয়ায় মস্ত-মস্ত শিল্প-কারখানা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু অপরদিকে রুশ জনসাধারণ না খাইতে পাইয়া

চরম কষ্ট পাইয়াছে। রুশিয়ার কর্ত্তারা প্রথম বর্ষ-পঞ্চকের এই গলদ ধরিতে পারিয়া দ্বিতীয় বর্ষ-পঞ্চকের জন্য সাবধান হইয়াছেন। জন-সাধারণের খাওয়া-পরা যাহাতে উন্নত হয় এইবার তাহার দিকে তাঁহাদের নজর পাড়িয়াছে।

এইবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথা পাড়া যাউক। প্রেসিডেণ্ট রুজ-ভেল্ট লক্ষ্যমাফিক আর্থিক নিয়ন্ত্রণের জবর-দস্ত্ অবতার সন্দেহ নাই। তিনি নিয়ন্ত্রণের মোসাবিদায় রুশিয়ার ঠিক উল্টা পথে চলিয়াছেন। রুশ কর্ত্তারা ভোগ্যদ্রব্যের ধার ধারেন নাই। রুজভেল্ট একমাত্র ভোগ্য দ্রব্যের কথাই ভাবিয়াছেন। যেন-তেন প্রকারেণ মার্কিণ নরনারীর খাওয়া-পরা উন্নত করিবার ধান্ধা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। অর্থাৎ পুঁজি-দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার মাথা-ব্যথা নাই। এই ধরণের "প্ল্যান্ড-ইকনমি"ও গলদে ভরা। কেননা সমাজ-মঙ্গলের জন্য একসঙ্গে চাই ভোগ এবং পুঁজি দুই-ই। রুজভেল্ট ভোগের গান গাহিতেছেন। পুঁজির সুর এখনো তাঁহার কানে বাজিতেছেনা। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিবেন। পুঁজির গান তাঁহাকেও গাহিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, নিয়ন্ত্রণপন্থীরা রুশিয়ায়ও ভুল করিয়া বসিয়াছেন আর মার্কিণ মুল্লুকেও ভুল করিয়া বসিয়াছেন। ভুল করা সম্বন্ধে যাঁহা বোলশেভিক রাষ্ট্র, তাঁহা পুঁজিনিষ্ঠ রাষ্ট্র। নিয়ন্ত্রণের ফলে আর্থিক দুনিয়া খানিকটা যুক্তিনিষ্ঠ হইয়াছে এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা ভ্রান্ত। কাস্‌সেলের মতে ১৯১৪ সনের তুলনায় জগৎ আজকাল বেশী যুক্তিনিষ্ঠা (র‍্যাশন্যালিজেশন) দেখাইতেছে না।

পান্তালেঅনি ও পারেত

ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রীদের নাম-কাম ভারতে একপ্রকার অজ্ঞাত।

১৮৯৬ সনে কস্‌সা-প্রণীত "ধনবিজ্ঞানের ভূমিকা" (ইস্ত্রডুৎসিঅনে আল্ল স্তুদিঅ দেল্লেকনমিয়া পলিতিকা) মিলানে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বইয়ের ইংরেজী তর্জ্জমা ভারতেও প্রচারিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-১৪) তাহার সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম।

কিন্তু সেই যুগে অন্য কোনো ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রী ভারতীয় আব-হাওয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ,—এক পান্তালেঅনি (১৮৫৭-১৯২৪) বাদে। ১৮৮৯ সনে ইতালিয়ানে প্রকাশিত পান্তালে-অনির বই পরবর্ত্তীকালে "পিওর ইকনমিক্‌স্‌" (অমিশ্র ধনবিজ্ঞান) নামে ইংরেজিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু কস্‌সা বা পান্তালেঅনির প্রভাব ভারতের ইস্কুল-কলেজে একপ্রকার ছিল না বলা চলে।

পান্তালেঅনি মেঙ্গার-প্রবর্ত্তিত আর ভীজার-প্রচারিত অষ্ট্রিয়ান আলোচনা-প্রণালীর প্রতিনিধি। তাঁহার চিন্তায় "সীমান্ত"-সুখের এবং সীমান্ত-কষ্টের তত্ত্ব যথোচিত ঠাঁই পাইয়াছে। ইংরেজ মার্শ্যাল যে-সময়ে অষ্ট্রিয়ান ভাবাপন্ন হইয়া সেকেলে রিকার্ডো-তত্ত্বকে নয়া গড়ন দিতেছিলেন সেই সময়েই ইতালির এই পণ্ডিতও একসঙ্গে অষ্ট্রিয়া ও রিকার্ডোর প্রচারক হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মার্শ্যালের "প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্‌" গভীরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিলে পান্তালেঅনির ছায়া এখানে-ওখানে মাড়াইতে হইবে। পান্তালেঅনির বইটা অতি সরস ভাবে লেখা। জ্যামিতিক 'চার্ট' বা ছবিগুলা সরল প্রণালীতে বুঝানো আছে। বিদেশী অর্থ-সাহিত্য হইতে বাংলা ভাষায় যে কয়খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তর্জ্জমা করা কর্ত্তব্য তাহার ভিতর এই বইখানা সর্ব্বপ্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

নিউইয়র্কে থাকিবার সময়ে, ১৯১৯-২০ সনে পান্তালেঅনির সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের আত্মিক লেনদেন চলিয়াছিল। তখন তিনি রোমে

অধ্যাপক। "জর্ণ্যালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা" (অর্থ ও সংখ্যাশাস্ত্র পত্রিকা) তাঁহার হাতে ছিল। তিনি এই পত্রিকায় বর্ত্তমান লেখকের রচনা প্রকাশিত করেন (এপ্রিল ১৯২০)।

রিকার্ডো-পন্থী ও অষ্ট্রিয়ান-পন্থী ধনবিজ্ঞান-গবেষকেরা "স্বাধীনতার" উপাসক। তাঁহারা সকলেই "লিবার‍্যাল" বা "উদার" মতের লোক। চাহিদা আর জোগানের শক্তি অবাধরূপে কাজ করিতে পারিলেই বাজারে উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। পান্তালেঅনি কট্টর স্বাধীনতাপন্থী এবং কট্টর আশাবাদী ও উন্নতি-নিষ্ঠ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে যে কয়জন নামজাদা ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রীর কথা য়াকপ তিভারণি তাঁহার "কম্পেন্দিঅ দি স্তরিআ দেল্লে ইস্তিতুৎসিঅনি এ দেল্লে দত্রিণে একনমিকে" (আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মতামতের ইতিহাস) গ্রন্থে (বারি ১৯৩৩) প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এইরূপ "ক্লাসিক" ধর্ম্মের লিবার‍্যাল-পন্থী। ফ্রাঞ্চেস্ক ফেরারা (১৮১০-১৯০০) ছিলেন চরমপন্থী "লিবার‍্যাল"। অর্থাৎ জনগণের আর্থিক জীবনে গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ তিনি কোনো মতেই বরদাস্ত করিতে রাজি ছিলেন না। ফরাসী বুস্কে-প্রণীত গ্রন্থের আলোচনায়ও এইরূপ লক্ষ্য করা গিয়াছে।

মেস্কেদালিয়া আঞ্জেল (১৮২০-১৯৯০১) তাঁহার "উদারতায়" কিছু সংযম রক্ষা করিয়া চলিতেন। আঞ্জেল টাকাকড়ি, সরকারী ঋণ, লোকবল, গড়-সংখ্যা ইত্যাদি নানা দিকে মাথা খেলাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পান্তালেঅনিও অনেক লেখা রাখিয়া গিয়াছেন। "লা তেঅরিয়া দেল্লা ত্রাস্‌লাৎসিঅনে দেল্লিম্পস্তা" (ট্যাক্‌স হস্তান্তরের তত্ত্বকথা) গ্রন্থ ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রী মহলে চরম সমাদর লাভ করিয়াছে।

ভিল্‌ফ্রেদ পারেত (১৮৪৮-১৯২৩) ইতালিয়ান বলিয়া পরিচিত।

তাঁহার পিতা ইতালিয়ান বটে, কিন্তু তাঁহার মা ছিলেন ফরাসী। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল প্যারিসে আর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল স্বইট্‌-সার্ল্যাণ্ডের ফরাসী অঞ্চলে। তিনি অধ্যাপকও ছিলেন স্বইস-ফরাসী জনপদের লোজান বিশ্ববিত্যালয়ে। তাঁহার "কুর দেকোনোমী পোলিটিক" নামক ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় লিখিত, বুঝাই যাইতেছে। বলা বাহুল্য, সেকালে পারেত ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিলেন। একালে তাঁহার নাম ও সূত্র একদম অজানা নয়।

ধনবিজ্ঞান বিষয়ক ফরাসী বইটা ১৮৯৬-৯৭ সনে প্রকাশিত হয়। পারেত তখন পান্তালেঅনি আর ফেরারা'র মতন চরম মতের উদার-পন্থী। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার উদারতা খানিকটা "নরম" হইয়াছিল। ১৯০৬ সনে মিলানে তাঁহার যে গ্রন্থ ইতালিয়ান ভাষায় বাহির হয় ("মানুয়ালে দি একনমিয়া পলিতিকা") তাহাতে নরম সুর দেখা যায়।

"আর্থিক স্থিতি-সাম্য" পারেত'র চিন্তায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। তাঁহার গবেষণার ভিতর আর একটা কথার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। আর্থিক জীবনে প্রত্যেক খুঁটিনাটিই অন্যান্য খুঁটিনাটির সঙ্গে সুজড়িত। এই সঙ্গে একটা নতুন দিকে পারেত'র মাথা খেলিতে থাকে। মানুষে-মানুষে যোগাযোগ সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা করেন যে, এই সব লেনদেন জিনিষে-জিনিষে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পদার্থের যোগা-যোগের অনুরূপ। মাল তৈয়ারি করা, মাল বিলি করা অথবা মাল অদল-বদল করা সবই পদার্থ-বিজ্ঞানের—"ফিজিক্‌সের" বা এমন কি "মেক্যানিক্‌সের"—সাহায্যে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কাজেই অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, রাষ্ট্রশাস্ত্র মামুলি গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগক্ষেত্র। সুতরাং ধনবিজ্ঞান পারেত'র হাতে পাকা গণিত-নিষ্ঠ বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহারই নাম "অমিশ্র" ধনবিজ্ঞান।

ষোল আনা মানুষকে জানিতে হইলে একমাত্র অমিশ্র ধনবিজ্ঞানের সাহায্য লইলে চলে না। পারেত'র মতে এই জন্য চাই সমাজশাস্ত্র। কাজেই পারেত সমাজশাস্ত্রের নানাক্ষেত্রেও বিচরণ করিয়াছেন। মানুষের জীবনে তিনি অনেক সময়ে 'যুক্তি'র খেলা ঢুঁড়িয়া পান না। মানুষ সর্ব্বদাই যে মাথা খাটাইয়া, বুদ্ধি খেলাইয়া, বিচার শক্তির দোহাই দিয়া কাজ করে পারেত একথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মানুষমাত্রেই "রাগ দ্বেষ" ইত্যাদি চিত্তবৃত্তির প্রভাবে কাজ করিয়া থাকে। একদিকে হৃদয়ের অনুভূতি বা মগজের খেয়াল অপর দিকে লোকাচার বা রীতিনীতি এই দুই শক্তির খেলা মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তায় খুব বেশী। কাজেই খাঁটি তর্কশাস্ত্রে অথবা বিজ্ঞান-বিদ্যায় যে সব মতামত বা চিন্তাপ্রণালীকে ভুল, অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলা হইবে সেই সবের আধিপত্যই মানুষের জীবনে জবর। এই হইতেছে ১৯১৫-১৬ সনে পারেত'র "ত্রাত্তাত দি সচিঅলজিয়া জেনেরালে"(সমাজ-তত্ত্বের মূলসূত্র) নামক ইতালিয়ানে প্রকাশিত গ্রন্থের "মুদ্দা"। তাঁহার "লে সিস্তেম্ সোসিয়ালিস্ত্" (সমাজতন্ত্রের নানা দল) ১৯০২-৩ সনে প্যারিসে বাহির হইয়াছিল। তাহাতেও এই সমাজদর্শন মূর্ত্তি পাইয়াছে।

পারেত'র বিশ্লেষণে মানুষে-মানুষে প্রভেদ বিস্তর। কাজেই জোর-জবরদস্তি করিয়া সাম্য, স্বরাজ, আত্মকর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি কায়েম করিলে শেষ পর্য্যন্ত এই সব রক্ষা করা সম্ভব নয়। সমাজের ভিতর অসাম্য অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকবার সাম্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গেই অথবা অল্প পরেই আবার নতুন করিয়া অসাম্য দেখা দিতে বাধ্য।

এই অসাম্যের কথা "ফাশিস্ত্" রাষ্ট্রিকদের অতি-প্রিয়। এই জন্য পারেতকে তারিফ করা মুসলিনির পেটোআদের পক্ষে অতি স্বভাবসিদ্ধ।

আর এক কারণেও ফাশিস্তুরা পারেত'র সমাজতত্ত্বকে ফাশিস্ত্ দর্শনের আত্মিক বনিয়াদ বিবেচনা করে। পারেত বলিয়াছেন যে, স্তরভেদ আছে সত্য, কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই সমাজের ভিতর উঠানামা চলিতেছে,—উঁচুরা নামিতেছে আর নীচুরা উঠিতেছে। যে-দলই বা যে-সমাজই ঘটনাচক্রে আজ উঁচু থাকুক না কেন, কোনো-না-কোনো সময়ে তাহার পতন ঘটিবেই ঘটিবে। ধনতন্ত্র, শক্তিতন্ত্র, গুণতন্ত্র ইত্যাদি ব্যবস্থায় উঁচুদের একৃতিয়ার বজায় রাখা সম্ভবপর কি? ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে পারেত বলিতেছেন,—"আল্‌বৎ সম্ভব। কর্ম্মকৌশল সুবিদিত। বিপক্ষকে সবংশে নিধন করা হইয়া থাকে। গোলমেলে লোকগুলাকে জেলে পাঠানো আর এক কায়দা। ঘুষ দিয়া শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে রুখিতে চেষ্টা করা হয়। আর নীচু স্তরের ভিতরকার ডানপিটে বা ত্যাঁদড় ও নেতৃস্থানীয় লোকগুলাকে উঁচুস্তরের লোকেরা খানিকটা ঠেলিয়া তুলিয়া তাহাদের তোয়াজ করে। এই সকল কর্ম্মকৌশল কায়েম করিলে ধনতন্ত্র আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। মিষ্টিমুখে স্বাধীনতা, স্বরাজ, সাম্য ইত্যাদির বোলচাল ঝাড়িতে যাহারা অভ্যস্ত তাহারা বেশী দিন মাথা খাড়া রাখিতে পারে না। তাহাদের পতন ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব। চিরকালই শক্তিযোগী তুখোড় ও বখেটে লোকেরা ছলে-বলে-কৌশলে নীচু স্তর হইতে উঠিয়া উঁচু স্তর দখল করিয়া বসিয়াছে। বর্ত্তমানেও তাহা সম্ভব। ভবিষ্যতেও তাহা ঘটিবে।" এই হইল পারেত'র সমাজদর্শনের এক কাঁচ্চা।

১৯২৩ সনে পারেত যখন মারা যান তখন মুসলিনি সবেমাত্র ফাশিস্ত্-রাজ কায়েম করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে মুসলিনি-রাজ পারেতকে শক্তিযোগের দার্শনিক বলিয়া তারিফ করিতেছে। আজকাল ইতালিতে পান্তালেঅনির চেয়ে পারেত'র ইজ্জৎ বেশী।

পারেত'র চিন্তাক্ষেত্র পান্তালেঅনির চিন্তাক্ষেত্রের চেয়ে বিস্তৃততর। সমাজ আর রাষ্ট্র দুই-ই তাঁহার বিশ্বকোষে বিপুল ঠাঁই অধিকার করিয়াছে। কাজেই নানা শ্রেণীর নানা লোক পারেত'র নিকট নানা প্রকার পাঁতি পাইতে পারে। ফাশিস্ত্‌রাও নিজ মেজাজ মাফিক সূত্র পারেত-দর্শনের ভিতর আবিষ্কার করিয়াছে।

এখনো পারেত'র রচনা ইংরেজিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রুশ-মার্কিণ সোরোকিন প্রণীত "কন্টেম্পোরারি সোশিঅলজিক্যাল থিয়োরীজ" গ্রন্থে (নিউ ইয়র্ক ১৯২৮) পারেত সম্বন্ধে বিশদ বৃত্তান্ত আছে।

ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক পারেত-প্রণীত দ্বিতীয় গ্রন্থ "মানুয়ালে দি একনমিয়া পলিতিকা" নামে ইতালিয়ান ভাষায় বাহির হইয়াছিল ১৯০৯ সনে। পরে সেই বৎসরই ইহার ফরাসী সংস্করণ (মানুয়েল দেকোনোমী পোলিটিক) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ধনবিজ্ঞানের সুপরিচিত ব্যবহার-মূল্য ("ইউটিলিটি", "ভাল্যয়র হ্বিসাজ", "ভ্যাল্যিউ ইন ইউস্") সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময়ে পারেত অর্থশাস্ত্রের নবীন-প্রবীণ প্রভেদটা পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পারেত নিজে নয়া ধনবিজ্ঞানের প্রতিনিধি, ভাল্‌রার চেলা অর্থাৎ "লোজান-পথের" পথিক।

কোনো জিনিষ ব্যবহার করিয়া তাহা দ্বারা মানুষের অভাব পূরণ করা সম্ভব। কাজেই সেই জিনিষের একটা ব্যবহার-মূল্য আছে। ইহাকে প্রয়োগ-মূল্য বা ভোগ-মূল্যও বলা চলে। পারেত বলিতেছেন যে, "ক্লাসিক"দের চিন্তায় মালের ভোগ-মূল্য অপিরিচিত ছিল না। কিন্তু ক্লাসিকদের বিশ্লেষণের ভিতর খানিকটা দুর্ব্বলতা ছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা এই ব্যবহার, প্রয়োগ বা ভোগ কাণ্ডটা পরিষ্কার করিয়া ধরিতে

পারেন নাই। ভোগমূল্য বলিলে কোনো বস্তুবিশেষের সঙ্গে যে কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে এই ধারণা তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা হয়ত অজ্ঞাতসারেই ভুলক্রমে ধরিয়া লইতেন যে, এই ভোগ-মূল্য বা প্রয়োগ-মূল্য বুঝি বস্তুমাত্রেরই একটা স্বাভাবিক স্বধর্ম্ম। অনেকে আবার মনে করিতেন যে, কোনো একটা জিনিষ বুঝি মানুষমাত্রের পক্ষেই ব্যবহারযোগ্য বা মূল্যবান্। দ্বিতীয়তঃ, ভোগমূল্য বা প্রয়োগমূল্য সম্বন্ধে "ক্লাসিক"দের আর একটা বড় গলদ ছিল। বস্তুটার কতখানি পূর্ব্বে ব্যবহার, প্রয়োগ বা ভোগ করা হইয়াছে তাহা তাঁহারা খতাইয়া দেখিতেন না। পূর্ব্বেকার ভোগ বা ব্যবহারের পরিমাণের উপর যে বস্তুটার বর্ত্তমান ভোগ-মূল্য নির্ভর করে এই ধারণা তাঁহাদের জন্মে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জলের একটা ভোগমূল্য আছে সোজাসুজি বলিলে এই কথার কোনো অর্থ নাই। কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম করিয়া যদি এই কথা বলা যায় তাহা হইলেও ইহার কোনো অর্থ হয় না। কেননা লোকটা যদি তৃষ্ণায় মরিতে বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার নিকট জলের ভোগমূল্য একরূপ, আবার সে যদি ইতিমধ্যে খানিকটা জল খাইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার ভোগ-মূল্য অন্যরূপ। অর্থাৎ সর্ব্বদাই বলা আবশ্যক যে, কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ভোগমূল্যের কথা বলা হইতেছে আর তাহার পূর্ব্বে কোনো-নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহার বা ভোগ করা হইয়াছে।

পারেত'র মতে,—ভোগমূল্য সম্বন্ধে ক্লাসিকদের অসম্পূর্ণতাগুল' শুধ্রাইবার সঙ্গে-সঙ্গে নয়া ধনবিজ্ঞানের জন্ম হয়। জেভন্সের হাতে নবীন অর্থশাস্ত্রের সূত্রপাত প্রচলিত মূল্যতত্ত্বের সংশোধনরূপে দেখা দেয়। ভাল্‌রা নয়া ধনবিজ্ঞানকে অর্থনৈতিক স্থিতি-সাম্যের বিশেষ

মূর্ত্তি বিষয়ক তত্ত্বকথার আকারে খাড়া করেন। স্বাধীন টক্কর ছিল ভাল্‌রার স্থিতিসাম্য-বিষয়ক বিশেষ মূর্ত্তি। ভাল্‌রার হাতে অর্থশাস্ত্র খুব বেশী উন্নতি ("গ্রে গ্রাঁ প্রোগ্রে") লাভ করে। অর্থনৈতিক স্থিতিসাম্যের অন্যতম মূর্ত্তি টক্করশূন্যতা বা নিষ্টক্কর একচেটিয়া অবস্থা। তাহার বিশ্লেষণ ফরাসী অর্থশাস্ত্রী কুর্ণো কর্ত্তৃক অন্য এক প্রণালীতে সাধিত হইয়াছিল। ইংরেজ মার্শ্যাল ও এজোয়ার্থ এবং মার্কিণ আর্ভিং ফিশার অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও সার্ব্বজনিকরূপে আলোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ একমাত্র মূল্যতত্ত্ব, অথবা একমাত্র-টক্কর-তত্ত্ব অথবা একমাত্র একচেটিয়া-তত্ত্ব লইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না।

পারেত নিজের গবেষণা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "কুর" নামক তাঁহার প্রথম ফরাসী গ্রন্থে অর্থনৈতিক স্থিতিসাম্যের সকল কথাই,—অর্থাৎ টক্করকে টক্কর আর একচেটিয়াকে একচেটিয়া দুইই—আলোচিত হইয়াছে। আর "মানুয়েল" নামক দ্বিতীয় গ্রন্থের গবেষণাগুলা এই সকল বিষয়েই আরও বহুদূর গিয়া ঠেকিয়াছে।

"ইউটিলিটি" শব্দে ধনবিজ্ঞানে যাহা বুঝা যায় সাধারণ কথাবার্ত্তায় তাহা বুঝা যায় না। বিষ কখনো সুখের বা ভোগের জিনিষ বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু বিষ প্রয়োগেও মানুষের কোনো না কোনো কাজ সিদ্ধ হইতে পারে। কাজেই অর্থনৈতিক হিসাবে বিষের ভোগ-মূল্য বা প্রয়োগমূল্য আছে। পারেত বলিয়াছেন যে, ক্লাসিকরা এই প্রভেদটা বুঝিতেন। কিন্তু অনেক সময়েই তাঁহাদের আলোচনায় এই প্রভেদ ফুটিয়া উটিত না। "ইউটিলিটি" শব্দটা দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া পারেত ধনবিজ্ঞানের বেলায় একটা নতুন শব্দে কায়েম করিবার পক্ষপাতী। এই শব্দ "ওফেলিমিতে",—বিরলতা। এটা "কুর" বইয়েই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। কোনো-কোনো

অর্থশাস্ত্রী পারেত'র শব্দটা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে দুনিয়ার বাজারে এটা বেশী চলে নাই। জানিয়া রাখা ভাল যে, প্রত্যেক বিজ্ঞানের সেবককেই মাঝে-মাঝে দুচারদশটা নয়া পারিভাষিক গড়িয়া লইতে হয়। কোনো-কোনোটা চলে, কোনো-কোনোটা কল্কে পায় না।

পারেত ধনবিজ্ঞানকে গণিতনিষ্ঠ করিতে চাহেন কেন? তাঁহার বিচারে,—যেখানে কোনো ঘটনার কারণ আবিষ্কৃত হইতেছে অথবা কোনো কারণের ফল বিশ্লেষিত হইতেছে সেইখানে সাধারণ তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের কারবারগুলা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের কারবার নয়। এই সমুদয় হইতেছে পরস্পর-সাপেক্ষতার দৃষ্টান্ত। দুই তরফের প্রত্যেকটাই অপর তরফের উপর নির্ভর করে। একটাকে কারণ আর অপরটাকে ফল বলিয়া বিবৃত করা চলে না। এই অবস্থায় আসল আলোচনা-প্রণালী হইল গাণিতিক। যন্ত্রবিজ্ঞানের মতন ধনবিজ্ঞানও পরস্পর-নির্ভরতার বিজ্ঞান। কাজেই এই দুই বিজ্ঞানে বিশেষ আবশ্যক গণিতশাস্ত্র।

চক্রশাস্ত্রী কার্লি

চক্র-গবেষণায় পারেত'র হাত দেখিতে পাওয়া যায় "কুর" নামক তাঁহার প্রথম ধনবিজ্ঞানবিষয়ক ফরাসী গ্রন্থে (১৮৯৬-৯৭)।

১৯০৬ সনে প্রকাশিত "মানুয়ালে"-গ্রন্থেও পারেত চক্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

পারেত'র বিবেচনায় উৎরাই এবং চড়াই এই দুইটা একত্রে চক্র-কাণ্ডের অন্তর্গত। একমাত্র উৎরাই বা ঘাট্‌তি বা মন্দাকে চক্র বলা উচিত নয়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী চড়াই, তেজী বা বাড়্‌তিও এই সঙ্গে বিবেচ্য।

তিনি বলেন যে চক্রের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ আর্থিক তুনিয়ার বাড়্তি-ঘাট্তি। দ্বিতীয়তঃ,—লোকজনের চিত্তগত অবস্থা।

পারেত চক্র-গবেষণার উপলক্ষ্যে সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্লেষণে,—চাহিদা কত বহরের হইবে তাহা প্রথম হইতে বুঝিয়া লওয়া মালোৎপাদক আর বেপারীদের কাজ। আর্থিক ভবিষ্য-গণনা বর্ত্তমানে এই সব কারবারী লোকের হাতে আছে। যদি ভবিষ্য-গণনাটা ঠিক হয় তাহা হইলে তাহাদের "পোয়া বার", আর যদি ভবিষ্যগণনায় ভুল হয় তাহা হইলে তাহাদের "কুপো কাৎ"। কিন্তু যদি কখনো গবর্মেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ব্যবস্থা কায়েম হয় অর্থাৎ সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্র দেখা দেয় তখন এই আর্থিক ভবিষ্যগণনা থাকিবে সরকারী চাক্‌রেদের হাতে। পারেত'র বিশ্বাস এই যে, সরকারী চাকুরেদের ভবিষ্য-গণনায় ভুল থাকিবে অনেক। আর তাহারা কারবারী লোকেদের চেয়ে বেশী ভুলই করিয়া বসিবে। প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন ইত্যাদি বিপুল শহরের জোগান মামুলি বেপারীও অন্যান্য কারবারীরা "হেসে খেলে" চালাইতেছে। কিন্তু লড়াইয়ের সময়কার ফৌজদের মাল জোগাইতে গিয়া গবর্মেণ্টগুলা চ্যাংড়ামি করিয়া বসে বিস্তর। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, গবর্মেণ্টের শাসনে ব্যবসা-বাণিজ্য আসিলে কেলেঙ্কারির একশেষ হইবে।

অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও প্রায় প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীই বর্ত্তমান আর্থিক দুর্য্যোগ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছেন। মর্ত্তারা, জিনি, ভির্জিলি, ফান্নো ইত্যাদি গবেষকের রচনা চোখে পড়িয়াছে। কেহ কেহ এই উপলক্ষ্যে চক্র-কাণ্ডের একাল-সেকাল সবই খতাইয়া দেখিতেছেন। আন্তনিঅ ফস্সাতি "রিভিস্তা দি একনমিয়া পলিতিকা" পত্রিকায় "তেঅরিয়া দেলি স্‌বক্কি" (বাজার-তত্ত্ব) গবেষণার সঙ্গে "ক্রিজি দি

সোভ্রাপ্রোডুৎসিঅনে” (অতি-উৎপাদনের সঙ্কট) বিশ্লেষণ করিয়াছেন (১৯৩১)। সেকালের ফরাসী অর্থশাস্ত্রী সায়, ইংরেজ রিকার্ডো-মিল, সুইস সিস্‌ম'দি, জার্মাণ রোড্‌ব্যার্টুস হইতে সুরু করিয়া একালের ইতালিয়ান পান্তালেঅনি ও পারেত্ত, ফরাসী বুনিয়াতিয়াঁ, আফ্‌তালিঅঁ ও লেস্কিুর পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক গবেষকের মত আলোচিত হইয়াছে। “আর্খিভিয় দি স্তুদি কর্পরাতিভি” পত্রিকায় ফিলিপ্পি কার্লি “লা তেঅরিয়া দেল্লে ক্রিজি কমে রিচের্কা চেন্ত্রালে দেল্লেকনমিয়া দিনামিকা” (সঙ্কট-তত্ত্ব) প্রবন্ধে বিষয়টা গতিশীল আর্থিক জীবনের মুখ্য সমস্যারূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ফিলিপ্প কার্লি বলিতেছেন যে, ১৮৯৭ সনে পারেত তাঁহার “কুর্‌” গ্রন্থে চক্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন ১৯২৪ সনে ইংরেজ পিগুও তাহাই বলিয়াছেন। দুই জনেই চক্র-গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠ ও চিত্তনিষ্ঠ দুই প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দুই জনেই আবার শেষ পর্য্যন্ত চিত্ত-গত অবস্থার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন।

কালির মতে চিত্তের উপর জোর দেওয়া পিগুর পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে, কেননা পিগুর আলোচনায় ধনবিজ্ঞান সমাজ-শাস্ত্রের অন্তর্গত। পিগু অর্থকথাকে মানুষের সমাজ-জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া আলোচনা করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু পারেত্ত'র মেজাজ অন্য ঢঙের। পারেত ধনবিজ্ঞানকে ষোল আনা যুক্তিশাস্ত্র বিবেচনা করেন। তাঁহার বিচারে সমাজ-শাস্ত্র পূরাপুরি অ-যুক্তির শাস্ত্র। ধনবিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ আদায়-কাঁচকলায়। উঠা-নামা বা বাড়্‌তি-ঘাট্‌তি নামক আর্থিক জীবনের গতিভঙ্গী চিত্তবিক্ষোভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব বস্তু সমাজ-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু স্থিতি-সাম্য হইল ধনবিজ্ঞানের অর্থাৎ যুক্তিনিষ্ঠ যন্ত্রবিদ্যার আসল কথা। স্থিতিতে আর গতিতে যে

প্রভেদ ধনবিজ্ঞানে আর সমাজবিজ্ঞানে সেই প্রভেদ। কাজেই চক্র-তত্ত্ব ধনবিজ্ঞানের বস্তু নয়,—সমাজবিজ্ঞানের বস্তু।

কার্লি বলিতেছেন যে, ধনবিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পিগুতে আর পারেত'য় আকাশ-পাতাল ফারাক থাকা সত্ত্বেও দুই জনে একই অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছেন। উভয়েই আর্থিক দুনিয়ার বহির্ভূত "চিত্তের" ভিতর চক্রের কারণ ঢুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন। জার্মাণ অর্থশাস্ত্রী সোম্বার্ট-প্রচারিত পারিভাষিক অনুসারে দুই জনেই "এক্সোগেন" অর্থাৎ বাহ্যগামী বা বাহ্যলক্ষণমূলক তত্ত্বের প্রচারক। যাঁহারা আর্থিক দুনিয়ার ভিতরকার অবস্থার মধ্যে চক্র-লক্ষণ ঢুঁড়িতে অভ্যস্ত তাঁহাদিগকে "এণ্ডোগেন" অর্থাৎ অন্তর্গামী বা অন্তর্লক্ষণমূলক তত্ত্বের প্রচারকরূপে বিবৃত করা হয়।

এণ্ডোগেন বা অন্তর্গামী চক্রতত্ত্বের মোটা কথা আর্থিক দুনিয়ার বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য। এই বৈষম্য সম্বন্ধে দুই দলের গবেষণা দেখা যায়। প্রথম দল টাকা-কড়ির অতি-বৃদ্ধি বা অতি-হ্রাস বিশ্লেষণ করিয়া চক্রের উৎরাই-চড়াই ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় দল মালোৎপাদনের অতি-কিছু দেখিতে অভ্যস্ত।

কার্লির মতে টাকা-কড়ির অতি-বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির পরে ঘটে, আগে নয়। তাঁহার বিবেচনায়,—টাকাকড়ি-ঘটিত কারণে চক্র উৎপন্ন হয় না। তিনি মালোৎপাদনের বৈষম্যে অর্থাৎ উৎপাদন ও খাদন বা জোগান ও চাহিদার অসামঞ্জস্যের ভিতর চক্র ঢুঁড়িয়া থাকেন।

একটা মজার কথা কার্লি বলিতেছেন। বাহ্যগামী চক্রশাস্ত্রীরা অর্থনৈতিক স্থিতিসাম্য স্বীকার করিয়া লইয়া অসামঞ্জস্যগুলা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু যে পারেত অর্থনৈতিক স্থিতি-সাম্যের আসল

দার্শনিক সেই পারেত চক্রতত্ত্বকে স্থিতিসাম্য-বিষয়ক তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই।

মার্কিণ অর্থশাস্ত্রীরা আর্থিক দুনিয়ায় একটা স্থিতিশীল অবস্থা দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিবেচনায় গতিই হইল আর্থিক দুনিয়ার স্বাভাবিক অবস্থা। কাজেই তাঁহারা "ক্রাইসিস" বা সঙ্কট শব্দ কায়েম করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদের প্রিয় পারিভাষিক হইল "সাইক্‌ল্" বা চক্র। এই "সাইক্‌ল্" শব্দে ও আবার মার্কিণরা একটা তথাকথিত নিয়মবদ্ধ কালমাফিক গতিভঙ্গী সমঝিতে অভ্যস্ত নয়। তাঁহাদের বিশ্লেষণে আর্থিক চক্রের লক্ষণ হইল পুনরাবৃত্তি বা পুনরভিনয় মাত্র। কিন্তু এই পুনরভিনয় কতদিন পর-পর ঘটিবে তাহার কোনো স্থিরতা মার্কিণ ব্যাখ্যায় দেওয়া হয় না।

আর্থিক দুনিয়ার মামুলি স্বধর্ম্মই হইল গতি। স্থিতির বিভিন্ন অবস্থা গতি। কাজেই গতিশাস্ত্র স্থিতিশাস্ত্রের বহির্ভূত নয়।

গতিগুলা যখন অতিবেগে সাধিত হয় অথবা অতি বিস্তৃত আকার ধারণ করে তখন ঘটিতেছে চক্র। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত স্থিতিসাম্যের দর্শনই চক্র-তত্ত্বের আসল যুক্তিশাস্ত্র। পারেত'র মতন গতিকে অর্থ-শাস্ত্রের বাহিরে একঘরে' করিবার দরকার নাই।

স্থিতির কোনো-কোনো অবস্থার নাম গতি, আর গতির কোনো-কোনো অবস্থার নাম গতি। সুতরাং পারেত'র স্থিতি-সাম্য-তত্ত্বই অর্থনৈতিক গতিভঙ্গী দর্শন জোগাইতে সমর্থ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, গতিগুলা দেখিতে-দেখিতে অতি-বিস্তৃত অথবা অতি-জবরদস্ত আকার ধারণ করিতেছে কেন? অর্থাৎ গতিসমূহ সময়ে-সময়ে চক্ররূপে দেখা দেয় কেন? এই প্রশ্নের জবাবে কালি আর্থিক দুনিয়ার একটা গুহ্যরহস্য বা "ভিতরকার কথা" খুলিয়া

ধরিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন যে, আর্থিক সংসারের আসল বস্তু হইল অভাব ও চাহিদা, উৎপাদন ও জোগান, ক্রয়শক্তি ও আয়। স্থিতিসাম্য থাকা সম্ভব কখন? যখন এই তিন প্রকার আর্থিক বস্তুর বা শক্তির কাজ এক সঙ্গে সমান জোরের সহিত চলে। অর্থাৎ আয় বা ক্রয়শক্তির এরূপ হওয়া চাই যে, জোগানের সব-কিছুই পুরাপুরি কেনা সম্ভব হয়। এক কথায়, উৎপাদন আর আয় সমান হারে না বাড়িলে এই স্থিতিসাম্য থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আর্থিক দুনিয়ায় এইরূপ সমান হারে বাড়্তি ঘটা অসম্ভব।

তাহার কারণ সম্বন্ধে কার্লি বলিতেছেন যে, আর্থিক দুনিয়া প্রধানতঃ দুই বড় মণ্ডলে বিভক্ত। একটা কৃষি-মণ্ডল আর একটা শিল্প-মণ্ডল। এই দুই মণ্ডলের বাড়্তি দুই স্বতন্ত্র হারে স্বতন্ত্র নিয়মে চলিয়া থাকে। কৃষিমণ্ডল চলে ঠিক যেন ঢিমে তেতালাভাবে, আর শিল্পমণ্ডল চলে ঠিক যেন অশ্বপৃষ্ঠে।

কৃষি-শিল্পের এই প্রভেদ একমাত্র উৎপাদনের হারেই আবদ্ধ নয়। আয় সম্বন্ধেও এই প্রভেদ দেখা যায় বিস্তর। কৃষিমণ্ডলের লাভ ও বেতন-মজুরি শিল্পমণ্ডলের লাভ ও বেতন-মজুরি হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। কাজেই কৃষিমণ্ডলের নরনারীর ক্রয়শক্তি শিল্পমণ্ডলের নরনারীর ক্রয়শক্তির চেয়ে আস্তে-আস্তে চলে।

চক্র-গবেষণার শেষ কথা কার্লির মতে কৃষি-শিল্প-প্রভেদ। আর্থিক দুনিয়ার কৃষি-শিল্পে অসামঞ্জস্য বা বৈষম্য দেখাইয়া দিয়াছেন সোম্বার্ট। কার্লি বলিতেছেন যে, সোম্বার্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে এই বৈষম্য কার্ল মার্ক্স্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মানুষকে পুরাপুরি আর্থিক জীব এবং পারেত'র পারিভাষিক মাফিক ষোলআনা যুক্তিনিষ্ঠ জীব ধরিয়া লইলেও আর্থিক দুনিয়ায় চক্র

অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। কেননা কৃষিমণ্ডলে আর শিল্পমণ্ডলে গতির অসাম্য, বৈষম্য অথবা অসামঞ্জস্য থাকিবেই থাকিবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, বিলাত এবং সমগ্র ইয়োরোপ হইতে বিগত সত্তর-আশী বৎসরের ধনদৌলত-বিষয়ক সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া রেখা-তরঙ্গের সাহায্যে কার্লি কৃষি-শিল্পের বৈষম্য দেখাইয়াছেন।

মোটের উপর দেখিতেছি যে, মার্ক্‌স্‌-সোম্বার্ট-প্রচারিত তত্ত্বটা কার্লি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর এই বস্তুনিষ্ঠ ও অন্তর্গামী তত্ত্বটার উপর জুড়িয়া দিয়াছেন পারেত-পিগুর চিত্তনিষ্ঠ ও বাহ্যগামী তত্ত্ব। পারেত-পিগু'র চক্র-ব্যাখ্যা কার্লির নিকট "অধিকন্তু ন দোষায়" মাত্র। কিন্তু গতিশীল আর্থিক জীবনের প্রধান কথা যে-চক্র সেই চক্রের আসল ব্যাখ্যা কার্লি মার্ক্‌স্‌-সোম্বার্ট-প্রদর্শিত পথেই ঢুঁড়িয়া পাইয়াছেন।

ইতালির ভূমিসংস্কার-("বনিফিকা") শাস্ত্রী

ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রের একটা পরিভাষা ভারতে সুপরিচিত নয়। এলিসেঅ য়ান্দল'র একটা লেখা ভারতবাসীর নজর এই দিকে টানিয়া লইতে সমর্থ। রচনার নাম "লা বনিফিকা ইন্তেগ্রালে এ ইল্‌ প্রগ্রেস্‌স্‌ দেল্লা লেজিস্‌লাৎসিঅনে স্থল্লে অপেরে পুব্‌লিকে" (ব্যাপক ভূমি-সংস্কার ও সরকারী কারবার সম্বন্ধে আইন-কানুনের ক্রমবিকাশ)। এই রচনাটা বাহির হইয়াছে "রিভিস্তা দি দিরিত্ত আগ্রারিঅ" পত্রিকায় (ফ্লোরেন্স, এপ্রিল জুন ১৯৩০)। আর একটা লেখাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "বনফিকা ইন্তেগ্রালে এদ্‌ একনমিয়া কর্পরাতিভা" (ব্যাপক ভূমিসংস্কার এবং সঙ্ঘবদ্ধ আর্থিক ব্যবস্থা)। লেখাটা বাহির হইয়াছে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-গবেষণা-পরিষদের বার্ষিক পত্রিকায় (১৯৩০-৩১)। লেখকের নাম আবুরিগ সেপিয়েরি।

সের্পিয়িরি হইতেছেন সরকারী ব্যাপক-ভূমিসংস্কার দপ্তরের সর্ব্ব-প্রধান কর্ম্মচারী। কৃষি-সচিবের নীচেই তাঁহার ঠাঁই। আর য়ান্দল এই দপ্তরের ডিরেক্টর বা পরিচালক। অর্থাৎ সের্পিয়েরি তাঁহার উপর-ওয়ালা।

দুই প্রবন্ধের ভিতরই "বনিফিকা ইন্তেগ্রালে" শব্দটা দেখিতে পাইতেছি। এই পারিভাষিকের কথাই বলিতেছিলাম। "ব্যাপক ভূমিসংস্কার" শব্দের ভূমিসংস্কারই বা কি আর ব্যাপকই বা কি?

ইতালি স্বাধীনতা ও ঐক্য লাভ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই ম্যালেরিয়া-ধ্বংসের লড়াই খাড়া করে। সরকারী খরচে ম্যালেরিয়া-লড়াই সুরু হয় ১৮৬৬ সনে। ম্যালেরিয়া হইতে ভূমির উদ্ধারসাধনকে "বনিফি-কাৎসিয়নে," সহজে ভূমিসংস্কার বলে। "বনিফিকার" কাজ ইতালিয়ান নরনারীর অতি পরিচিত বস্তু। বলা বাহুল্য "বনিফিকা"-শাস্ত্রীর দলও ইতালিয়ান সমাজে সুপরিচিত। বুঝাই যাইতেছে যে, "বনিফিকা" বস্তুটা প্রধানতঃ এবং মুখ্যতঃ স্বাস্থ্যবিষয়ক। কিন্তু ভূমির উদ্ধার সাধন, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি কাজ অর্থ বিষয়কও বটে। অধিকন্তু লোকজনের মরা-বাঁচা, গোবলদ-শূয়রছাগলের মরা-বাঁচা ইত্যাদি বিষয়কেও একমাত্র স্বাস্থ্যকথার অন্তর্গত বিবেচনা করা চলে না। ইহার সঙ্গে খাওয়া-পরার কথা, কৃষিসম্পদের কথা, টাকাপয়সা রোজগারের কথা, জীবনযাত্রা-প্রণালীর কথা সবই সুজড়িত।

১৮৬৬ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত পঞ্চান্ন বৎসরে ইতালিয়ান সরকার "বনিফিকা"র জন্য ৪৯২,০০০,০৯০ লিয়ার (অর্থাৎ ৩১০,০০০,০০০৲ টাকা) খরচ করিয়াছিল। বৎসরে গড় পড়তা ৫,৬০০,০০০৲ টাকার হিসাব দেখা যাইতেছে। ইতালির এই "বনিফিকা"-কাণ্ড বর্ত্তমান লেখকের নজরে পড়ে সর্ব্বপ্রথম ১৯২১-২৩ সনে ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণিতে

প্রবাসের সময়ে। ১৯২৪-২৫ সনে প্রথমবার ইতালিতে থাকিবার সময়ও এই দিকে বিশেষরূপেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আসল কথা,—কি স্বাস্থ্যোন্নতির তরফ হইতে, কি চাষ-আবাদের উন্নতির তরফ হইতে ইতালিকে বনিফিকার দেশরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখা আবশ্যক এইরূপ মনে হইয়াছিল। "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" গ্রন্থে (মাদ্রাজ ১৯২৬) ইতালির "বনিফিকা"-গৌরব বিবৃত করিতে ভুলি নাই।

মুসলিনির ফাশিস্ত্-রাজ স্থরু হওয়ার পর অবধি "বনিফিকা"-কাণ্ডে যুগান্তর আসিয়াছে। আগে বনিফিকা বলিলে আইনের চোখে প্রধানতঃ বা একমাত্র স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন বুঝা যাইত। ফাশিস্ত্-যুগে বনিফিকা-ভোগী অর্থাৎ সংস্কার-প্রাপ্ত জমিজমার "আর্থিক" উন্নতি সাধনও আইনের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। ১৯২৩ সন হইতে ফি বৎসরই নানা আইন জারি করিয়া ফাশিস্ত্ সরকার বিভিন্ন উপায়ে চাষের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯২৮ সনে মুসলিনির এক বক্তৃতার বাণী ছিল নিম্নরূপ—"রিস্কাত্তারে লা তেব্বরা, এ কন্ লা তেব্বরা লি উঅমিনি, এ কন্ লি উঅমিনি লা রাস্সা" (অর্থাৎ করিতে হইবে জমির উদ্ধার, জমি দিয়া উদ্ধার করিতে হইবে নরনারীকে, আর নরনারীর সাহায্যে উদ্ধার করিতে হইবে সমগ্র জাতিকে)। এই বাণীর ভিতর দেখিতে হইবে "বনিফিকা"র নবীন মূর্ত্তি। প্রথমতঃ ম্যালেরিয়া-ধ্বংস, দ্বিতীয়তঃ, ভূমিসংস্কার ও চাষের উন্নতি, তৃতীয়তঃ লোকবল বৃদ্ধি, এবং চতুর্থতঃ ইতালির বিস্তার-সাধন এই চার লক্ষ্য এক সঙ্গে ফাশিস্ত্ বনিফিকা-নীতির অন্তর্গত। ইহারই নাম "বনিফিকা ইন্তেগ্রালে" অর্থাৎ (ব্যাপক বা সর্ব্বগ্রাসী ভূমি-সংস্কার)। এই নীতি অনুসারে ১৯৩০ সন হইতে কাজ স্থরু হইয়াছে। সম্প্রতি চোদ্দ বৎসরের মেয়াদ লইয়া কাজ চলিবে। সরকারী বরাদ্দ

৪,৩৫৪,০০০,০০০ লিয়ারের। অর্থাৎ আজকালকার সিক্কার মাপে ইতালিয়ান গবর্মেন্ট খরচ করিবে প্রায় ১,০০০,০০০,০০০৲ টাকা।

"বনিফিকা ইন্তেগ্রালে"র আইন জারি হইবার পর প্রথম বৎসরে কতখানি কাজ হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন সের্পিয়েরি "লা লেজ্জে সুল্লা বনিফিকা ইন্তেগ্রালে নেল্ প্রিম আন্ন দি আপ্লি-কাৎসিঅনে" (১৯৩১)। এই বিবরণীর ভিতর "বনিফিকা"র তত্ত্বকথাও আছে। ভূমিকায় কৃষি-ও বন-সচিব জ্যাকম অচের্ব ফাশিস্ত্-রাজের লোকবল-নীতি ও পল্লীগঠন-নীতির সঙ্গে "বনিফিকা"র অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের কথা বলিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইতালিয়ান অর্থ-শাস্ত্রে পল্লীসংস্কার ও লোকপ্রসার নীতির জয়-জয়কার চলিতেছে। তাহার সঙ্গেই আছে গাঁথা "বনিফিকা"।

গ্রাৎসিয়ানি

অর্থশাস্ত্রীরা যে সাধারণতঃ কোনো একটা বা দুইটা বিষয় লইয়া চিরজীবন কাটায় না তাহার এক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত নেপ্ল্সের অধ্যাপক আউগুস্ত গ্রাৎসিয়ানির "তেঅরিয়ে এ ফাত্তি একনমিচি' (অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্য) গ্রন্থ। এই বই ১৯১২ সনে প্রকাশিত (তোরিণো)। ইহার ভিতর আছে রকমারি মাল। ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী দেখিতেছি, আইনকানুনের আর্থিক বনিয়াদ পাইতেছি। উনবিংশ শতাব্দীবিষয়ক ইতালিয়ান-জার্ম্মাণ চিন্তা-বিনিময়ের প্রত্নতত্ত্ব আছে। ১৫২৬ সনে ইতালিয়ান সিয়েনা-রিপাব্লিক একটা সরকারী কর্জ্জ লইয়া-ছিল। তাহার বৃত্তান্তও আছে। তাহার উপর লুইজি কস্সা এবং ভিত কুস্থমান এই দুই জন উনবিংশ শতাব্দীর ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রীর মতামতও জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে। কুস্থমান জার্ম্মাণ

অর্থশাস্ত্রী ভাগ্নার-প্রবর্ত্তিত ষ্টেট-সোশ্যালিজমের প্রচারক ছিলেন। আরো দুই জন ইতালিয়ান সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে। তাঁহারা সাহিত্যরথী হিসাবে প্রসিদ্ধ। একজন মানৎসনি আর একজন রস্‌মিনি। দুই জনেরই রচনার ভিতর কতখানি এবং কিরূপ অর্থকথা পাওয়া যায় তাহার আলোচনা পাইতেছি। পেল্লেগ্রিণ রস্‌সি (১৭৮৭-১৮৪৮) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে ইতালির একজন ইয়োরোপ-বিখ্যাত উকিল ছিলেন। ফ্রান্সে আর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডেও তাঁহার খাতির ছিল। আইনকানুনের-অধ্যাপক হিসাবে তাঁহাকে দেশবিদেশের নানা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতেও হইয়াছিল। তস্কানা (টাস্কানি) দেশের রাষ্ট্রিক কারবারেও তাঁহার হাত ছিল। রস্‌সির জীবন আর মতামত আলোচনার জন্য গ্রাৎসিয়ানি সুবৃহৎ অধ্যায় লিখিয়াছেন। অর্থশাস্ত্র বিষয়ক রচনায় রস্‌সি ইংরেজ আডাম স্মিথ, রিকার্ডো আর ম্যালথাস এই তিনজনের সিদ্ধান্তগুলা ফ্রান্সে আর ইতালিতে প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। গ্রাৎসিয়ানির গ্রন্থে অবাধ বিনিময়, স্বাধীনতা, সামাজিক আইন, "ক্লাসিক" পন্থী অর্থশাস্ত্র, ঐতিহাসিক-অর্থশাস্ত্র, সংরক্ষণ-নীতি ইত্যাদি সুপরিচিত বিষয়ের বিশ্লেষণও আছে। আবার কোম্পানীর শেয়ারের উপর ট্যাক্‌স, আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনায় টাকাকড়ির স্থান, বেকার সমস্যা ইত্যাদির কথাও আলোচিত হইয়াছে।

১৮৯৯ সনে প্রকাশিত "সুই কারাত্তারি এল্ল স্‌ভিলুপ্প আত্তুয়ালে দেল্লেকনমিয়া পলিতিকা" (ধনবিজ্ঞানের স্বরূপ ও বর্ত্তমান অবস্থা) প্রবন্ধে আউগুস্ত গ্রাৎসিয়ানি বলিতেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে পণ্ডিত-মহলে তর্ক চলিত ইতালির অর্থশাস্ত্রে দান উঁচু দরের কিনা। আজকাল সেই সব মামলা চুকিয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রীরা যে ইয়োরোপে

ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় অগ্রণী ছিলেন একথা বর্ত্তমানে সকলেই স্বীকার করেন। ধনবিজ্ঞানের প্রধান-প্রধান সূত্রগুলার অনেক-কিছুই ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রীদের গবেষণার সঙ্গে সুজড়িত। গ্রাৎসিয়ানি দক্ষিণ ইতালির লোক। কাজেই দক্ষিণ ইতালির গৌরব প্রচার করা তিনি তাঁহার অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর পণ্ডিত কারাফা রাজস্বের আয়-ব্যয়ের সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার যোগাযোগ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। ১৬১৩ সনে সেরুরা মুদ্রা সম্বন্ধে অতি-আধুনিক মত প্রচার করেন। গ্রাৎসিয়ানি অষ্টাদশ শতাব্দীকে ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ইতালির স্বর্ণযুগ বিবেচনা করেন। ব্রজ্জিয়ার কর-বিষয়ক আলোচনা প্রসিদ্ধ। গালিয়ানি একালের মেঙ্গার-প্রবর্ত্তিত "অষ্ট্রিয়ান অর্থশাস্ত্রের" আসল কথাগুলা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর জেনভেজি ছিলেন ধনবিজ্ঞান বিষয়ক সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থকার। ইঁহারা তিন জনেই দক্ষিণ ইতালির লোক।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভাল যে, উত্তর ইতালিতে আর দক্ষিণ ইতালিতে আত্মিক প্রভেদ দেখানো ইতালিয়ান সুধীদের একটা প্রায় সার্ব্বজনিক রীতি। অর্থশাস্ত্রী গ্রাৎসিয়ানি, দার্শনিক ক্রচে ইত্যাদি নেপ্‌ল্‌স্ অঞ্চলের সুধীবর্গের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে এইরূপ বুঝিতে পারিয়াছি। অপর দিকে মিলান, রোম ইত্যাদি শহরের আবহাওয়ায়ও এই মত স্পর্শ করিয়াছি। অবশ্য উত্তরের চিন্তায় দক্ষিণ অবনত আর দক্ষিণের চিন্তায় উত্তর অবনত,—এইরূপ প্রাদেশিকতা বা জনপদগত সঙ্কীর্ণতাও সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করা গিয়াছে।

১৭৫৪ সনে আন্তনিঅ জেনভেজি (১৭১২-১৭৬৯) নেপ্‌ল্‌সের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিভারনি বলিতেছেন যে, ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাপকের পদ ইয়োরোপে এই প্রথম। তাঁহার

মতে দ্বিতীয় পদ স্পষ্ট হইয়াছিল সুইডেনের ষ্টকহল্‌মে আর তৃতীয় ইতালির পাভিয়ায়। যাহা হউক তিভারণির বৃত্তান্তে জানিতে পারি যে, ১৭৬৫ সনে জেনভেজির বক্তৃতাগুলা "লেৎসিঅনি দি কমার্চ্য অসিয়া দি একনমিয়া চিভিলে" (বাণিজ্য বা সমাজের অর্থকথা) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (নেপ্‌ল্‌স্)। ইতালিতে এই বই ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে ষোলকলায় সম্পূর্ণ প্রথম গ্রন্থ। বোধ হয় দুনিয়ার অর্থ-সাহিত্যেও এই গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথম,—এই মত তিভারণি প্রচার করিয়াছেন।

গ্রাৎসিয়ানির কথা আবার ধরা যাউক। তিনি চিত্তবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত অষ্ট্রিয়ান গবেষণা-প্রণালীর সঙ্গে পুরাণা গবেষণা-প্রণালীর যোগাযোগ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অধিকন্তু, "আরোহ"-পদ্ধতি ও অবরোহ-পদ্ধতির ফলাফল ও আলোচনা করিতে ভুলেন নাই। ভারতবর্ষে আমরা আজও "সীমান্ত-সুখ" ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করি নাই বলা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর ভিতর জার্ম্মাণিতে আর ইতালিতে ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় লেনদেন সমূহ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া গ্রাৎসিয়ানি জার্ম্মাণ শ্মোল্লার-প্রবর্ত্তিত আলোচনা-প্রণালীর তারিফ করিয়াছেন। ব্যবসা-সংগঠন, আর্থিক গড়ন, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদির বৃত্তান্ত শ্‌মোল্লারের পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্রীদের গ্রন্থে স্থান পাইত না।

গ্রাৎসিয়ানি "লিবার‍্যাল" মতের অর্থশাস্ত্রী। মজুরদের উপকার তিনি অবাধ বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত দেখিতে পান।

তিভারণি ও ভির্জ্জিলি

জেনোআর অধ্যাপক যাকপ তিভারনি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মতামতের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন (বারি ১৯৩৩)। পূর্ব্বে তিনি পাদভায় ছিলেন। উত্তরাধিকারের উপর কর সম্বন্ধে

বর্ত্তমান জগতের কোথায় কিরূপ আইন আছে সেই সম্বন্ধে তিভারণির "লিম্পস্তা স্থল্লে স্থচ্চেস্‌সিঅনে" ১৯১৬ সনে বাহির হইয়াছিল। এই বইয়ের মাল আজও কাজে লাগে। কেন না আইনগুলার বৃত্তান্ত ছাড়া করের বিশ্লেষণও ইহার ভিতর প্রচুর পরিমাণে আছে। বড় বড় শহরের বাড়ীঘর-সমস্যা সম্বন্ধে তিভারণির বই আছে। সে ১৯০০ সনের লেখা। দেশবিদেশের লোকের সম্পত্তি আর কত আয় এই বিষয়ে তিভারণি ১৯০১ সনে লিখিয়াছিলেন। বাংলাদেশে আজও এই সম্বন্ধে আলোচনাকারীর উদ্ভব হয় নাই। সমাজে ধনদৌলতের বিতরণ কিরূপে ন্যায্য প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে তাহার আলোচনা একটা বইয়ের মুদ্দা (১৯০২)। রাজস্ব ও কর সম্বন্ধে কয়েকখানা বই আছে। ইতালিয়ান গবর্মেণ্টের সরকারী ঋণ সম্বন্ধে তিভারণির দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০৮-১০ সনে। রাজস্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বইয়ের লেখক হিসাবে তিভারণি ইতালিতে স্থপরিচিত। গবর্মেণ্টের হাতে বাণিজ্যের ব্যবস্থা একচেটিয়া হইলে সরকারী আয়ব্যয়ের অবস্থা কিরূপ হয় এই সম্বন্ধে তাঁহার একখানা বই আছে (১৯২০)। পাদভার সেভিংস-ব্যাঙ্কের শত বর্ষ পূর্ণ হইলে (১৯২২) এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তিভারণি একখানা বই লিখেন। ক্ষতিপূরণের জন্য জার্ম্মাণির দেনা আর মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পর ঋণ সম্বন্ধেও তাঁহার রচনা আছে (১৯২৩)।

সিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিলিপ ভির্জ্জিলি প্রাদেশিক কর-ব্যবস্থায় সংস্কারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া রোমের "রিভিস্তা দি একনমিয়া পলিতিকা" পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৯৩১)। সেই বৎসরই রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক লোকবল পরিষদের কংগ্রেসে তিনি সিয়েনার একটা পুরাণা ব্যাঙ্কের

জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করেন। ব্যাঙ্কটার নাম "ইল্ মন্তে দেই পাস্কি"। ১৯২৯ সনের শেষাশেষি আরব্ধ বিশ্ব-দুর্য্যোগ সম্বন্ধে বোধ হয় ইতালির প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীই দু'একবার মগজ খেলাইয়াছেন। ভির্জ্জিলির রচনাও আছে (১৯৩২)। এইটা রোম হইতে প্রকাশিত লা "ভিতা ইতালিয়ানা"য় বাহির হইয়াছিল। ইতালিয়ান সুধীরা স্বদেশী পূর্ব্বপুরুষগণের কথা বলিতে ভালবাসেন। প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীই দু'একজন গুরুস্থানীয় অর্থশাস্ত্রীর জীবনবৃত্তান্ত আর মতামত আলোচনা করিয়াছিলেন দেখিতেছি। পিয়েত্র রস্‌সি (১৮৫৭-১৯৩১) সম্বন্ধে ভির্জ্জিলির বক্তৃতাও উল্লেখযোগ্য। রস্‌সি অবশ্য ছিলেন প্রধানতঃ আইনশাস্ত্রী।

সংখ্যাশাস্ত্রী বেনিনি

১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাশাস্ত্রী বেনিনি "দা মাল্‌থুস আ মুসলিনি" (মালথুস হইতে মুসলিনি পর্য্যন্ত) প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিতেছি লোকসমস্যা সম্বন্ধে বেনিনির মতামত।

জার্ম্মাণ যুবা রিকার্ডো করহেয়ার একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে ভূমিকা দিয়াছেন জগতের দুই সেরা লোক। একজন হইতেছেন বিশ্ববিশ্রুত "পাশ্চাত্যের ক্রমপতন" গ্রন্থের লেখক জার্ম্মাণ পণ্ডিত ওস্‌ভাল্ড স্পেংলার। আর একজন ইতালির রাষ্ট্রনায়ক বেনিত মুসলিনি। ইঁহাদের সকলেরই বাণী একরূপ:—"জন্ম হ্রাসের অর্থ জাতিপুঞ্জের মৃত্যু।"

মালথুসের সময় লোকসংখ্যা বাড়িতেছিল হু-হু করিয়া। কাজেই তাঁহার বাণী ছিল,—"কমাও লোক সংখ্যা"। মুসলিনির যুগে অবস্থা

উল্টা। অর্থাৎ জন্মসংখ্যা কমিতেছে হু-হু করিয়া। কাজেই বাণী হইয়াছে "বাড়াও লোকসংখ্যা যেন-তেন. প্রকারেণ।" বেনিনি বলিতেছেন :—"মাল্‌থুসের পাঁতি,—সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য ইত্যাদি—কার্য্যক্ষেত্রে টেকসই নয়। অপর দিকে একালের মালথুস-পন্থীরা যে সকল জন্মনিরোধক কৌশলের প্রয়োগ চাহিতেছেন তাহাও অতি-জঘন্য জড়নিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নয়।"

মুসলিনির মতে জোর-জবরদস্তি করিয়া প্রথম হইতেই লোকবল সম্বন্ধে একটা সীমানা টানিয়া দিবার দরকার নাই। অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। কখনো লোকবল বাড়ানো দরকার,—কখনো বা কমানো আবশ্যক হইতে পারে।

বেনিনি বলিতেছেন, বর্ত্তমান যুগের আসল বিপদ নগর-জীবন। কিন্তু শহরে গুঁতাগুঁতি করিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। পল্লীর উন্নতি সাধন আবশ্যক। চাষের উন্নতি সাধন আবশ্যক। তাহা হইলেই অনেক নতুন-নতুন লোকের অন্নসংস্থান হইতে পারিবে।

প্রত্যেক দেশের ভিতর এমন কতকগুলা ব্যক্তি আছে যাহাদের সংসারে জন্মের হার বেশী। অন্যান্য পরিবারে জন্মের হার কম হইলেও মোটের উপর ঐ সকলের দরুণ দেশের লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে পারে। সেই সকল বৃহৎ-পরিবারওয়ালা ব্যক্তিদের জীবন, কোষ্ঠী, হাড়মাস বিজ্ঞানসম্মতরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। মুসলিনি এই সকল দিকেই এক সঙ্গে নজর দিয়াছেন। এই সকল কথা বলিয়া সংখ্যাশাস্ত্রী বেনিনি মুসলিনিনিষ্ঠা দেখাইতেছেন।

লোকশাস্ত্রী জিনি

বৃহৎ পরিবারের "প্রাণ-তত্ত্ব" আলোচনা করা বর্ত্তমানে ইতালিয়ান

অর্থশাস্ত্রীদের অন্যতম প্রধান কাজ। "বৃহৎ পরিবার" শব্দে অন্ততঃ সাত পুত্রকন্যার জনক-জননীর কর্ম্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। ইতালির যেখানে-যেখানে এইরূপ মা-বাপ দেখা যায় সেখানে-সেখানে ধনবিজ্ঞান-গবেষকরা গিয়া হাজির হয়। অবশ্য সবই গবর্মেণ্টের হুকুমে চলিয়া থাকে। পল্লীর মোড়ল হইতে শহুরে হাসপাতালের বড় ডাক্তার পর্য্যন্ত প্রত্যেক সরকারী চাকুরে এই গবেষণা-কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য। তাহার উপর আছে সরকারী সংখ্যাদপ্তরের অর্থশাস্ত্রী বা লোকশাস্ত্রীর দল। এই বিপুল কাজের মাথায় আছেন কর্‌রাদ জিনি।

লোকবিদ্যার আসরে ১৯০৮ সন হইতে জিনি বৃটিশ বা প্রকারান্তরে মালথুস-প্রচারিত মতের বিরোধী। লোক-সংখ্যা কমাইবার দিকে পাতি দেওয়া তাঁহার বিচারে যুক্তিসঙ্গত নয়।

লড়াইয়ের সময়ে জার্ম্মাণির বিরুদ্ধ-পক্ষের রাষ্ট্রপুঞ্জ লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়ে। কাজেই "মিত্ররাষ্ট্র"-সঙ্ঘের তদ্‌বিরে খাদ্যদ্রব্য বিষয়ক কমিশন বসে। ১৯১৮ সনের এক সভায় ইংরেজ পণ্ডিত ষ্টার্লিং শরীরের বহর আর দেশের তাপমাত্রা হিসাব করিয়া বলেন যে, ইংরেজদের পক্ষে জন প্রতি রোজ ৩,৩০০ ক্যালরি বা খাদ্য-তাপ চাই। তাঁহার মতে ফরাসীদের জন্য চাই ৩,২২০ আর ইতালিয়ানদের জন্য আবশ্যক ৩,১৭৭। ইতালির পক্ষ হইতে জিনি বলেন যে, লোক-জনের পেশা, বয়স, দৈনিক কাজের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করিলে ইতালিয়ানদের পক্ষে ইংরেজদের সমান ক্যালরিই আবশ্যক বিবেচিত হইবার কথা। জিনি বরাবরই স্বাধীন খেয়ালের আর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার পক্ষপাতী।

লোকবিদ্যা বিষয়ক এক বিপুল বিশ্বকোষ জিনির হাত হইতে বাহির হইয়াছে (১৯৩০)। নাম "দেমগ্রাফিয়া"। এই গ্রন্থের জন্য

সিসিলির সংখ্যাশাস্ত্রী জিঙ্গালি ইত্যাদি পণ্ডিতেরা তাঁহার সহযোগী ছিলেন।

"বাজি সিয়েন্তিফিকে দেল্লা পলিতিকা দেল্লা পপলাৎসিয়নে" (লোক-সংখ্যা-নীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি) গ্রন্থ ১৯৩১ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার এক জায়গায় জিনি বলিতেছেন :—"ফ্রান্স নীচু জন্মহারের দেশ আর জার্ম্মাণি ঠিক উল্টা। জার্ম্মাণরা টাকা খাটায় ছেলেপুলে মানুষ করিবার জন্য, লোক-সংখ্যা পুষ্ট করিবার মতলবে। অপর দিকে ফরাসীরা টাকা খাটায় পুঁজি বাড়াইবার জন্য। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, জার্ম্মাণিতে ধনদৌলতের বাড়্‌তি ফ্রান্সের চেয়ে চড়া হারে ঘটিয়াছে। অর্থাৎ লোক কমাইলেই যে আর্থিক উন্নতি সাধিত হয় এরূপ বলা চলে না। জার্ম্মাণরা লোক-সংখ্যায়ও বাড়িয়াছে আবার ধনসম্পদেও বাড়িয়াছে।"

ইতালির বাহিরে ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রী বলিলে লোকেরা পান্তালে-অনি আর পারেত এই দুই জনের নাম করিত। বর্ত্তমানে বোধ হয় জিনি অতি নামজাদাদের সর্ব্বপ্রথম। বক্তৃতার জন্য তাঁহার উপর তলব হইয়াছে আমেরিকা হইতে আর জাপান হইতে। ঘরের কোণে সুইটসার্ল্যাণ্ড। সেইখানেও ডাক পড়িয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, সরকারী সংখ্যাদপ্তরের প্রেসিডেণ্টরূপে জিনি লোকনীতি সম্বন্ধে মুসলিনির দক্ষিণ হস্ত। আসল কথা,—জিনির মতামতই ফাশিস্ত্ "দুচে" (নায়ক) লুফিয়া লইয়াছেন। কাজেই জিনির পক্ষে ফাশিস্ত্ লোক-নীতির বার্ত্তা লইয়া "যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে" ইত্যাদি চালাইবার সুযোগ সহজেই জুটিয়াছে। অপর দিকে নিজের মতলব মাফিক গবেষণা চালানো, গবেষক বাহাল করা, প্রবন্ধ লেখানো, রেখা-তরঙ্গের ছবি আঁকানো,—ইত্যাদি সবই তাঁহার পক্ষে "হাতের পাঁচ।"

এই আবহাওয়ায়ই জিনি ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে রোমে আন্তর্জ্জাতিক লোকবল-কংগ্রেসের সভা ডাকিয়াছিলেন। "ফাশিস্ত্" লোকশাস্ত্রীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে অর্থশাস্ত্রী, লোকশাস্ত্রী, চিকিৎসাশাস্ত্রী, প্রাণশাস্ত্রী, সংখ্যাশাস্ত্রী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজন আসিয়াছিল বিস্তর। এই আসরে বর্ত্তমান লেখকের পাত-পিঁড়িও পড়িয়াছিল। হরেক রকম চিজই আলোচিত হইয়াছিল বটে,—কিন্তু মোটের উপর আবহাওয়া ছিল "বৃহৎ পরিবার" বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। ফ্রান্স, জার্ম্মাণি আর ইতালি এই তিন দেশেরই পণ্ডিতেরা এই আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

ইতালিয়ান গবেষকদের কয়েক জনের নাম করিতেছি। কিজি আলোচনা করিয়াছিলেন শরীরের গঠনের সঙ্গে সন্তান-উৎপাদন শক্তির যোগাযোগ। মদেনা প্রদেশের কম-সে-কম সাত সন্তানের মা-বাপদের শরীর-গবেষণার বৃত্তান্ত আনিয়াছিলেন আগাজ্জতি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইতালির বারি বন্দরের "বৃহৎ পরিবার"গুলার জীবনযাত্রা প্রণালী ও চিত্তবৃত্তি শ্রীমতী এলেনা কারলি-সাপনার'র আলোচ্য বিষয় ছিল। রোমের নিকটবর্ত্তী লাৎসিঅ জেলার এক শহরের বৃহৎ পরিবারের মা-বাপ সম্বন্ধে শরীর-গবেষণার ফলাফল বিবৃত করিয়াছিলেন তিরেল্লি। মারাস্‌সিনি বৃহৎ পরিবারের মা-বাপদের অঙ্গগঠন সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। চুস্কুনার আলোচ্য বিষয়ও সেইরূপ ছিল। এমিলিয়া প্রদেশের ১৪৫০ জন বৃহৎ পরিবারের মা-বাপদের শরীর বিষয়ক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের লেখক ছিলেন ফ্রাস্‌সেত্ত।

এই ধরণের বহু রচনা ছিল। জেলায়-জেলায় এইরূপ অনুসন্ধান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অনুসন্ধানের কাজে অনেক চিকিৎসক, প্রাণশাস্ত্রী, ধনবিজ্ঞানসেবক, সমাজশাস্ত্রী ও সংখ্যাশাস্ত্রী মোতায়েন ছিলেন।

জন্মহ্রাসের কারণ বিশ্লেষণ মলিনারির প্রবন্ধের মুদ্দা। ইতালিয়ান সরকারী সংখ্যাদপ্তরের চেষ্টায় ছোট-ছোট ৪৭৫টা শহর হইতে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। লোকসংখ্যার সঙ্গে রাজস্বনীতির যোগাযোগ আলোচনা ছিল মারিঅ পুলিয়েজের প্রবন্ধের মতলব।

"মেত্রন" (মাপজোক) নামক সংখ্যাবিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা জিনির হাতে সম্পাদিত হইতেছে। দেশের লোকের জাতিগত ধনদৌলত ("রিক্কেৎসা") আর মাথা-পিছু আয় ("রেদ্দিত") ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণার কাজেও জিনি হাত দেখাইয়াছেন। এই দিকে ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙালী অর্থশাস্ত্রীদের দৃষ্টি পড়া উচিত।

১৯১৪ সনে প্রকাশিত "লাম্মস্তারে এলা কম্পজিৎসিঅনে দেল্লা রিক্‌কেৎসা দেল্লে নাৎসিঅনি" (দেশবিদেশের ধনদৌলতের পরিমাণ ও সংগঠন) নামক জিনি-প্রণীত গ্রন্থ ইতালিয়ান সমাজে আজও চলে। "মেত্রন" পত্রিকায় জিনি চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বিভিন্ন দেশের অর্থশাস্ত্রী-দের নিকট হইতে সম্পদ-ও আয়-বিষয়ক গবেষণা ছাপিয়াছেন।

পিয়েত্রা

পাদভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাশাস্ত্রী গায়েতান পিয়েত্রাও এই দলেরই অন্তর্গত। তাঁহার একটা প্রবন্ধও আসরের জন্য ছিল। "বৃহৎ পরিবার" সম্বন্ধে সোজাসুজি আলোচনা তাহার মুদ্দা ছিল না। রচনার নাম ছিল নিম্নরূপ :—"ইল্ কস্ত মনেতারিঅ দেল্লুঅম" (মানুষের মুদ্রা-মূল্য)। মার্কিণ সংখ্যাশাস্ত্রী ডাব্‌লিনের এই বিষয়ে একটা বই আছে। এক একটা লোক তৈয়ারি করিতে খরচ পড়ে কত আর সে যথাসময়ে রোজগারই বা করে কত ইহাই হইল রচনার আলোচ্য বিষয়। খুঁটি-নাটিগুলা এক, দুই করিয়া খুলিয়া ধরা হইয়াছে। রচনাটা যারপর

নাই বস্তুনিষ্ঠ। ইহার তর্জ্জমা বাঞ্ছনীয়। খরচ আর রোজগারের তথ্যগুলা জানা থাকিলে পরিবারের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে প্রথম হইতে সজাগ থাকা সম্ভব। বৃহৎ পরিবার পুষ্ট করিবার জন্য ফাশিস্ত-রাজ যে আন্দোলন চালাইতেছে সেই আন্দোলনের আত্মিক সাহায্য পিয়েত্রার গবেষণায় পাওয়া যাইবে।

মানুষের দাম সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার থাকিলে সহজেই বুঝা যায় লোক-রপ্তানিতে এক-একটা দেশের ক্ষতি কত হয়। জার্ম্মাণ সংখ্যাশাস্ত্রী অ্যন্‌ষ্ট্‌ এঙ্গেল আর ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রী পারেত এই তরফ হইতে বিষয়টা আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া শিশুমৃত্যু, অকাল মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনায় পরিবারের এবং দেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বুঝিবার জন্য মানুষের মুদ্রা-মূল্য আলোচনা করা জরুরি।

অধিকন্তু জীবন-বীমা, দৈব-বীমা, বার্দ্ধক্য-বীমা বা দৈহিক অক্ষমতা-বীমা ইত্যাদি বীমা-ব্যবসার কাজ এই সকল হিসাব ছাড়া চলিতেই পারে না।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, শৈশবে আর পঠদ্দশায় বা সাক-রেতির সময়ে লোকের খরচপত্র হয় বটে। কিন্তু যখন হইতে আয় সুরু হয় তখন ক্রমে ক্রমে সেই সকল খরচ উসুল হইয়া যায়। অধিকন্তু প্রত্যেক বয়সের খরচপত্র চালাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে কিছু মুনাফা থাকে। অর্থাৎ মানুষ তৈয়ারির কারবার একটা লাভজনক ব্যবসা। এই সার্ব্বজনিক মতের বিরুদ্ধে জিনি রায় দিয়াছেন। জিনির বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, এই কারবারে লোকসান ছাড়া লাভ হয় না।

পিয়েত্রা বলিতেছেন যে, জিনির মতে আর সার্ব্বজনিক মতে প্রভেদ ঘটিবার কারণ সোজা। হিসাব করিবার প্রণালীতে গোলযোগ আছে।

সাধারণতঃ লোকেরা ফি বৎসরে যে টাকাটা খরচ করা হইতেছে সেই টাকার সুদ পরবর্ত্তী বৎসরে কত তাহা কষিয়া দেখে না। অধিকন্তু ছেলে মানুষ করিতে গিয়া মা-বাপ-ভাইবোনেরা বিনা-পয়সায় যে সকল মেহনৎ করে তাহার দাম ধরিতে অভ্যস্ত নয়।

অনেকগুলা সংখ্যা-তালিকা দেখাইয়া পিয়েত্রা বলিতেছেন যে, বয়সের প্রত্যেক বৎসরেই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। পুরুষের বেলা বয়স হিসাবে খাঁকৃতি (অর্থাৎ আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয়) কত তাহা নিম্নে দেখানো যাইতেছে :—

বয়স		খাঁকৃতি
১৫ বৎসর	...	৩৪,২১৪ লিয়ার
৩০ ,,	...	৬২,৭০৬ ,,
৪৫ ,,	...	৭৬,২৪৯ ,,
৬০ ,,	...	৯৯,৬৩০ ,,
৭৩ ,,	...	১১৪,৫৯২ ,,

মেয়ের বেলাও খাঁকৃতি দেখা যায়,—বরং আরও বেশী। সোজা কথায়, মানুষ জীবনে যতই রোজগার করুক না কেন, কখনই সে তাহার খরচ শুধিতে পারে না।

পিয়েত্রা বলিতেছেন যে, কড়ায়-ক্রান্তিতে হিসাব করিলে বলিতেই হইবে যে, মানুষ তৈয়ারির ব্যবসায় লোকসান ছাড়া লাভ নাই। এই কারবারে টাকা খাটাইয়া লাভবান হওয়া অসম্ভব। জিনির সিদ্ধান্ত পুরাপূরি প্রমাণিত ও সমর্থিত হইতেছে। পিয়েত্রার হিসাবগুলা পাদভার মজুর-সমাজ হইতে সংগৃহীত।

পিয়েত্রা বলিতেছেন,—"বুঝাই যাইতেছে যে, দুনিয়ার নরনারী যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে খাঁটি বাণিয়ার মত হিসাব করিয়া চলিত

তাহা হইলে সংসারে সন্তান-জন্ম অতিমাত্রায় স্থগিত থাকিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের নায়ক মুসলিনির কথাই ঠিক। মানুষ আর্থিক জীব বটে, কিন্তু তাহার পূর্ণ মানবত্ব খোয়াইয়া বসে নাই। ষোল আনা মানুষের অভাব-চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই কাজ করিতেছে। ইতালির পক্ষে লোকবলই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী সম্পদ্। কাজেই ব্যক্তিগত স্বার্থহানি বা লোকসানের সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেশের চরম স্বার্থপুষ্টির জন্য আমাদেরকে উচ্চতর যুক্তির বশবর্ত্তী হইতে হইবে।"

মুসলিনির বাণী যাঁহারা বরদাস্ত করিতে অর্থাৎ জন্মসংখ্যা বাড়াইবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে প্রস্তুত নন তাঁহারাও পিয়েত্রার গবেষণা-প্রণালীটা রপ্ত করিতে রাজি হইবেন। বাঙলায় চাই এইরূপ সংখ্যা-নিষ্ঠভাবে মানুষের আর্থিক কিম্মৎ গবেষণা।

জর্জ্জ্য মর্ত্তারা

"জার্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভস্তা দি স্তাতিস্তিকা" নামক ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-মাসিকের সম্পাদক জর্জ্জ্য মর্ত্তারা "প্রস্পেত্তিভে একনমিকে,—১৯২৭" (১৯২৭ সনে আর্থিক দুনিয়ার গতি) নামে এক-খানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। মর্ত্তারা নব-প্রতিষ্ঠিত মিলান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রোম ইতালির রাষ্ট্র-কেন্দ্র বটে, কিন্তু শিল্পকেন্দ্র, ব্যবসা-কেন্দ্র, ব্যাঙ্ক-কেন্দ্র হইতেছে মিলান। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা দুই বৎসর পূর্ব্বেও মিলানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলনা। যাহা হউক, ইতালির অন্যতম প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত মিলানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহাল আছেন।

মর্ত্তারার বইটা মিলানের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-

সংখ্যা প্রায় ৫০০। ঠিক যেন "আর্থিক দুনিয়ার গতি" নামে এক একখানা বই ফী বৎসর বৎসরের প্রথম দিকে বাহির হইয়া থাকে। ১৯২৭ সনের বইটা সপ্তম সংখ্যা। যে বৎসর বইটা বাহির হয় সেই বৎসর দুনিয়ার কোথায় কিরূপ আর্থিক লেনদেন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহাই বিবৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করাই এই গ্রন্থের মতলব। কিন্তু মোটের উপর অতীতের কাহিনীই এইরূপ রচনার প্রাণ।

তবে নেহাৎ ফটোগ্রাফ বলা চলেনা। কেননা কোনো এক মুহূর্ত্তের তথ্য প্রকাশ এই গ্রন্থের লক্ষ্য নয়। সিনেমার ছবিতে যেরূপ মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত মূর্ত্তি পায়, মর্ত্তারার "প্রস্পেত্তিভে" সেইরূপ ঘটনা-ধারার চিত্র। এক কথায় ইতিহাস বলিলেও দোষ হইবে না। কিন্তু অনেক লোকেরই,—বিশেষতঃ কেজো লোকের,—ভবিষ্যৎটা আন্দাজ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হয়। সেই সব লোকের পক্ষে "আর্থিক দুনিয়ার গতি"র মতন বই যার পর নাই মূল্যবান্। অবশ্য প্রায় প্রত্যেক ভবিষ্যদ্‌বাণীরই ফলন সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বাধা থাকা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ আর্থিক জগতে প্রায়ই যখন-তখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিতেছে।

এই রয়্যাল অক্টেভো আকারের ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী ঢাউস বইটার ভিতর মর্ত্তারা ১৮টা বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ১৮টা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ের সূচী নিম্নরূপ :—(১) শস্য, (২) মদ, (৩) অলিভ তেল, (৪) ফলমূল ও শাকশব্জী, (৫) রেশম, (৬) কৃত্রিম রেশম, (৭) তুলা, (৮) হেম্প্, (৯) পশম, (১০) কয়লা, (১১) কেরোসিন তেল, (১২) জল-বিজলী, (১৩) লোহা, (১৪) তামা, (১৫) জাহাজ, (১৬) রেল, (১৭) রাজস্ব, (১৮) টাকা-কড়ি। বাদ

পড়িয়াছে লোকজনের বহির্গমন। অধিকন্তু মজুর ও মজুরি সম্বন্ধে কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ নাই।

রেল, রাজস্ব আর টাকাকড়ি বিষয়ক প্রবন্ধ তিনটা একমাত্র ইতালিয়ান তথ্যের সংগ্রহ। অন্যান্য প্রবন্ধগুলা গোটা দুনিয়ার কথায় ভরা।

কেরোসিন তেল সম্বন্ধে আলোচনা-প্রণালী বিবৃত করিলে গ্রন্থের কাঠামটা বুঝা যাইবে। মর্ত্তারা বলিতেছেন যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কেরোসিন তেল পরিস্কার করিবার পর প্রধানতঃ আলো জ্বালিবার কাজে তাহা ব্যবহার করা হইত। আর পরিষ্কার করিবার পর তেলের যে গাদ পড়িয়া থাকে তাহা লাগানো হইত চাকা, কলকব্জার প্যাঁচ ইত্যাদি লোহার জিনিষ পালিশ করিবার জন্য। কিন্তু বিগত আড়াই দশকে বিজলী বাতি কেরোসিনের আলোর ঠাঁই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আলোর জন্য কেরোসিনের চাহিদা কম। কাজেই একটা শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর দিকে ঘটনাচক্রে মোটর গাড়ীর আবিষ্কার ও চলাচল কেরোসিনের ইজ্জৎ বাঁচাইয়া দিয়াছে। এদিকে ডীজেল এঞ্জিনের তেল-ক্ষুধা জবর। সঙ্গে সঙ্গে টেক্‌নিক্যাল প্রক্রিয়ার সাহায্যে তেলের গাদগুলাকে উচ্চ শ্রেণীর মালে পরিণত করা হইয়াছে। আর এই মাল ঘর গরম করিবার ষ্টোভ ইত্যাদি যন্ত্রে বেশ ব্যবহারোপযোগী। ফলতঃ সকল দিক্ হইতেই তেলের চাহিদা বাড়িতেছে। বাষ্পের বদলে তেল ব্যবহার করিতে পারিলে এঞ্জিনটার জন্য কম জায়গা দরকার হয়। এই সুবিধা থাকায় তেলের দিকে সকলেরই টান বেশী।

দুনিয়ায় আজকাল যত কয়লা উঠে তাহার শতকরা ১২ অংশ উৎপন্ন হয় তেল। আর দুনিয়ায় সকল প্রকার কয়লার তাপশক্তি যত তার

শতকরা ১৫ কি ১৮ অংশ হইতেছে তেলের। তেল দুনিয়ায় হুহু করিয়া দিগ্বিজয় চালাইতেছে। কেননা ১৯১৪ সনেও,—অর্থাৎ যুদ্ধের সমসমকালে কয়লার তুলনায় তেলের অনুপাত আজকালকার অনুপাতের তিনভাগের একভাগ মাত্র ছিল। আটোমোবিল আর উড়ো জাহাজ একমাত্র তেলের উপর নির্ভর করে। তেল লইয়াই বহুসংখ্যক "স্থাবর জঙ্গম" এঞ্জিন চলিয়া থাকে। লড়াইয়ের জন্য যে সব নয়া-নয়া জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে সবই তেলের দাস। আর বাণিজ্য-জাহাজের শতকরা ৩০টা তেলের জোরে চলে।

তেলের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলা বিবৃত করিয়াছেন :—

(১) তেলের দুনিয়া,—ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ; শিল্প-বৃত্তান্ত (মার্কিণ, বৃটিশ, ওলন্দাজ ও রুশ তেল-ট্রাষ্টের কথা), তেলের জন্য লড়াই, ১৯১২—১৯২৬ পর্য্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ (৪ কোটি ৮৪ লাখ টন হইতে ১৪ কোটি ৭১ লাখ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে) ; তেল-উৎপাদক দেশের বিবরণ ; আন্তর্জ্জাতিক তেলের বাজার, তেল খরিদ করে কোথায় কাহারা ; বাজারদর ১৯১৯ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত।

(২) ইতালির তেল-সম্পদ্,—ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক কথা, কবে কত উৎপন্ন হইয়াছে ; বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ; বাজার-দর।

(৩) বর্ত্তমান অবস্থা—(ক) দুনিয়ায়। তেল পরিষ্কার কৌশলে উন্নতিসাধিত হইয়াছে। তাহার ফলে অল্প পরিমাণ তেল উৎপন্ন হইলেও নানাবিধ কাজ অনেক পরিমাণে একসঙ্গে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তেলের উৎপত্তি মেক্‌সিকো ছাড়া—অন্যান্য দেশে বাড়্‌তির দিকেই দেখা যাইতেছে। অপর দিকে কয়লার দাম কমিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু

কয়লার ব্যবহার সম্বন্ধেও উন্নতি হইয়াছে। কাজেই কয়লার সঙ্গে লড়াইয়ে তেলের স্থযোগ এখন কিছু কম।

(খ) ইতালিতে। তেলের ক্ষুধা বাড়্তির দিকে।

মর্ত্তারার মগজে লোহা, তামা, রেশম, পশম ইত্যাদি সব চিজ সম্বন্ধেই এইরূপ "বিশ্ব-বোধ" ঘর করিতেছে। এই ধরণের তথ্যনিষ্ঠ দুনিয়া-মন্থনকারী ধনবিজ্ঞানসেবক ইতালিতে অনেক। বাঙালী সমাজে এইরূপ গবেষক দেখা দিবে কবে?

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, বিশ্বব্যাপী মন্দার যুগটায় (১৯২৯-৩৫) সোনার থাঁকৃতি খুব জবর। মর্ত্তারা ১৯৩৪ সনের "প্রস্পেত্তিভে একনমিকে" গ্রন্থে দেখাইতেছেন যে, যথার্থ অবস্থা ঠিক উল্টা। প্রথমতঃ দুনিয়ায় "কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক", নোট-ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ-ব্যাঙ্কগুলায় সোনার তাল পরিমাণে বাড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দুনিয়ায় খনি হইতে সোনার উৎপাদনও বাড়িয়াছে। ১৯২৯ সনে এই প্রথম খাতে জগতের সকল ঠাঁইয়ে যত সোনা ছিল তার চেয়ে পর-পর বৎসর কি পরিমাণ বাড়িয়াছে নিম্নে দেখানো যাইতেছে:—

বৎসর	কেন্দ্র-ব্যাঙ্কে সোনার পরিমাণ বৃদ্ধি
১৯৩০	১১,৯২০,০০০,০০০ লিয়ার
১৯৩১	৬,০০০,০০০,০০০ ,,
১৯৩২	১১,১০০,০০০,০০০ ,,
১৯৩৩	১,১৪০,০০০,০০০ ,,
মোট বৃদ্ধি	৩০,১৬০,০০০,০০০ ,,

বুঝিতে হইবে যে, ১৯২৯ সনে দুনিয়ার কেন্দ্র-ব্যাঙ্কগুলায় যত সোনা

মজুদ ছিল ১৯৩০ সনে তার চেয়ে ১১,৯২০,০০০,০০০ লিয়ার বেশী ছিল।

এইবার দ্বিতীয় দফা দেখা যাউক। মন্দার যুগে খনি হইতে কি পরিমাণ সোনা উঠিয়াছে। তাহার ফিরিস্তি নিম্নরূপ :—

১৯৩০ : ৭,৬২০,০০০,০০০ লিয়ার
১৯৩১ : ৮,১০০,০০০,০০০ ,,
১৯৩২ : ৮,৭৪০,০০০,০০০ ,,
১৯৩৩ : ৮,৭১০,০০০,০০০ ,,

মোট ৩৩,১৭০,০০০,০০০ ,,

এই চার বৎসরে ৩৩,১৭০,০০০,০০০ লিয়ার মূল্যের সোনা উঠিয়াছিল। মন্দার পূর্ব্ববর্ত্তী চার বৎসরে (১৯২৬-২৯) উৎপন্ন সোনার মূল্য ছিল কম,—২৮,৯৭০,০০০,০০০ লিয়ার।

জগতের "কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক"গুলায় সোনার "রিজার্ভ" মন্দার যুগে কিরূপ বাড়িয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহা দেখানো হইতেছে "মিলিয়ন" লিয়ারে) :—

দেশ	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪ (মে)
ফ্রান্স	৩১,০১৮	৩৯,৮৮৩	৫১,২৬২	৬১,৭৯৮	৫৭,৩৯২	৫৮,২৬৯
হল্যাণ্ড	৩,৪১৪	৩,২৫৩	৬,৭৭৪	৭,৮৮৯	৭,০৩২	৬,১৮৯
বেলজিয়াম	৩,১০৫	৩,৬২৬	৬,৭৩৬	৬,৮৫৮	৭,২২২	৭,১৩০
স্বইট্‌-সার্ল্যাণ্ড	২,১৮১	২,৬১৪	৮,৬০৪	৯,০৫৯	৭,৩২৫	৫,৯৯৯
ইতালি	৫,১৯০	৫,২৯৭	৫,৬২৬	৫,৮৩৯	৭,০৯২	৬,৬৬৭
বিলাত	১৩,৫০৯	১৩,৭১২	১১,২১৬	১১,১৫১	১৭,৭২৫	১৭,৭৬০

রুশিয়া	২,৭৯৬	৪,৭৩২	৬,২৩৮	৬,৯৯০	৭,৯০০	×
সমগ্র ইয়োরোপ	৮৬,৩২০	৯৫,৫১২	১১১,১৬৪	১২২,৩৩৯	১২২,৯২৪	×
ভারত	২,২৩৩	২,২৪০	২,৮৭৮	২,৮৭৮	২,৮৭৮	২,৮৭৮
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৭৪,১০০	৮০,২৭৫	৭৬,৯৬৯	৭৬,৮৫৫	৭৬,২২৮	৯০,০৪১
সমগ্র জগৎ	১৯৭;৪৫৮	২০৯,৩৭৯	২১৫,৩৭৭	২২৬,৪৭৪	২২৭,৬১০	×

উপরের তালিকায় অঙ্কগুলা মিলিয়ন লিয়ারে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্কের পর ০০০,০০০ বসাইলে যাহা হয় তত পরিমাণ লিয়ার রিজার্ভ ছিল।

বুঝিতেছি যে, ১৯২৯ সনে যে অবস্থা ছিল ১৯৩৩ সনে তাহার চেয়ে ৩০,১০০,০০০,০০০ লিয়ার বেশী ছিল মজুদ। এই গেল গোটা দুনিয়ার হিসাব। যে কয়টা দেশের হিসাব দেখানো হইয়াছে তাহার কোনোটায়ই সোনার "রিজার্ভ" কমে নাই। সর্ব্বত্রই বাড়িয়াছে, মায় ভারতেও।

এই হিসাবে ভারতের "পেপার কারেন্সী রিজার্ভ" অর্থাৎ কাগজী মুদ্রার জামিন স্বরূপ সরকারী তহবিলের সোনা ১৯২৯ সনে ছিল ২,২৩৩,০০০০০০ লিয়ার। ১৯৩৪ সনের মে মাসে উহার পরিমাণ ছিল ২,৮৭৮,০০০,০০০ লিয়ার।

বাড়্‌তি সব চেয়ে বেশী দেখিতেছি ফ্রান্সে। "গোটা জগতের" কেন্দ্র-ব্যাঙ্কে সোনার রিজার্ভ বাড়িয়াছে বটে। কিন্তু কোনো-কোনো দেশে কমিয়াছে। ইয়োরোপের জার্ম্মাণি, এশিয়ার জাপান আর দক্ষিণ আমেরিকা ঘাট্‌তির দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য, যথা (মিলিয়ন লিয়ারে):—

দেশ	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪ মে
জার্ম্মাণি	১০,৩৩৩	১০,০৩০	৪,৪৫৪	৩,৬৪৮	১,৭৪৭	৫৮৯
জাপান	১০,১৫৩	৭,৮২৩	৪,৪৫১	৪,০২৫	৪,০২৫	৪,২৬৮
আর্জ্জেন্টিনা	৮,২৫১	৭,৮৩৩	৪,৮০৩	৪,৭২৯	৪,৫৪৬	×

সর্ব্বত্রই অঙ্কগুলার সঙ্গে ০০০,০০০ জুড়িয়া লিয়ারের পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে (১৯১৯-২৩) দুনিয়ার সর্ব্বত্র কাগজী মুদ্রার রেওয়াজ খুব বাড়িয়াছিল। জার্ম্মাণিতে ইহা চরমে গিয়া ঠেকিয়াছিল। মর্ত্তারা বলিতেছেন যে, আর্থিক দুর্য্যোগের মুদ্রা-লক্ষণ তখন যেরূপ দেখা গিয়াছিল একালের আর্থিক দুর্য্যোগে (১৯২৯-৩৫) মুদ্রা-লক্ষণ সেরূপ নয়। এই যুগে কাগজী মুদ্রার রেওয়াজ কমিয়াছে বৈ বাড়ে নাই। সেকালের মুদ্রা-"পতনে" আর একালের মুদ্রা-"পতনে" বিপুল প্রভেদ। সেকালে সোনার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখিয়া কাগজী মুদ্রা জারি করা হইয়াছিল। একালে সোনার তাল গবর্মেণ্টের তাঁবে অথবা কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের সিন্দুকের ভিতর প্রচুর। কাজেই গবর্মেণ্ট-গুলা অতি-হিসাবী রূপে চলিলেও প্রচুর পরিমাণে কাগজী মুদ্রা জারি করিতে অধিকারী। কিন্তু গবর্মেণ্টগুলা কাগজী মুদ্রা প্রচার সম্বন্ধে যার পর নাই সংযম অবলম্বন করিয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই কাগজী মুদ্রার পরিমাণ কমিয়াছে। কোথাও বাড়িয়া থাকিলে বৃদ্ধির পরিমাণ অল্প। নিম্নে কয়েকটা দেশের বৃত্তান্ত দেখানো যাইতেছে (প্রত্যেক অঙ্কের সঙ্গে ০০০,০০০ জুড়িয়া বুঝিতে হইবে):—

দেশ	মুদ্রা	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
বিলাত	পাউণ্ড	৩৭০	৩৬৯	৩৬৪	৩৭১	৩৯২
জাপান	ইয়েন	১,৬৪২	১,৪৩৬	১,৩৩১	১,৪২৬	১,৩৮১

ভারত	টাকা	১,৭৯৪	১,৬১৩	১,৭৯৩	১,৭৪৮	১,৭৮১
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	ডলার	৭,০২৫	৩,৬৮৮	৪,৮১৭	৪,৮০৭	৫,০৭৭

বিভিন্ন দেশের মুদ্রাগুলাকে সবই সোনার লিয়ারে পরিণত করিলে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ হইবে দেশে দেশে নিম্নরূপ (মিলিয়নে) :—

দেশ	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
বিলাত	৩৪,১৯৩	৩৫,১০১	২৩,৩৪৩	২৩,১২৩	২৪,৩৯৪
জাপান	১৫,২৭৪	১৩,৬০০	১০,৯৯২	৫,৬১৭	৫,১৬২
ভারত	১২,৪৪১	১১,০১১	৮,৬৩৯	৮,২৩৫	৮,৩১৩
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৭৬,৪৭৫	৭০,০৭২	৯১,৫২৩	৯১,৩৩৩	৬১,৬৪০
ইতালি	১৬,৮৫৪	১৫,৬৮০	১৪,২৯৫	১৩,২৭১	১৩,২৩৮
জার্ম্মাণি	২৪,৬২৬	২৩,৬১২	২৩,৫২৬	১৭,৯৮২	১৮,২৭২

সর্ব্বত্রই অঙ্কগুলার সঙ্গে ০০০,০০০ জুড়িয়া দিতে হইবে।

এই তালিকায় ইতালি আর জার্ম্মাণির অবস্থাও দেখানো হইল। দেশ ছয়টার সর্ব্বত্রই দেখিতেছি কাগজী মুদ্রার ঘাটতি। ১৯১৯-২৩ যুগের জার্ম্মাণির কথা মনে আনিলে ১৯২৯-৩৪এর জার্ম্মাণির মুদ্রাসংযম সবিশেষ চিত্তাকর্ষক হইবার কথা।

অপর দিকে কয়েকটা দেশে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়াছে। সোনার লিয়ারে (০০০,০০০) নিম্নের তালিকা দ্রষ্টব্য :—

দেশ	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
ফ্রান্স	৫১,০৪৪	৫৬,৮৯৯	৬৩,৮১৪	৬৩,২৯৫	৬১,৪৯৭
হল্যাণ্ড	৬,৫৮৩	৬,৪৬৯	৭,৮২৮	৭,৩৬২	৬,৯৭৩
বেলজিয়াম	৭,৩৬২	৮,৬৭৫	৯,৬৫৩	৯,৫৮২	৯,০৩১

সুইটসার্ল্যাণ্ড	৩,৬৬২	৩,৮৯৩	৫,৮৯৯	৫,৯০৬	৫,৫৩৬
রুশিয়া	২৪,২২৬	৩৯,৩৬২	৫০,৩৯৯	৫৭,১৬৫	৬৩,৫৬৯

কিন্তু কাগজীমুদ্রার পরিমাণে বাড়্‌তির দেশগুলায়ও মুদ্রাসংযম লক্ষ্য করিতে হইবে। কেন না ঐ সকল দেশের কেন্দ্র-ব্যাঙ্কে সোনার তাল যে পরিমাণে আসিয়া মজুত হইয়াছে তাহার অনেক কম হারে কাগজী-মুদ্রা জারি করা হইয়াছে।

"প্রস্পেত্তিভে একনমিকে" নামক বর্ষপঞ্জী ১৯২১ সনে সুরু করা হয়। আজ পর্য্যন্ত চৌদ্দ সংখ্যা বাহির হইল। এই পঞ্জিকার জন্য আর্থিক জীবনের সকল বিভাগেই সম্পাদককে মাথা ঘামাইতে হয়।

মর্ত্তারার লেখা প্রধানতঃ "জার্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা" নামক অর্থশাস্ত্র ও সংখ্যা বিষয়ক মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়। এই পত্রিকার তিনি অন্যতম সম্পাদক। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার যে সকল পুস্তিকা বা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই লোকবল বিষয়ক। কালানুসারে কয়েকটা রচনার নাম করা যাইতেছে (যে নগরে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নাম সহ), যথা :—

১৯০৮, ইতালির বড় বড় শহরের নরনারী তোরিণো)।

১৯০৯, ইতালিতে অপরাধ ও অপরাধী (তোরিণো)।

১৯০৯, মিলান শহরের বিবাহ ও জন্মমৃত্যু সংখ্যা (মিলান)।

১৯১০, বাসিলিকাতা ও কালাব্রিয়া জেলায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-কালীন লোকসংখ্যা (রোম)।

১৯১১, লোক-হ্রাসের দুঃস্বপ্ন ও ইতালির অবস্থা (মেস্‌সিনা)।

১৯২০, অর্থ নৈতিক সংখ্যা ও লোকবল (রোম)।

১৯২৫, লড়াইয়ের সময়কার ও তাহার পরবর্ত্তী কালের ইতালিয়ান স্বাস্থ্যকথা (বারি)।

১৯৩০, মৃত্যুহারের ঘাটতি (রোম)।

১৯৩৩, অর্থ নৈতিক ভবিষ্য গণনা (রোম)।

১৯৩৪, মানুষের খরচ ও আয় (রোম)।

এই সমুদয়ের অনেকগুলাই বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য লিখিত বক্তৃতা। কোনো-কোনোটা ইস্তিতুত নাৎস্যনালে দেল্লে আস্সিকুরাৎসিঅনি নামক সরকারী বীমা-কোম্পানীর তদবিরে তৈয়ারি ও প্রকাশিত।

"স্বাধীনতা"র অর্থশাস্ত্রী আঁরি ক্রশি ও ঈভ-গীয়ো

একালের "স্বাধীনতা"-পন্থীরা ধনবিজ্ঞানের গবেষণায় কিরূপ মতামত পোষণ করেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রী আঁরি ক্রশি তাহার ভাল দৃষ্টান্ত। ক্রশি বর্ত্তমানে প্যারিসের সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিকের (ধনবিজ্ঞান পরিষদের) প্রেসিডেণ্ট। এই পরিষৎ স্বাধীনতার কেল্লা বিশেষ। ১৯৩৪ সনে যে সকল অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া ক্রশি যে সব কথা বলিয়াছেন তাহার কিছু-কিছু দেখানো যাইতেছে।

আইরিশ ফ্রীষ্টেটের অর্থনীতি সম্বন্ধে ক্রশি বলিয়াছেন,—"মানুষ ষোলআনা আর্থিক জীব নয়। একটা তথাকথিত আর্থিক মানব কোথাও দেখা যায় না। সর্ব্বদাই অর্থ নৈতিক যুক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে গোলে পড়িতে হইবে। আইরিশ ফ্রীষ্টেটের কর্ত্তারা যাহা-কিছু করিতেছেন তাহার অনেক-কিছুই আর্থিক হিসাবে যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু তবুও সেই সব অর্থশাস্ত্রীর পক্ষে পর্য্যবেক্ষণের বস্তু।"

ক্রশি দেশে-দেশে পুঁজি-চলাচল সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"মাল-চলাচল যেমন বন্ধ হইয়া যায় পুঁজির আমদানি-রপ্তানি ও সেইরূপ বন্ধ

হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে চাই আবার স্বাধীন লেন-দেন। টাকাকড়ির গতিবিধি স্বাধীন না হইলে দুনিয়ার ধনদৌলতে উন্নতি দেখা যাইবে না।"

মূল্য-নির্দ্ধারণ বিষয়ে গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ক্রশি বলিয়াছেন যে, লড়াইয়ের পর ফ্রান্সে বিঘা প্রতি গমের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে উৎপাদনের হার আরও বাড়িয়া যাইবে। প্রধান কারণ এই যে, আবাদের প্রণালী উন্নত করা হইয়াছে। তাহার উপর, আজকাল যে বীজ ব্যবহার করা হইতেছে তাহাও উন্নত ধরণের। অধিকন্তু গবর্মেণ্টের দেওয়া উৎসাহ ত লাগিয়াই আছে। চাষীদিগকে সর্ব্বদাই সরকারী ফার্ম্মাণে জানানো হইতেছে নিম্নরূপ—"লড়াইয়ে জিতিলেই হইল না, গমের লড়াইয়েও জেতা চাই।" ফলতঃ ফরাসী নরনারীর জন্য যত গম চাই তার চেয়ে কিছু বেশীই উৎপন্ন হইতেছে।

অপর দিকে গমের চাহিদাও লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে বেশ-কিছু কমিয়া আসিয়াছে। ইয়োরোমেরিকার প্রায় সকল দেশেই এইরূপ অবস্থা। লোকেরা গমের রুটি খাইতেছে কম। নতুন-নতুন খাদ্য-দ্রব্যের রেওয়াজ দেখা যাইতেছে। কাজেই গমের রুটির জন্য দরদ আপেক্ষিক হিসাবে কমিতেছে। আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। সাধারণতঃ পল্লীবাসীরা,—চাষীরা,—শহুরে নর-নারীর চেয়ে বেশী গমের রুটি খাইতে অভ্যস্ত। কিন্তু শহরের বাড়্তি ঘটিতেছে বলিয়া রুটিপ্রিয় নরনারী কমিতেছে বৈ বাড়িতেছে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমবিকাশে ইহা এক নতুন ঘটনা।

উৎপাদন বেশী। চাহিদা কম। এই অবস্থায় গবর্মেণ্ট জোর-জবরদস্তি করিয়া গমের দাম বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিলে কোনো সুফল

হইবে না। চাই বাজারের স্বাধীন গতিবিধি। দাম আপনা-আপনি যেখানে গিয়া ঠেকে সেই খানেই দাঁড়াইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। এই হইল ক্রশির বিচার-প্রণালী।

ফরাসী অর্থশাস্ত্রীরা "প্রেসি" নাম দিয়া ধনবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সার আর "কুর্" নাম দিয়া ধনবিজ্ঞানের ঢাউস বই লিখিতে অভ্যস্ত। ক্রশির হাতেও এই দুই প্রকার বই বাহির হইয়াছে।

ঈভ্‌গীয়ো ঠিক ক্রশির মতনই কট্টর স্বাধীনতাপন্থী ছিলেন। "লা সিয়ঁাস একনমিক" নামক গ্রন্থ সেই স্বাধীনতার কেল্লা। তিনি আর সেনেটার-ব্যাঙ্কার রাফায়েল-জর্জ্জ লেভি ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের যুগ্ম সভাপতি ছিলেন। সেই সময়ে বর্ত্তমান লেখকের সঙ্গে এই পরিষদের যোগাযোগ সাধিত হয় (১৯২০)। ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-সেবীদের উদ্দেশ্যে ঈভ্‌গীয়ো যে অভিবাদন দিয়াছিলেন সেইটা মূল ফরাসীতে এবং ইংরেজি তর্জ্জমায় পুণা হইতে প্রকাশিত সেকালের "জার্ণ্যাল অব দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সোসাইটি"তে (ভারতীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষৎ পত্রিকায়) প্রকাশ করিয়াছিলাম (১৯২১)। এই সব বর্ত্তমান লেখকের "ফিউচ্যারিজম অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থে (১৯২২) এবং "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের প্রথম ভাগে (১৯৩২) ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ঈভগীয়োর অভিবাদন নিম্নরূপ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২১):—

"আমরা আপনাকে ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সভ্যরূপে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ধনবিজ্ঞান বিদ্যা একটি আন্তর্জ্জাতিক শাস্ত্র। পাটিগণিত এবং জ্যামিতি যেমন সনাতন ও সার্ব্বজনীন, অর্থশাস্ত্রও সেইরূপ। কোনো দেশের সীমানা দ্বারা এই শাস্ত্রের সত্য-সমূহকে গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না। যে সকল সত্য এই বিদ্যায় অধিকৃত

অথবা যে সকল সত্য অধিকার করিবার জন্য এই বিদ্যার গবেষকেরা চেষ্টিত তাহার কোনোটাই সীমাবদ্ধ নহে। এই বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ বলা সম্ভব নয় যে, পিরিনীজ পাহাড়ের এপারকার যা-কিছু সবই সত্য আর ওপারের সব হইতেছে অসত্য। প্যারিসে যা সত্য তাহা বোম্বে এবং কলিকাতায়ও সমানভাবে সত্য।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী ফিজিঅক্রাৎ অর্থাৎ প্রকৃতি-নিষ্ঠ ধনতত্ত্ব-বিদগণই অর্থশাস্ত্রের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। ইংরেজ দার্শনিক হিউম ও আডাম স্মিথ নিজ-নিজ চিন্তা ধারার ভিতর ফরাসী প্রকৃতিবাদীদের প্রভাব অস্বীকার করেন নাই। ফরাসী পণ্ডিত জ়াঁ-বাপ্‌তিস্ত্‌ সায়, বাস্তিয়া, ল্যরোআ-ব্যোলিয়্যো এই প্রকৃতিবাদীদের প্রদর্শিত পথই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের প্যারিসের ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ও সেই ধারাই বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। আমরা ভারতীয় ধনবিজ্ঞানসেবিগণের সঙ্গে নিয়মিত আদান-প্রদান চালাইতে পারিলে যার পর নাই সুখী হইব। আমাদের বিশ্বাস,—এই আদান-প্রদানে যে চিন্তা-বিনিময় সৃষ্ট হইবে তাহার ফলে ধনবিজ্ঞান বিদ্যার উন্নতি হইতে পারিবে।

"দুনিয়ায় সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহাতে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছে যে, ধনবিজ্ঞান বিদ্যার দাম আরও বাড়িতেই থাকিবে। একালের দুনিয়ায় যে সব দুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কৃত সত্যসমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞতা হইতে প্রসূত।"

ঈভগীয়োর এই "বাণী"র ভিতর "ক্লাসিক" পথ আর "স্বাধীনতা"র সূত্রগুলা অতি সরলভাবে বিবৃত আছে।

ফ্রান্সের ব্যাঙ্কশাস্ত্রী

শার্ল্‌ লেব্যো-প্রণীত "বাঁক দ' ফ্রাঁস" গ্রন্থে (১৯৩১) কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের

কার্য্যপ্রণালীগুলা অতি বিশদরূপে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। লেব্যো এই ব্যাঙ্কের কার্য্যগুলা চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) নোট জারি করা (২) কর্জ্জ দেওয়া, (৩) টাকাকড়ির বাজারে অন্যান্য কাজ, (৪) সরকারী খাজাঞ্চিখানার কাজ। ব্যাঙ্ক-শাসন বিষয়ক বৃত্তান্তও আছে। ফরাসী অর্থশাস্ত্রীদের ব্যাঙ্ক-বিষয়ক গবেষণা বর্ত্তমান লেখকের "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" (১৯২৬), "অ্যাপলায়েড ইকনমিক্‌স" (১৯৩২) আর "ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্‌লেম্‌স্‌" (১৯৩৪) ইত্যাদি গ্রন্থের নানা স্থানে ব্যবহার করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনা, ব্যাঙ্কের শ্রেণীবিভাগ, ব্যাঙ্কের ইতিহাস, ব্যাঙ্কের তুলনা-সাধন ইত্যাদির দিকে ফরাসী অর্থশাস্ত্রীদের ঝোঁক বেশ দেখা যায়। বিগত বিশত্রিশ বৎসরের ভিতর অনেক ব্যাঙ্ক-লেখক ফ্রান্সে নামজাদা হইয়াছেন। ১৯১৩ সনে আলব্যা উয়ার ফরাসী কর্জ্জ প্রথার বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সনে যুদ্ধের ভিতর আঁদ্রে লীস জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের ব্যাঙ্কপ্রথা তুলনায় আলোচনা করেন। লড়াই থামিবার পর ১৯১৯ সনে ফ্রান্সের কর্জ্জ-সমস্যা সম্বন্ধে জার্ম্যাঁ-মার্ত্ত্যাঁর বই বাহির হয়। আঁদ্রে তেরি-প্রণীত ফরাসী ব্যাঙ্ক-বিষয়ক গ্রন্থ ১৯২১ সনে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সনে এদ্মঁ বাল্‌দি ফরাসী "বাঁক্‌ দাফেয়ার" বা শিল্পবাণিজ্য-সহায়ক ব্যাঙ্কের অবস্থা বিবৃত করেন।

১৯২৮ সনে গাব্রিয়েল কোলে একখানা বই লিখিয়াছেন। তাহার নাম "প্রোব্‌লেম বাঁকেয়ার" (ব্যাঙ্ক-সমস্যা)। গ্রন্থের আলোচিত সমস্যা দুইটা—(১) "লে'দ্‌ আ ল্যাঁদুস্ত্রী" (শিল্পবাণিজ্যে সাহায্য) (২) "লা লিকিদিতে দে কাপিতো" (পুঁজির ঝুঁকি)। ব্যাঙ্ক-ব্যবসাকে এই দুই পরীক্ষায় ফেলিয়া যাচাই করা কোলের মতলব। "ল্যাঁদুস্ত্রী" বলিলে একমাত্র কারখানা, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্র

বুঝিতে হইবে না, "ব্যবসা-বাণিজ্য"ও ইহার অন্তর্গত। "লিকিদিতে" (ইংরেজি "লিকুইডিটি") শব্দে বুঝিতে হইবে গচ্ছিত টাকার কত হিস্যা যখন-তখন পাওনাদার বা আমানতকারীকে ফেরৎ দেওয়া সম্ভব।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসার ভাল-মন্দ বা ছোট-বড় খতাইবার জন্য কোলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্ম্মাণি এই চার দেশের অবস্থা সুবিস্তৃত ও সুগভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রকাণ্ড বই সৃষ্ট হইয়াছে। এই বইয়ে যে সকল মাল আছে সকল মাল সাধারণতঃ ব্যাঙ্কবিষয়ক বইয়ে এত পরিমাণে চোখে পড়ে না।

বস্তুনিষ্ঠরূপে তুলনা চালাইয়া কোলে বলিতেছেন যে, বিলাতী ব্যাঙ্কের ধরণ-ধারণ "বিশেষী-করণের" উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন। যে-ব্যাঙ্ক যে-শ্রেণীর অন্তর্গত সেই ব্যাঙ্ক তাহার বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে হাত দিতে অভ্যস্ত নয়। "বাঘা-বাঘা" পাঁচটা প্রতিষ্ঠান (মিড্‌ল্যাণ্ড, লয়েড্‌স্‌, ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার, বার্ক্‌লেজ আর ন্যাশন্যাল-প্রোভিন্সিয়াল) মক্কেলদের নিকট হইতে পাওয়া ডিপজিটের বা আমানতের টাকা অতি নিরাপদভাবে খাটাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। বাণিজ্য-কাগজের কেনা-বেচার জন্য স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক আছে। তাহাদিগকে "ডিস্কাউণ্ট হাউস" ও "বিল-ব্রোকার" বলে। শিল্প-বাণিজ্যের "পুঁজি" জোগাইবার কাজে মোতায়েন আছে অন্য এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান।

ফ্রান্সে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের ভিতর ও এইরূপ বিশেষীকরণ দেখা যায়। কিন্তু মাত্রা বিলাতের মতন নয়। শিল্প-বাণিজ্যে পুঁজি জোগাইবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদিগকে "বাঁক্ দাফেয়ার" বলে। এই সমুদয় এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কিন্তু বিলাতের অন্যান্য দুই

শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কাজ এইখানে এক শ্রেণীর দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই-গুলাকে "এতাব্লিস্‌মাঁ দ্য ক্রেদি" বা কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান বলে। ক্রেদি লিঅনে, কঁতোয়ার নাশ্যনাল দেস্কঁৎ, সোসিয়েতে জেনার‍্যাল, বাঁক্ নাশ্যনাল দ্য ক্রেদি, ক্রেদি অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল এ কমার্সিয়াল, ক্রেদি কমার্সিয়াল দ্য ফ্রাঁস,—এই ছয়টা কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের "বাঘা-বাঘা" ব্যাঙ্ক। মক্কেলদের আমানত খাটাইবার সময় ইহারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাণিজ্য-কাগজের "ডিস্কাউন্ট"-ব্যবসায়ও ইহারা সেই সঙ্গে লাগিতে ভয় পায় না। বিলাতে এই দুই কারবারের জন্য দুই বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান আছে। এই "ক্রেদি"-ব্যাঙ্কগুলাকে ফ্রান্সে "বাক্-দ্য দপো" অর্থাৎ ডিপজিট-ব্যাঙ্ক বা আমানত-ব্যাঙ্কও বলে।

বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক-জগতেও আলাদা-আলাদা ব্যবসার জন্য আলাদা-আলাদা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। তবে এই বিশেষীকরণটা বিলাতী ঢঙের নয়, ফরাসী ঢঙের। প্রথমেই একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল। বেলজিয়ামে ব্যাঙ্কগুলার বড় বড় চারটা দল আছে—(১) সোসিয়েতে জেনার‍্যাল দ্য বেলজিকের দল (২) বাঁক্ দ্য ব্রুসলের দল (৩) লুভাঁর দল, (৪) কেস্ জেনার‍্যাল দ্য রেপর এ দ্য দেপো'র দল।

প্রত্যেক দলের ভিতরই ব্যাঙ্কগুলার শ্রেণীবিভাগ ফরাসী শ্রেণী-বিভাগের মত। অর্থাৎ কতকগুলা শিল্প-বাণিজ্যের কাজে পুঁজি জোগাইবার জন্য "বাঁক্ দাফেয়ার"। অন্যগুলা অবশিষ্ট সকল প্রকার কারবার চালায়। এই অবশিষ্টগুলাকে "বাঁক্ মিক্‌স্‌ত্" বা মিশ্র ব্যাঙ্ক বলে।

এই তিন দেশের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান হইতে জার্ম্মাণির প্রতিষ্ঠানগুলা

আগাগোড়া পৃথক প্রণালীতে পরিচালিত হয়। জার্ম্মাণরা বিশেষী-করণের একদম ধার ধারে না। প্রত্যেক ব্যাঙ্কই সকল প্রকার কাজে টাকা ঢালে। বাণিজ্য-কাগজ কেনাবেচা আর শিল্পবাণিজ্যে পুঁজি খাটানো আর মামুলি কর্জ্জ দেওয়া সব-কিছুই প্রত্যেক জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক নিজ কর্ম্মক্ষেত্রের অন্তর্গত বিবেচনা করে। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় শ্রেণী-বর্জ্জন, জাতি-ভঙ্গ বা বর্ণ-সঙ্কর বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহার চরম দৃষ্টান্ত জার্ম্মাণি। লড়াইয়ের আগে মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলা বার্লিনের শাসন হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিত। কিন্তু মফঃস্বলের সঙ্গে বার্লিনের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠই ছিল। লড়াইয়ের পর মফঃস্বলের প্রতিষ্ঠান-গুলা প্রায় ষোলআনা বার্লিনের ব্যাঙ্কের উদরস্থ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলা বার্লিনের শাখা মাত্রে পরিণত হইয়াছে। কেন্দ্রীকরণ চলিয়াছে জবরদস্তরূপে।

কোলের মতে টাকাকড়ির "নিরাপদ" খাটানো সম্বন্ধে বিলাতী ব্যাঙ্কগুলা সকল দেশের সেরা। অর্থাৎ ডিপজিটওয়ালারা বা আমানত-কারীরা যে-কোনো মুহূর্ত্তে তাহাদের আমানতের টাকা যত সহজে বিলাতী ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ফেরৎ পাইতে পারে অন্যদেশের ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তত সহজে পারে না। বিলাতের পরে ফ্রান্সের ঠাঁই। তাহার পরে বেলজিয়াম। আমানতকারীদের তরফ হইতে জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলা নিকৃষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোলে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক-প্রথাকে বিপজ্জনক বলিতে রাজী নন। আমানতকারীদের টাকা যখন-তখন ফেরৎ দিবার ক্ষমতা জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কসমূহের যথেষ্টই আছে।

শিল্পবাণিজ্যের সাহায্য হয় কোন্ দেশের ব্যাঙ্ক-প্রথায় সব চেয়ে বেশী? এই প্রশ্নের জবাব দিতে যাইয়া কোলে বলিতেছেন যে,—জার্ম্মাণির ব্যাঙ্কগুলা এই হিসাবে সকল দেশের সেরা। বেলজিয়ামের

ঠাঁই জার্ম্মাণির ঠিক পরে, ফ্রান্স আসে বেল্‌জিয়ামের পরে। বিলাতী ব্যাঙ্কগুলার ঠাঁই সর্ব্বনিম্নে।

কোলে বলিতেছেন যে, "নিরাপদ" হিসাবে জার্ম্মাণি সকলের নীচে আর বেলজিয়াম বেশ উন্নত। অপর দিকে শিল্প-বাণিজ্যে সাহায্য দেওয়ার তরফ হইতে জার্ম্মাণি সকলের উপরে বটে কিন্তু বেলজিয়ামের ঠাঁইও বেশ উচ্চ। কাজেই জার্ম্মাণি ও বেলজিয়ামের ভিতর টক্কর চলা স্বাভাবিক। কোলের রায় পড়িয়াছে বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক-প্রথার স্বপক্ষে।

ভূমি-শাস্ত্রী সাঁ-জেনি

ফ্লুর দ্য সাঁজেনি-প্রণীত "লা প্রোপ্রিয়েতে রুবাল আঁ ফ্রাঁস" (ফ্রান্সের পল্লী-সম্পত্তি) গ্রন্থে (১৯০২) ফরাসী জমিজমার অর্থকথা সুন্দররূপে বিবৃত আছে। লেখক এই বইয়ের ভিতর সংখ্যাকে সংখ্যা, শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলা, আইনকানুনকে আইনকানুন আর "সমাজ-দর্শন" কে সমাজদর্শন সবই একসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। বইখানা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু রচনাটা আজও বাঙালী এবং অন্যান্য ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীর পক্ষে ভূমিবিষয়ক গবেষণার আদর্শ-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

ফরাসীরা বহর অনুসারে জমিজমাকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করিতে অভ্যস্ত :—(১) বড়,—কম-সে-কম ৫০ হেক্তার (৩৭৫ বিঘা), (২) মাঝারি ৬ হেক্তার হইতে ৫০ হেক্তার (৪৫ বিঘা হইতে ৩৭৫ বিঘা) পর্য্যন্ত, (৩) ছোট,—৬ হেক্তার (৪৫ বিঘা) পর্য্যন্ত। এই তিন প্রকার জমিজমার কোষ্ঠী ও ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য বইটার উৎপত্তি।

গোটা ফ্রান্সের ভূমিসম্পদ্ বহর হিসাবে নিম্নের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—

১।	ছোট	১২,৭৫৪,৮০৩	হেক্টার	২৫·৭৯	%
২।	মাঝারি	১৯,২১৭,৯০২	,,	৩৮·৯৪	,,
৩।	বড়	১৭,৪১৫,৫৯৯	,,	৩৫·২৭	,,
	মোট—	৪৯,৩৮৮,৩০৪	,,	১০০·০০	

সাঁ-জেনি বড় বহরের ভূসম্পত্তির বিরোধী নন। বরং তিনি জার্ম্মাণির দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে, বড় বহরের মালিকেরাই কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ। ছোট বহরগুলা সম্বন্ধে সাঁ-জেনির সহানুভূতি স্বাভাবিক। এই সমুদয়ের অস্তিত্ব বজায় রাখা তাঁহার অর্থনীতির অন্তর্গত। জার্ম্মাণরা আর ইংরেজরা "নতুন করিয়া" ছোট বহর গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট। ফরাসীদের পক্ষে নতুন করিয়া গড়িবার প্রয়োজন নাই। যে-সব চলিয়া আসিতেছে সেই সব যাহাতে বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করাই সাঁজেনির পাঁতি অনুসারে ফরাসী আইনের কর্ত্তব্য। বড় বহরকে কমাইয়া ছোট করা অথবা ছোটকে বাড়াইয়া বড় করা সাঁজেনির লক্ষ্য নয়। তবে মাঝারি বহরের উপরই ফ্রান্সের কৃষিশক্তি ও ভূমিশক্তি নির্ভর করিতেছে এইরূপই তাঁহার মত।

সাঁজেনি জমিজমা সম্বন্ধে যতখানি ওস্তাদি দেখাইয়াছেন ফ্রান্সের কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেও সেইরূপ গবেষণার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। "লা বাঁক্ দ্য ফ্রাঁস আ ত্রাভেয়ার ল্য' সিয়েক্ল্" (১৮৯৬) তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মজুরদের বীমা আর চাষীদের বীমা সম্বন্ধে তিনি ১৯০০ সনে লিখিয়াছিলেন। এই রচনায় স্বদেশ ও বিদেশ দুই তরফ হইতেই তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। "সাভোয়া জনপদের ইতিহাস"

তাঁহার এক নামজাদা গ্রন্থ। এই বইয়ের জন্য তিনি ১৮৭১ সনে আকাদেমী ফ্রাঁসেজের পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কৃষি-সঙ্কট (১৮৯৯), জমিবন্ধকি ব্যাঙ্ক (১৮৮৯) ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁহার গবেষণা আছে। সাঁজেনি উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থশাস্ত্রী।

রেলবিষয়ক অর্থশাস্ত্রী গদ্‌ফ্যার্ণো

১৮৭৮ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরের "আপ্যার্স্ন্ ছ লেভো-লিসিঁঅঁ দে শেম্যাঁ ছ ফের্যার ফ্রাঁসে" গ্রন্থে (প্যারিস ১৯২৮) গদ্‌ফ্যার্ণো ফরাসী রেলের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। "এতাতিস্‌ম্" বা সরকারী প্রভাবের বিস্তার-সাধন এই অর্দ্ধশতাব্দীর অন্যতম বিশেষত্ব। এই যুগে রেলসড়ক ১৯,৮৪৪ কিলোমেটার হইতে ৩৯,৭৫৪ কি-মে পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে, অর্থাৎ ঠিক ডবল হইয়াছে। ১৮৫৯, ১৮৮৩ আর ১৯২১ সনে গবর্মেণ্ট রেলকোম্পানীগুলার সঙ্গে চুক্তি করিয়া তাহাদের উপর নিজের একতিয়ার বাড়াইয়াছে। অধিকন্তু প্রত্যেক চুক্তির সঙ্গে-সঙ্গেই কোম্পানীগুলা নিজ-নিজ লাভের একটা বড় হিস্যা গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯২১ সনের ব্যবস্থায় কোম্পানীগুলা পরস্পর ঐক্যবদ্ধতার দিকেও অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই কেন্দ্রীকরণ ফরাসী রেলের পক্ষে একটা নতুন কথা। কোনো কোম্পানীই নিজ স্বাধীনতা বর্জ্জন করে নাই। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে অপরের সহ-যোগিতা স্পষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে। কাজেই পূরাপূরি ঐক্য বা কেন্দ্রী-করণ শব্দ কায়েম করা চলিবে না। কিন্তু মাশুল সম্বন্ধে সাম্য ও সামঞ্জস্য কায়েম হইয়াছে। কুলী-কেরাণী-কর্ম্মচারীদের বেতন এবং শাসনকার্য্য ও সামঞ্জস্যের অন্তর্গত হইয়াছে। অটোমোবিলের সঙ্গে রেল টক্কর দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কিনা এই সম্বন্ধে গদফ্যার্ণা নেহাৎ

অতি-সাহসিকও নন আবার অতি-ভীরুও নন। তিনিবলিয়াছেন যে, বিষয়টা বেশ সাবধানে বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিবার ক্ষমতা রেল-কোম্পানীগুলার আছে।

ফরাসী লোকশাস্ত্রীর দল

ফ্রান্সে জন্মবৃদ্ধি-পরিষৎ চলিতেছে লড়াইয়ের পর হইতে। বৎসর-বৎসর এই পরিষদের কংগ্রেসও বসে। পরিষদের নাম "কঁসেই স্থপেরিয়্যর ছ লা নাতালিতে।" এই পরিষৎ গোটা ফ্রান্স জুড়িয়া শাখা বা সহায়ক-সমিতি কায়েম করিয়াছে। "আসোসিয়াসিঅঁ ছ ফামিয় নঁব্র্যজ্" (বৃহৎ পরিবার সমিতি) নামক কয়েক শ' প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের নানা জেলায় কাজ করিতেছে। এই "কঁসেই"য়ের অন্যতম পরিচালক ফ্যার্দিনা বোভ্রা ইয়োরোপের লোক-সংখ্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শোচনীয় দশা দেখিতে পাইয়া জন্মনিরোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য কথা তুলিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ফ্রান্সে বিদেশী—বিশেষতঃ স্লাভ জাতীয়—নরনারীর আমদানি পছন্দ করেন। "কঁসেই"য়ের আর একজন লোকশাস্ত্রী ভিয়ই দেশে-বিদেশে "একালে"র পরিবার-নীতি বা গৃহস্থালী-নীতিকে ধ্বংস করিবার জন্য বাহাল আছেন। তিনি "প্রিম্ আ লা নাতালিতে" (জন্মবৃদ্ধির জন্য অর্থ-সাহায্য) নীতির স্বপক্ষে অন্যতম বড় লেখক ও বক্তা।

"উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের পল্লীবর্জ্জন" ("লেক্সদ রুরাল") বিশ্লেষণ করিয়া সমাজশাস্ত্রী গাস্তঁ রিশার বলিতেছেন,—"ইহাতে ভয়ের কোনো কারণ নাই। 'আভ্যন্তরীণ' উপনিবেশ স্থাপন, লোক আমদানি-রপ্তানি মানুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক কাণ্ড। শহর আর পল্লী দুইই এক নজরে—এক দেশের স্বার্থে,—খতাইয়া দেখা আবশ্যক।"

ফরাসী গবর্মেণ্টের সংখ্যা-দপ্তরের কর্ত্তা লুসিঅঁা মার্শ্ সংখ্যাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে ফ্রান্সের বাহিরেও সুপরিচিত। রোমের আন্তর্জ্জাতিক লোকবল-কংগ্রেসে (১৯৩১) তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়া দেশ-বিদেশের লোকেরা বুঝিয়াছিল যে, ফরাসীরা লোকবল বাড়াইবার আন্দোলনে ইতালিয়ানদের পেছনে নহে। কংগ্রেসের সভায় পঠিত তাঁহার প্রবন্ধে লোকসংখ্যা সম্বন্ধে "যুক্তিযোগে"র প্রয়োগ আলোচিত হইয়াছিল। তাঁহার বিবেচনায় পল্লীবর্জ্জন আর নগরের চৌহদ্দি-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। শহরে লোক-বৃদ্ধি আপনা-আপনিই ঘটিতেছে। কাজেই লোকবৃদ্ধির বিশেষ ব্যবস্থা চাই পল্লী-সমাজে। এই দিকে গবর্মেণ্টের নজর থাকা আবশ্যক।

ফ্রাঁসোআ মার্সাল লোকসংখ্যার উপর সরকারী আইনের প্রভাব সম্বন্ধে ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া সেকালের ইহুদি ও রোমাণ কানুন হইতে ফরাসী বিপ্লবের আইন পর্য্যন্ত সবই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে ফ্রান্সে জন্মসংখ্যা কমিবার প্রধান কারণ সম্পত্তি ভাগা-ভাগির ব্যবস্থা। ১৯২০ সনে ফ্রান্সে "আলোকাসিঅঁ ফামিলিয়াল" অর্থাৎ "পারিবারিক ভাতা" বিষয়ক আইন কায়েম হইয়াছে। তখন হইতে জন্মবৃদ্ধির দিকে ফরাসী নরনারীর নজর কিছু-কিছু গিয়াছে।

বুস্কে

ফরাসী অর্থশাস্ত্রী বুস্কের বিবেচনায় মধ্যযুগের কথা বাদ দিলে "আধুনিক" অর্থশাস্ত্রকে তিন যুগে বা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ক্লাসিক; দ্বিতীয়তঃ, ক্লাসিকের সীমানায় অবস্থিত অথবা ক্লাসিকের সমালোচক; আর তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ। ক্লাসিকের দৃষ্টান্ত ইংরেজ আডাম স্মিথ, ফরাসী জঁা-বাপতিস্ত্ সায়,

ইংরেজ মালথুস, রিকার্ডো ও জন ষ্টুয়ার্ট মিল, এবং "অজ্ঞাত" ইতালিয়ান ফেরারা।

ফ্রাঞ্চেস্ক ফেরারা (১৮১০-১৯০০) কট্টর স্বাধীনতা-নিষ্ঠ। বুস্কে বলিতেছেন,—"অন্যান্য স্বাধীনতানিষ্ঠ ক্লাসিক অর্থশাস্ত্রীরা প্রয়োজন হইলে স্বাধীনতার সীমানা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ফেরারা চরমপন্থী নাছোড়বন্দ। ইংরেজ আডাম স্মিথ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপাসক হইয়াও সাময়িক হিসাবে স্বদেশ-রক্ষার জন্য সরকারী শিল্প-"সংরক্ষণের" পক্ষে পাঁতি দিয়াছেন। স্মিথের অর্থশাস্ত্রে নৌবাণিজ্য-সংরক্ষণ সমর্থিত হইয়াছে। অধিকন্তু, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র সংরক্ষণ-শুল্ক চাপাইলে তাহার বিরুদ্ধে সংরক্ষণ-শুল্ক চাপানো স্মিথের বিবেচনায় প্রশস্ত। কিন্তু ফেরারা সরকারী হস্তক্ষেপের ষোল আনা বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইতালিয়ান স্বদেশসেবক মাৎসিনি যেরূপ স্বাধীনতা-নিষ্ঠ, অর্থ-ক্ষেত্রে তাঁহার সমসাময়িক ফেরারাও তাই।"

বুস্কে দেখাইয়াছেন যে, মেঙ্গারের সীমান্তসুখতত্ত্ব ফেরারার আলোচনার ভিতরও পাওয়া যায়। ফেরারাকে ক্লাসিক হিসাবে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের চেয়ে বড় বিবেচনা করা বুস্কের রচনার বিশেষত্ব। বুস্কের মতে ফেরারা হইতেছেন শেষ ক্লাসিক।

জার্ম্মাণির কার্ল মার্ক্‌স্‌, ফ্রীড্‌রিশ লিষ্ট আর রোমান্টিক আডাম ম্যিলার ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীরা দ্বিতীয় যুগ বা শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দলের ভিতর জার্ম্মাণির "ইতিহাস-নিষ্ঠ" অর্থশাস্ত্রীরাও পড়ে। ইহারা "ক্লাসিক"-বিরোধী।

বিজ্ঞাননিষ্ঠ অর্থশাস্ত্রের প্রতিনিধি হইলেন জার্ম্মাণ গস্‌সেন, সুইস-ফরাসী ভাল্‌রা, অষ্ট্রিয়ান মেঙ্গার, ব্যোমবাভার্ক ও ভীজার, এবং ইতালিয়ান পারেত।

যে বইয়ে বুস্কে এই সকল মত প্রচার করিয়াছেন তাহার নাম "এস্‌সে স্থির লেভোলিয়্যসিঅঁ ছ লা পাঁসে একনমিক্" অর্থাৎ অর্থ নৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ বিষয়ক রচনা (প্যারিস, ১৯২৭)। বুস্কে কয়েক-খানা বই লিখিয়া অর্থরাষ্ট্র-সমাজ-শাস্ত্রী পারেত'র চিন্তাপ্রণালী ফ্রান্সে প্রচার করিয়াছেন। হল্যাণ্ডের সামাজিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এবং অষ্ট্রিয়ান রাজস্ব ও মুদ্রা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্বন্ধেও তাঁহার বই আছে।

বুস্কে পারেত'র ভক্ত। পারেত অবশ্য গণিত-নিষ্ঠ ভাল্‌রার শিষ্য। কিন্তু বুস্কে বিবেচনা করেন যে, গণিতনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র অতীতের সামগ্রী। ক্যাল্‌কুলাস ইত্যাদি গণিত-বিদ্যার দৌলতে ধনদৌলত-বিষয়ক গবেষণা আর বড় বেশী বাড়িবে না।

বুস্কে বলিতেছেন যে,—ক্লাসিকেরা "ভোগ"-মূল্য, "প্রয়োগ"-মূল্য বা "ব্যবহার"-মূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে মাথা খেলাইতে চাহিতনা। তাহাদের গবেষণা প্রধানতঃ বা একমাত্র "বিনিময়"-মূল্যের কোঠে আবদ্ধ ছিল। বিনিময়-মূল্যের বনিয়াদ ছিল তাহাদের মাল-উৎপাদনের খরচা (অর্থাৎ মেহনতের পরিমাণ)। ভোগ-মূল্যের সঙ্গে বিনিময়-মূল্যের যোগাযোগ ক্লাসিক অর্থশাস্ত্রে একপ্রকার অজ্ঞাত। এমন কি সোশ্যালিষ্ট-সর্দ্দার কার্ল মার্ক্‌স্‌ও বিনিময়-মূল্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ষোল আনা ক্লাসিক। সকলেই বিনিময়-মূল্যটাকে মালের একটা বস্তুগত গুণ বিবেচনা করিত।

ক্লাসিক অর্থশাস্ত্রের এই অসম্পূর্ণতা বা একদেশদর্শিতা শুধ্‌রাইবার জন্য দেখা দিল নয়া অর্থশাস্ত্র। তাহার বিধানে ভোগ-মূল্যের ইজ্জৎ আবিষ্কৃত হইল। বিনিময়-মূল্যই মূল্যতত্ত্বের সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিল না। অধিকন্তু বিনিময়মূল্যের সঙ্গে ভোগমূল্যের যথোচিত যোগসূত্র সম্বন্ধেও অর্থশাস্ত্রীদের মাথা পরিষ্কার হইল। ধনবিজ্ঞানে নবজীবন বা যুগান্তর আসিল। এই নয়া অর্থশাস্ত্রকে অষ্ট্রিয়ান নামে চিহ্নিত করা সর্ব্বত্র

দস্তুর। ভিয়েনার মেঙ্গার ইহার অন্যতম প্রবর্ত্তক। বুস্কে ইহাকে সুইটসার্ল্যাণ্ডের লোজান নগরের সঙ্গেও গাঁথিয়া রাখিতে চাহেন। কেন না ভাল্‌রাও ইহার অন্যতম প্রবর্ত্তক। ভাল্‌রা ছিলেন লোজানের অধ্যাপক।

বুস্কের মতে ভাল্‌রার মত অর্থশাস্ত্রী "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"। দুনিয়ার অতীত আর বর্ত্তমান অর্থশাস্ত্রী এবং ভবিষ্যতে যে সকল অর্থ-শাস্ত্রী জন্মিবেন তাঁহাদের সকলেরই তিন হাজার হাত অগ্রবর্ত্তী ("ইল্ দেপাস্ ত্ম মিল্ কুদে তূ লেজ্ একোনোমিস্ত্ পাস্‌সে, প্রেজ়াঁ এ সাঁ ত্যুং আভেনিয়র")।

নয়া ধনবিজ্ঞানের ভিতরকার দুই দল সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। অর্থশাস্ত্রের লোজান-রীতি পুরাপুরি গণিত-নিষ্ঠ। অষ্ট্রিয়ান-রীতি প্রধানতঃ চিত্ত-নিষ্ঠ। গণিতের জোরে ভাল্‌রা "অর্থ নৈতিক স্থিতি-সাম্য" প্রতিষ্ঠা করিলেন চমৎকাররূপে। অপর দিকে মেঙ্গার চিত্ত-নিষ্ঠার সাহায্যে অর্থশাস্ত্র নতুন বনিয়াদের উপর খাড়া করিলেন। ১৮৭১ সনে মেঙ্গারের "গ্রুণ্ডস্প্রেৎট্‌সে ড্যর ফোল্‌কস্‌-ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌স্‌-লেরে" অর্থাৎ ধনবিজ্ঞানের মূল্যসূত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ সন যথার্থ "বিজ্ঞান"রূপে অর্থশাস্ত্রের নব-জন্মের প্রথম বৎসর। ভোগমূল্যের ইজ্জৎ প্রতিষ্ঠিত হয় এই বৎসর ; আর বিনিময় মূল্যের সঙ্গে ভোগ-মূল্যের যোগও সাধিত হয় এই বৎসর।

ভাল্‌রার রচনা দুই ভাগে বিভক্ত। একটার নাম "লেকোনোমী প্যিয়র" (অমিশ্র ধনবিজ্ঞান)। অপরটার নাম "লোকোনোমী সোসিয়াল" (সামাজিক ধনবিজ্ঞান)। বুস্কের তারিফ একমাত্র "অমিশ্র" ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কেন না তিনি ভাল্‌রার সমাজ-বিষয়ক অর্থাৎ মিশ্র ধনবিজ্ঞানকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়াছেন।

অপর দিকে মেঙ্গারের বিরুদ্ধে বুস্কের একপ্রকার কোনো নালিশ নাই। কেন না মেঙ্গার ষোল আনা "পিওর" বা অমিশ্র। তাঁহার সঙ্গে "ফলিত", মিশ্র, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা ঐ ধরণের কোনো প্রকার কর্ম্মমূলক অর্থশাস্ত্রের সংস্রব নাই। যাহা হউক বুস্কের বিশ্লেষণে ভাল্‌রা আর মেঙ্গার এই দুইজনেই অর্থশাস্ত্রের বিজ্ঞান-মূর্ত্তির অবতার রূপে দেখা দিয়াছেন।

বুস্কের শেষ কথা নিম্নরূপ:—ভাল্‌রা-মেঙ্গারের হাতে ধনবিজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে বটে। কিন্তু গণিতের পাল্লায় পড়িয়া ধন-বিজ্ঞান বস্তু হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। অপর দিকে চিত্ত-বিজ্ঞানের নামে অর্থশাস্ত্রীরা ধনদৌলতের সব-কিছুই "অবরোহ"-প্রণালীতে ("ডিডাক্‌টিভ") বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অনেক সময়েই একদম অলীক ও অবাস্তবে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন।

ফরাসী অর্থশাস্ত্রীদের কর্ম্মশালায়

আঁরি ওজেয়ার "লা ফ্রাঁস দোজুরদুই" (আজকার ফ্রান্স) নামক বইয়ে (১৯২৪) ফরাসী দেশের আর্থিক ভূগোল লিখিয়াছেন। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কোনো দফাই বাদ পড়ে নাই। বইটা আগাগোড়া বর্ত্তমানের তথ্য লইয়া গঠিত। অপর দিকে "উভ্‌রিয়ে দু তাঁ পাস্‌সে" (অতীত কালের মজুর) নামক বইয়ে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মজুর-জীবন ওজেয়ারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। আবার "ল প্রঁ্যাসিপ দে নাস্যনালিতে এ সেজ ওরিজিন ইস্তোরিক" (জাতীয়তার মূলসূত্র ও তাহার ঐতিহাসিক উৎপত্তি) নামক গ্রন্থও তাঁহার লেখা। "লা মুভেল ওরিয়াঁতাসিঁ একনমিক" (নয়া আর্থিক দিক্‌দর্শন) বইয়ে একালের

ধনদৌলত বিবৃত আছে। তাহা ছাড়া "নোৎর আঁপির কলনিয়াল' (আমাদের উপনিবেশসাম্রাজ্য) বই লিখিয়াও ওজেয়ার প্রসিদ্ধ।

আর্থিক ইতিহাস রচনায় "একালে" ফরাসী পণ্ডিত আঁরি সে সিদ্ধহস্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থিক ও সামাজিক ফ্রান্স সম্বন্ধে তাঁহার বই ফরাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯২৪ সনে। ইতিমধ্যে তাহার ইংরাজি তর্জ্জমা বাহির হইয়াছে নিউইয়র্কে (১৯২৮)। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী শিল্পবাণিজ্য বিষয়ক বই "লেভোলিয়্যসিওঁ কমার্সিয়াল এ অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল গু লা ফ্রাঁস সু লাঁসাঁ রেজিম" নামে ১৯২৫ সনে বাহির হইয়াছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বই ১৯২৯ সনের রচনা। ১৯২৬ সনে বাহির হইয়াছিল "লেজ্ ওরিজিন দু কাপিতালিস্‌ম্ মদ্যার্ণ" (আধুনিক পুঁজিনিষ্ঠার উৎপত্তি)। বইটায় পুঁজি-নিষ্ঠার উৎপত্তি ছাড়া ক্রমবিকাশও বিবৃত আছে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইয়োরামেরিকার আর্থিক গড়ন এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। বর্ত্তমানে ভারত পুঁজি-নিষ্ঠার যে-স্তরে আছে তাহা মোটের উপর সেই গড়নেরই অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

আঁরি সে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থশাস্ত্রী এমিল লেভাস্যয়রের ধারাই বাড়াইয়া চলিয়াছেন বলিতে হইবে। ১৭৮৯ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ফ্রান্সের মজুর-সমাজ আর শিল্প-সম্পদ কিরূপ অবস্থায় ছিল তাহার বিশ্লেষণের জন্য লেভাস্যয়রের অন্যতম গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। ১৭৮৯ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত মজুরসমাজের অবস্থা লইয়াও তিনি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকন্তু ফরাসী বাণিজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁহার দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ বই আছে (১৯১১)।

ভারতে শার্ল্‌-জিদ এবং শার্ল্‌-রিস্ত্ এই দুই ফরাসী পণ্ডিতের সমবেতরূপে তৈয়ারী "আর্থিক মতামতের ইতিহাস" সুপরিচিত।

মজার কথা,—এই দুই গ্রন্থকারের ধরণ-ধারণ, মেজাজ, আলোচনা-প্রণালী সবই আলাদা-আলাদা। জিদ হইলেন সমবায়-পন্থী। সমবায়ের দৌলতে তিনি যুগান্তর আনিতে প্রয়াসী। রিস্ত্ এই সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে চান না। জিদ মজুরি প্রথার বিলোপ পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়াছেন। জিদের প্রাণের কথা শ্রেণী-বিরোধের ধ্বংস সাধন এবং তাহার পরিবর্ত্তে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা।

মজুরি সম্বন্ধে রিস্ত্ বলিতেছেন যে, বাস্তিয়া-প্রবর্ত্তিত "একোনোমী অপ্‌তিমিস্ত্"ও 'বস্তুনিষ্ঠ নয়, আবার রডব্যার্টুস-প্রচারিত সোশ্যালিষ্ট দুঃখনিষ্ঠাও ঠিক নয়। মনে রাখিতে হইবে যে, এই দুঃখবাদ ক্লাসিক রিকার্ডো প্রবর্ত্তিত "লৌহ নিয়ম" হইতে উৎপন্ন। বাস্তিয়ার আশা-নিষ্ঠায় বুঝানো হইয়া থাকে যে, আর্থিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সুদের হিস্যা কমিয়া আসে আর মজুরির হিস্যা বাড়িতে থাকে। রিস্তের বিবেচনায় এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের কোনোটাই খাঁটি তথ্যের জোরে সপ্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। রিস্ত্ ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের জন্য বিভিন্ন আলোচনা-প্রণালী কায়েম করিবার পক্ষপাতী। সামাজিক ও আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিশ্লেষণে তিনি চাহেন ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালী এবং "আরোহ" ("ইণ্ডাকৃটিভ") পদ্ধতির প্রয়োগ। কিন্তু অর্থ নৈতিক তত্ত্বকথা, বিনিময়-তত্ত্ব, মূল্য-তত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি "লোজান"-রীতি অর্থাৎ ভাল্‌রা-প্রবর্ত্তিত গণিত-নিষ্ঠা কায়েম করিতে চাহেন।

মুদ্রাশাস্ত্রী আল্‌বেয়ার আফ্‌তালিঅঁকে লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে লোকেরা "চক্র"শাস্ত্রী বলিয়া জানিত। ১৯১৩ সনে প্রকাশিত "লে ক্রীজ্ পেরিওদিক দ্য স্যুর-প্রোডুক্‌সিঅঁ" (অতি-উৎপাদনের দুর্য্যোগ) সেকালে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান মন্দার যুগে ধনবিজ্ঞানের গবেষকেরা

বইটার দিকে নজর ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতি-উৎপাদনের ফলে মালের "সীমান্ত-সুখ" অল্পকালের ভিতরই কমিতে সুরু করে। সুতরাং মালের উৎপাদন নিরর্থক হইয়া পড়ে অর্থাৎ উৎপাদনকারীরা লোকসান ভুগিতে বাধ্য হয়।

আল্‌বেয়ার আফ্‌তালিঅঁ অষ্ট্রিয়ান চিন্তনিষ্ঠার পক্ষপাতী। টাকা-কড়ি, বিনিময়-মূল্য ইত্যাদি সকল বিষয়ের আলোচনায়ই তিনি সীমান্ত-সুখের কথা পাড়িতে অভ্যস্ত। তাঁহার বিবেচনায় অনেক তথ্যই মাপজোকের আওতায় আনিয়া ফেলা সম্ভবপর নয়। কাজেই গণিতশাস্ত্রের উপর সকল সময়েই নির্ভর করা চলে না। ১৯২৬ সনে "রেভিয়ু দেকোনোমী পোলিটিক" পত্রিকায় বিনিময় বিষয়ক প্রবন্ধে আফ্‌তালিঅঁ তাঁহার গবেণা-প্রণালীর নমুনাও দিয়াছেন।

বাণিজ্যবিষয়ক অর্থশাস্ত্রী জিন্নু

ফ্রান্সের ন্যাঁসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান-অধ্যাপক ক্লোদ-যোসেফ জিন্নু আজকাল প্যারিসের "জুর্নে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল" অর্থাৎ শিল্প-দৈনিক সম্পাদন করিতেছেন। ১৯২৪ সনে তাঁহার "লাপ্রেগেয়ার এ লা পোলিটিক কমার্সিয়াল" বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগের বাণিজ্যনীতি। অন্যান্য ফরাসী লেখকের মতন জিন্নুও রচনাকৌশলে ওস্তাদ। তাঁহার মতামত পরখ করিবার জন্য কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আজকালকার বাজারে সর্ব্বদা নিম্নলিখিত মত জোরের সহিত প্রচারিত হইয়া থকে :—

"লড়াইয়ের ঠেলায় অর্থশাস্ত্রের পুরাণা মূলসূত্রগুলা আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। ধনবিজ্ঞান বলিলে প্রাক্-লড়াইয়ের যুগে যে

সকল স্বতঃসিদ্ধ, প্রাথমিক স্বীকার্য্য বা অর্থ নৈতিক সিদ্ধান্তের অ, আ, ক, খ বুঝা যাইত সেই সমুদয় সূত্র লড়াইয়ের ধাক্কা খাইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। সেই সমুদয়কে এই শাস্ত্রের ভিত্তি বা বনিয়াদ বলা আর চলে না। সেকালের সনাতন, সর্ব্ববাদিসম্মত, স্থির-প্রতিষ্ঠিত মতামতগুলাকে আর সেরূপ নিরেট, অকাট্য ও সার্ব্বজনীন সত্য বিবেচনা করা সম্ভবপর নয়।"

কিন্তু জিন্নু বলিতেছেন—"এই মত ষোল আনা ভ্রমাত্মক। আসল কথা ধনবিজ্ঞান-বিদ্যাটা মানুষের গড়া বিদ্যা। এই বিদ্যাটা সর্ব্বদাই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার বিরাম নাই। কোনো জায়গায় আসিয়া এই বিদ্যা আটক হইয়া পড়ে না। ধনবিজ্ঞানের আর একটা বিশেষত্ব-পুর্ণ লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। আগা-গোড়া ইহা জ্যান্ত সত্যের বিদ্যা। যথার্থ ঘটনার ঘাঁটাঘাঁটি আর বস্তুসমূহের বিশ্লেষণ হইতে এই বিজ্ঞানের জন্ম। এই সকল লক্ষণওয়ালা বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের আবহাওয়ায় কতকগুলা অদ্ভুত, অভূত, অশ্রুত বস্তু, ঘটনা, কর্ম্মকৌশল ও চিন্তাপ্রণালী লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে বাধ্য হইয়াছে। মানুষের চোদ্দ পুরুষে, অতএব অর্থশাস্ত্র বিদ্যার কোষ্ঠীতে,—এই ধরণের বস্তু ও ঘটনা কখনো অভিজ্ঞতার ভিতর আসে নাই। অধিকন্তু এই সব কর্ম্মকৌশল ও চিন্তাপ্রণালী কোনো দুই এক ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না। আর্থিক জীবনের প্রত্যেক গলিঘোঁচে এইরূপ অদ্ভুত রকমের জল্পন-কল্পন, পরীক্ষা, কর্ম্মপ্রণালী ইত্যাদির জয়জয়কার চলিয়াছিল। এই সকল নতুন-নতুন জ্যান্ত সত্যের সম্মুখীন হইবামাত্র ধনবিজ্ঞান নতুন-নতুন পথে বাড়িয়া চলিবে ইহা ত অতি স্বভাবসিদ্ধ কথা।"

জিন্নুর মতে,—বাস্তবিক পক্ষে পুরাণা মূল সূত্রগুলা বাতিল ত হয়ই নাই, বরং সেইগুলা যে সত্যসত্যই সনাতন ও সার্ব্বজনীন তাহাই

প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এমন কোনো ঘটনা ঘটে নাই যাহা সেই স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ অ, আ, ক, খ'র সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। লড়াইয়ের যুগে আর তাহার পরবর্ত্তী কালে যাহা-কিছু আর্থিক সংসারে দেখা গিয়াছে সব-কিছুই সনাতন ধনবিজ্ঞানের পূর্ব্ব হইতে বলা-কওয়া ঘটনা বা ঘটনার ফলাফল মাত্র।

ফরাসী অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর একদল পণ্ডিত কট্টর সনাতনপন্থী। প্যারিসের "সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক" (ধনবিজ্ঞান পরিষৎ) এই দলের কেল্লা বিশেষ। এই পরিষৎ ১৮৪২ সনে প্রতিষ্ঠিত,—জগতের সর্ব্বপ্রাচীন ধনবিজ্ঞান পরিষৎ। ১৯২০ সন হইতে বর্ত্তমান লেখক এই পরিষদের অন্যতম সভ্য। অধ্যাপক জিদ্ "সোসিয়েতে"-পন্থীদের মতই অতি প্রবলভাবে প্রচার করিতেছেন। যে-মতটার কথা বলা যাইতেছে ইহাকে অর্থশাস্ত্রের আখড়ায় "ক্লাসিক" মত বলা হইয়া থাকে।

জিদ্ আরও লিখিয়াছেন—"কে অস্বীকার করিতে পারে যে, ধন-বিজ্ঞান ভবিষ্যতের কথা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক-ঠাক বুঝিতে পারিয়াছিল? মুদ্রানীতির ফলাফল কখন কিরূপ হইতে বাধ্য তাহা কি 'ক্লাসিক' বা সনাতন অর্থশাস্ত্র বহুদিন হইতেই প্রচার করিয়া আসে নাই? আর্থিক জগতে একঘরো হইয়া থাকিলে,—তা স্বেচ্ছায়ই হউক বা জোর-জবরদস্তির ফলেই হউক—দেশে ও দুনিয়ায় কিরূপ ঘটা অবশ্যম্ভাবী তাহার বিশ্লেষণ কি অনেক দিন পূর্ব্বেই ক্লাসিক অর্থশাস্ত্র করিয়া চুকে নাই?"

একালে অর্থ-নৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই হযবরল দেখা যাইতেছে। জিদ্ বলিতেছেন—

"এইরূপ দুর্গতি কেন ঘটিতেছে? তাহা কি আর চোখে আঙুল

দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? একটুকু মাথা খেলাইলে সকলেই ধরিতে পারিবেন যে, সনাতন ধনবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলাকে অবজ্ঞা করিবার দরুণই এই সকল দুর্য্যোগ-দুর্দ্দৈব ঘটিতেছে। 'প্রকৃতির পথ,' স্বাধীনতার পথ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে।"

তবে কি "সনাতন" অর্থশাস্ত্রের ঋষিরা ভবিষ্যতের সব-কিছুই "দেখিতে" পাইয়াছিলেন? জিন্নুর মতে, "আলবৎ। প্রকৃতিনিষ্ঠ ঋষিরা দুনিয়ার হালচাল সবই বুঝিতেন। 'প্রকৃতি'-বিরোধী কাজ-কর্ম্ম সুরু হইলে, স্বাধীনতার পথ অবরুদ্ধ হইলে, লোকজনের কাজকর্ম্মে গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ বাড়িতে থাকিলে দুঃখ-দৈন্য-দুর্য্যোগ অবশ্যম্ভাবী। এই সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের ভবিষ্য-গণনা সম্বন্ধে বড় জোর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এই সকল প্রকৃতি-বিরোধী অর্থাৎ গবর্মেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত কাজকর্ম্মের ফল-প্রসূত দুর্দ্দৈবের যুগে রক্তমাংসের নরনারী দেশে-বিদেশে কতখানি সহিতে পারে এবং কতদিন পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করিয়াও বাঁচিতে পারে তাহা বোধ হয় তাঁহারা পূরাপূরি ধরিতে পারেন নাই। প্রকৃতি-বিরোধী গবর্মেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত আথিক কাজকর্ম্মের যুগে লোকেরা যে কেবল কষ্ট সহিতে থাকে ইহা নয়। তাহারা এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়িতেও লাগিয়া যায়। এই কথাটাও 'ক্লাসিক'দের জানা ছিল। কিন্তু কত দিন ধরিয়া দেশ ও দুনিয়ার লোক গবর্মেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ব্রতবদ্ধ থাকিতে পারে এই সম্বন্ধে তাঁহাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টি বোধ হয় পর্য্যাপ্ত ছিল না। তাঁহারা বুঝিতেন যে, দুচারদিন বা দুচার মাসের ভিতরই লোকজনের কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা সুফল লাভ করে।

অর্থাৎ অল্পকালের ভিতরই আবার দেশ ও দুনিয়া গবর্মেণ্টের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ পদাঘাত করিয়া প্রকৃতিস্থ স্বাধীনতাপন্থী হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ সাত দশ বৎসরেও মোড় ফিরিল না। মাত্র এইটুকই তাহাদের বুঝিবার গলদ ছিল।”

ক্লাসিক ধনবিজ্ঞানের ভবিষ্যবাণী ফলিয়াছে এবং ফলিতে বাধ্য। সরকারী আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেশ ও দুনিয়া আবার ‘প্রকৃতিস্থ’ হইবে। তবে যত কম সময়ে মোড় ফেরা সনাতন অর্থশাস্ত্রীদের চিন্তায় স্বাভাবিক, তত কম সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মোড় ফিরিলনা। ইহাই জিন্থর আফ্‌শোস!

অর্থশাস্ত্রী কল্‌স ও ক্রুইলে

লেঅঁ কল্‌স ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি সেকালের ল্যরোআ-ব্যোলিয়ো আর একালের রাফায়েল-জর্জ্জ লেভি, ঈভ-গীয়ো এবং আঁরি ক্রশি ইত্যাদির মতন ক্লাসিক-পন্থী “স্বাধীনতা”র প্রতিনিধি। তাঁহার বিপুল গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত। নাম “কূর্‌ দেকোনোমী পোলিটিক” (১৯০১-৭)। বইটার ভিতর তত্ত্বকথার হিস্যা কম। মাত্র প্রথম খণ্ডে “স্বাধীনতা”র বিশ্লেষণ আছে। অন্যান্য খণ্ডগুলা অ্যাপ্‌লায়েড বা অর্থনৈতিক কর্ম্মকাণ্ড সংক্রান্ত। কল্‌স “একল্‌ দে পঁ এ শোসে” নামক প্যারিসের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক। কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর যন্ত্রপাতি-ঘটিত কারবারের ঠাঁই উঁচু হইতে পারিয়াছে। অধিকন্তু “পুল ও শড়কের” কলেজ যে অর্থশাস্ত্রীর আত্মিক আবহাওয়া গঠন করিয়াছে সেই অর্থশাস্ত্রীর গ্রন্থে যানবাহন বিষয়ক তথ্য প্রচুর হইবার কথা। তাহা ছাড়া রাজস্ব-বিষয়ক আলো-

চনা অন্যান্য ফরাসী এবং অ-ফরাসী অর্থশাস্ত্রীর মতন কল্‌সঁ'র কেতাবেও বড় ঘর অধিকার করিয়াছে। ফরাসী অর্থশাস্ত্রীদের অনেকেই এমন কি মজুর বিষয়ক সরকারী আইন-কানুনের ও বিরোধী। কিন্তু কল্‌সঁ সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনতা সম্বন্ধে অত বেশী চরমপন্থী নন। এই বিষয়ে তিনি অনেকটা ল্যরোআ-ব্যোলিয়্যোর মত। ঈভ্-গীয়ো অবশ্য চরমপন্থীর চরম। সরকারী হস্তক্ষেপ তাঁহার চিন্তায় বিষ বিশেষ।

বস্তুনিষ্ঠার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফরাসী অর্থশাস্ত্রীদের নানা বৈঠকে মোলাকাৎ হয়। লিঅঁর অধ্যাপক শার্ল্ ক্রুইলে এত বস্তুনিষ্ঠ যে, তিনি ধনবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড ছাড়া আর-কিছুর তোয়াক্কা রাখেন না। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১২ সনে তাঁহার বই বাহির হইয়াছিল টেক্‌স্টবুক রূপে। ফরাসীরা বক্তৃতাগুলাকে "প্রেসি" বা "কুর" নামে বাহির করিতে অভ্যস্ত। দেশের আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-পরিচালনা, কারবার-সংগঠন ইত্যাদি তথ্য ক্রুইলের গবেষণায় বড় ঠাঁই অধিকার করে। এই হিসাবে কারেন্সী বা মুদ্রাশাস্ত্রী ব্যার্ত্রঁ। নোগারো প্রায় ক্রুইলের দলের লোক। তবে নোগারো "তত্ত্ব-কথা"য় মজিতেও রাজি আছেন। তাঁহাকে এই হিসাবে কল্‌সঁ এবং ক্রুশির জুড়িদার বিবেচনা করা সম্ভব। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠায় তাঁহার ঝোঁক প্রবল। তবে তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার মেজাজ অল্প-বিস্তর খেলিয়া থাকে।

জমিজমা ও চাষ-আবাদের অর্থশাস্ত্রী জেরিং

জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রী মাক্‌স্ জেরিং সম্বন্ধে নানা উপলক্ষে নানা কথা বলিয়াছি। দুনিয়ার লোক তাঁহাকে প্রধানতঃ জমিজমার আইন-সংস্কারক বলিয়া জানে। অধিকন্তু জার্ম্মাণির ভিতর "আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ"

স্থাপনের পরামর্শদাতারূপেও তাঁহার ইজ্জৎ সুপ্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক জেরিং-প্রবর্ত্তিত সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা, উত্তরাধিকারের নিয়ম-পরিবর্ত্তন, চাষী-উপনিবেশের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রথমবার জার্ম্মাণিতে থাকিবার সময় ১৯২১-২৪ সনে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীমহলে তথ্য প্রচার করিয়াছি। ১৯২৬ সনে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" গ্রন্থে তাহার বিবরণ আছে। জেরিং বয়সে খুবই প্রবীণ। তবে এখনো তাঁহার লেখাপড়া চলিতেছে দস্তুর মতন। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট ১৯২৫-২৬ সনে আর্থিক জীবনে রূপান্তর-বিষয়ক "এঙ্কোয়েটে-আউসশ্‌তস্‌" বা তদন্ত-সমিতি কায়েম করে। তাহার কৃষিশাখার পরিচালক বাহাল হন জেরিং। ইনি আজও বার্লিনের কৃষি-গবেষণা-পরিষদের অধ্যক্ষ। ১৯৩১ সনে বার্লিনের, পাউল পারায় কোম্পানী কর্ত্তৃক জেরিং-সম্পাদিত "ডী ডয়চে লাণ্ডভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌ উণ্টার ফোল্ক্‌স্‌ উণ্ড ভেল্টভির্ট্‌-শাফ্‌ট্‌লিখেন ষ্টাণ্ড্‌পুঙ্ক্‌টেন" (জার্ম্মাণ কৃষি,—দেশ ও দুনিয়ার ধনদৌলতের তরফ হইতে আলোচিত) গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে জেরিংয়ের মতামত কিছু কিছু দেখাইয়া যাইতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মানিতে শিল্প-বিপ্লব বেশ-কিছু মাথা খাড়া করিতে সুরু করে। পল্লী-জার্ম্মাণি শহর-জার্ম্মাণিতে পরিণত হইতে থাকে। কারখানাবহুল নগরে মজুরদের বস্তি বাড়িয়া চলে। বিলাতের মতন জার্ম্মাণিতেও শহুরে নরনারীর খাওয়া-পরা জোগাইবার জন্য দেশের ভিতর দরদ উপস্থিত হয়। পল্লী-চাষীদের মেহনতের উপর শিল্প-জনপদের মজুর-কেরাণীদের "ডাল-রুটি" বা রুটি-মাখন নির্ভর করিত, বলাই বাহুল্য। আসল কথা, শিল্পনিষ্ঠার বনিয়াদ ছিল কৃষি-নিষ্ঠা, কিষাণ-জীবন, চাষী-নরনারীর হাতপা'র জোর আর মাথার ঘাম।

লাখ-লাখ নতুন-নতুন শহুরো মজুর-কেরাণীর জন্য "রুটি-মাখন" অথবা আলু-মাংস জোগাইয়া উঠা মুখের কথা নয়। জার্ম্মাণ চাষীরা চাষের পরিমাণ বাড়াইতে বাধ্য হয়। সঙ্গে-সঙ্গে পুরাণা চাষের জমিতেই বেশী পরিমাণে ফসল ফলাইবার জন্যও "ইণ্টেন্‌সিভ" বা গভীরতর আবাদ কায়েম হইতে থাকে। ফলতঃ খরচ-পত্রের মাত্রা বাড়াইয়া চাষী-জার্ম্মাণি শিল্পী-জার্ম্মাণিকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে।

চাষ-আবাদে বেশী-বেশী খরচ করার অর্থ অতি সোজা। কৃষি-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। কাজেই দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর কোনো-কোনো যুগে জার্ম্মাণরা চড়া হারে খাদ্য-দ্রব্য জোগাইতে এবং খরিদ করিতে অভ্যস্ত ছিল। এমন কি কারখানায় প্রস্তুত মালের মূল্য-রেখা চড়াইয়ের দিকে যাইবার পূর্ব্বেই কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য-রেখা দু'এক ধাপ চড়িয়া থাকিত।

এই গেল জার্ম্মাণ সমাজে শিল্পনিষ্ঠার আর শিল্প-প্রসারের যুগের প্রথম অবস্থার কথা। কৃষিজ দ্রব্যের চড়া মূল্য এই অবস্থার আসল কথা। কিন্তু অপরদিকে সেই সময়েই মার্কিণ মুল্লুকে সুরু হয় আর্থিক উন্নতির জোয়ার। আমেরিকান মুল্লুকে চাষীর জয়জয়কার আজও যেমন প্রবল, তখনও সেইরূপ প্রবলই ছিল। সেই দেশে শিল্পোন্নতি ঘটিতেছিল বটে, কিন্তু ইয়োরোপের লোকেরা দেখিত যে, দুনিয়ায় মার্কিণ মাল বলিলে কৃষিজ দ্রব্যই বুঝা যাইত প্রধান। বস্তুতঃ মার্কিণ কিষাণদের মাল ইয়োরোপের বাজারে-বাজারে এত শস্তায় পৌঁছিতে-ছিল যে, জার্ম্মাণ চাষীরা "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। মার্কিণ মালের পাল্লায় পড়িয়া জার্ম্মাণ কিষাণরা নিজ-নিজ মালের দাম কমাইতে সুরু করে। কিন্তু দাম কমাইবারও একটা সীমা আছে। দাম কমাইতে-কমাইতে চাষীরা "হাভাতো" "হাঘরো"

হইয়া পড়িবার অবস্থায় আসিয়া পড়িতেছিল। জার্ম্মাণ সরকার বেগতিক দেখিয়া মার্কিণ মালের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপাইয়া দিল। সংরক্ষণ-শুল্কের দেওয়ালের ভিতর বসবাস করিয়া জার্ম্মাণ চাষীরা স্বদেশী কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত উঁচু রাখিবার সুযোগ পাইল। সরকারী সাহায্য পাইয়া চাষীরা কোনো মতে বাঁচিয়াছে সত্য। কিন্তু তবুও কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস একদম রুখিয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

শিল্পদ্রব্যের "মূল্য-রেখা" আগে চলিত কৃষিজ দ্রব্যের "মূল্য-রেখা" হইতে নীচের ধাপে। কিন্তু মার্কিণ টক্করের পাল্লায় পড়া অবধি কৃষিজ দ্রব্যের "মূল্য-রেখা" সর্ব্বদাই রহিয়াছে শিল্প-দ্রব্যের "মূল্য-রেখার" নীচের ধাপে। মূল্য-ব্যবস্থায় ইহা এক বিপুল বিপ্লব। এই বিপ্লবের ধাক্কা হইতে জার্ম্মাণ চাষীরা আজও যথার্থরূপে উদ্ধার পায় নাই।

জার্ম্মাণরা এবং ইয়োরামেরিকান মূল্য-শাস্ত্রীরা এই উপলক্ষে একটা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে। "মূল্য-কাঁচি" ("প্রাইজ্-শেরে" বা প্রাইস-সিজার্স্) কথাটা বোলশেভিক রুশিয়ার "বর্ষপঞ্চক"-ওয়ালারা চালাইতে অভ্যস্ত। কোনো ভারতীয় লেখকের রচনায় এখনো শব্দটা চোখে পড়ে নাই। কথাটা সোজা। কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যে আর শিল্প-দ্রব্যের মূল্যে যে প্রভেদ সেই প্রভেদ বা ফাঁককে বলে মূল্য-কাঁচি। এই ফাঁকটা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল কাঁচির দুই পাত বা বাঁট জুড়িয়া দেওয়া। কাঁচির দুই পাত জুড়িয়া না দিলে কিছু কাটা সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ কাঁচির জীবন নিরর্থক থাকে। জার্ম্মাণরা রুশরা, ইতালিয়ানরা সকলেই মূল্য-জগতের প্রভেদ বা ফাঁকটা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। একই বাজারে শিল্পদ্রব্যের দাম অতি-চড়া অথচ কৃষিজ দ্রব্যের দাম অতি-নরম, এই অবস্থা জনসাধারণের

বিশেষতঃ চাষীদের আর্থিক জীবনে কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই হইল মূল্যশাস্ত্রের অ, আ, ক, খ।

বুঝিতে হইবে যে, সংরক্ষণ-শুল্ক ভোগ করিয়াও জার্ম্মাণরা মূল্য-কাঁচির দুই পাতকে একত্রে জুড়িয়া দিতে পারে নাই। দুই মূল্য-রেখায় ফাঁক রহিয়া গিয়াছিল বিস্তর।

লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে সাধারণতঃ দেশী-বিদেশী লোকেরা জার্ম্মাণির যন্ত্রনিষ্ঠা আর শিল্পোন্নতি লক্ষ্য করিতে অভ্যস্ত। ইস্পাত, কলকব্জা, লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক মালোৎপাদন ইত্যাদির কোঠে জার্ম্মাণরা লড়াইয়ের পরবর্ত্তী দশ-পনের বৎসরে অনেক-কিছু করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু চাষ-আবাদের কাজেও যে জার্ম্মাণরা এই যুগে উল্লেখযোগ্য অনেক-কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছে, এই কথাটা ভুলিলে চলিবে না। জগৎ-জোড়া আর্থিক মন্দা স্বরু হইবার সম-সম কালে,—১৯২৮-৩০ সনে,—চাষ চালাইয়া জার্ম্মাণরা ১৯১২-১৪ সনের ফসলের কাছাকাছি উঠিতে পারিয়াছে। "জানোয়ার-চাষের" কারবারে ইহারা লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সীমানা ছাড়াইয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। আলু, ওট্‌স্ আর রাই আজকাল জার্ম্মাণিতে এত উৎপন্ন হয় যে, বিদেশে রপ্তানি করিবার মতন মালও উদ্বৃত্ত থাকে প্রচুর পরিমাণে। একটা বড় কথা এই যে, আজকাল বিদেশ হইতে অল্পমাত্র মাংস কিনিলেই চলিয়া যায়। মাংসের জোগান সম্বন্ধে জার্ম্মাণ জাতি অনেকটা "স্বরাট্" হইয়া পড়িয়াছে। কোনো-কোনো জিনিষ,—বিশেষতঃ যব, শব্জী, দুধের জিনিষ, ভূট্টা, পশু-খাদ্য এখনো বিদেশ হইতে বেশ-কিছু আমদানি করিতে হয় বটে, কিন্তু মোটের উপর চাষ-ব্যবসা জার্ম্মাণ জাতিকে প্রায় ষোল আনা "স্বদেশী" করিয়া তুলিয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাক্-যুদ্ধ-যুগের তুলনায় একালের জার্ম্মাণি

চৌহদ্দিতে ছোট। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, জার্ম্মাণরা চাষ-আবাদে অনেক নতুন-নতুন উন্নতি কায়েম করিয়া বসিয়াছে। এই জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প জমিনেও পূর্ব্বের চেয়ে বেশী মাল উৎপাদন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। এক কথায় ইহার নাম "ইন্‌টেন্‌সিভ্‌" বা গভীরতর চাষের জয়জয়কার। সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখা ভাল। জার্ম্মাণির জমিন স্বভাবত কম উর্ব্বর। প্রায় সিকি-পরিমাণ জমি চাষ-আবাদের কাজে লাগানো কঠিন। তাহার উপর আছে পার্ব্বত্য জমি। সেই সকল জনপদে চাষ চালানো এক প্রকার অসাধ্য। অধিকন্তু তাহার অনেক অংশই পুরাপুরি অনুর্ব্বর। এই ধরণের নিকৃষ্ট জমির মালিক হইয়াও জার্ম্মাণ চাষীরা দশ-পনের বৎসরের ভিতর যে সকল সুফল দেখাইতে পারিয়াছে, সেই সমুদয়কে "কৃষি-যুগান্তর" রূপে বিবৃত করা চলে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগে এই যুগান্তর বা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, গভীরতর চাষ, নিকৃষ্ট জমিনে সোনা ফলানো ইত্যাদি কাজ পয়সার খেলা। বিঘা প্রতি, মায় কাঠা প্রতি বেশী-বেশী রুধির ঢালিতে না পারিলে এই সব চিজ দেখানো অসম্ভব। চাই দেদার পুঁজি আর সঙ্গে সঙ্গে চাই দেদার মজুর। অবশ্য অপর দিকে এক কথায় ইহার নাম মাল মাগ্‌গি করা। কাঠা প্রতি খরচ যে পরিমাণে বা যত গুণ বাড়ানো হয় কাঠা প্রতি মালের উৎপাদন-বৃদ্ধি সেই পরিমাণে বা ততগুণ সাধিত হয় না। এই অতি সোজা কথা। সে যাহা হউক, পুঁজি ঢুঁঢ়ার মামলা এই যুগের জার্ম্মাণ চাষীদের আসল মামলা।

হাজার তিনেক চাষীদের আবাদবিষয়ক খরচ-পত্রের হিসাব সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ১৯২৩-৩০ এই বৎসর সাতেকের অঙ্ক কষা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ চাষী কোনো

"মুনাফা" ভোগ করে না। তাহাদের যত্র আয় তত্র ব্যয়। অন্যান্যের অবস্থা স্বচ্ছল। অর্থাৎ "লভ্যাংশ" নামক বস্তুর সোআদ তাহারা পায়। বুঝিতে হইবে যে, জার্ম্মাণ চাষীরা আজকাল কাঠা প্রতি মাল উৎপন্ন করেও বেশী, আর সঙ্গে সঙ্গে কাঠা প্রতি লভ্যাংশ পায়ও বেশী। অন্ততঃ পক্ষে দশ আনা চাষীর আর্থিক অবস্থায় "মুনাফা" মালুম হয়।

কিন্তু এই "মুনাফা" তাহাদের কপালে ভোগ করা সম্ভবপর হয় না। কেন না কর্জ্জের স্বদ জোগাইতে গিয়া মুনাফার প্রায় সব-কিছুই ঘর-ছাড়া হইয়া যায়। কর্জ্জহীন চাষী জার্ম্মাণিতে নাই। আবার চড়াহারে কর্জ্জের স্বদ দেয় না এমন চাষী ও জার্ম্মাণিতে নাই। কাজেই যন্ত্রপাতি, কৃষি-শিক্ষা, কৃষি-প্রচার, রাসায়নিক সার ইত্যাদির দৌলতে অশেষ প্রকার উন্নতি-সাধন করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত মুনাফার বেলায় জার্ম্মাণ চাষীরা "কলা" খাইতে অভ্যস্ত। অতএব চাষীদের আসল সমস্যা হইল চড়াহারে স্বদ-সমস্যা।

স্বদের হার এত চড়া কেন? জার্ম্মাণিতে পুঁজির পরিমাণ কম বলিয়া। জার্ম্মাণির চর্চ্চা করিতে-করিতে অধ্যাপক জেরিং ঠিক যেন আমাদের বাঙলাদেশেই আসিয়া হাজির! কেন না, চাষীর কর্জ্জ, চড়া স্বদ আর পুঁজির খাঁকতি এই ত্র্যহস্পর্শ বাঙালী জীবনের বনিয়াদ বিশেষ।

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে আইন জারি করিয়া কতকগুলা "বিশিষ্ট" স্বদের হার কমাইয়া দিয়াছে। লম্বা-মেয়াদি কর্জ্জের দরুণ এতদিন যে-হারে স্বদ দেওয়া হইতেছিল এই আইনের ফলে তাহার চার আনা মাত্র ভবিষ্যতে দিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা একটা মস্ত রেহাই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে স্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা কোথায়? কেন না বর্ত্তমানে যে সকল কর্জ্জ লওয়া

হইতেছে আর ভবিষ্যতে লওয়া হইবে তাহার স্থদের হার ত কমিতেছে না। বরং পুঁজির পরিমাণ যতদিন কম থাকিবে ততদিন ধরিয়া স্থদের হার চড়া থাকিতে বাধ্য।

জার্ম্মাণ মুল্লুকে পুঁজির খাঁকৃতি এত বেশী কেন? অন্যান্য বিভাগের জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীদের সঙ্গে গলা মিলাইয়া জেরিং বলিতেছেন:— "লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য জার্ম্মাণরা বিদেশী লোকজনকে কোটি কোটি মার্ক দিতে বাধ্য হইতেছে বলিয়া।" এইখানে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। জার্ম্মাণরা ফি বৎসর আজও বেশ-কিছু ধন-সম্পদ্ জমাইতে পারিতেছে। ১৯১৩ সনে—অর্থাৎ লড়াই বাধিবার সম-সম কালে জার্ম্মাণির কৃষি-সমবায় সমিতিগুলার সম্পত্তির কিম্মৎ ছিল ২২০ কোটি মার্ক। মুদ্রা-পতনের যুগে মার্কের মূল্য বিলকুল শূন্যে পরিণত হয় (১৯২২-২৩)। মুদ্রা-স্থিতীকরণের প্রথম বর্ষে (১৯২৪) কৃষি-সমবায়-সমিতিগুলার সম্পত্তি দাঁড়ায় মাত্র ৮ কোটি রাইখ্স্ মার্ক। কিন্তু ১৯৩০ সনে কিম্মৎ উঠিয়াছে ১৬০ কোটি পর্য্যন্ত। বুঝিতে হইবে যে, এমন কি চাষীরাও এই সাত-আট বৎসরের ভিতর সম্পদের মাত্রা বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। বাড়্তির পথে জার্ম্মাণির ইহা অন্যতম জীবন-লক্ষণ। পুঁজি-গঠন চলিতেছে মন্দ নয়। কিন্তু সেই সময়ে চাষীদের সমবেত কর্জ্জ ছিল ১,১০০ কোটি রাইখ্স্ মার্ক আর তাহাদের সমবেত স্থদের পরিমাণ ছিল ৯৬॥০ কোটি রাইখ্স্ মার্ক।

১৯৩০ সনের মাঝামাঝি জার্ম্মাণির প্রায় বার আনা চাষীর অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। এই সব চাষীরা গড়পড়তা কম-সে-কম সাত শ' বিঘার মালিক। পশ্চিম জার্ম্মাণির প্রায় আধাআধি চাষীর অবস্থা তদ্রূপ। ছোট-বহরের চাষীদের অবস্থাও খতাইয়া দেখা গিয়াছে। পূর্ব্ব অঞ্চলের প্রায় দশ আনা আর পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় ছয় আনা

"গঙ্গামুখো পা" রূপে রহিয়াছে। দেউলিয়া আর আধা-দেউলিয়া অবস্থায় এই সকল চাষীদের জীবন আর আবাদ চলিতেছে। এক কথায় "দেশ শুদ্ধ লোক" কর্জ্জে ডুবিয়া রহিয়াছে।

জার্ম্মাণ চাষীকে আর জার্ম্মাণ জাতিকে উদ্ধার করিবে কে? যে পারিবে লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে। জার্ম্মাণ নরনারীর নতুন পুঁজির প্রায় ছয় আনা আজকাল একমাত্র ক্ষতিপূরণের টাকার স্থদ জোগাইতেই নষ্ট হইতেছে। অতএব ভার্সাইয়ের সন্ধির কড়ারগুলা ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ চাষীর সম্পদ্-বৃদ্ধি অসম্ভব।

১৯৩১ সনে জার্ম্মাণির সরকারী আর্থিক-তদন্ত-সমিতির নিকট জেরিং এই পাঁতি জারি করিয়াছেন। ১৯২৭ সনের জেনীভায় অনুষ্ঠিত বিশ্বদৌলত-সম্মেলনে তাঁহার মত এইরূপই ছিল। বস্তুতঃ ১৯২১-২৩ সনে বর্ত্তমান লেখকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সময়ও তিনি এই কথাই বলিতেন। সহজেই বুঝা যাইতেছে কেন ১৯৩৩ সনের জানুয়ারি মাসে ভার্সাই সন্ধি ধ্বংস করিবার ঝাণ্ডা খাড়া করিয়া স্বদেশ-সেবক হিট্‌লার জার্ম্মাণ জাতির উদ্ধারকর্ত্তারূপে সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন।

আডোল্‌ফ্‌ ভেবার

উনবিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক-শাস্ত্রীরা বিলাতী ব্যাঙ্ক-প্রথার তারিফ করিতেন। তাঁহারা জার্ম্মাণিতে বিলাতের ব্যাঙ্ক-বিশেষীকরণ আমদানি করিতে চাহিতেন। তাঁহাদের বিচারে সর্ব্বস্বহ ঢাউস ব্যাঙ্ক-প্রথায় জার্ম্মাণির ক্ষতি হইতেছিল। ১৯০১ সনে যখন জার্ম্মাণিতে ব্যাঙ্ক-ফেলের ধুম লাগে তখন জার্ম্মাণ অর্থ-শাস্ত্রীরা নিজেদের মতগুলা খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত এইরূপ প্রচার করিতে থাকেন। এই অবস্থায় মিউনিকের অর্থশাস্ত্রী আডোল্‌ফ্‌ ভেবার স্থপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে

যুক্তি দেখাইবার সুযোগ পান। তাঁহার মতে সুপ্রচলিত জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কপ্রথা বর্জ্জন করিবার কোনো দরকার নাই। ইংরেজি ব্যাঙ্কপ্রথায়ও গলদ আছে। যে বইয়ে এই মত প্রচারিত হয় তাহা বিলাতী ও জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের তুলনামূলক রচনা। "ডেপোজিটেন-বাঙ্কেন উণ্ড স্পেকুলাট্‌সিয়োন্‌স্‌-বাঙ্কেন" (ডিপজিট-ব্যাঙ্ক ও ঝুঁকি-ব্যাঙ্ক) নামে বইটা বাহির হয় (১৯০২)। এমন কি জার্ম্মাণিতেও তখনকার দিনে এইরূপ একটা বই লেখা কষ্টকল্পনার জিনিষ ছিল। কেন না তথ্য ও অঙ্ক ঢুঁড়িতে হইত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে। অথবা ব্যাঙ্কের আফিসে-আফিসে গিয়া ধর্‌ণা দিয়া পড়িয়া না থাকিলে গ্রন্থে ব্যবহার-যোগ্য মাল ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইত না।

বিলাতী ব্যাঙ্কগুলাকে সহজে ডিপজিট-ব্যাঙ্ক বলা হইয়াছে। আমানত-কারীদের পুঁজি নিত্যনৈমিত্তিক কেনাবেচায় খাটানো এই সব ব্যাঙ্কের কারবার। আর জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলা সকল প্রকার পুঁজি শিল্প-বাণিজ্যের জন্য খাটাইতে অভ্যস্ত। মামুলি কেনা-বেচার কারবার অপেক্ষা শিল্প-বাণিজ্যের কারবারে পুঁজি ঢালার ব্যবসা বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। এই জন্য জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ককে এক কথায় ঝুঁকি-ব্যাঙ্ক বলা হইয়াছে। আজকালকার পারিভাষিকে বিলাতী ঢঙের ব্যাঙ্কগুলাকে "কমার্শ্যাল" বা বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক আর জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলাকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বা শিল্প (বা মিশ্র) ব্যাঙ্ক বলা হইয়া থাকে। পারিভাষিক শব্দের জোরে কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ বুঝানো সহজ নয়। কাজেই আসল কথা,—ভেবারের শব্দেও গলদ আছে আর আজকালকার শব্দগুলাও পূরাপূরি পরিষ্কার নয়।

১৯২৮ সনে ভেবারের "আল্‌গেমাইনে ফোল্‌ক্‌স্‌ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌স্‌-লেরে" বাহির হইয়াছে। বইটা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক টেক্‌ষ্ট্‌বুক রূপে লেখা। এই রচনার অন্যতম বিশেষত্ব হইতেছে "রাট্‌সিওনালিজীরুং

(র‍্যাশন্যালিজেশন) বা যুক্তিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা। "যুক্তিযোগ" জার্ম্মাণ কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের মুড়ি-মুড়কি স্বরূপ। লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে ইয়োরামেরিকার "প্রবীণ" দেশগুলায় আর বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণিতে—যুক্তিযোগ দিগ্‌বিজয়ী হইয়াছে। ১৯২৭ সনের বিশ্বদৌলত-সম্মেলনে (জেনীভা) যুক্তিযোগের আলোচনা খুব প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল। ভেবারের বইটা বোধ হয় টেক্‌ষ্ট্‌বুক হিসাবে যুক্তিযোগ-আলোচনায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীদের লেখা টেক্‌ষ্টবুকের আকার-প্রকার ভারতে অজ্ঞাত। যদি কখনো কোনো জার্ম্মাণ কেতাব বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা করিবার খেয়াল দেখা দেয় তাহা হইলে ভেবারের বইটা এইজন্য বাছাই করা যাইতে পারে। এমন কি দশ বৎসর পরেও এই বইয়ের মাল ভারতীয় ধনবিজ্ঞানসেবীদের নিকট চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ মালুম হইবে। ইতিমধ্যে অবশ্য বইটার নতুন-নতুন সংস্করণও বাহির হইতে থাকিবে।

ভেবার-প্রচারিত ধনবিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক থাকা ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক। কেন না ভেবার রিকার্ডো-পন্থী লোক। আর্থিক ইতিহাসে দখল থাকার দরুণ অথবা আর্থিক তথ্য ও অঙ্কগুলার জোরে কোনো ব্যক্তি অর্থশাস্ত্রী হইতে পারে না। এই হইল তাঁহার মত। ধনবিজ্ঞানের মোটা-মোটা কথাগুলা পাকড়াও করিতে হইলে আর্থিক মানব সম্বন্ধীয় সার্ব্বজনিক স্বতঃ-সিদ্ধস্বরূপ যোগান ও চাহিদার মূলসূত্র-সমূহ কব্জায় আনিতে হইবে। এই মূলসূত্রসমূহের গবেষণা ক্লাসিক পদ্ধতির গোড়ার কথা। সেই সকল কথাই ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদে "স্বাধীনতা"র বনিয়াদরূপে গৃহীত হয়। ইংরেজি ধনবিজ্ঞানের ধারায় তাহাকেই রিকার্ডো-তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। ভেবার কোনো গোঁজামিল না রাখিয়া এই সার্ব্বজনিক স্বীকার্য্যসমূহের উপর ধনবিজ্ঞানের

ভিত্তি গাড়িবার কথা তুলিয়াছেন। জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ তথা-কথিত ইতিহাস-প্রতিষ্ঠিত অর্থশাস্ত্রের সেবক। অধিকন্তু জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীই "সোসিয়ালপোলিটিক" (সামাজিক রাষ্ট্রনীতি) অথবা আর্থিক জীবনে সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য ভেবার নিজেও তাহাই। তবুও তিনি ইতিহাস-বিবর্জ্জিত সার্ব্বজনীন আর্থিক চিত্ত-প্রসূত গোড়ার কথাগুলা সম্বন্ধে জোর্‌সে পাঁতি দিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে বার্লিনের মজুর-শাস্ত্রী হার্ক্‌নারের কথা মনে পড়িতেছে। চিরজীবন "ক্লাসিক"-পন্থীর বিরুদ্ধে লড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত হার্ক্‌নারও ক্লাসিক পন্থার পুনর্জ্জন্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। ভেবার হার্ক্‌নারের লক্ষ্য অনুসারে ক্লাসিক পদ্ধতিকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগীরূপে নতুন গড়ন দিবার কাজে মোতায়েন আছেন। এইজন্য ভেবারের টেক্‌ষ্টবুক-টার দিকে ভারতবাসীর নজর ফেলা আবশ্যক।

ভারতবর্ষে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ এখনো খুব অল্পই আলোচিত হয়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক অংশ যে ক্লাসিক প্রণালী ছাড়া অন্য প্রণালীতে আলোচিত হইতে পারে না সেই সম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থকারের "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" গ্রন্থের (১৯২৬) ভূমিকায় পরিষ্কার রূপে বলিয়া দেওয়া আছে। জগতের সর্ব্বত্র ধনদৌলতের ঐতিহাসিক আলোচনা আর সোশ্যালিজ্‌মের সরকারী হস্তক্ষেপ বর্ত্তমানকালে অতি প্রবল। এই প্রবল আওতায় ধনবিজ্ঞানের আসল কথাগুলা ধামাচাপা পড়িতে পারে এই ভয়ে বর্ত্তমান লেখকের ব্যবস্থায় ঝালে-ঝোলে-অম্বলে ক্লাসিক পদ্ধতির অবতার রিকার্ডোকে ভারতীয় সুধীমণ্ডলে হাজির করানো হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "আর্থিক উন্নতি" মাসিক কায়েম করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রথম সংখ্যা হইতে রিকার্ডোর বাংলা তর্জ্জমা এই মতলবেই প্রকাশ করা হইতেছে। বাঙালী অর্থশাস্ত্রী মহলে

রিকার্ডো-প্রবর্ত্তিত পথে অথবা আধুনিকীকৃত রিকার্ডোর পদ্ধতি অনুসারে ধনগবেষণার সূত্রপাত হইলে সুখের হইবে সন্দেহ নাই।

জগতের অধিকাংশ অর্থশাস্ত্রীকেই কোনো একটা বা দুইটা শাখার সঙ্গে পূরাপূরি গাঁথা রূপে দেখিতে পাই না। আডোল্ফ্ ভেবারও শাখা হইতে শাখায় উড়িয়া বেড়াইতে অভ্যস্ত। শহরের আর্থিক সমস্যা লইয়া ভেবার কয়েকখানা বই লিখিয়াছেন। জমি ভাড়া সম্বন্ধে (১৯০৪) আর ঘরবাড়ী সম্বন্ধে (১৯০৮) ছিল দুইটা স্বতন্ত্র রচনা। পরে "ডী গ্রোস্-ষ্টাট্ উণ্ড ইঁরে সোৎসিয়ালেন প্রোব্লেমেন" (মহানগরী ও তাহার সামাজিক সমস্যা) প্রকাশিত হয়। "আর্মেনভেজেন" (দরিদ্র-সমস্যা, ১৯০৭) একখানা বইয়ের নাম। ১৯১৪ সনে প্রকাশিত হয় মজুর ও মজুরি-সমস্যা বিষয়ক "ডী লোন্বেভেগুঙেন ড্যর গেভের্কশাফ্ট্স্-ডেমোক্রাট্সী" (ট্রেড ইউনিয়ন-স্বরাজের মজুরি ব্যবস্থা)। ১৯২৬ সনে বাহির হইয়াছে "ফ্যিরজর্গে উণ্ড ভোলফার্ট্স্প্লেগে" (সমাজিক সেবা ও হিতসাধন)। পুঁজি আর মজুর এই দুই শক্তির লড়াই সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯২১ সনে। দেখা যাইতেছে যে, জমিজমা হইতে সুরু করিয়া ব্যাঙ্ক আর দরিদ্র-সেবা পর্য্যন্ত ভেবারের গবেষণায় কোনো কথাই বাদ যায় নাই। অধিকন্তু তিনি "হাণ্ডভ্যের্টারবুখ্ ড্যর ষ্টাটস্-ভিসেস্ন শাফ্টেন" (রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিশ্বকোষ) নামক ঢাউস-ঢাউস সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ বিপুল গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক (১৯২৫-২৯)। ষ্টাট্স্-ভিসেস্ন শাফ্টেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) বলিলে জার্ম্মাণরা ধনবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই তিন বিজ্ঞানের অন্তর্গত সব-কিছুই বুঝিয়া থাকে। ভেবার মিউনিকের বিশ্ববিদ্যালয়ে "ষ্টাট্সভিসেস্নশাফ্টেনের" অধ্যাপক। অথচ ভারতে, বিলাতে ও আমেরিকায় সুপরিচিত "রাষ্ট্রবিজ্ঞান" বিদ্যার অন্তর্গত মাল লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয় না।

এই সকল দেশে ইকনমিক্‌স্‌ বলিলে যাহা বুঝায় ভোবার মিউনিকে তাহাই পড়াইয়া থাকেন। অধিকন্তু তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত রচনাবলী সবই ইকনমিক্‌স্‌-বিদ্যার অন্তর্গত। তথাপি জার্ম্মাণির পারিভাষিকে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। দেশে-দেশে পারিভাষিক লইয়া গণ্ডগোল জবর।

কার্ল্‌ ডীল

ধনবিজ্ঞান বিষয়ক টেক্‌স্টবুক জাতীয় বইয়ের লেখক হিসাবে ফ্রাইবুর্গের অধ্যাপক কার্ল্‌ ডীল একালের জার্ম্মাণদের ভিতর নং১ শ্রেণীর অন্তর্গত। টেক্‌স্টবুকটার বহর অবশ্য ভারতীয় মাপে বুঝিতে হইবে না। ইনি চার খণ্ডে বিভক্ত, হাজার দুয়েক পৃষ্ঠার মাল! গ্রন্থের ভূমিকাই পাঁচ-শ' পৃষ্ঠা খাইয়া বসিয়াছে। তাহাতে আছে মাত্র ধনবিজ্ঞান বিদ্যা কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা আর এই বিদ্যার বিভিন্ন আলোচনা-প্রণালী। বাঙালীর পক্ষে এই বলিলেই সহজে বুঝা যাইবে যে, মার্শ্যালের "প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌" বইটার মতন চারখানা বই একত্রে যাহা হয় তাহাই হইতেছে ডীল-প্রণীত "টেওরেটিশে নাট্‌সিওনাল-য়্যেকোনোমী" (ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ)।

একমাত্র তত্ত্বাংশে প্রায় কোনো জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীর পেট ভরে না। কর্ম্মকাণ্ড তাঁহাদের গবেষণাবলীর অনেক অংশ দখল করিয়া থাকে। অধিকন্তু যে সকল রচনা "তত্ত্বাংশ" নামে পরিচিত সেই সবের ভিতরও "কেজো" লোকের কথা থাকে বিস্তর।

লড়াইয়ের যুগে আর লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে দুনিয়ার সকল অর্থ-শাস্ত্রীই কর্ম্মকাণ্ডে মসগুল হইয়াছেন, জার্ম্মাণদের ত কথাই নাই। ডীল একালে কিরূপ কর্ম্মকাণ্ড চালাইতেছেন তাহার কিছু নমুনা দিতেছি।

১৯৩১ সনে বার্লিনের "নোট-গেমাইনশাফ্‌ট ড্যর ডয়চেন ভিসেন্‌সশাফ্‌ট্" (জার্ম্মাণ বিজ্ঞানের সাহায্য পরিষৎ) আর্থিক জার্ম্মাণির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কার্ল ডীলও এই গবেষণার আসরে তলব পাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্যগুলা সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

জার্ম্মাণিতে আজকাল চড়া হারে খাজনা আদায় করা হইতেছে। এই খাজনার চাপে কৃষিশিল্পবাণিজ্য "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতেছে। দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার ও বেপারীরা এই অবস্থা দেখিয়া ভাবিতেছে যে, জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা নেহাৎ কাহিল। কাজেই জার্ম্মাণ কারবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ-অজার্ম্মাণ সকলেই উদ্বিগ্ন। সুতরাং টাকা কর্জ্জ পাওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আর যাহারা টাকা কর্জ্জ দিতে ঝুঁকিতেছে তাহারা নিজেদের ঝুঁকিটা অতি চাড়া হারে জরীপ করিয়া লইতেছে। অর্থাৎ অল্প সুদে টাকা বাহির করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। জার্ম্মাণির কৃষিশিল্পবাণিজ্য সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এই সমুদয় হইতে কর্জ্জ উসুল করাও কঠিন আর সুদ উসুল করাও কঠিন। জার্ম্মাণদেরকে টাকা ধার দিলে সুদ আর আসল দুই-ই খোয়াইয়া বসিতে হইবে, ইত্যাদি। এইরূপ হইতেছে দেশী-বিদেশী মহাজনদের মতিগতি। ডীলের মতে বর্ত্তমানে সুদের যে হার চলিতেছে তাহাকে "অর্থনৈতিক" হার বিবেচনা করা উচিত নয়। ইহা বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্র-নৈতিক হার।

খাদ হইতে সোনার উৎপাদনের বাড়তি-ঘাটতির কথা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তুলিবার প্রয়োজন নাই। আসল কথা পুঁজির থাকৃতি। দেশে-দেশে পুঁজির লেনদেন স্বাভাবিকরূপে সাধিত হইতেছে না। রাষ্ট্রনৈতিক কারণে পুঁজি-চলাচলে বাধা আসিয়া জুটিয়াছে। কাজেই

সোনার চলাচল স্বাভাবিক রূপে সাধিত হইতেছে না। কোনো দেশে অত্যধিক সোনার তাল জমিয়াছে আবার কোনো দেশে সোনার খাঁকৃতি জবর। স্থদের হারের চড়াইয়ের সঙ্গে এই অস্বাভাবিক অবস্থার যোগাযোগ দেখিতে হইবে।

১৯২৪ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণিতে ১৩,৬০০,০০০,০০০ মার্ক বিদেশী পুঁজির আমদানি হইয়াছিল। এই পাঁচ বৎসর ডয়েস্-প্রবর্ত্তিত আর্থিক ব্যবস্থার যুগ। কিন্তু ফি বৎসরই জার্ম্মাণ সরকার কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উপর চড়া হারে ট্যাক্স চাপাইতে থাকে। কাজেই টাকা জমাইবার সুযোগ জার্ম্মাণিতে বেশী ছিল না। ১৯১৪ সনে জার্ম্মাণ নরনারীর সমবেত আয়ের শতকরা ১১·৫ অংশ খাজনা দেওয়া হইত। ১৯৩১ সনে দেওয়া হইতেছে শতকরা ২৮·৬ অংশ। ডয়েস-ব্যবস্থার যুগে ফি বৎসর ২,০০০,০০০,০০০ মার্ক করিয়া লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য টাকা জোগাইতে হইয়াছে। এই কারণেও জার্ম্মাণদের হাতে টাকা জমিতে পায় নাই। বরং যেটুকু পুঁজি জার্ম্মাণদের ছিল তহোর অনেক অংশই ট্যাক্স এড়াইবার মতলবে আর মারা যাইবার ভয়ে স্বদেশত্যাগী হইয়াছে। সরকারী আইন-কানুনের জোরে সেই সব জার্ম্মাণ পুঁজি স্বদেশে ফিরাইয়া আনা সম্ভরপর নয়। ফলতঃ সকল তরফ হইতেই জার্ম্মাণিতে পুঁজির অভাব দেখা যাইতেছে।

১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩০ সনের জুন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণি বিদেশী মহাজন-রাষ্ট্রগুলাকে ১১,০০০,০০০,০০০ মার্ক বুঝাইয়া দিয়াছে। এই গেল ডয়েস-প্ল্যান আর ইয়ংপ্ল্যানের যুগ। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী "রেপারেশন-কমিশন" বা লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণবিষয়ক অন্তর্জ্জাতিক দপ্তরের ব্যবস্থায় জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট মালে ও টাকায় কম্-সে-কম্

২০,০০০,০০০,০০০ মার্ক দিয়াছিল। সেই কমিশনের মেয়াদ ছিল ১৯১৮ নবেম্বর হইতে ১৯২৪ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ক্ষতিপূরণ-দপ্তর জার্ম্মাণির নিকট হইতে পাওয়া জিনিষপত্রের দাম খুব কম করিয়া ধরিয়াছিল। জার্ম্মাণরা নিজেদের হিসাবে ১৯১৮-১৯২৪ সনে কম-সে-কম ৪০,০০০,০০০,০০০ মার্ক দিয়াছে।

জন্মভূমির জন্য লোকেরা অনেক-কিছু সহিতে পারে,—যদি তাহারা দেখে যে, এই কষ্টের একটা সীমানা আছে। কিন্তু ১৯৩১ সনের শেষে জার্ম্মাণরা সেই সীমানা দেখিতে পাইতেছে না। ভবিষ্য সম্বন্ধে তাহাদের কোনো আশা নাই। আর দেশী বা বিদেশী কোনো কাজকর্ম্ম সম্বন্ধেই তাহারা নিয়মবদ্ধভাবে কর্ম্ম-কৌশল গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে একটা যা-রয়-সয় এমন একটা চুক্তি খাড়া না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মাণদের পক্ষে কোনো উল্লেখযোগ্য আর্থিক কাজ সাম্‌লানো অসম্ভব।

এই সকল মত শুনিলেই বুঝা যাইবে যে, ক্ষতিপূরণের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণরা সকলেই খড়্গহস্ত। ১৯৩১ সনে হিট্‌লারের দল রাষ্ট্রনীতির খোলা বাজারে অতি-কিছু ছিল না। লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা,—অর্থশাস্ত্রীরা—হিট্‌লারকে নেহাৎ বেয়াকুব অর্ব্বাচীন ছোকরা ছাড়া আর কিছু ভাবিত না। অথচ ১৯৩৩ সনে হিট্‌লারের গদিতে বসিবার বৎসর খানেক পূর্ব্বে প্রবীণ পণ্ডিত কার্ল ডীল ক্ষতিপূরণ-নাকচনীতির তত্ত্বকথাগুলা স্পষ্টাস্পষ্টি বলিয়া দিতে কসুর করেন নাই।

"বিশ্বদৌলত-শাস্ত্রী"র দল

"ভেল্ট্-ভির্ট্‌শাফ্‌ট্" (বিশ্বদৌলত) জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রের ডালভাত বিশেষ। এই শব্দটা দিনে দুএকবার ব্যবহার করে না এমন

ধনবিজ্ঞানসেবী জার্ম্মাণিতে আছে কি না সন্দেহ। কাজেই এই পারিভাষিটাকে জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রের অন্যতম পেটেণ্ট স্বরূপ গ্রহণ করা চলিতে পারে। য়েনা হইতে প্রকাশিত এবং কীল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পাদিত "ভেল্ট্-ভির্ট্শাফ্ট্লিখেস্ আর্খিফ্" নামক দ্বৈমাসিকের মারফৎ দুনিয়ার লোক জার্ম্মাণির এই পেটেণ্টের সঙ্গে সুপরিচিত। কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান-পরিষৎকে "ইন্‌ষ্টিটুট্ ফ্যির ভেল্ট্-ভির্ট্শাফ্ট্" বলে। বহুদিন ধরিয়া অধ্যাপক হার্ম্‌স্ এই পরিষদের অধ্যক্ষ এবং পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। হার্ম্‌সের রচনাবলী হইতে বিশ্বদৌলত বিষয়ক চিন্তায় বর্ত্তমান লেখকের কিছু-কিছু খোরাক জুটিয়াছে। ১৯১২ সনে তাঁহার "ফোল্ক্স্ভির্ট্শাফ্ট উণ্ড ভেল্ট্ভির্ট্শাফ্ট্" (দেশের দৌলত ও বিশ্বদৌলত) বই বাহির হইয়াছিল।

বিশ্বদৌলত সম্বন্ধে অন্যতম পাকা লেখক অষ্ট্রিয়ার বাণিজ্যশাস্ত্রী শিল্ডার। তিনি ভিয়েনার "হাণ্ডেল্‌স্‌মুজেয়ুম" বা বাণিজ্য-সংগ্রহালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে দুনিয়া মন্থন করিতে হয়। তাঁহার রচনাবলী জার্ম্মাণির "ভেল্ট্ভির্ট্শাফ্টলিখেস আর্খিফ্" পত্রিকায় বাহির হইত। ১৯১১ সনে তাঁহার "এণ্ট্ভিক্লুংস টেণ্ডেন্‌ৎসেন ড্যর ভেল্ট্-ভির্ট্শাফ্ট্" (বিশ্বদৌলত বিকাশের ধারা) নামক বিপুল গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। ১৯১৫ সনে বাহির হয় দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয় চাষ ও শিল্পের যোগাযোগ, শুল্কনীতি, উপনিবেশ, বিদেশে পুঁজি খাটানো ইত্যাদি বিষয়। দ্বিতীয় ভাগের প্রধান কথা দেশ-বিদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ এবং তাহার প্রভাবে আর্থিক গড়নের আকারপ্রকার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কৃষিশিল্পবাণিজ্যবিষয়ক তথ্য ও অঙ্ক এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

শিল্ডারের মতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ দিন-দিন বাড়িতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়া যাইবে। সার্টোরিয়ুস্ ফোন ভাল্টার্স-হাউজেন বিশ্বদৌলত-বিদ্যার অন্যতম প্রতিনিধি। ১৯২৭ সনে তাঁহার "ভেল্ট্‌ফির্ট্‌শাফ্‌ট্‌ উণ্ড ভেল্টানশাউঙ" (বিশ্বদৌলত ও বিশ্ববোধ) প্রকাশিত হইয়াছে।

হারমান শুমাখার

বার্লিনের অর্থশাস্ত্রী হারমান শুমাখার-প্রণীত "ভেল্ট্‌-ভির্ট্‌শাফট্‌লিখে ষ্টুডিয়েন" ১৯১১ সনে প্রকাশিত হয়। ইহা বিশ্বদৌলতবিষয়ক রচনাবলীর সংগ্রহ-পুস্তক। জার্ম্মাণিতে বিশ্বদৌলত বলিলে কি বুঝায় আর ধনবিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা-প্রণালী কি চিজ, এই দুই জিনিষ এই গ্রন্থের ভিতর ধরিতে পারা যায়। ১৯১১ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলা এই গ্রন্থের ভিতর ঠাঁই পাইয়াছে। শুমাখার অনেক দিন ধরিয়া "শ্‌মোল্লার্স্‌ য়ারবুখ" ("শ্‌মোল্লার-প্রবর্ত্তিত বর্ষপঞ্জী") নামক ধনবিজ্ঞান-ত্রৈমাসিকের সম্পাদক ছিলেন। সেই উপলক্ষে এই পত্রিকায় রচনাবলী বাহির হইত। ১৯১০ সনে জার্ম্মাণি ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশের বড়-বড় শিল্পকারখানার গতিবিধি বা স্থান-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তুলনামূলক রচনা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায়ই ১৯০৫ সনে তাঁহার "ডী উর্‌জাখেন উণ্ড ভির্কুঙ্গেন ড্যার কোন্‌ৎসেন্ট্রাট্‌সিয়োন ইম্ ডয়চেন বাঙ্কভেজেন" নামক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসমূহে ঐক্যবন্ধন ও কেন্দ্রীকরণ এই রচনার আলোচ্য ছিল। শুমাখারের এই রচনা হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থকারের পক্ষে ভারতের জন্য হদিশ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

এই উপলক্ষে রীস্‌সার প্রণীত "এণ্ট্‌ভিক্‌লুংস্‌-গেশিষ্টে ড্যার ডয়চেন

গ্রোসবাঙ্কেন" (বাঘা-বাঘা জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের ক্রমবিকাশ-কথা, ১৯০৫) আর আডোল্‌ফ ভেবার-প্রণীত "ডেপোজিটেন-বাঙ্কেন উণ্ড স্পেকুলাট্-সিয়োন্‌স্-বাঙ্কেন" (১৯০২) ও উল্লেখযোগ্য। আডোল্‌ফ্ ভেবারের কথা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

শুমাখারের আর একটা রচনাও বর্ত্তমান গ্রন্থকারের বিচারে ভারতবর্ষের জন্য যার-পর-নাই মূল্যবান্ বিবেচিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণ জাতি সমাজ-বীমা ("সোৎসিয়ালভার্জিখারুং") বিষয়ক আইন-কানুনে এবং কর্ম্মকাণ্ডে জগতের অগ্রণী। এই সম্বন্ধে শুমাখারের এক প্রবন্ধ ইংরেজি ও বাংলা রচনার জন্য কাজে লাগাইতে পারা গিয়াছে। এই বিষয়ে কাস্কেল প্রণীত আর ১৯২১ সনে প্রকাশিত "ডী সোৎসিয়াল-পোলিটিশে গেজেট্‌স্-গেবুঙ" (সমাজরাষ্ট্রিক আইনকানুন) ও উপকারে আসিয়াছিল।

লড়াইয়ের সময় শুমাখার "ডয়চলাণ্ডস্ ষ্টেল্লুং ইন ড্যর ভেল্ট্-ভির্ট্‌শাফ্‌ট্" (বিশ্বদৌলতে জার্ম্মাণির ঠাঁই) রচনা করিয়াছিলেন (১৯১৫)। দেখিতেছি যে, টেক্‌ষ্টবুক-জাতীয় বই শুমাখারের হাত হইতে একটাও বাহির হয় নাই। লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে "ডাস প্রোবলেম ড্যর ইণ্টার্নাট্‌সিওনালেন ক্রীগস্-ফারশুল্ডুঙ্গেন" (লড়াইয়ের ঋণ-সমস্যা) সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। অন্যান্য বহু রচনাও আছে।

"উণ্টারনেমারটুম্ উণ্ড সোৎসিয়ালিস্‌মুস্" প্রবন্ধে ব্যবসাবাণিজ্যে ধুরন্ধরি করার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের যোগাযোগ আলোচিত হইয়াছে (১৯১৯)। পুরাণা রচনার ভিতর ১৯০৭ সনের মুদ্রাসমস্যা আর উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক-সাহিত্যও উল্লেখযোগ্য।

জার্ম্মাণিতে অর্থনৈতিক কারবার সম্বন্ধে কংগ্রেস, কমিশন, সভা,

সম্মেলন ইত্যাদি ব্যবস্থা লাগিয়াই আছে। তাহার উপর পত্রিকার সংখ্যা এবং বিশ্বকোষের সংখ্যাও অনেক। অধিকন্তু প্রত্যেক অধ্যাপকই বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার সময় একটা সার্ব্বজনিক বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত। কাজেই জার্ম্মাণির অর্থসাহিত্যে প্রবন্ধের আকারে রচনা ঝুড়ি-ঝুড়ি। রচনাগুলাও বহরে বেশ বিশাল। প্রত্যেক নামজাদা অর্থশাস্ত্রীই পঞ্চাশ পার হইবার সময় অথবা ষাটপঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পণ করিতে-করিতেই কম্‌সেকম্‌ শ দেড়েক ঢাউস প্রবন্ধের লেখকরূপে সম্মানিত হইয়া থাকেন। তাহার উপর ছোট খাটো সমালোচনা, টীকাটীপ্পনী ইত্যাদি জাতীয় রচনা ত প্রত্যেকের নস্থিস্বরূপ আছেই। মনে রাখিতে হইবে যে, পত্রিকার সঙ্গে আটপৌরে যোগাযোগ সকলেই রাখিয়া চলিতে অভ্যস্ত। ফলতঃ, কোন্ অর্থশাস্ত্রী যে কোন্ বিষয়ে বেশী মাথা খেলাইয়াছেন তাহা অনেক সময়েই কষ্টকল্পনা করিয়া ঠাওরাইতে হয়।

জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রের আখ্‌ড়ায়-আখ্‌ড়ায়

যন্ত্রনিষ্ঠা প্রথম হইতেই শিল্পনিষ্ঠার আসল বনিয়াদ। সেই যন্ত্রনিষ্ঠা বর্ত্তমান কালে,—বিশেষতঃ মহা-লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে যার-পর-নাই বাড়িয়া গিয়াছে। একালের ধনদৌলত বলিলে যন্ত্রপাতির বাড়্‌তি-নিয়ন্ত্রিত যুক্তিযোগ (র‍্যাশন্যালিজশন) বুঝিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে ভাফ্‌ফেনশ্‌মিট্‌-প্রণীত "টেখ্‌নিক উণ্ড ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌" (যন্ত্রপাতি ও আর্থিক ব্যবস্থা) আর বেকেরাট প্রণীত "ড্যর মডার্ণে ইণ্ডুষ্ট্রিয়া-লিস্‌মুস্‌" (আধুনিক শিল্পনিষ্ঠা) "একালের অর্থশাস্ত্র" বিষয়ক রচনা (১৯২৯-১৯৩০)। বেকেরাট একমাত্র যন্ত্রপাতি আর যুক্তিযোগ লইয়াই সন্তুষ্ট নন। তাঁহাকে কার্টেল, ট্রাষ্ট্‌ ইত্যাদি সঙ্ঘ সম্বন্ধেও

প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। যন্ত্রপাতির ইতিহাস এক হিসাবে মানুষের আর্থিক ইতিহাসেরই অঙ্গ বিশেষ। মান্ধাতার আমল হইতে এই দুই ইতিহাস সুজড়িত। ভাফ্‌ফেনশ্‌মিট্‌ এই কথাটার উপর জোর দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে দুনিয়ার কোন্‌ কোন্‌ কারবারে কিরূপ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে তাহার আলোচনাই আসল কথা। অধিকন্তু যন্ত্রপাতির নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রভাবে শিল্পজগৎ যে রোজই নতুন গড়ন পাইয়া বসিতেছে তাহাও ভাফ্‌ফেনশমিটের রচনায় সুস্পষ্ট।

ভ্যার্ণার সোম্বার্ট "ড্যর মডার্ণে কাপিটালিস্‌মুস্‌" (আধুনিক পুঁজিনিষ্ঠা) নামক চারখণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট্‌ গ্রন্থের লেখক হিসাবে দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ। বইগুলা ১৯০২ হইতে ১৯১৬ সনের ভিতর বাহির হইয়াছিল। মজার কথা, ইনি লেখাপড়া সুরু করেন মার্কস্‌-পন্থী হিসাবে। কিন্তু বোলশেভিকরা রুশিয়ায় মার্ক্‌স্‌-গীতার দিগ্‌বিজয় সুরু করিবার সমসমকালে (১৯১৭-২২) তিনি বাঁকিয়া বসেন। ১৯২৪ সনে তাঁহার "ড্যর প্রোলেটারিশে সোৎসিয়ালিসমুস" (মজুর-নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্র) বাহির হয়। ইহার ভিতর সোম্বার্টের ডিগবাজি খাওয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

সার্টোরিয়ুস ফোন ভাল্টার্সহাউজেনকে নানা গবেষণার ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশে পুঁজি খাটাইবার ভিতর ধনবিজ্ঞান কতখানি আছে এই কথাটা লইয়া তিনি বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালাইয়া ছিলেন। মালের আমদানি-রপ্তানি যেমন আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের একটা বড় কথা, পুঁজির আমদানি-রপ্তানিও সেইরূপ। কিন্তু পুঁজি-বিষয়ক আমদানি-রপ্তানির কথা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গবেষকেরা অনেক সময়েই ভুলিয়া থাকেন। যে সকল দেশের লোকেরা

বিদেশে মাল রপ্তানি করিতে চায় তাহাদের পক্ষে বিদেশে পুঁজি খাটানো অতি জরুরি, এই সম্বন্ধে ভাল্টার্স্হাউজেন অর্থশাস্ত্রীদের ধারণা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। বইটা "ডাস ফেল্ক্স্-ভির্ট্শাফ্ট্লিখে সিষ্টেম ড্যর কাপিটালআন্লাগে ইম আউসলাণ্ডে" (বিদেশে পুঁজি খাটাইবার অর্থকথা) নামে বাহির হইয়াছিল (বার্লিন ১৯০৭)। আজও এই বইয়ের মাল হইতে তথ্য এবং তত্ত্ব সংগ্রহ করা আবশ্যক হইয়া থাকে। ভাল্টার্স্হাউজেনকে জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর সর্ব্বদাই উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিতে হয়। কেননা "ভেল্ট্-ভির্ট্-শাফ্ট্" (বিশ্বদৌলত) বিদ্যার গবেষণায় তাঁহার হাত যথেষ্ট। ১৯২৭ সনে এই সম্বন্ধে তাঁহার বই বাহির হইয়াছে। অধিকন্তু ১৮১৫ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত আর্থিক জার্ম্মাণির ইতিহাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে হয়।

আর্থিক ইতিহাসের চর্চ্চায় মিউনিকের ষ্ট্রীডার একটা নতুন দুনিয়া খুলিয়া ধরিয়াছেন। সোম্বার্টের গবেষণাসমূহে সেই সব একপ্রকার অজানা ছিল। ষ্ট্রীডার মধ্যযুগ,—চতুর্দ্দশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ সমাজ খুঁটিয়া-খুটিয়া দেখাইতেছেন যে, পুঁজিনিষ্ঠা সেকালেও ছিল খুব জবর। ধর্ম্মগুরুরা অর্থাৎ গির্জ্জার সব "বাবারা" ধনদৌলতের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার বিরুদ্ধে, কামিনী-কাঞ্চনের বিরুদ্ধে হিতোপদেশ ঝাড়িয়াছেন বটে। কিন্তু তাঁহারাই কুটিরশিল্প ইত্যাদির পুষ্টিকল্পে যাহা-কিছু করিয়াছেন তাহার ভিতর পুঁজিনিষ্ঠার আসল এবং স্পষ্ট মূর্ত্তি ধরা পড়ে। দেখা যাইতেছে যে, ষ্ট্রীডারের মতামত অল্পদিনের ভিতরেই অর্থসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য আকারে দেখা দিবে।

মজুর ও মজুরি আলোচনা করিতে-করিতে কার্ল্ ব্যিশর মজুর-জীবনের "ছন্দে"র ভিতর গিয়া হাজির হইয়া ছিলেন। দেশ-বিদেশের

চাষী, ছুতার, মিস্ত্রী, মাঝি, ঘরামী, গাড়োয়ান ইত্যাদি শ্রেণীর নরনারীর আটপৌরে কাজের ভিতর "তাল", স্বর, ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু কাজের ভিতরকার তালের সঙ্গে-সঙ্গে দেশ-বিদেশের নরনারী সঙ্গীত চালাইতে, কম্‌সেকম্‌ গান গাহিতে অভ্যস্ত। দুনিয়ার নানা মুল্লুকের নরনারীর কর্ম্ম-সম্পর্কিত গানগুলা সংগ্রহ করিয়া কার্ল্‌ ব্যিশর "আর্‌বাইট্‌ উণ্ড রিথ্‌মুস্‌" (কর্ম্ম ও ছন্দ) নামে ছাপিয়াছিলেন (১৮৯৬)। বইটার অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এক হিসাবে রচনাটাকে নৃতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু ইহার ভিতর মজুরের গতিবিধির সঙ্গে চিত্তবিকাশের যোগাযোগ আলোচিত হইয়াছে। কাজেই ইহাকে চিত্তবিজ্ঞানের অন্তর্গত করাও সম্ভব। আজকাল "প্‌সিকো-টেখনিক্‌", সাইকলজিক্যাল টেক্‌নলজি, বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল সাইকলজি ইত্যাদির মারফৎ যন্ত্রপাতি-সম্পর্কিত চিত্তকথার আলোচনা বাড়িয়া যাইতেছে। কোনো-কোনো কারখানায় কাজ চলিবার সঙ্গে সঙ্গেই গান অথবা সঙ্গীত চালাইবার রেওয়াজ পর্য্যন্ত দেখা যায়। ব্যিশরের "কর্ম্ম ও ছন্দ" বইটা সেই আন্দোলনেরই অন্যতম প্রবর্ত্তক।

লোকবিদ্যার চর্চ্চা করেনা জার্ম্মাণিতে এমন কোনো অর্থশাস্ত্রী অথবা সংখ্যাশাস্ত্রী আছে কিনা সন্দেহ। তাহা ছাড়াও এই বিদ্যা-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গবেষণা আর স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রকাশও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একালের অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর পাউল মম্ব্যার্ট ১৯২৯ সনে লিখিয়াছেন "বেফোল্কারুংস্‌লেরে" (লোকবিদ্যা বা লোকশাস্ত্র)। বলা বাহুল্য, গ্রন্থের ভিতর সব-কিছুই আছে। দুনিয়ার লোক-বিকাশের ইতিহাস আর লোকশাস্ত্রবিষয়ক মতামতের ইতিহাস ত আছেই। তাহার উপর আছে লোক-তত্ত্ব। একদিকে লোকসংখ্য

অপর দিকে "নারুংস্-স্পীলরাউম" (খাদ্যক্ষেত্র) এই দুইয়ের যোগাযোগ আলোচনা করা হইল লোকশাস্ত্রের তত্ত্বকথা। মম্ব্যার্টের মতে বর্ত্তমান যুগে ইংরেজ পণ্ডিত মাল্‌থুসের মত খাটে না। ১৯০৭ সনেই এক রচনায় তিনি প্রচার করেন যে, একালের জন্মহ্রাস সম্পদ্-বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। লোকসংখ্যা কমিলে দেশের বা দুনিয়ার আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে এরূপ তিনি বিশ্বাস করেন না। মানুষের ক্রয়-শক্তিই আসল কথা। মানুষের সংখ্যা আসল কথা নয়। মানুষের সংখ্যা কমা সত্ত্বেও ক্রয়শক্তি যে-কে-সেই অথবা এমন কি বাড়িয়া যাইতেও পারে। লোকশাস্ত্রীদের ভিতর খুব কম লোকই এরূপ জোরের সহিত আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন।

মার্কিণ ভূমিশাস্ত্রী হেন্‌রি জর্জ্জের মতন জার্ম্মাণিতেও একজন ভূমিসংস্কার-শাস্ত্রী জবরদস্ত আন্দোলন চালাইতেছেন। নাম আডোল্‌ফ ডামাশ্‌কে। তাঁহার "ডী বোডেনরেফোর্ম" (ভূমিসংস্কার) বইটা ১৯০২ সনে প্রথম বাহির হইয়াছিল। ১৯২৩ সনে বইটার বিংশ সংস্করণ বাহির হয়। এই সময় ১৩৬,০০০ কপি বিক্রী হইয়াছিল। সকল বিষয়েই জর্জ্জের সঙ্গে ডামাশ্‌কের মিল আছে এরূপ বুঝিতে হইবে না। কিন্তু তিনি জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন যে, জমির খাজনা সকল প্রকার সামাজিক দুর্গতির কারণ। জমির খাজনা যতটা আদায় করা হয় তাহার একটা বড় হিস্যা সমাজের প্রাপ্য, মালিকের প্রাপ্য অবশিষ্ট অংশ। ডামাশ্‌কের অন্যান্য বইও আছে। সবই "লাখে লাখে" বিক্রী হয়। ইয়োরোপের অনেক ভাষায় এই সব পুস্তিকা ও গ্রন্থের তর্জ্জমা প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস-প্রণেতা হিসাবেও ডামাশ্‌কের নাম আছে।

রশার-শ্‌মোল্লার-সোম্বার্ট বনাম "ক্লাসিক"-মেঙ্গার-শুম্‌পেটার

১৮৭০ সনের পরবর্ত্তী যুগে ধনবিজ্ঞানের জার্ম্মাণ আখড়ায় এই বিদ্যার আলোচনা-প্রণালী লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে তুমুলভাবে। এই লড়াইয়ের এক দিকে সর্দ্দার ছিলেন বার্লিনের অর্থশাস্ত্রী গুষ্টাফ্‌ শ্‌মোল্লার (১৮৩৮-১৯১৭) আর অপরদিকে সর্দ্দার ছিলেন ভিয়েনার অর্থশাস্ত্রী কার্ল মেঙ্গার (১৮৪০-১৯২২)। শ্‌মোল্লার বলিতেন যে, ধনবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হওয়া উচিত প্রত্যেক দেশের ভিন্ন ভিন্ন যুগগুলাকে যথাসম্ভব জ্যান্তভাবে লোকের সম্মুখে আনিয়া খাড়া করা। এই জন্য আবশ্যক প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান। যুগ-গুলার বিশ্লেষণের সঙ্গে-সঙ্গে সকল প্রকার আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জীবন-বৃত্তান্ত পাকড়াও করা কর্ত্তব্য। ইহারই নাম ধনবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক রীতি বা পদ্ধতি।

এই রীতি বা পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা বলিতেন যে, ধনবিজ্ঞানেয় লক্ষ্য হওয়া উচিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা বা সূত্র প্রচার করা। এই বিদ্যার আদর্শ হওয়া উচিত পদার্থবিজ্ঞান এবং তাহার বিভিন্ন শাখা। আর্থিক দুনিয়ার তথ্য ও ঘটনাগুলাকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ও শৃঙ্খলীকৃত করিয়া সেই সমুদয় হইতে সার্ব্বজনিক বা সনাতন নিয়ম আবিষ্কার করা ছাড়া ধনবিজ্ঞানের আর-কোনো মতলব থাকিতে পারে না। ইহাকে বলা যাইতে পারে ধনবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক রীতি।

শ্‌মোল্লারের গ্রন্থ বাহির হয় ১৯০০-১৯০৪ সনে "গ্রুণ্ডরিস ড্যর ফোল্‌ক্‌স্‌-ভির্টশাফট্‌স্‌-লেরে" (ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ) নামে।

ঐতিহাসিক ধনবিজ্ঞানের প্রথম ধাপ দেখিতে পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধেই। যে যুগে জার্ম্মাণ পণ্ডিত সাভিনি আইন-কানুনের ঐতিহাসিক রীতি কায়েম করিতেছিলেন সেই যুগে ভিল্‌হেল্ম রশার ইতিহাস-প্রতিষ্ঠিত ধনবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। ক্লাসিক-পন্থী অবরোহ-পদ্ধতির ধনবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই ছিল তাঁহার প্রতিবাদ। ১৮৪৩ সনে তাঁহার "গ্রুণ্ডরিস্‌ ৎসু ফোরলেজুঙ্গেন য়িবার ডী ষ্টাট্‌স্‌ভির্ট্‌শাফট্‌ নাখ্‌ গেশিষ্ট্‌লিখার মেটোডে" (রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বনিয়াদ,—ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী অনুসারে) আর ১৮৫৪ সনে "সিষ্টেম ড্যর ফোল্‌ক্‌স্‌ভির্ট্‌শাফট্‌" (ধনবিজ্ঞান) বাহির হয়। এইখানে পরিষ্কার রূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, কি রশার কি শ্‌মোল্লার কেহই ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে বিজ্ঞান হিসাবে বাড়াইতে পারেন নাই। তাঁহারা আর্থিক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন মাত্র। তবে শ্‌মোল্লার প্রবর্ত্তিত ঐতিহাসিকতার খানিকটা বিশেষত্ব আছে। তথ্যের সঙ্গে সংখ্যার যোগাযোগ শ্‌মোল্লারপন্থীদের গবেষণাসমূহকে নতুন গড়ন দিতে পারিয়াছে। সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশ দেখাইবার দিকে তাঁহাদের ঝোঁক সুস্পষ্ট। রচনাগুলাকে সমাজশাস্ত্রের অঙ্গ বিবেচনা করা চলে। অধিকন্তু তাঁহারা গবর্ণমেন্টের সাহায্যে দেশের কৃষিশিল্পবাণিজ্যের পুষ্টিসাধন করাইবার যুক্তি প্রচার করিতে অভ্যস্ত। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নরনারীর জন্য সরকারী খাজানা হইতে খরচ করানো তাঁহাদের ধনবিজ্ঞান-সেবার অন্যতম লক্ষ্য।

ঐতিহাসিক ধনবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে মেঙ্গারের রচনা বাহির হইয়াছিল "উণ্টারজুখুঙেন য়িবার ডী মেটোডে ড্যর সোৎসিয়াল-ভিসেন-শাফ্‌টেন উণ্ড ড্যর পোলিটিশেন য়েকোনোমী ইন্‌স্‌ বেজোণ্ডেরে" (সমাজবিজ্ঞান এবং বিশেষতঃ ধনবিজ্ঞানের আলোচনা প্রণালী) নামে

১৮৮৩ সনে। মেঙ্গার-পন্থীদের ভিতর ভীজার ও ব্যোমবাভার্ক ইত্যাদি অষ্ট্রিয়ানরা ছাড়া আডোল্‌ফ্‌ ভাগ্নার এবং একালের আডোল্‌ফ্‌ ভেবার উল্লেখযোগ্য। বুঝাই যাইতেছে যে, ইহারা অবরোহপদ্ধতির লোক,—ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে দেখিতে চাহেন। কিন্তু শ্‌মোল্লার-পন্থীদের হাতে ধনবিজ্ঞানের বিজ্ঞান ছাড়া ধনদৌলত বিষয়ক আর সবই দেখিতে পাওয়া যায়।

"একালের মজুরসঙ্ঘ" (১৮৮৭)-লেখক লুয়ো ব্রেন্টানো, "চাষী-স্বাধীনতার ইতিহাস" (১৮৮৭)-লেখক ক্নাপ, মজুর-জীবন ও মজুর-আন্দোলনে বিশেষজ্ঞ হার্ক্‌নার ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীরা এইরূপ "বিজ্ঞান-হীন" ঐতিহাসিক ধনবিজ্ঞানের নামজাদা প্রতিনিধি। সঙ্গে-সঙ্গে বলিয়া রাখা দরকার যে, ঐতিহাসিক রীতির প্রথম যুগ যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন,—যথা রশার, ক্নীস, হিল্ডেব্রাণ্ড ইত্যাদি পণ্ডিতেরা,—তাঁহারা "তত্ত্বকথা"র আলোচনায় সময় দিতে ভুলিতেন না। অর্থাৎ ইতিহাসনিষ্ঠ হইয়াও রশার-পন্থীরা শ্‌মোল্লারপন্থীদের তুলনায় অনেকটা "থিয়োরি"-নিষ্ঠ বা দর্শননিষ্ঠ ছিলেন। অবরোহ-পদ্ধতিকে পুরাপুরি কলা দেখানো তাঁহাদের আলোচনা-প্রণালীর অন্তর্গত ছিল না।

বর্ত্তমানে ইতিহাস-নিষ্ঠ জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীদের সেরা প্রতিনিধি ভ্যার্ণার সোম্বার্ট, আর দর্শননিষ্ঠ বা বিজ্ঞাননিষ্ঠদের সর্ব্বপ্রধান হইতেছেন বোধ হয় যোসেফ শুম্‌পেটার। সোম্বার্টের আধুনিক পুঁজিনিষ্ঠা বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চার খণ্ডে বিভক্ত। ১৯০২ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া এই বই বাহির হইয়াছিল। ধনদৌলতের ইতিহাস আর সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশ বিষয়ক গবেষণা বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহার বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রের এই গ্রন্থ। কিন্তু তথাপি এই সকল গবেষণাকে বিজ্ঞানহীন ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গতই সমঝিতে হইবে।

অপর দিকে যোসেফ শুম্‌পেটার স্বইস-ফরাসী ভালরার ধারা বজায় রাখিয়া লোজান-পথের পথিক। তাঁহার "ভেজেন উণ্ড হাউপ্‌ট্‌-ইন্‌হাণ্ট ড্যর টেওরেটিশেন নাটূসিওনালয়্যেকোনোমী" (১৯০৮) গ্রন্থে ধনবিজ্ঞানের "থিয়োরি" বা তত্ত্বাংশের স্বরূপ ও মোটা কথাগুলা আলোচিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীদিগকে আর্থিক ইতিহাসের চাপ হইতে মুক্তি দেওয়া এই বইয়ের উদ্দেশ্য। ১৮৮৩ সনে মেঙ্গার সেকালের ঐতিহাসিক ধনবিজ্ঞানের (শ্‌মোল্লারের) বিরুদ্ধে যে লড়াই চালাইয়াছিলেন সেই লড়াই চালাইতেছেন শুম্‌পেটার থিয়োরি-নিষ্ঠ হিসাবে একালের ইতিহাস-নিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। বলা যাইতে পারে যে, একালে একচোখো বা কট্টর ইতিহাসপন্থী অর্থশাস্ত্রী জার্ম্মাণ পণ্ডিত-সংসারে আর দেখা যায় না। জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক অর্থ-শাস্ত্রীই অল্পবিস্তর থিয়োরি-নিষ্ঠ তত্ত্ব-সেবক এবং "বিজ্ঞান"-গবেষক। আজকাল আর্থিক ইতিহাসকে একমাত্র আর্থিক ইতিহাসরূপে ইজ্জৎ দিবার রেওয়াজ জার্ম্মাণিতে বাড়িয়া চলিতেছে। আর্থিক ইতিহাসকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিবার প্রবৃত্তি,—এক কথায় ইহাকে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার একমাত্র বা প্রধান মূর্ত্তি বিবেচনা করিবার খেয়াল আর দেখিতে পাই না।

এই উপলক্ষ্যে শুম্‌পেটার-প্রণীত "এপোকেন ড্যর ডগ্‌মেন-উণ্ড মেটোডেন-গেশিষ্টে" (১৯২৪) হইতে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। বইটা ধনবিজ্ঞানের মতামত ও আলোচনা-প্রণালীর নানা যুগবিষয়ক রচনা। সহজে ইহাকে ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস বলিব। এই বইয়ের ভিতর ইতিহাসপন্থীদের নিকট হইতে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা কি-কি পাইয়াছে শুম্‌পেটার তাহার বৃত্তান্ত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইতিহাসপন্থীদের গবেষণায় মানুষ যে সর্ব্বদা যুক্তিশীল বা যুক্তিনিষ্ঠ

নয় এই কথাটা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই বিষয়ে প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীর টনটনে জ্ঞান থাকা ভাল। কেন না ক্লাসিকপন্থী, বিজ্ঞান পন্থী, থিয়োরিনিষ্ঠ ও তত্ত্বগবেষক অর্থশাস্ত্রীরা মানুষকে ষোল আনা যুক্তিযোগীরূপে ধরিয়া লইতে অভ্যস্ত। সুতরাং ইতিহাসপন্থীদের আবিষ্কার বিশেষ মূল্যবান্। ইতিহাসপন্থীদের আর একটা বড় দান হইতেছে আর্থিক জীবনের গতিশীলতা সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করা। কিন্তু ক্লাসিকপন্থীরা আর্থিক জীবনের স্থিতি লইয়াই প্রধানতঃ জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত। ইতিহাসপন্থীদের তৃতীয় আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা আর্থিক দুনিয়া বা মানব-সমাজকে জ্যান্ত জীব বা জীবনী-শক্তি-বিশিষ্ট বস্তুরূপে দেখিয়াছেন। কিন্তু ক্লাসিকপন্থীরা সমাজকে একটা যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত বস্তুরূপে দেখিতে অভ্যস্ত। চতুর্থতঃ ইতিহাস-পন্থীরা আর্থিক জগতের ভিতর সার্ব্বজনীন নিয়ম দেখিতে পান না। তাঁহারা দেশভেদে আর্থিক কর্ম্মকৌশলের বিভিন্নতা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ক্লাসিক অর্থশাস্ত্র সার্ব্বজনীন এবং এমন কি সনাতন সত্য আবিষ্কার করিতে অভ্যস্ত।

ইতিহাস-পন্থীদের দান সম্বন্ধে শুম্পেটারের এইরূপ স্বীকারোক্তি যার-পর-নাই মূল্যবান্। কেন না তিনি নিজে ইতিহাসপন্থী নন। অধিকন্তু বিজ্ঞানপন্থী হিসাবে তিনি ধনবিজ্ঞানের গবেষণায় ইতিহাসের নিকট কোনো ঋণ স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ ইতিহাস-নিষ্ঠার পাল্লায় পড়িয়া জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীরা যে পুরামাত্রায় বিজ্ঞান-হীন হইয়া পড়িতেছিল এইরূপ গালাগালি করার জন্য শুম্পেটার নামজাদা। এই সকল মামলায় তত্ত্ব, থিয়োরি, বিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দে বুঝিতে হইবে মূল্যতত্ত্ব, মূল্যবিজ্ঞান বা থিয়োরি অব্ ভ্যালুর শাখা-প্রশাখা।

চক্রশাস্ত্রী ভাগেমান

জার্ম্মাণির সরকারী সংখ্যা-দপ্তরের কর্ত্তা অ্যার্ণষ্ট ভাগেমান বৎসর আট-দশ ধরিয়া আর্থিক জীবনের উঠা-নামা বিশ্লেষণের কাজেও বাহাল আছেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাঁহার তদবিরে একটা "ইন্‌ষ্টিটুট" চলিতেছে। ভাগেমানের "আইনফিয়্রুং ইন্ ডী কোন্‌-যুঙ্কটুরলেরে" (চক্র-তত্ত্বের ভূমিকা) বইটা ঘাঁটিলে চক্রগবেষণা কি চিজ বুঝা যাইবে। বইটা বাহির হইয়াছে ১৯২৯ সনে (লাইপৎসিগ)।

ভাগেমানের মতে স্থিতি ও সাম্য আর্থিক কর্ম্মকাণ্ডের একটা দিক্ মাত্র। অপর দিক হইতেছে গতি ও অবস্থার পরিবর্ত্তন। বাড়া-কমা, উঠা-নামা, চড়াই-উৎরাই, বাড়্‌তি-ঘাটতি এই সব জিনিষ আর্থিক জীবনের পক্ষে ব্যতিরেক বিশেষ নয়। এইগুলা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। গতিগুলাকে স্বাভাবিক বিবেচনা করা একালের অর্থশাস্ত্রের অন্যতম নূতনত্ব।

আর্থিক জীবনের গতিভঙ্গী সময়ের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন। অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন কতকালের ভিতর ঘটে তাহার উপর নির্ভর করে গতিগুলার আকার-প্রকার। ভাগেমান আর্থিক গতির চাররূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন :—

১। অবস্থার পরিবর্ত্তন "একবার মাত্র" সাধিত হয়।

(ক) পরিবর্ত্তনটা ধাপের পর ধাপে চলে। ফলতঃ সবগুলা ধাপ মিলাইলে একটা ক্রমবিকাশের ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে,—সোনারূপার উৎপাদন বেশী হইতে থাকিলে জিনিষপত্রের দাম আস্তে-আস্তে কিন্তু ক্রমাগত বাড়িয়া চলে।

(খ) পরিবর্ত্তনটা থাপছাড়া ভাবে হঠাৎ সাধিত হয়। ইহাতে

ক্রম-পরম্পরার ভঙ্গ ঘটে। ক্রম-ভঙ্গ স্থায়ী অথবা অস্থায়ী দুই আকারে দেখা দেয়।

একটা কোম্পানী ফেল হইলে এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা কোনো জনপদ দেশের হাত-ছাড়া হইলে এইরূপ ঘটিতে পারে। হঠাৎ কোন যান্ত্রিক বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে হয়ত পুরাণা পথ আগাগোড়া বর্জ্জিত হয় আর একটা একদম নতুন-কিছু খাড়া হয়। ধর্ম্মঘটের ফলেও ক্রম-ভঙ্গ দেখা দেয়,—কিন্তু এই ক্ষেত্রের ক্রম-ভঙ্গ স্থায়ী নয়।

২। অবস্থার পরিবর্ত্তন "মাঝে-মাঝে"—কিছু কাল পর পর—দেখা দেয়।

(ক) এই "মাঝে-মাঝে" অবস্থায় কালের ব্যবধান সম্বন্ধে একটা নিয়ম, শৃঙ্খলা বা ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঋতু অনুসারে ফসলের দামে পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তন-গুলা বন্ধনশীল ছন্দের অধীন। অর্থাৎ ফী বৎসরই একটা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে নির্দ্দিষ্ট উঠানামা ঘটিতে বাধ্য।

(খ) কালের ব্যবধান সম্বন্ধে কোনো বাঁধাবাঁধি না থাকিতেও পারে। কবে কখন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা কোনো নিয়ম অনুসারে পূর্ব্ব হইতে বলা চলে না। ফসলের দাম হয়ত শিল্প-বাণিজ্য অথবা শিল্পজাত দ্রব্যের বাড়তি-ঘাটতির দরুণ মাঝে-মাঝে উঠিতে-পড়িতে বাধ্য হয়। তখন মূল্য-পরিবর্ত্তনের গতিভঙ্গীতে প্রাকৃতিক ঋতু মাফিক ছন্দ ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায় না।

আর্থিক জীবনের বনিয়াদ বৈচিত্র্যশীল। বহুসংখ্যক খুঁটিনাটির উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক খুঁটিনাটিরই পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আবার কোনো এক দফার পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে অন্যান্য দফাগুলায়ও

পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। পরিবর্ত্তন সমূহের ভিতর এইরূপ পারস্পবিক সম্বন্ধ বা পরস্পর-নির্ভরতা আর্থিক গড়নের এবং আথিক গতিভঙ্গীর সনাতন কথা। যে-কোনো কেন্দ্র বা খুঁটিনাটি হইতেই গতি বা পরি-বর্ত্তন সুরু হইতে পারে। কাজেই কোনো একটা কেন্দ্রের বা খুঁটিনাটির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া পরিবর্ত্তনগুলাকে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করিতে বসা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

আর্থিক জীবনে মালের সঙ্গে মুদ্রার সম্বন্ধ একটা অতি-বড় গোড়ার কথা। মুদ্রার-তরফে গতি সুরু হইলে মালের দুনিয়ায় গতি দেখা দেয়। আবার মালের জগতে কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিলে মুদ্রার দুনিয়া অস্থির হইয়া উঠে।

অধিকন্তু মাল তৈয়ারির জন্য আদেশ পাওয়া আর্থিক ব্যবস্থার এক দিক্, আর এক দিক্ হইল মাল তৈয়ারি করা। দুই দিকেই স্বাধীন-ভাবে গতি সুরু হওয়া সম্ভব। দুই দিকেই বহু খুঁটিনাটি। প্রত্যেক খুঁটিনাটির উপর অপরাপর খুঁটিনাটি নির্ভর করে। কুদরত্তি মাল সংগ্রহ, মজুর ও মজুরি, যন্ত্রপাতি, কৰ্জ্জ ও সুদ, দেশের বাজার বা অন্তর্ব্বাণিজ্যের ব্যবস্থা, বহির্ব্বাণিজ্য বা আমদানি-রপ্তানি, মাল গুদামজাত করা ইত্যাদি অর্থিক কর্ম্ম-প্রণালীর প্রত্যেকটায়ই পরি-বর্ত্তনের সূত্রপাত হইতে পারে।

বিবাহ ধনসম্পদের সঙ্গে সংযুক্ত। আর্থিক দুরবস্থার সময়ে লোকেরা বিয়ে করিতে ঝুঁকে না। খাওয়াপরার স্বচ্ছলতা অথবা তাহার কাছা-কাছি কিছু অবস্থা বুঝিয়া লওয়া উচিত,—যখনই দেখা যায় যে, নরনারী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। এই হিসাবে কোনো দেশের হাজার-করা নরনারীর ভিতর কতগুলা বিবাহ ঘটিতেছে তাহা জানিতে পারিলে আর্থিক জীবনের "সূচী" পাওয়া সম্ভব। ঘটনা-

চক্রে জার্ম্মাণি, বিলাত ইত্যাদি দেশের বিবাহ-সংখ্যা অনেকটা নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ভিতরকার জার্ম্মাণ-সমাজ-বিষয়ক কয়েকটা মোটা কথা নিম্নের তালিকায় দেখানো হইতেছে :—

১। হাজার করা বিবাহের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী কবে কবে	১৮২৫	১৮৩৩	১৮৪২	১৮৫০	১৮৫৮	১৮৬৭
২। কত বৎসর পর-পর বিবাহ-সংখ্যা সব চেয়ে বেশী	×	৮	৯	৮	৮	৯

বিলাতের উনবিংশ শতাব্দীতেও উঠানামা অর্থাৎ বাড়্‌তি-ঘাট্‌তি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সনতারিখগুলা জার্ম্মাণির সনতারিখ হইতে বিভিন্ন। বুঝিতে হইবে যে, গতিভঙ্গী সর্ব্বত্রই আছে বটে,—কিন্তু গতিভঙ্গীর বহর ও আকার-প্রকার সর্ব্বত্র একরূপ নয়। বিলাতী সমাজে আর্থিক জীবনের রেখা-"শিখর" কিরূপ নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে :—

১। আর্থিক জীবনের চরম স্বচ্ছলতা কবে কবে দেখা গিয়াছিল	১৮২৪	১৮৩৬	১৮৪৭	১৮৫৭	১৮৬৬-৬৭

২। কত বৎসর পর-পর সম্পদের "শিখর" দেখা গিয়াছিল	×	১১	১১	১০	১০

দেখা যাইতেছে যে, সম্পদ্‌বিষয়ক রেখাতরঙ্গের শিখর জার্ম্মাণিতে দেখা গিয়াছিল ৮।৯ বৎসর পর-পর। কিন্তু বিলাতী শিখরে-শিখরে সময়ের ফারাক ১০-১১ বৎসর।

তবুও দেখা যাইতেছে যে, বিলাতী শিখরে আর জার্ম্মাণ শিখরে কিছু-কিছু মিল আছে। ১৮২৫, ১৮৫৮ আর ১৮৬৭ এই তিন বৎসর ইংরেজ আর জার্ম্মাণ দুই সমাজের পক্ষেই সু-কাল। এই কয় বৎসর জার্ম্মাণিতে বিবাহ-রেখার শিখর ইংরেজ সম্পদ্-শিখরের সঙ্গে আর জার্ম্মাণ বাণিজ্য-শিখরের সঙ্গে সমানভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৩, ১৮৪২ আর ১৮৫০ এই তিন সনের বিবাহ-শিখর জার্ম্মাণির বাণিজ্য-সম্পদ্ অথবা বিলাতী ধনদৌলতের গতিভঙ্গীর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখে নাই।

বিলাতে আর জার্ম্মাণিতে একটা বড় প্রভেদ এই যুগে লক্ষ্য করিতে হইবে। ১৮২০ সনের পরবর্ত্তী কালে চাষ-আবাদের উপর বিলাতী ধনদৌলতের আকার-প্রকার নির্ভর করিত না। কিন্তু জার্ম্মাণিতে ১৮৬০-৬৭ সন পর্য্যন্ত ধনদৌলত প্রধানতঃ কৃষিবিষয়ক ছিল। ফসলের দামের হ্রাস-বৃদ্ধিতে সম্পদের ঘাটতি-বাড়্তি মাপা হইত। কিন্তু বিলাতে ১৮২০-৩০ সনের পর শিল্পজাত দ্রব্যের দাম দেখিয়া লোকেরা সম্পদের মাত্রা আর সঙ্গে-সঙ্গে বিবাহের মরসুম নির্দ্ধারিত করিত। কৃষিসম্পদের সঙ্গে বিবাহের "লগ্নে"র যোগাযোগ দেখিবার জন্য ভাগেমান দুইটা রেখা-তরঙ্গ ছাপিয়াছেন। একটায় আছে বিবাহ-

রেখার গতিভঙ্গী আর একটায় দেখিতেছি রাইশস্যের দামের গতি-ভঙ্গী। ১৮৬০ সন পর্য্যন্ত দুয়েরই উৎরাৎ-চড়াই প্রায় সমান্তরাল-ভাবে চলিয়াছে। শিখরগুলা একই সনে পড়িয়াছে।

আর্থিক জার্ম্মাণির দ্বিতীয় যুগ ১৮৬৭ হইতে ১৯১৩ অর্থাৎ প্রুশিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার লড়াই হইতে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র সুরু হওয়া পর্য্যন্ত কাল। এই সময়ের রেখাতরঙ্গ নিম্নরূপ:—

১। হাজার-করা বিবাহ-সংখ্যা কবে-কবে খুব বেশী	১৮৭৬	১৮৮২	১৮৮৫	১৮৯০	১৯০০	১৯০৩	১৯১২
২। কতবৎসর পর-পর বিবাহ-সংখ্যা খুব বেশী	×	৫	১৩	৫	১০	৬	৬
৩। আর্থিক জীবনরেখার শিখর কবে-কবে	১৮৭৪-৭৬	১৮৮৩	১৮৮০-৮৪	১৮৯০	১৯০০	১৯০৬	১৯১৩

দেখা যাইতেছে যে, ১৮৮০, ১৯০০, ১৯০৬-০৭, ১৯১২-১৯১৩ এই চার বৎসর বিবাহ-রেখা আর ধনদৌলতের 'রেখা' এক সঙ্গে মাথা চাড়িয়া তুলিয়াছিল। ১৮৭২-৭৩ সনের মিলটাও উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৭ সনের অবস্থায় মিল দেখা যাইতেছে না। এই সময়ে অষ্ট্রিয়ায়-প্রুশিয়ায় লড়াই চলিতেছিল। তাহা ছাড়া এই সময়ে জার্ম্মাণির ধনদৌলত সনাতন কৃষিনিষ্ঠার বদলে নতুন শিল্পনিষ্ঠার দিকে ঝুঁকিতেছিল। বোধ হয় এই দুই কারণে বিবাহের সঙ্গে সম্পদের যোগাযোগ সম্বন্ধে গরমিল

ঘটিয়া থাকিবে। অধিকন্তু ১৮৮০-৮৫ সনের অমিলটা দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। এই অমিলের কারণও স্পষ্ট। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই সময়ে চাষ-আবাদের স্বর্ণযুগ। চাষীদের পক্ষে রাতারাতি লক্ষপতি ক্রোরপতি হওয়া একটা অতি-কিছু ছিল না। জার্ম্মাণি হইতে হাজারে হাজারে চাষী স্বদেশ ছাড়িয়া আমেরিকায় বাস্তুভিটা গড়িতে চলিয়া যায়। পাঁচ বৎসরে দশলাখ জার্ম্মাণ নরনারী দেশত্যাগী হয়। বলা বাহুল্য,—জার্ম্মাণ সমাজের পক্ষে এ এক বিষম দুর্য্যোগের যুগ।

তৃতীয় যুগের আসল ঘটনা বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে (১৯১৪-১৮)। লড়াইয়ের পর কাগজী মুদ্রার অতিপ্রচলন ১৯২৩ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সাড়ে নয়-দশ বৎসরের বিবাহ আর আর্থিক জীবন সম্বন্ধে রেখার উৎরাই-চড়াইগুলা স্বাভাবিক গতিভঙ্গীর সাক্ষী হইতে পারে না।

১৯২৩ সনের শেষের দিকে জার্ম্মাণিতে নয়া মুদ্রা কায়েম হয়। তাহার পর হইতে ১৯২৯ সনে বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগের সূত্রপাত পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় বৎসর সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায়।

এই যুগের অর্থিক জীবনে আর প্রাক্-লড়াই আর্থিক জীবনে প্রভেদ বিপুল। একালে বাজারের দরদস্তুর ব্যক্তিগত টক্করের উপর নির্ভর করে না বলিলেই চলে। সবই সঙ্ঘে-সঙ্ঘে সমঝোতা, চুক্তি, "সন্ধি" ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর্থিক জীবন "স্বাধীনতা" হারাইয়া বাঁধাবাঁধির ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। কম্‌সেকম্ শতকরা ৫০টা জিনিষপত্রের দাম এই যুগে এইরূপ চুক্তিমাফিক নিয়ন্ত্রিত। সেইরূপ মজুরের বাজারেও কম্‌সেকম্ শতকরা ৯০ ক্ষেত্রে মজুরির হারে এইরূপ বাঁধাবাঁধি দেখা যায়। এই কয় বৎসরের ভিতর বিবাহ আর আর্থিক জীবনবিষয়ক রেখাতরঙ্গের আকারপ্রকার নিম্নরূপ :—

১৯২৪ উৎরাই, রীতিমত ঘাট্‌তি।

১৯২৫ চড়াই, বাড়্‌তির বন্যা।

১৯২৬ উৎরাই, আবার ঘাট্‌তি।

১৯২৭ চড়াই, রীতিমত বাড়্‌তি।

১৯২৮ উৎরাই, ঘাট্‌তির পথে।

আর্থিক জীবনের উৎরাই-চড়াই প্রায় সকল বিভাগেই দেখা গিয়াছিল যথা,—(১) মজুরনিয়োগ, (২) জিনিষপত্রের দাম, (৩) মাল কিনিবার জন্য আদেশ, (৪) কুদরত্তি মালের আমদানি, (৫) মাল-উৎপাদন। এই সকল দিকেই একসঙ্গে বাড়্‌তি অথবা ঘাট্‌তি দেখা দিয়াছিল।

"কোন্‌যুঙ্কটুর" বা উঠানামার "কারণ" ঢুঁড়িবার জন্য ভাগেমান চিন্তিত নন। তাঁহার বিবেচনায় আর্থিক জীবনের ঘটনাগুলার ভিতর অথবা আর্থিক গড়নের ভিতর একটা পারস্পরিক যোগাযোগ আবিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু কোনো ঘটনাকে বা অঙ্গকে এই সকল গতিভঙ্গীর "কারণ" বিবেচনা করা চলিবে না। ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী জেভন্‌স্‌ বলিতেন যে, এগার বৎসর পর-পর সূর্য্যের ভিতর যে দাগ বা ছাপ দেখা যায় তাহার দরুণ আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হয়। মার্কিণ পণ্ডিত মুর শুক্রগ্রহের গতিবিধির ভিতর এইরূপ দুর্য্যোগের উৎপত্তি দেখিতে পান। অপর দিকে ইংরেজ পণ্ডিত পিগু এবং জার্ম্মাণ পণ্ডিত শুম্‌পেটার বণিক্‌শিল্পীদের চিত্ত-পরিবর্ত্তন—সাহস বা উদ্বেগ ইত্যাদির স্রোতের সঙ্গে আর্থিক দুনিয়ায় বাড়্‌তি-ঘাট্‌তি দেখিতে অভ্যস্ত। ভাগেমান এই সকল ব্যাখ্যার বা বিশ্লেষণের কোনোটাকেই কারণ-তত্ত্বের অন্তর্গত করিতে রাজি নন।

আজকালকার "চক্র"-গবেষণায় যে সকল কারণ-তত্ত্ব দেখা যায়

সেই সমুদয়কে ভাগেমান তুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর কারণতত্ত্বগুলা আর্থিক "গড়নে"র (ষ্ট্রাক্‌চ্যর) ভিতরকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সুজড়িত। যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ-তত্ত্বের প্রচারক তাঁহারা জগতের বিভিন্ন জনপদের আর্থিক গড়নের "বৈষম্য", অসাম্য বা বিভিন্নতা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর কারণতত্ত্বের প্রতিনিধি জার্ম্মাণ ডীট্‌সেল, মার্কিণ মূর ও ইংরেজ জেভন্‌স্। ইহাদের বিবেচনায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে বাড়্‌তি-ঘাট্‌তিই চক্র সৃষ্টি করে। জার্ম্মাণ লীফ্‌মান যন্ত্রনিষ্ঠার বাড়্‌তি, যান্ত্রিক আবিষ্কার ও উন্নতি, যন্ত্রপাতির প্রচুর প্রয়োগ বা অতি-ব্যবহার ইত্যাদি ঘটনাকে আর্থিক গতিভঙ্গীর আসল কারণ মনে করেন। জার্ম্মাণ সোম্বার্ট আর সুইডিশ কাস্‌সেল শিল্পনিষ্ঠার প্রসার, কারখানার বাড়্‌তি ইত্যাদির উপর বেশী জোর দিতে অভ্যস্ত। জার্ম্মাণ পোলে বিবেচনা করেন যে, লোকবলের বৃদ্ধি এই আর্থিক চক্রের জন্য দায়ী। জার্ম্মাণ ফোগেল আর্থিক উন্নতি মাত্রকেই উৎরাই-চড়াইয়ের জনক সমঝিয়া থাকেন।

ভাগেমান দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ-প্রচারকদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া একালের আর্থিক দুনিয়াকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা :—

(ক) পুঁজিনিষ্ঠাহীন জনপদ ;—রুশিয়ার এশিয়ান অংশ, আফ্রিকার কঙ্গো (বেলজিয়ান), পশ্চিম আফ্রিকা (ফরাসী), সুডান (আফ্রিকা), ট্রিপলি (উত্তর আফ্রিকা)।

(খ) পুঁজিনিষ্ঠাশীল নবীন জনপদ,—মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সকল দেশে চৌহদ্দির অনুপাতে পুঁজি আর লোকবল অপেক্ষাকৃত কম।

(গ) আধা-পুঁজিনিষ্ঠাশীল জনপদ,—রুশিয়ার ইয়োরোপীয়ান অংশ, সমগ্র এশিয়া (জাপান আর রুশিয়ার অধীনস্থ এশিয়া বাদে)। এই সকল জনপদে চৌহদ্দির অনুপাতে পুঁজির পরিমাণ অল্প কিন্তু লোকবল প্রচুর।

(ঘ) পূরা-পুঁজিনিষ্ঠাশীল জনপদ,—গোটা ইয়োরোপ (রুশিয়া ও তুর্কী বাদে), মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর এশিয়ার জাপান।

"কাপিটালিস্‌মুস্‌" বা পুঁজিনিষ্ঠার মাপকাঠিতে দুনিয়ার দেশগুলাকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য "কাপিটালিস্‌মুস্‌" বস্তুটা কি তাহা সংখ্যার সাহায্যে বুঝানো হইয়াছে। এই জন্য লওয়া হইয়াছে চার প্রকার অঙ্ক,—

(১) জনপদের প্রতি স্কোয়ার মাইলে লোকসংখ্যা।

(২) যন্ত্রভোগ বা যন্ত্রপ্রয়োগ :—(ক) দেশের লোকের মাথাপিছু কত টাকার যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হয়, (খ) প্রত্যেক স্কোয়ার মাইলে কত টাকার যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হয়।

(৩) বহির্বাণিজ্যের হিসাব,—দেশের লোকের মাথাপিছু কত টাকার আমদানি রপ্তানি।

(৪) শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ—(ক) গোটা আমদানির শতকরা কত অংশ যন্ত্রপাতির হিস্যা, (খ) গোটা রপ্তানির শতকরা কত অংশ যন্ত্রপাতির হিস্যা।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভাল যে, "পুঁজিনিষ্ঠার" (শিল্পনিষ্ঠার বা যন্ত্রনিষ্ঠার) যে সকল লক্ষণ দেখানো হইল সেই সবের "গভীরতর বিশ্লেষণ" চালাইলে ভাগেমানপ্রদর্শিত শ্রেণীবিভাগ কিছু-কিছু বদলানো আবশ্যক হইবে। উপরের তালিকায় সমগ্র ইয়োরোপকে এক শ্রেণীর ভিতর ফেলা হইয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপের বল্কান অঞ্চল, পোল্যাণ্ড

এবং অন্যান্য জনপদ বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষের কোনো-কোনো জনপদের সঙ্গে প্রায় এক শ্রেণীর ভিতর আসিয়া পড়িবে।

দেশবিদেশের "ইকনমিক ষ্ট্রাকচ্যর" বা আর্থিক গঠন সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের "ট্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ান ব্যর্থ-রেট্স্ ইন কম্পারেটিভ ডেমগ্রাফি" প্রবন্ধ "ইণ্ডিয়ান জার্ণ্যাল অব ইকনমিক্স্" পত্রিকায় বাহির হইয়াছে (এলাহাবাদ, এপ্রিল ও জুলাই, ১৯৩৪। তাহা ছাড়া ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্লেম্স্" গ্রন্থে ও (১৯৩০) এই বিষয়ে আলোচনা আছে। পেশা হিসাবে উপার্জ্জনকারী মেয়ে-পুরুষের সংখ্যা দেখিলে ভাগেমানের শ্রেণীবিভাগ পুরাপুরি টেকসই হইবে না।

অধিকন্তু আমদানি-রপ্তানির হিসাব কিছু জটিলতাপূর্ণ। ভারতবর্ষের মত এক বিপুল মহাদেশের ভিতরকার বোম্বাইয়ের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্য-সম্বন্ধ রাজনৈতিক যোগাযোগের দরুণ, "ঘরোআ" বাণিজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু ইয়োরোপের এক একটা ছোট্ট দেশ,—বেলজিয়াম, লাট্ভিয়া, আলবনিয়া ইত্যাদি—তাহার লাগাও দেশের সঙ্গে যাহাকিছু কেনা-বেচা করে তাহার সবই,—আবার রাজনৈতিক কারণে,—"আন্তর্জ্জাতিক" নামে বিবৃত হয়। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলা যদি রাষ্ট্রিক হিসাবে স্বাধীন হইত তাহা হইলে বাঙ্লার সঙ্গে আসামের সম্বন্ধ, বিহারের সঙ্গে উড়িষ্যার সম্বন্ধ ইত্যাদি আজকালকার "ঘরোআ" বা প্রাদেশিক সম্বন্ধগুলা অর্থাৎ "অন্তর্ব্বাণিজ্য" সবই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যরূপে পরিচিত হইতে পারিত। সেইরূপ গোটা ইয়োরোপ যদি ঘটনাচক্রে কোন ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের অন্তর্গত থাকিত তাহা হইলে জার্ম্মাণির সঙ্গে ফ্রান্সের বাণিজ্য, ইতালির সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার বাণিজ্য সবই "ঘরোআ" ছাড়া আর কিছু হইত না। কাজেই আসল

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ দেখিয়া কোনো দেশের আর্থিক পরিস্থিতির গড়ন যথার্থরূপে বুঝা যায় না।

যাহা হউক, শ্রেণীবিভাগটা খাঁটি বিজ্ঞানসম্মতরূপে করা হইয়াছে কি না সম্প্রতি দেখিবার দরকার নাই। পৃথিবীর জনপদে-জনপদে "পুঁজি", "যন্ত্র" বা "শিল্প" ইত্যাদির তরফ হইতে জাতিভেদ আবিষ্কার করা সম্ভব। এইরূপ শ্রেণীভেদ আছে বলিয়া এক দেশ হইতে আর এক দেশে (১) লেকে-চলাচল ও ২) পুঁজি চলাচল ঘটিয়া থাকে। এই দুই-প্রকার চলাচলে কোনো বাধা উপস্থিত হইলেই *আর্থিক দুনিয়ার স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র যথাস্থান হইতে সরিয়া যায়।* কাজেই চক্রব্যবস্থায় নতুন গতিভঙ্গীর সূত্রপাত হয়। এইরূপে জনপদগত অসাম্য বা বৈষম্যও দুর্য্যোগ-সৃষ্টির কারণরূপে দেখা দিতে পারে।

অধিকন্তু এইরূপ বৈষম্যের জন্য এমনও ঘটিতে পারে যে, যখন কোনো-কোনো জনপদে আর্থিক ঘাটতি বা উৎরাই খুব জবর ঠিক সেই সময়ে অন্য কোনো-কোনো জনপদে হয়ত তাহার উল্টা অর্থাৎ বাড়্‌তি বা চড়াই দেখা যাইতেছে। ইয়োরোপে যখন মন্দা তখন আফ্রিকায় বা দক্ষিণ আমেরিকায় বাজারের চাহিদা হয়ত প্রচুর হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই ইয়োরোপ হইতে রপ্তানি বাড়্‌তির দিকে যাইতে পারে। সুতরাং সেই সময়ে ঐ সকল অঞ্চলে সুদের হার চড়িয়া যাইতে পারে আর সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ হইতে লোক-রপ্তানিও তখন প্রবল আকারে আশা করা যায়।

আর্থিক জীবনের হরেক ক্ষেত্রেই এক একটা গতিভঙ্গী দেখা যায়। অধিকন্তু ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের গতিভঙ্গীগুলা এক সঙ্গে আলোচনা করিলে তাহাদের ভিতর কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধও আবিষ্কার করা

সম্ভব। বিভিন্ন ক্ষেত্রের গতিভঙ্গীগুলার সম্বন্ধকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা চলে :—

১। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের গতিগুলা একদিকে

(ক) সমান জোরে

(খ) অ-সমান জোরে

(গ) একটার পর আর একটা

২। দুই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের গতি পরস্পর পরস্পরের বিপরীত দিকে।

এই ধরণের গতিভঙ্গীগুলা একত্রে সাজাইলে আর্থিক জীবনের "ঝোঁক" বা আগামী "ভবিষ্য" কিরূপ তাহা পূর্ব্ব হইতে কিছু-কিছু বুঝিয়া রাখা সম্ভব। বহুসংখ্যক গতিভঙ্গীর রেখাতরঙ্গ লইয়া কারবার করিলে শেষ পর্য্যন্ত "ব্যারোমেটার" খাড়া করা যাইতে পারে। জল-বায়ুর চাপ মাপিবার জন্য যেমন ব্যারোমেটার কায়েম হয় আর্থিক জীবনের উৎড়াই-চড়াই মাপিবার জন্যও আর্থিক ব্যারোমেটার কায়েম করা যায়। ১৯১০ সনে আমেরিকার আর্থিক জীবন মাপিবার জন্য ব্যাব্সন একটা ব্যারোমেটার কায়েম করেন। সেটা আজও চলিতেছে। তাহাতে বহু-সংখ্যক উৎরাই-চড়াইয়ের রেখাতরঙ্গ "একত্র" থাকে। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটা ব্যারোমেটার কায়েম হইয়াছে (১৯১৯)। তাহাতে তিন প্রকার গতি-ভঙ্গী দেখানো হয়,—(ক) ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনা আর শেয়ার বাজার, (খ) জিনিষপত্রের দাম, (গ) মুদ্রা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভাগে-মানের তদবিরে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের কায়েম করা একটা ব্যারোমেটার আছে। সেটা ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে হার্ভার্ডের নিয়ম মানিয়া চলা হয় না। ইহার ভিতর আছে—(১) মালোৎপাদন,

(২) মজুরনিয়োগ, (৩) মালগুদামের অবস্থা, (৪) আমদানি-রপ্তানি, (৫) ব্যবসার পরিস্থিতি. (৬) কর্জ্জ ব্যবস্থা, (৭) শেয়ার, মাল, ও টাকার বাজারের পরস্পর সম্বন্ধ, (৮) বাজার দর। এই সকল রেখা আল্‌গা-আল্‌গা দেখানো হয়। ব্যাব্‌সন হইতে এইখানে প্রভেদ।

ভাগেমানের মতে এই সব ব্যারোমেটারের সাহায্যে আর্থিক জীবনের বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ এবং মাপজোকসমন্বিত জ্ঞান জন্মিতে পারে। কোন্‌ শক্তিটা কখন কতখানি প্রাধান্য লাভ করিল ইহা বুঝিতে পারা যায়। অধিকন্তু ভবিষ্যতের গতি কোন্‌ দিকে তাহাও খানিকটা আন্দাজ করা চলে। কিন্তু "ভবিষ্যবাণী", ভবিষ্যৎ দেখিতে পারা ইত্যাদি বলিলে লোকেরা সহজে যাহা বুঝে এই সবের জোরে তাহা দাবী করা উচিত নয়। বড় জোর এই পর্য্যন্ত বলা চলে যে, আগামী মাস তিনেকের ভিতর লোকনিয়োগ সম্বন্ধে বাড়্‌তি, ঘাট্‌তি না স্থিতি আশা করা যায়। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের "কোন্‌যুক্‌টুর ফর্শুঙ" বা চক্র-গবেষণা বিষয়ক পরিষৎ হইতে তিন-তিন মাসে আগে-আগে এইরূপ গতি নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এই সকল নির্দ্দেশের সঙ্গে যথাসময়ে ঘটনাবলীর মিলও দেখা গিয়াছে,—কোনো-কোনো সময়ে।

আডাম ম্যিলার-মণ্ডল ও ন্যাশনাল-সোশ্যালিষ্ট অর্থশাস্ত্র

জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর ফ্রীডরিশ লিষ্ট (১৭৮৯-১৮৪৬) আর কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ (১৮১৮-১৮৮৩), দুই জন দুই তরফের জগদ্‌গুরু। ধনবিজ্ঞানের জার্ম্মাণ ধারা বুঝিবার জন্য লিষ্টের একজন সমসাময়িক সম্বন্ধে পরিচিত থাকা আবশ্যক। জার্ম্মাণির পণ্ডিত মহলে তাঁহার নামডাক আছে বেশ। কৃষিবিষয়ক অর্থশাস্ত্রী হাইনরিখ ফোন ট্যিনেন (১৭৮৩-১৮৫০) এর কথা বলিতেছি। ১৮২৬ সনে তাঁহার বই বাহির হয়। লিষ্টের

জগদ্‌বিখ্যাত "ডাস নাট্‌সিওনালে সিষ্টেম ড্যর পোলিটিশেন-য়েকো-নোমী" ১৮৪০ সনের পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ট্যিনেনের বইয়ের নাম "ড্যর ইজোলিয়ার্টে ষ্টাট ইন বেৎসীহুং আউফ লাণ্ডভির্ট্-শাফ্‌ট্ উণ্ড নাট্‌সিওনাল-য়েকোনোমী" (একাকীকৃত রাষ্ট্র,—কৃষি ও অর্থশাস্ত্রের তরফ হইতে আলোচনা)।

ট্যিনেনের আলোচনা-প্রণালী খতাইয়া দেখাইতেছি। খুব বড় একটা শহরের কথা কল্পনা করা যাউক। ইহার চারি দিকে অতি-উর্ব্বর জমিন আর এই জমি বিলকুল সমতল এইরূপও ধরিয়া লইতে হইবে। শহরের অনেক দূরে এই সমতল ভূমি এক অ-চষা জঙ্গলে গিয়া মিশিয়াছে। সেই জঙ্গল এই শহরটাকে গোটা দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই গেল "বিচ্ছিন্ন" বা "একঘর্‌য়ে" বা "একাকীকৃত" রাষ্ট্রের মোসাবিদা।

এই ধরণের রাষ্ট্রের আর্থিক বনিয়াদ হইল শহরটা অথবা শহরের কেনাবেচা বা বাজারটা। এই বাজার হইতে কোনো অঞ্চল দূরে, কোনো অঞ্চল বেশী দূরে। এই আপেক্ষিক দূরত্বের উপর নির্ভর করে কোন্ অঞ্চলে কিরূপ মাল উৎপন্ন হইবে। বাজারে মাল পাঠাইবার মেহনৎ বা খর্চ্চা আর্থিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

এই গেল ট্যিনেনের চিন্তার কাঠামো। এই কাঠামোর ভিতর মজুর, মজুরি, পুঁজি, সুদ, শুল্ক ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রের নানা কথা বিশ্লেষিত হইয়াছে। পুঁজি-প্রয়োগের "সীমা", মজুর-ব্যবহারের "সীমা" ইত্যাদি পারিভাষিক কায়েম করিয়াছিলেন বলিয়া ট্যিনেনকে অনেক সময়ে "সীমান্ত-লাভালাভ"-তত্ত্বের প্রবর্ত্তক বলা হইয়া থাকে। কখনো-কখনো তাঁহাকে গাণিতিক অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রবর্ত্তকরূপেও বিবৃত করা হয়। এই হিসাবে জার্ম্মাণ যানবাহনশাস্ত্রী গস্‌সেনও ১৮৫৪ সনে প্রকাশিত

গ্রন্থের জন্য মেঙ্গার-জেভন্‌স-ভাল্‌রা ইত্যাদির পূর্ব্ববর্ত্তী ট্যিনেনের জুড়িদার বিশেষ।

ট্যিনেনের রচনায় বিলাতী আডাম স্মিথ আর রিকার্ডো দুয়েরই প্রভাব আছে। কিন্তু উভয়ের বিরুদ্ধেই তাঁহার মাথা খেলিয়াছিল। এমন কি তাঁহার বইয়ের নাম এবং প্রধান মুদ্দাটা স্মিথ-রিকার্ডোর বিলকুল উণ্টা পক্ষ।

সেকালের জার্ম্মাণিতে বিলাতী আডাম স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) পশার খুব বেশী ছিল। ঘটনাচক্রে ইংরেজ অর্থশাস্ত্র ছিল অশুল্ক আর সর্ব্ববাধাহীন বাণিজ্যের শাস্ত্র। জার্ম্মাণ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) "বিশ্বশান্তি"র উপায় স্বরূপ এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক আর পরবর্ত্তী জার্ম্মাণ চিন্তাবীর-গণের ভিতর অনেকেই স্মিথ-বিরোধী মত প্রচার করিয়াছিলেন।

"একাকীকৃত" রাষ্ট্রের কল্পনায় ট্যিনেন একলা ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জার্ম্মাণ চিন্তার ইহা একটা বিশেষত্ব ছিল বলা যাইতে পারে। দার্শনিক ফিখ্‌টের "ড্যর গেশ্লোস্‌সেনে হাণ্ডেল্‌স্‌-ষ্টাট্‌" (অর্থাৎ রন্ধ্রহীন বাণিজ্য-রাষ্ট্র) গ্রন্থের সুরও এইরূপ। এই বইটা ১৮০০ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদেশী টক্কর হইতে ফিখ্‌টের আদর্শ-রাষ্ট্র সুরক্ষিত।

বিলাতী আডাম স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) "ওয়েল্‌থ অব্‌ নেশ্যন্‌স্‌" (দেশ-বিদেশের সম্পদ) গ্রন্থে (১৭৭৬) বিশ্বব্যাপী এবং সার্ব্বজনীন টক্করের সুপ্রভাব বিবৃত হইয়াছিল। এই মতের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণিতে যে-সকল রচনা দেখা দেয় তাহার অন্যতম প্রথম বোধ হয় ফিখ্‌টের বই। তাহার পর আডাম ম্যিলার "এলেমেণ্টে ড্যর ষ্টাট্‌স্‌-কুন্‌ষ্ট্‌" (রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র বা গোড়ার কথা) প্রকাশ করিয়া আডাম স্মিথের

"অবাধ বাণিজ্য" নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন (১৮০৯)। ম্যিলার অন্যান্য বিষয়েও স্মিথের ঘোরতর বিরোধী।

১৮৪০ সনে লিষ্ট-প্রণীত "স্বদেশী ধনবিজ্ঞান"-গ্রন্থ পুরাপুরি দুয়ার-বন্ধ-করা রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার করে নাই সত্য। কিন্তু একটা তথা-কথিত আন্তর্জ্জাতিকতা বা সার্ব্বজনীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন খাড়া করিয়া লিষ্টও যথাসম্ভব রক্তহীন এবং বিদেশী টক্কর হইতে সংরক্ষিত জনপদের সম্পদ্-কথা চর্চ্চা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, লিষ্টও জবরদস্ত স্মিথ-বিরোধী অর্থশাস্ত্রী।

"একালের" যাঁহারা আডাম ম্যিলারকে পুনর্জ্জীবন দান করিতেছেন তাঁহাদের অগ্রণী ভিয়েনার অর্থরাষ্ট্রসমাজ-শাস্ত্রী ওথমার স্পান। তাঁহার শিষ্য য়াকোব বাক্সা ম্যিলার এবং "ম্যিলার-মণ্ডল" সম্বন্ধে নানাবিধ রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। মহা-লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগের ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় এই সমুদয় রচনা অন্যতম বিশেষত্বপূর্ণ বস্তু। দেখা যাইতেছে যে, এই উপায়ে স্মিথ-বিরোধী অর্থাৎ সার্ব্বজনীনতা-বিরোধী মত জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রে জোরের সহিত ঠাঁই পাইতেছে। অধিকন্তু লিষ্ট্-পরিষদের তদ্‌বিরে লিষ্টকেও পুনর্জ্জীবন দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ একালের জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া আত্মিক হিসাবে "বিশ্বপ্রেম" ও ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে স্বদেশিকতা ও সঙ্ঘনিষ্ঠার চাষ চালাইতে ঝুঁকিয়াছে। আডোল্‌ফ্ হিট্‌লার-প্রবর্ত্তিত ন্যাশন্যাল-সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্রের অর্থশাস্ত্র এই ধরণের ধনবিজ্ঞানই পছন্দ করে। হিট্‌লারপন্থীরা ম্যিলার-মণ্ডলের উপাসক।

আডাম ম্যিলারকে "নাৎসি"-পন্থীরা যে এত দূর সম্মান করিতে প্রস্তুত হইবে তাহা স্পান এবং বাক্সার চিন্তায় স্থান পাইয়াছিল কি না সন্দেহ। ১৯৩৩ সনের জানুয়ারি মাসে জার্ম্মাণ রাষ্ট্র হিট্‌লারের দখলে

আসিয়াছে। তখন পর্য্যন্ত হিট্‌লারের দলে "লিখিয়ে-পড়িয়ে" লোক বোধ হয় বড় বেশী ছিল না। কোনো নামজাদা অর্থশাস্ত্রী বা রাষ্ট্র-শাস্ত্রীকে খোলাখুলি হিট্‌লারপন্থীরূপে দেখা যায় নাই। ১৯৩৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে "হোখ্‌শুলে উণ্ড আউসলাণ্ড" (বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদেশ) নামক বার্লিন হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় দেখিতেছি যে, অধ্যাপক অ্যারভিন ভিস্কেমান "ড্যর নাট্‌সিওনাল-সোৎসিয়ালিসমুস্ উণ্ড ডী ফোল্ক্‌স্ ভিট্‌শাফ্‌ট্‌স্‌লেরে" (নাৎসি ও অর্থশাস্ত্র) নামক প্রবন্ধে *নাৎসি অর্থশাস্ত্রের তরফ হইতে ম্যিলারকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন।* অবশ্য লিষ্টের ঠাঁই ত উচ্চ বিবেচিত হইবারই কথা। ফিখ্‌টেকেও গুরুরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, জার্ম্মাণির ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় ম্যিলার সম্বন্ধে বা এক কথায় ম্যিলার-মণ্ডল সম্বন্ধে একটা নবযুগ আসিতেছে।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়া রাখা যাউক যে, আডাম ম্যিলারের "এলেমেণ্টে ড্যর ষ্টাট্‌স্‌কুন্‌ষ্ট" বর্ত্তমান লেখকের "পজিটিভ ব্যাকগ্রাণ্ড অব হিন্দু সোসিঅলজি"র দ্বিতীয় ভাগে (এলাহাবাদ ১৯২৪-২৫) কিছু-কিছু ব্যবহৃত হইয়াছে। স্পান-প্রণীত "ড্যর ভারে ষ্টাট" অর্থাৎ "যথার্থ রাষ্ট্র" (ভিয়েনা ১৯২১) গ্রন্থের দৌলতে ম্যিলারের রচনাবলীর দিকে নজর গিয়াছিল। স্পানের মতামত "পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ সিন্স ১৯০৫" (মাদ্রাজ ১৯২৮) গ্রন্থে কথঞ্চিৎ সুবিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে পারিয়াছি।

অর্থশাস্ত্রের মার্কিণ ধারা

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্য্যন্ত ভারতে অ-বৃটিশ অর্থশাস্ত্রীর নাম খুব কম জানা ছিল। বোধ হয় ১৯০৫ সনের পর ১৯১০ সনের কাছা-

কাছি মার্কিণ ওয়াকার ভারতীয় বিশ্ববিত্থালয়ের চৌহদ্দিতে প্রবেশ লাভ করে। সেই সঙ্গে বোধ হয় ফরাসী অর্থশাস্ত্রী জিদ্‌কেও ভারতীয় পাঠশালার আবহাওয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯১৫ সনে প্রথম বার আমেরিকায় থাকিবার সময় এডুইন সেলিগ্‌ম্যান আর টাওসিগ প্রধানতঃ এই দুইজন অর্থশাস্ত্রীকে বাঙালী পাঠকের নিকট পরিচিত করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। বোধ হয় তখন ইস্কুল-কলেজের পাঠ্য-তালিকায় উভয়েই স্থান পাইয়াছিলেন। আমেরিকান অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর পরে মুদ্রাশাস্ত্রী আর্ভিং ফিশারের "পার্চেজিং পাওয়ার অব ম্যনি" (টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি) ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকাল চক্রশাস্ত্রী চার্ল্‌স্‌ মিচেলও ভারতে ক্রমে-ক্রমে পরিচিত হইতেছেন। এই ক্ষেত্রেও ফিশারের কাজ বর্ত্তমানে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে।

আর্থিক গতিভঙ্গী দেখা যায় সাধারণতঃ বাজারের তেজী-মন্দা রূপে। সমগ্র দেশব্যাপী আকারেও এই উঠানামা দেখা যায়। দেশসুদ্ধ লোক "সুযোগ" ভোগ করে অথবা দেশসুদ্ধ লোক "দুর্য্যোগে" কষ্ট পায়। সারা দেশময় একটা উঠা, চড়াই বা বাড়তি লক্ষ্য করিতে পারি অথবা হয়ত তাহার উল্টা,—নামা, উৎরাই বা ঘাট্‌তি—দেখিতে পাই। আর্থিক জীবনের রেখা পাহাড়-চূড়ার মতন আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠে-নামে। এই সকল বিষয়ে "আর্থিক উন্নতি"র নানা সংখ্যায় নানা উপলক্ষ্যে আলোচনা করা গিয়াছে। এই উৎরাই-চড়াইয়ের ছবি আঁকা আর অঙ্ক কষা একালের ধনবিজ্ঞানের অতি-বড় কথা। বস্তুতঃ, মূল্যতত্ত্বকে বর্ত্তমান যুগে এই উঠানামা-তত্ত্বের ভিতরই পাকড়াও করিতে হইবে।

বিদেশের সর্ব্বত্রই উৎরাই-চড়াইয়ের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গবেষণার ব্যবস্থা

হইয়াছে। সেই সব প্রতিষ্ঠানকে সাধারণতঃ ক্রাইসিস (বা সঙ্কট)-পরিষৎ বলা হয়। লেখালেখিও বাহির হইতেছে বিস্তর। কয়েকখানা সুলিখিত গ্রন্থও নানা ভাষায় বাহির হইয়াছে। মার্কিণ পণ্ডিত ফিশারের বইয়ের নাম "বুম্‌স্ অ্যাণ্ড ডিপ্রেশ্যন্‌স্" (লণ্ডন ১৯৩৩)। ইংরেজিতে এই ধরণের বইয়ের নাম করিতে হইলেই যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রকাশিত মার্কিণ পণ্ডিত মিচেল প্রণীত "বিজ্‌নেস্ সাইক্‌ল্‌স্" (ব্যবসা-চক্র) আর লড়াইয়ের পরে প্রকাশিত ইংরেজ পিগু প্রণীত "ইনডাষ্ট্রিয়্যাল ফ্লাক্‌চুয়েশ্যন্‌স" (শিল্পজগতের উঠানামা) উল্লেখ করিতে হইবে। সেই দুইখানা বই টেক্‌সট্ বুক হিসাবে সর্ব্বত্রই চলিতেছে। ফিশারের এই বইটাও তাহাদেরই জুড়িদার হইবে ইংরেজী ভাষাভাষী নরনারীর মুল্লুকে। ১৯২৯-৩৩ সনের বিশ্বসঙ্কটের যুগে এই বই লেখা। কাজেই বইটার ভিতর সময়োপযোগী তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রচুর পাওয়া যাইবে। ফিশার অঙ্কে আর তথ্যতালিকায় সুদক্ষ।

আমরা "নবধা কুললক্ষণং" জানি, ফিশার সেইরূপ "নবধা সঙ্কট-লক্ষণং বা দুর্য্যোগ-লক্ষণং" প্রচার করিয়াছেন। "ক্রাইসিসে"র নয় লক্ষণ নিম্নরূপ :—(১) কর্জ্জ লোপ, (২) টাকাকড়ির পরিমাণ হ্রাস, (৩) সিক্কার দর বৃদ্ধি, (৪) কারবারের পুঁজি হ্রাস, (৫) লভ্যাংশের ঘাটতি, (৬) উৎপাদন, ক্রয়বিক্রয় আর নিয়োগের ঘাটতি, (৭) অন্ধকার দেখা আর অবিশ্বাস, (৮) সিক্কার হাত-ফেরার সময় বেশী লাগা (৯) সুদের হার বৃদ্ধি।

এই নব-লক্ষণ যে-কোনো দেশের আর্থিক দুর্য্যোগেই ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হয় না।

ধনবিজ্ঞানে একটা নতুন গবেষণার বস্তু দেখা দিয়াছে। মার্কিণ সংখ্যাশাস্ত্রী ডাব্‌লিন আর তাঁহার সহযোগী লোট্‌কা দুই জনে মিলিয়া

১৯৩১ সনে একখানা বই লিখিয়াছেন। নাম "দি ম্যানিভ্যালু অব ম্যান" (মানুষের মুদ্রা-মূল্য)। ডাব্‌লিন নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান লাইফ ইন্‌শিওর‍্যান্স কোম্পানীর সংখ্যাদপ্তরের কর্ত্তা। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, মানুষের বয়স, মানুষের আয়-ব্যয় ইত্যাদি বস্তু লইয়া তাঁহাকে হামেশা মাথা ঘামাইতে হয়। ফি মাসে তিনি "ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল বুলেটিন"ও বাহির করেন। তাহার ভিতর "মেট্রোপলিটানে'র অভিজ্ঞতাগুলা বিবৃত থাকে। "ক্যালকাটা রিভিউ", "আর্থিক উন্নতি" ইত্যাদি পত্রিকার মারফৎ এই সমুদয়ের কিছু-কিছু ব্যবহার করিতে পারিয়াছি। "মানুষের মুদ্রা-মূল্য" বইয়ে দেখানো আছে জন-প্রতি খরচ পড়ে কত। বুঝিতে হইবে যে, মাল তৈয়ারী করিতে যেমন টাকা লাগে তেমনি মানুষ তৈয়ারি করিতেও টাকা লাগে। মানুষ তৈয়ারি করার মেহনৎ ও খরচপত্রের অনেক-কিছুই (সবটা যদিও নয়) টাকায় মাপাজোকা সম্ভব। সেইরূপ তৈয়ারি-মানুষটাকে বাজারে বেচাও হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই গতর খাটাইয়া কিছু-কিছু টাকা রোজগার করে। এই টাকা রোজগারটাও মানুষের মুদ্রা-মূল্য। অর্থাৎ মানুষের মুদ্রা-মূল্য দ্বিবিধ—(১) খরচের দাম, (২) আয়ের পরিমাণ। বলা বাহুল্য, কারবার আগাগোড়া খাইখরচা হইতে ওষুধপত্রের দাম পর্য্যন্ত সব-কিছু খুঁটিয়া-খুঁটিয়া বাহির করা। এই ধরণের গবেষণায় বাঙালীকেও শীঘ্রই মাথা দিতে হইবে।

জন বেট্‌স্‌ ক্লার্ক

মার্কিণ অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর ক্লার্ক তাঁহার "ডিষ্ট্রিবিউশন অব ওয়েল্‌থ্‌" (ধনদৌলতের বিতরণ) গ্রন্থে (১৮৯৯) "মার্জিন্যাল ইউটিলিটি" অর্থাৎ সীমান্ত-সুখ বা সীমান্ত-সুযোগ তত্ত্বের প্রচারক

ছিলেন। ১৯০৭ সনে প্রকাশিত "এস্‌সেন্‌শ্যাল্‌স্‌ অব ইকনমিক থিয়োরি" (ধনবিজ্ঞানের মূল-সূত্র) বইয়েও এই মতই প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতের ইস্কুল-কলেজে সেলিগ্‌ম্যান মার্কিণ অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধিরূপে পরিচিত। তাঁহার চিন্তায়ও সীমান্ত সুযোগ-দুর্য্যোগের কথা প্রবল।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক জন বেট্‌স্‌ ক্লার্ক ১৯২৬ সনের জানুয়ারি মাসে আশী বৎসর পূর্ণ করিলেন। জন্ম তারিখে (২৬ জানুয়ারি) নিউ ইয়র্ক শহরের ইউনিভার্সিটি ক্লাব-গৃহে একটা বৈজ্ঞানিক "ফলার" অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মহোচ্ছবের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান। বাছিয়া-বাছিয়া মাত্র আশী জন অথিতির জন্য "পাতপিঁড়ি" করা হইয়াছিল। অধিকাংশই বুড়ার দল। খানাপিনা ছাড়া একটা আধ্যাত্মিক স্মৃতির ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। ধনবিজ্ঞানবিদ্যার সেবকেরা ক্লার্কের নামে নিজ-নিজ আলোচ্যবিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এইগুলা ক্লার্কস্মৃতিগ্রন্থ নামে বাহির হইতেছে।

জন বেট্‌স্‌ ক্লার্কপ্রণীত গ্রন্থাবলী দুনিয়ার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সকল বইয়ের কোনো-কোনোটা কখনও টেক্‌স্‌ট্‌বুকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। ক্লার্কের "ফিলজফি অব্‌ ওয়েল্‌থ্‌" (ধন-দর্শন, ১৮৮৫) আর "ডিষ্ট্রিবিউশ্যন অব্‌ ওয়েল্‌থ" (ধন-বণ্টন) প্রসিদ্ধ। এই দুই বই দুনিয়ার অর্থনৈতিক সাহিত্যে মার্কিণ ধনবিজ্ঞানসেবীদের অতি উৎকৃষ্ট দান। একালের "ক্লাসিক" হিসাবে বই দুইটা সকল দেশে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

ক্লার্কের আলোচনা-প্রণালীটাও "ক্লাসিক"। তিনি মানবজীবনের স্বার্থাস্বার্থ-বিষয়ক কতকগুলা মূলসূত্র স্বীকার করিয়া লইয়া আলোচনায়

অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত। সহজে এই প্রণালীকে "ডিডাকৃটিভ্" বা অবরোহ-প্রণালী বলা যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ হইতে স্থরু করিয়া ক্রমশঃ কোনো সার্ব্বজনিক ও সনাতন সত্যে "আরোহণ" করিবার রীতি ক্লার্কের বিশেষত্ব নয়। এই হিসাবে সেকালের "ক্লাসিক" রিকার্ডো আর একালের ক্লাসিক ক্লার্ক এক গোত্রের অন্তর্গত। রিকার্ডোর রচনার কিয়ংদশ ইতিমধ্যে "আর্থিক উন্নতি"র কয়েক সংখ্যায় তর্জ্জমা করাইয়া বাহির করিয়াছি।

ডিডাকৃটিভ প্রণালী কটমট চিজ। ক্লার্কও কটমট। কিন্তু ধনবিজ্ঞান-বিদ্যায় বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রবেশলাভ করিতে হইলে একমাত্র ঐতিহাসিক প্রণালী ধরিয়া চলিলে বেশী দূর যাওয়া সম্ভবপর নয়। আজকালকার দিনে ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালীর জয়জয়কার চলিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্লাসিক রীতির ডিডাকৃটিভ প্রথাও খুব জোরের সহিতই চলিতেছে। জন বেট্স্ ক্লার্কের গুণগ্রাহীদের সংখ্যা বেশ পুরু।

বস্তুতঃ জগৎ-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রীতির জোরে ধনবিজ্ঞানের কোনো "নিয়ম"—বিশেষতঃ মূল্যতত্ত্বের কোনো স্থত্র আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হইবেও না। আর একালে আমেরিকার যে "ইন্ষ্টিটিউশন্যাল" বা প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা-প্রণালীর স্বপক্ষে আন্দোলন চলিতেছে তাহার ফলেও মূল্যতত্ত্বের কোনো নিয়ম বা স্থত্র আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না। ডিডাকৃটিভ ক্লাসিক রীতির নয়া সংস্করণ—অর্থাৎ মার্শ্যাল, ক্লার্ক ইত্যাদির পথই একালেও ধন-বিজ্ঞানের জন্য যার পর নাই জরুরি।

ক্লাসিক বা "সেকেলে"-ক্লাসিক রীতির বিশেষত্বটা খুব মূল্যবান্। এই আলোচনা-প্রণালীতে আর্থিক জীবনকে নড়ক-চড়নহীন রূপে

"ধরিয়া লওয়া" হয়। পৃথিবীতে গতিও আছে সন্দেহ নাই। দুনিয়ার ধনদৌলতে একটানা সহজ-সরল বিকাশ দেখা যায় না একথাও সত্য। ঝড়-ঝাপটা, কাল-বৈশাখী ইত্যাদির দৌরাত্ম্যঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে অথবা কয়েক বৎসর পর-পর আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে ইহাও অজানা নয়। কিন্তু প্রতি মূহূর্ত্তেই, আর্থিক লেনদেনের প্রত্যেক কারবারেই, বাজারে দর-কষাকষির প্রত্যেক অবস্থায়ই একটা অচলায়তন, একটা স্থিতি আছেই আছে। সেই স্থিতি, গতিহীনতা বা নড়ন-চড়নশূন্যতাকে আর্থিক জগতের "অন্যতম" স্বাভাবিক অবস্থা রূপে বিনা তর্কে "স্বীকার" করিয়া লওয়া চলিতে পারে। আর গতিবিধি, নড়ন-চড়ন, ঝড়-ঝাপটা, আধি-ব্যাধি-দুর্য্যোগ ইত্যাদিকে অ-নিয়ম, ব্যতিরেক বা ঐ ধরণের কিছু সমঝিয়া লওয়া সম্ভব। এই সকল স্বীকার্য্য বা প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধ ক্লাসিক রীতির বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে। বুঝা যাইতেছে যে, এই স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্য্যগুলা দুনিয়ার ধনদৌলত সম্বন্ধে ষোল আনা বা পূরা সত্য নয়, আংশিক সত্য মাত্র। কিন্তু দরকষাকষি বা অন্য কোনো লেনদেনের যথার্থ চরিত্র আর্থিক সংসারের স্থিতিশীল বা নড়ন-চড়নহীন ব্যবস্থায় পাকড়াও করা খুবই সম্ভব। এই জন্যই ক্লাসিক রীতিকে তারিফ করিতে হইবে। ক্লাসিক রীতির তদবিরে স্থিতিবিষয়ক সূত্রগুলা আবিষ্কৃত না হইলে ধনবিজ্ঞান বিদ্যাবিজ্ঞানরূপে পরিচিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ।

আর্থিক কারবারের,—"ব্যবসা বাণিজ্যে"র প্রতিক্ষণেই সকল তরফ হইতে টক্কর চলিতেছে। এই টক্করের প্রভাবে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীই নিজ নিজ মেহনতের, ব্যক্তিত্বের বা কর্ম্মদক্ষতার চরম উপকার লাভ করিতেছে। কেহই "অতি-কিছু" পাইতেছে না, প্রত্যেকেই ন্যায্য পাওনা পাইতেছে। কেহই "অতি-কিছু" ছাড়িতে বা নষ্ট করিতে

বা লোকসান দিতে বাধ্য হইতেছে না,—প্রত্যেকেই যতটুকু ছাড়া বা নষ্ট করা বা লোকসান দেওয়া ন্যায্য বা আবশ্যক তাহাই ক রতেছে। ফলতঃ "অতিরিক্ত" আয়, "অতিরিক্ত" মুনাফা, "অতিরিক্ত" লাভ ইত্যাদি বস্তু স্থিতিশীল দুনিয়ায় দেখা যাইতে পারে না। খরিদদারেরা দোকানদারদেরকে "অতি-বেশী" দাম দিতেছে না। বুঝিতে হইবে যে, টক্কর-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক দুনিয়ায় "লাভ"ও নাই "লোকসান"ও নাই। দাঁ মারাও নাই আর ঠকাও নাই। ক্রেতা হিসাবে কেহ ক্ষতিগ্রস্ত নয়। জিনিষটা তৈয়ারি করিতে যাহা খরচ হয় ক্রেতারা তাহার বেশী দিতে বাধ্য হয় না। সুতরাং স্রষ্টারাও,— দোকানদারেরাও খর্চ্চার অতিরিক্ত লাভ দখল করিতে পারে না। ফলতঃ এক দিকে ব্যক্তিমাত্রেই ন্যায্যরূপে লাভবান হইতেছে, অপর দিকে গোটা বাজার, পল্লী, সমাজ বা দেশও সকল প্রকার আর্থিক শক্তি হইতে চরম "কায়দা" উঠাইতে পারিতেছে। টক্কর-নিষ্ঠ দুনিয়া সার্ব্বজনিক চরম লাভের দুনিয়া।

এই গেল ক্লার্কের হাতে ক্লাসিক ধনবিজ্ঞানের মূর্ত্তি। বলা বাহুল্য এই মূর্ত্তির মহাভারতই ধনবিজ্ঞানের বিপুল সৌধ। এইখানে আবার বলিয়া রাখি যে, ক্লাসিক মূর্ত্তির ধনবিজ্ঞান আংশিক ধনবিজ্ঞান মাত্র। কেন না টক্কর অনেক সময়েই স্বাধীনভাবে চালানো সম্ভব-পর হয় না। অধিকন্তু জগৎ গতিশীলও বটে। কাজেই ধনবিজ্ঞানের অন্যান্য মূর্ত্তিও কল্পনা করা সম্ভব। সেই সকল মূর্ত্তির অন্যতম বর্ত্তমান প্রচারক "ইকনমিক্‌স অব ওয়েলফেয়ার" (মঙ্গলসাধনের ধনবিজ্ঞান)-প্রণেতা ইংরেজ পিগু। আর এক প্রচারক মার্কিণ মিচেল। মার্শ্যাল-ক্লার্কের সঙ্গে পিগু-মিচেলের যোগাযোগ না ঘটাইলে ষোল আনা অর্থ-শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না।

এডুইন সেলিগ্‌ম্যান

এডুইন সেলিগ্‌ম্যান ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে টেক্‌ষ্টবুক-লেখক হিসাবে সুপরিচিত। মার্কিণ পণ্ডিতমহলে তাঁহাকে কার্ল্‌ মার্ক্‌সের মত-প্রচারকরূপে একটা বড় ঠাঁই দেওয়া হয়। ১৯০৩ সনে তিনি "ইকনমিক "ইণ্টাপ্রের্টেশন অব হিষ্টরি" (ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা) নামক বই প্রকাশ করেন। শতাব্দীর প্রথম দিকে এইটা প্রবন্ধের আকারে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পাদিত "পোলিটিক্যাল সায়েন্স কোআর্টার্লি"তে বাহির হইয়াছিল। সেলিগ্‌ম্যান মার্ক্‌স্‌কে "আর্থিক ব্যাখ্যা"র যথার্থ জনকরূপে বিবৃত করিয়াছেন। সেলিগ্‌-ম্যানের এই মত বর্ত্তমানে টেক্‌সই নয়। হার্ভার্ডের রুশ-মার্কিণ পণ্ডিত পিতিরিম সোরোকিন তাঁহার "কন্‌টেম্পোরারি সোসিওল-জিক্যাল থিয়োরীজ" (একালের সমাজতত্ত্ব) নামক সুবিস্তৃত গ্রন্থে (নিউ ইয়র্ক ১৯২৮) বহু প্রমাণের সাহায্যে মার্ক্‌স্‌কে এই সম্বন্ধে "জনকে"র পদ হইতে নামাইতে পারিয়াছেন। তাহা ছাড়া সেলিগ্‌-ম্যানের অন্যান্য ভুল বা অসম্পূর্ণতাও সোরোকিনের হাতে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও "আর্থিক ব্যাখ্যা" বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহার জন্য সেলিগ্‌ম্যানের বইটার নিকটই ইংরেজি পাঠকেরা প্রধানতঃ ঋণী। জাপান, চীন, স্পেন ইত্যাদি দেশেও এই বইয়ের তর্জ্জমা বাহির হইয়াছে।

রাজস্ব সম্বন্ধে ও রাজস্বের ইতিহাস সম্বন্ধে রচনা সেলিগ ম্যানের অন্য এক বিশেষত্ব। এই বই সার্ব্বজনিক কাজে লাগে না। বর্ত্তমান লেখকের "পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌স অ্যাণ্ড থিয়োরীজ অব দি হিন্দুজ" গ্রন্থে সেলিগ ম্যানের রাজস্ব বিষয়ক বই (এস্‌সেজ ইন

ট্যাক্‌সেশন, ১৯১৩) তুলনামূলক আলোচনার জন্য কাজে লাগিয়াছে। এই বিষয়ে সেলিগ্‌ম্যান তিন-চারখানা বই লিখিয়াছেন।

বর্ত্তমানে সেলিগ্‌ম্যান সমাজবিদ্যার বিশ্বকোষ সম্পাদন করিতেছেন। দেশবিদেশের বহুসংখ্যক লেখক এই কাজের জন্য মোতায়েন আছেন। গোটা বার খণ্ড বাহির হইয়া গিয়াছে। বিশ্বকোষের নাম "এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্সেজ"। বর্ত্তমান লেখকের রচনাও এই বিশ্বকোষে স্থান পাইয়াছে।

লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগের একটা বড় আর্থিক তথ্য হইতেছে অটো-মোবিলের রেওয়াজ-বৃদ্ধি। অটোমোবিল বিক্রীর বাবসায় একটা নতুন কায়দা অথবা পুরাণা কায়দার প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। তাহার নাম "ইন্‌ষ্টলমেণ্ট সেলিং" (বা কিস্তী মাফিক দাম দেওয়ার ব্যবস্থা)। এই বিষয়ে সেলিগ্‌ম্যান ১৯২৭ সনে একখানা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বই তৈয়ারি করিয়াছেন। তথ্য-সংগ্রহের জন্য সহায়ক ছিল অনেক। সহায়কদের রচনাগুলা দ্বিতীয় খণ্ডের মাল। খুঁটিয়া-খুঁটিয়া নানা স্থান হইতে বস্তু-নিষ্ঠ খবর লওয়া এই গবেষণার প্রধান লক্ষণ।

সেলিগ্‌ম্যানের রচনা সর্ব্বদাই প্রাঞ্জল। কিস্তীতে কেনা-বেচার অর্থশাস্ত্র বিষয়ক কেতাবও সরস রচনার অন্যতম দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান জগতে ব্যবসা-সংগঠনের মূর্ত্তি কিরূপ তাহা বস্তুনিষ্ঠভাবে বুঝিয়া দেখিবার জন্য এই বইখানা পড়িয়া দেখিতেই হইবে। বাঙ্‌লা দেশে আমরা জানি যে, পাটের কেনা-বেচায় চাষী হইতে সুরু করিয়া কলিকাতার পাটের কল পর্য্যন্ত অথবা ডাণ্ডীর পাটের কল পর্য্যন্ত কম-সে-কম গণ্ডা দেড়েক হাত-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। ভাল করিয়া খতাইয়া দেখিলে বুঝিব যে, কেবলমাত্র চাষ-আবাদের মালেরই নয়, দুনিয়ার সকল্ প্রকার জিনিষের কোষ্ঠীতেই খোদ উৎপাদক হইতে

খোদ খাদক পর্য্যন্ত কম-সে-কম গণ্ডা দেড়েক হাত-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অটোমোবিলের কেনা-বেচায় এই হাত-পরিবর্ত্তন কাণ্ড কত জটিল তাহা সেলিগ্‌মানের বইয়ে পরিষ্কার করিয়া দেখানো আছে।

১৯২৬ সনের শেষাশেষি আমেরিকায় মোটের উপর ৩৮,০০০,০০০,০০০ ডলার মূল্যের মাল কেনা-বেচা হইয়াছিল। তাহার ভিতর "কিস্তীমাফিক" কেনা-বেচা হইয়াছিল ৪,৮৭৫,০০০,০০০০ ডলার মূল্যের জিনিষ সম্বন্ধে। তাহার দরুণ বাজারে পাওনা ছিল ২,২০১,০০০,০০০ ডলার। কিস্তী মাফিক কেনা-বেচার ভিতর এক অটোমোবিলের হিস্যাই ২,৭৩৪,০০০,০০০ ডলার। অটোমোবিল বাবদ পাওনা ছিল ২,০৮৬,০০০,০০০ ডলার। দেখা যাইতেছে যে, অটোমোবিল ছাড়াও অনেক জিনিষ কিস্তী মাফিক কেনা-বেচা হইত। ঘরবাড়ীর আসবাব, পিয়ানো, সেলাইয়ের কল, কাপড়চোপড়, রেডিও, ফনোগ্রাফ, অলঙ্কার, গ্যাসষ্টোভ, ট্র্যাক্‌টর, ভ্যাকুয়াম-ঝাঁটা ইত্যাদি জিনিষ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু আধাআধি হিস্যা ছিল অটোমোবিলের।

বুঝাই যাইতেছে যে, কিস্তী মাফিক কেনা-বেচা "নগদ" কেনা-বেচা নয়। অর্থাৎ ইহা ধারে কেনা-বেচা। কিন্তু মামুলি "ধারে" কেনা-বেচার সঙ্গেও ইহাকে এক গোত্রে ফেলা চলিবে না। এই ব্যবস্থাকে কোনো-কোনো অর্থশাস্ত্রী মার্কিণ সম্পদের বনিয়াদ বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। তাঁহারা ইহাকে সেকেলে শিল্প-বিপ্লবের সমান পদে তুলিয়া থাকেন। কিস্তী মাফিক কেনা-বেচার সাহায্যে একটা "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব" সাধিত হইয়াছে এইরূপ তাঁহাদের বিশ্বাস। অপর দিকে ঠিক উল্টা গাহিবার লোকও আছে বিস্তর। কিস্তী মাফিক কেনা-বেচাকে অতি বিপজ্জনক আর্থিক ব্যবস্থা

বিবেচনা করা অনেকের দস্তুর। তাঁহাদের বিশ্বাস,—এই ব্যবস্থায় আমেরিকায় আর্থিক দুর্গতি ত ঘটিবেই, এমন কি মার্কিণ নরনারীর নৈতিক সর্ব্বনাশও ইহাতে অবশ্যম্ভাবী।

সেলিগ্‌ম্যানের চিন্তায় নৈরাশ্য বা দুঃখনিষ্ঠা আগেও ছিল না, এখনো নাই। অটোমোবিলকে তিনি কোনো-কোনো অতিমাত্রায় নীতি-নিষ্ঠ নরনারীর মতন বিলাস-সামগ্রী বিবেচনা করেন না। তাঁহার "নীতিশাস্ত্রে" বিলাস নিন্দিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার "অর্থশাস্ত্রে" বিলাসসামগ্রী নামক কোনো বস্তু একপ্রকার নাই। কিস্তী মাফিক কেনা-বেচায় "অটোমোবিল এবং অন্যান্য বিলাস সামগ্রীর দিকে লোকের ঝোঁক যায়" এইরূপ অপবাদ যাঁহারা রটাইয়াছেন সেলিগ্‌ম্যান তাঁহাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন।

যুগে যুগে আর্থিক ব্যবস্থার বা গড়নের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রত্যেক গড়নের সঙ্গে-সঙ্গেই কর্জ্জ-প্রথারও পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের যে আর্থিক গড়ন পুষ্ট হইতেছে তাহার আনুষঙ্গিক একটা নতুন ঢঙের কর্জ্জ-ব্যবস্থাও দেখিতে পাইতেছি। তাহারই নাম কিস্তী মাফিক কেনা-বেচা। এই হইল সেলিগ্‌ম্যানের "মুদ্দা"।

মার্কিণ অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর দেশ-বিদেশে পরিচিত লোক বোধ হয় সেলিগ্‌ম্যানের মতন আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। জাপান, রুশিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্ম্মাণি এবং আর্ম্মিণিয়া ইত্যাদি নানা দেশের ভাষায় তাঁহার একাধিক বই অনূদিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় সেলিগ্‌ম্যানের দুএকটা রচনা পাওয়া উচিত ছিল।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্র

একটা নতুন পারিভাষিক শব্দ ধন-বিজ্ঞানের আখড়ায় দেখা দিয়াছে। সেকালে যেমন ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-প্রতিষ্ঠিত ধন-বিজ্ঞানের নাম শুনা যাইত, আজকাল সেইরূপ শুনা যাইতেছে "ইন্‌ষ্টিটিউশন্যাল ইকনমিক্‌স্" বিদ্যার নাম। শব্দটা উঠিয়াছে মার্কিণ অর্থশাস্ত্রীদের আসরে। ১৯২৪ সনে নিউ ইয়র্কে বাহির হইয়াছে টুগ-ওয়েলের "ট্রেণ্ড অব ইকনমিক্‌স্" (ধনবিজ্ঞানের ঝোঁক) গ্রন্থ। ইহা একটা সংগ্রহের বই,—পাঁচ ফুলে সাজি। নানা লোকের মত একত্রে দেখানো হইয়াছে। নামজাদাদের ভিতর আছেন চার্ল্‌স্ ওয়েজ্‌লি মিচেল।

"আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ" পত্রিকায় "প্রাতিষ্ঠানিক" ধন-বিজ্ঞানের স্বপক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা বাহির হইয়া থাকে বলা বাহুল্য। লড়াইয়ের যুগে অথবা তাহার পরবর্ত্তীকালে "প্রতিষ্ঠান" সমূহের দিকে মার্কিণ অর্থশাস্ত্রীদের নজর জোরের সহিত পড়িয়াছে। আমেরিকায় থাকিবার সময় এই সব লক্ষ্য করিয়াছি (১৯১৪-১৯১৫ আর ১৯১৭-২০)। একালে দুনিয়ায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে,—কি মূল্য, কি মজুরি—সবই দলবদ্ধ চুক্তির উপর নির্ভর করে, দলাদলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পূরাপূরি স্বাধীন টক্কর, স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত দরকষাকষি এক এক প্রকার দেখা যায় না। এক দিকে মজুর-সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ অপর দিকে পুঁজিপতিরাও সঙ্ঘবদ্ধ। সর্ব্বত্রই সঙ্ঘের অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জয়জয়কার। সুতরাং "সেকেলে" রিকার্ডো-প্রবর্ত্তিত জোগান-চাহিদার সম্বন্ধ অথবা একালের "মার্জিন্যাল ইউটিলিটি" বা "ডিস্‌ইউটিলিটি" অর্থাৎ সীমান্ত-সুযোগ বা সীমান্ত-দুর্য্যোগ ইত্যাদির

উপর ধর্ণা দিয়া থাকা গবেষকদের উচিত নয়। বেশী জোর দেওয়া উচিত তথ্যের দিকে, বস্তুর দিকে, অঙ্কের দিকে, মানুষে-মানুষে যোগাযোগের দিকে। ষোল আনা স্বাধীন অর্থাৎ পূরাপূরি বাধাহীন প্রতিযোগিতার দুনিয়া আর আলোচ্য বস্তু নয়। তাহার বদলে দেখা দিয়াছে বাঁধাবাঁধি-ভরা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্লেষণ। ধনবিজ্ঞান বিদ্যা এক দিকে সুপরিচিত ঐতিহাসিক ধনবিজ্ঞানের আকার-প্রকার পাইয়া বসিতেছে। অপর দিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ, সামাজিক ব্যবহার বা লেনদেন ইত্যাদির আলোচনায় ধনবিজ্ঞান আর চিত্তবিজ্ঞান পরস্পর সুজড়িত হইয়া পড়িতেছে।

আর্থিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষ যা-কিছু করে সবই সে প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বা সাহায্যে করে। প্রতিষ্ঠানগুলার ভিতর নর-নারী তাহাদের আগেকার আর পাশের নরনারীর কাজকর্ম্ম, চিন্তাধারা বা রীতিনীতি মূর্ত্তিমন্তরূপে দেখিতে পায়। অর্থাৎ বলা যাইতে পারে যে, মানুষের আর্থিক এবং অন্যান্য কাজকর্ম্ম সবই প্রধানতঃ আগেকার আর পার্শ্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক লোকজনের স্বভাব, অভ্যাস বা চরিত্রের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। পূরাপূরি স্বাধীন বা ব্যক্তিত্বপূর্ণ চিন্তা ও কাজের পরিমাণ মানুষের আর্থিক জীবনে খুবই কম।

কাজেই মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদির কথা ভুলিয়া প্রতিষ্ঠান, প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেন, সামাজিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিলে মানুষের "সুরৎ" বদলাইয়া দেওয়া সম্ভব। মানুষ আসলে কিরূপ জানোয়ার তাহা না জানিলেও হয়ত চলে। চাই তাহার সামাজিক "স্বভাব", ব্যবহার বা লেনদেন ইত্যাদির উপর প্রভাব বিস্তার করা। এই গেল অতি সহজে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্রের জল্পন-কল্পন।

প্রতিষ্ঠান বা ব্যবহার বা লেনদেনগুলা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সার্ব্বজনিক বা সনাতন সূত্র ঝাড়িতে যাওয়া আর চলিতে পারে না। সার্ব্বজনিক মূল্যতত্ত্ব বা সনাতন মূল্যতত্ত্ব, সার্ব্বজনিক মজুরি-তত্ত্ব বা সনাতন মজুরিতত্ত্ব, সার্ব্বজনিক মুদ্রাতত্ত্ব, সার্ব্বজনিক বাণিজ্যতত্ত্ব ইত্যাদি সবই সিকায় তুলিয়া রাখা দরকার। তাহার ঠাঁইয়ে চাই প্রত্যেক অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দাম কিরূপে গড়িয়া উঠিতেছে, মজুরির হার কোন্-কোন্ শক্তির প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহার দিকে নজর ফেলিতেই প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশাস্ত্রীরা আগ্রহান্বিত।

ওয়েজ্‌লি মিচেল

মাপাজোকার কারবারে ওজে্‌লি মিচেল সিদ্ধহস্ত। সিদ্ধহস্ত বলিলে ঠিক বলা হইল না। এইটাই হইল ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় তাঁহার আসল কাজ। আর্থিক ক্ষেত্রের যেখানে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ নাই সেখানে মিচেলের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্কিণ অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর মিচেলকে এই হিসাবে মার্কামারা লোক বিবেচনা করা সম্ভব। সম্প্রতি কেবল নামজাদা লোকের কথা বলিতেছি। কেন না অর্থ, রাষ্ট্র ও সমাজ বিষয়ক মার্কিণ পত্রিকার যে সংখ্যাই খুলি না কেন, সর্ব্বত্রই সংখ্যার ছড়াছড়ি, অঙ্কের শ্রেণী, এক কথায় পারিমাণিক বিশ্লেষণ দেখিতে পাই। আমেরিকায় বসবাস করিবার সময়ে ধনবিজ্ঞানে আর সমাজবিজ্ঞানে সংখ্যাশাস্ত্রের ইজ্জদ্ যেখানে-সেখানে লক্ষ্য করিতাম। আর সেই ইজ্জদের সঙ্গে-সঙ্গে মিচেলের আলোচনা-প্রণালীও বর্ত্তমান লেখকের চিন্তামণ্ডলে স্থায়ী ঘর করিয়া বসিয়াছিল।

১৯১৩ সনে প্রকাশিত "বিজ্‌নেস্ সাইক্‌ল্‌স্" (বা ব্যবসা-

চক্র)-গ্রন্থের লেখক হিসাবে মিচেল অর্থশাস্ত্রকে একদম পুরাপুরি সংখ্যার উপর খাড়া করাইয়াছিলেন। নিউ ইয়র্কে থাকিবার সময় এই গ্রন্থের ভিতরকার অঙ্কগুলা ধনবিজ্ঞানের গবেষণায় যার পর নাই বিপ্লবসূচক মনে হইয়াছিল। এই বইটা পরে "খোল-নল্‌চে" বদলাইয়া নতুন আকারে দেখা দিয়াছে (১৯২৭)।

বইটার প্রথম আলোচ্য বিষয় ব্যবসাচক্রের "ক্রম"-বিশ্লেষণ। বাজারের লোকেরা জানে যে তেজীর পর মন্দা আসে,—মন্দার পর আসে তেজী,—তাহার পর আবার মন্দা ইত্যাদি। এই হইল আর্থিক জীবনের "ক্রম"। শুদ্ধ কথায় ইহার নাম সঙ্কোচ বা সঙ্কোচন আর তাহার পর প্রসার বা প্রসারণ। সরস শব্দ হইল উৎরাইয়ের পর চড়াই আর চড়াইয়ের পর উৎরাই ইত্যাদি। এই "ক্রম" বা পৌর্ব্বাপর্য্যের ধারা ব্যবসা-প্রণালীর সঙ্গে কিরূপ জড়িত তাহার কথা মিচেলের বইয়ের দ্বিতীয় কথা। একালের ধনদৌলতের যেরূপ গড়ন তাহার প্রভাব এই জন্য বিশ্লেষিত হইয়াছে। সংখ্যা, অঙ্করাশি ইত্যাদি এই সকল গবেষণা আর আলোচনার প্রাণ। কাজেই এই দিকে মিচেলের নজর গিয়াছে। সংখ্যাগুলা নিছক মনগড়া অঙ্ক নয়। শিল্পবাণিজ্যের সংসারে ধনোৎপাদন, বাজার-দর, ধনবিতরণ ইত্যাদির পরিমাণ ঠিক-ঠাক যাহা লিপিবদ্ধ আছে সেই সব মিচেলের অন্যতম আলোচ্য বস্তু।

"সাইক্‌ল্‌" বা চক্র ইত্যাদি আর্থিক জীবনের বিচিত্র ঘটনাসমূহ উনবিংশ শতাব্দীর অর্থশাস্ত্রীরাও আলোচনা করিতেন। তাহার ফলাফল ভারতে আমরা সেকালে অল্প-বিস্তর অবগত ছিলাম। "প্যানিক", আতঙ্ক, ভয়, সঙ্কট, দুর্য্যোগ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মারফৎ পাওয়া যাইত। "স্বদেশী আন্দোলনের" যুগে (১৯০৫-১৪) এই সকল বিষয়ে ফরাসী, জার্ম্মাণ বা অন্য কোনো

গবেষণা ভারতবাসীর একপ্রকার জানা ছিল না। মিল-পন্থীদের মতামতই আমাদের একমাত্র ভোগ্য বস্তু ছিল।

সুতরাং ১৯১৫-১৮ সনে অর্থশাস্ত্রী সেলিগ্ম্যান ও ভেব্লেন, দার্শনিক ডুয়ী, ঐতিহাসিক রবিনসন ও বিয়ার্ড, রাষ্ট্রশাস্ত্রী ডানিং, সমাজশাস্ত্রী গিডিংস ইত্যাদির সুধী-মণ্ডলে মিচেলের কাজ-কর্ম্মের পরিচয় পাইয়া একটা নয়া দুনিয়ার সঙ্গে মোলাকাৎ হইয়াছিল বলিতে হইবে। মিচেলের বইটাকে একমাত্র চক্রতত্ত্বের গ্রন্থস্বরূপ গ্রহণ করি নাই। ধনবিজ্ঞান বিদ্যাটাকে অঙ্কের বনিয়াদে গড়িয়া তুলিলে যে নতুন এক সৌধ খাড়া করা সম্ভব এই কথাই প্রধানতঃ মিচেলের আবহাওয়ায় পাইয়াছিলাম। বস্তুতঃ মিচেলের "গোল্ড, প্রাইসেজ্ অ্যাণ্ড ওয়েজেস আণ্ডার দি গ্রীণব্যাক ষ্ট্যাণ্ডার্ড" বইটার (১৯০৮) ভিতরও সংখ্যার ছড়াছড়িই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য। তাহাতে মার্কিণ ঘরোয়া লড়াইয়ের যুগের টাকাকড়ির অর্থকথা বিবৃত আছে। গ্রীণব্যাক ("সবুজ-পিঠ") ছিল সেই যুগের নোটের নাম। নোটের এক পিঠ সবুজ রঙের থাকিত। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই নোটের "পশ্চাতে" বন্ধক-স্বরূপ সোণা নাই। অর্থাৎ যে আর্থিক ব্যবস্থায় "গ্রীণ-ব্যাক" নামক নোট জারি ছিল সেই ব্যবস্থায় মার্কিণ মুল্লুকে স্বর্ণমান বজায় ছিল না। স্বর্ণমান বজায় থাকিলে নোটগুলার পিঠ সোনালী রঙের বা পীতাভ হয়। রংয়ের ফারাক করিয়া মার্কিণ রাষ্ট্র জনসাধারণকে মুদ্রা-চরিত্র বুঝাইয়া দিতে অভ্যস্ত। যাহা হউক, মিচেলের "সোনা, মূল্য ও মজুরি" বইটা আগাগোড়া অঙ্ক-তালিকার পর অঙ্ক-তালিকা।

মিচেলের বস্তুনিষ্ঠা আর সংখ্যানিষ্ঠা কাজে লাগাইবার জন্য

আমেরিকানরা একটা টোল কায়েম করিয়াছে। এই টোলে ইস্কুইলা ছাত্র পড়ানো হয় না। তোড়া-তোড়া টাকা খরচ করা হয় আর নামজাদা লেখক বাহাল করা হয়। তাহাদের কারবার থাকে "রাগ-দ্বেষ-বহিষ্কৃত" রূপে অর্থাৎ কোনো "প্রপাগাণ্ডা" বা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে অনুসন্ধান-গবেষণা চালানো আর বই লেখা। টোলটা নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত। নাম "ন্যাশনাল বিউরো অব ইক-নমিক রিসার্চ"। দেশের লোকের আয় সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হইয়া থাকে, বেকার সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হইয়া থাকে ইত্যাদি। এই সকল গবেষণায় টোলের অধ্যক্ষপদে বাহাল আছেন মিচেল। যুবক ভারতে মিচেল গুরুরূপে গৃহীত হইলে ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় একটা নবযুগ আসিবে। বস্তুতঃ মিচেলের "বিজ্‌নেস সাইক্‌ল্‌স্‌" বইটা ভারতীয় অর্থশাস্ত্রী মহলে ধনবিজ্ঞানের "ভূমিকা" স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একালের "ধনদৌলত"কে ধনদৌলত আর একালের "অর্থশাস্ত্র"কে অর্থশাস্ত্র,—দুইই মিচেলের বইয়ে এক সঙ্গে মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

অর্থকথার সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন

১৯২৮ সনে "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকার মারফৎ মার্কিণ সমাজ-শাস্ত্রী পিতিরিম সোরোকিনকে ভারতবর্ষে পরিচিত করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। হার্ডার (জার্ম্মাণ) হইতে সোরোকিন পর্য্যন্ত সমাজ-চিন্তার ধারা দেখানো উপলক্ষ্য ছিল। এই সোরোকিনকে অর্থ-শাস্ত্রীদেরও মনে রাখা আবশ্যক।

মার্কিণ অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় পিতিরিম সোরোকিন বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সোরোকিন জাতিতে রুশ। বোলশেভিক বিপ্লবের

ধাক্কায় দেশত্যাগী হইয়া আমেরিকায় বসবাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিজ্ঞানের বাজারে সোরোকিনকে সমাজশাস্ত্রী বলিয়া জানে। কিন্তু সমাজশাস্ত্রীরা অনেকেই অর্থশাস্ত্রের মাল লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে অভ্যস্ত। জার্ম্মাণ সমাজশাস্ত্রী টোন্নীস ও মাক্স্ ভেবার, ফরাসী সমাজশাস্ত্রী তার্দ্ ও দুর্খাইম, ইংরেজ সমাজশাস্ত্রী হবহাউস ইত্যাদি একালের পণ্ডিতগণের নাম সহজেই মনে পড়িবে। সোরোকিনের বেলায় দুএকটা বিশেষত্ব-পূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা আবশ্যক। "সোসিঅলজি অব রেভোলিউশন" (১৯২৫) গ্রন্থে বিপ্লবের সমাজকথা আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। "সোশ্যাল মোবিলিটি" বা "সামাজিক গতিপ্রবণতা" গ্রন্থের ভিতর আর্থিক চলাফেরা, উঠানামা, উৎরাই-চড়াইয়ের কথা বিস্তর আছে। "রুর‍্যাল-আর্বাণ" (পল্লী-শহর) সমস্যামূলক গ্রন্থের ভিতর অর্থকথা বিপুল আকারে ঠাঁই পাইয়াছে। সোরোকিনকে ধনদৌলতের সংখ্যা-শাস্ত্রী ও সমাজশাস্ত্রীরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখা চলিতে পারে।

অধিকন্তু "কণ্টেম্পোরারি-সোসিঅলজিক্যাল থিয়োরিজ" (সমসাময়িক সমাজশাস্ত্র) নামক বৃহদাকার গ্রন্থে (১৯২৮) সোরোকিন অন্যান্য অনেক আর্থিক বিশ্লেষণের ভিতর একটা অতিমাত্রায় বিপ্লবমূলক মত প্রচার করিয়াছেন। সেই মতটা প্রত্যেক ধনবিজ্ঞান-গবেষকের জানিয়া রাখা দরকার। কার্ল্ মার্ক্স্ আর ফ্রীড্রিশ এঙ্গেল্সের প্রচারিত "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা" সুপরিচিত। ভারতে মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী সেলিগম্যানের মারফৎ মার্ক্স্-এঙ্গেল্সের মত বোধ হয় অনেকটা রপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক কথায় মতটা নিম্নরূপ। পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ ধনোৎপাদনের

আকারপ্রকার বা কর্ম্মকৌশল। ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রী আকিলে লরিয়ার হাতে এই মত আরও চরমরূপে দেখা দিয়াছে। তাঁহার বিচারে জমিজমার ভোগস্বত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্বই সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, নীতি ইত্যাদি সব কিছুরই নিয়ামক। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মত চলিয়া আসিতেছে।

সোরোকিন এই "আর্থিক ব্যাখ্যা"-কাণ্ডের চরম শত্রু। মানুষের সংস্কৃতির উপর আর্থিক প্রভাব আছে। ইহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতির "কারণ" ধনদৌলত অথবা ইহার "একমাত্র" কারণ ধনদৌলত এরূপ বিশ্বাস করিবার কোনো যুক্তি নাই। সোরোকিন প্রাচীন হিন্দু, চীনা, গ্রীক হইতে স্বরু করিয়া মার্কস্-এঙ্গেল্সের যুগ পর্য্যন্ত দুনিয়ার পণ্ডিতদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন আর দেখাইতেছেন যে, খাওয়াপরার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগাযোগ সম্বন্ধে অনেকের ধারণাই স্পষ্ট ছিল।

সোরোকিন বলিতেছেন যে, মানুষের জীবনে আর্থিক শক্তি ছাড়াও অন্যান্য শক্তি কাজ করে। ধর্ম্ম, বিদ্যা, যাদু ইত্যাদি অনেক-কিছুর প্রভাবই যথেষ্ট। জার্ম্মাণ সমাজশাস্ত্রী মার্ক্স্ ভেবার তাঁহার "ভির্ট্-শাফ্ট্স্-গেশিষ্টে" (আর্থিক ইতিহাস) নামক গ্রন্থে (১৯২৪) দেখাইয়াছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে আর্থিক গড়নটাই ধর্ম্মজীবনের ফল স্বরূপ গড়িয়া উঠে। ভেবারের মতে আধুনিক পুঁজিনিষ্ঠা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

নৃতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রতত্ত্ব, আইন ইত্যাদি নানা বিদ্যার কোঠ হইতে তথ্য ও অঙ্ক বাহির করিয়া সোরোকিন আর্থিক ব্যাখ্যাকে বাতিল সপ্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, লম্বায়-চওড়ায় গরীবেরা ধনীদের চেয়ে খাটো, ওজনেও

কম। বোধ হয় মগজের ওজন আর বহরও ধনীদের চেয়ে গরীবদের খানিকটা অল্প। এরা বাঁচেও কম। আর এদের মথোর ক্ষমতাও কিছু-কম। দারিদ্র্যের সঙ্গে শরীরের, স্বাস্থ্যের আর "আত্মার" এইরূপ "কো-রেলেশন" বা যোগাযোগ বহু-সংখ্যক নৃতত্ত্ব-বিষয়ক তথ্যের ও অঙ্কের জোরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোরোকিন নিজেও এই ধরণের গবেষণায় হাত দেখাইয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি বলিতেছেন যে, "কো-রেলেশুন" বা যোগাযোগ-গুলা সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ দারিদ্র্য না থাকিলেও এইরূপ অল্পতা, হ্রস্বতা, খাকৃতি, ঘাটতি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা গিয়াছে। আবার বহু সংখ্যক দরিদ্র নরনারীর জীবনে এই সকল ঘাটতি দেখা যায় নাই। অপরদিকে যদিও বা দারিদ্র্যের সঙ্গে এই সকল দুর্ব্বলতার যোগাযোগ স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, তথাপি দারিদ্র্য যে এই সকল দুর্ব্বলতার "কারণ" তাহা বলা সম্ভবপর নয়। অন্যান্য কারণেও এই সকল ঘাটতি ঘটিতে পারে।

গরীবদের ভিতর হাজার-করা মৃত্যুহারও বেশী আর জন্মহারও বেশী। দেশবিদেশের নানা লোকশাস্ত্রীর গবেষণায় এই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সোরোকিনের মতে এই যোগাযোগেও গলদ দেখিতে পাওয়া যায়। দারিদ্র্য ছাড়া অন্যান্য কারণেও মৃত্যুহার বেশী হইতে পারে আর জন্মহারও বেশী হইতে পারে। সংখ্যাশাস্ত্রের সাহায্যেই এই সব প্রমাণ করা সম্ভব। মন্দার যুগে লোক বেশী মরে এরূপ সপ্রমাণ করা যায় না।

আত্মহত্যা করে কারা বেশী,—গরীবেরা না ধনীরা? সোরোকিন এই সম্বন্ধে ফরাসী সমাজশাস্ত্রী দুর্খাইমের মত খানিকটা গ্রহণ করিতে রাজি। সংখ্যার জোরে গরীবদেরকে বড়লোকের চেয়ে

বেশী আত্মহত্যাপ্রবণ প্রমাণিত করা কঠিন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ায় ধনসম্পদ বাড়িয়াছে। অথচ এই আর্থিক উন্নতির যুগেই আত্মহত্যার বাড়্তিও দেখা যায় স্পষ্টরূপে। কাজেই দারিদ্র্যকে আত্মহত্যার কারণ সমঝিয়া রাখা ঠিক নয়।

আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্থ যাহারা হয় তাহাদের ভিতর গরীব বেশী না ধনী বেশী? দারিদ্র্যের সঙ্গে শাস্তির "কোরেলেশ্যন" বা যোগাযোগ অনেকদিন হইতেই অপরাধশাস্ত্রীরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। সোরোকিন নিজেই "ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট" (অপরাধ ও শাস্তি) গ্রন্থের লেখক হিসাবে এই যোগাযোগের কথা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই যোগাযোগের বিষয় লইয়া অতি-মাত্রায় লাফালাফি করিতে প্রস্তুত নন। অন্যান্য যোগাযোগের মতন দারিদ্র্য-অপরাধ যোগাযোগও অসম্পূর্ণ অর্থাৎ আংশিক। ইহাকে পূরাপূরি গ্রহণ করিবার মতন যুক্তি সোরোকিন দেখিতে পান না। এমন কি টাকা পয়সা বিষয়ক অপরাধের বেলায়ও তিনি দারিদ্র্যকে একমাত্র কারণ ঠাওরাইতে অসমর্থ। ফরাসী সমাজশাস্ত্রী রিশার অনেক সংখ্যার জোরে দেখাইযাছেন যে, ধনদৌলত-সম্পর্কিত কারণ ছাড়াও ধনদৌলত বিষয়ক অপরাধ ও সাজা ঘটিয়া থাকে। সোরোকিন বলিতেছেন যে, গরীবরাই সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা অপরাধীদের ভিতর সংখ্যা হিসাবে বড় নয়। অধিকন্তু অনেক গরীব দেশে ধনী দেশের চেয়ে কম অপরাধ ও সাজা দেখা যায়। তাহা ছাড়া একটা মস্ত কথা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান যুগে ইয়োরামেরিকার প্রায় সকল দেশেই নরনারীর আর্থিক অবস্থায় উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অপরাধ আর সাজার বহর এই সকল দেশে বাড়্তির পথেই চলিয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা তথ্যের দিকে

নজর রাখা আবশ্যক। ধনদৌলত-বিষয়ক অপরাধী আর সাজাপ্রাপ্ত লোকজনের ভিতর ধনী লোকের সংখ্যা বিস্তর। অপর দিকে গরীব-দের অনেকেই এই ধরণের টাকা-পয়সা-ঘটিত অপরাধের কাজ করে না। এই সকল তথ্য মনে রাখিলে দারিদ্র্যকে অপরাধের কারণ বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বিজ্ঞানসেবীই ইতস্ততঃ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ইংরেজ সমাজশাস্ত্রী হব্‌হাউস-প্রণীত "মেটিরিয়্যাল কাল্‌চার অ্যাণ্ড সোশ্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌স্ অব দি সিম্প্‌লার পীপ্‌ল্‌স্" (আদিম জাতি-পুঞ্জের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান) গ্রন্থের মাল উদ্ধৃত করিয়া সোরোকিন দেখাইতেছেন যে, নরনারীর আর্থিক গড়ন একরূপ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রিক গড়ন হরেক রকমের হইতে পারে। আর্থিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যে আর্থিক ব্যবস্থার ফলমাত্র এইরূপ বিশ্বাস করা চলিতে পারে না। হব্‌হাউসের বইয়ে ৪০৩টা বিভিন্ন জাতির বা সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবৃত আছে। এই কাজে হব্‌হাউসের সহায়ক ছিলেন গিন্‌স্‌ব্যর্গ ইত্যাদি কয়েকজন সমাজশাস্ত্রী।

আর্থিক গড়নকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা :—(১) নিম্ন স্তরের শিকারী, (২) উচ্চ স্তরের শিকারী (৩) নিম্নতর স্তরের কৃষিজীবী, (৪) নিম্ন স্তরের পশুপালক (ক) উচ্চতম স্তরের কৃষিজীবী, (৬) উচ্চস্তরের পশুপালক, (৭) উচ্চতম স্তরের কৃষিজীবী। দেখা যায় যে, প্রায় সকল প্রকার শাসন-ব্যবস্থাই প্রত্যেক স্তরের আর্থিক গড়নের আবহাওয়ায় বিকাশ লাভ করিয়াছে। আবার প্রত্যেক শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গেই সকল প্রকার আর্থিক গড়নের যোগাযোগ দেখিতে পাই। বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও যোগাযোগগুলা এইরূপ বিচিত্র। বিবাহের নিয়মেও কোনো বাঁধাবাঁধি দেখিতে পাওয়া যায় না! শিকারী,

পশুপালক আর কৃষিজীবী তিন শ্রেণীর জাতির ভিতরই দুই প্রকার বংশ-ব্যবস্থা বিদ্যমান,—মাতৃধারায় বংশ আর পিতৃধারায় বংশ। মাতৃধারাকে অথবা পিতৃধারাকে কোনো বিশিষ্ট আর্থিক গড়নের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখা চলিবে না। প্রত্যেক শ্রেণীর সমাজেই বহুবিবাহ (বহুপত্নীপতিত্ব) প্রথাও দেখা যায় আবার একবিবাহ (একপত্নীপতিত্ব) প্রথাও দেখা যায়।

ইতালিয়ান নৃতত্ত্বসেবী মাৎসারেল্লা প্রণীত "স্তুদি দি এৎনলজিয়া জ্যুরিদিকা" (১৯০৩) গ্রন্থ হইতে নজির লইয়া সোরোকিন বুঝাইতেছেন যে, ঘরজামাই বা অন্যান্য পারিবারিক গড়নসমূহও আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেনা।

আদিম নরনারীর কথা ছাড়িয়া আধুনিক অর্থাৎ জটিলতর এবং "সভ্য"তর নরনারীর কথা ধরিলে দেখা যায় যে, ইতিহাসের বা সংস্কৃতির আর্থিক ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করা আরও অসম্ভব। এই বিষয়ে সোরোকিন জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রী সোম্বার্টের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন।

সোম্বার্ট তাঁহার "টেখ্‌নিক উণ্ড কুল্টুর" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, ধনোৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও কর্ম্মকৌশল পরিবর্ত্তিত হইল না অথচ সংস্কৃতি এবং সভ্যতা-ভব্যতা বিলকুল বদলাইয়া গেল,—এমন কি হয়ত লোপাট হইয়া গেল। অপর দিকে চীনের ক্রমবিকাশে দেখা যায় যে, চীনারা অনেক নতুন-নতুন যন্ত্রপাতি ও কর্ম্মকৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল অথচ তাহাদের জীবনযাত্রা, সভ্যতা-ভব্যতা, এক কথায় সস্কৃতি যে-কে সেই রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সংস্কৃতিকে যন্ত্রপাতির ফল বিবেচনা করা অযুক্তিসঙ্গত। জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতেছি যে, নানা ঠাঁইয়ে নানা যন্ত্রপাতি ও কর্ম্মকৌশল অথচ সংস্কৃতি এবং সমাজব্যবস্থা প্রায় একরূপ।

অপর দিকে সমাজ-ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির গড়ন বিভিন্ন অথচ ধনোৎপাদনের কর্ম্মকৌশলে এবং যন্ত্রপাতিতে প্রভেদ নাই। একই পুঁজিনিষ্ঠ কৃষিকর্ম্ম অথবা শিল্পবাণিজ্য কোথাও হয়ত চলিতেছে স্বাধীন মজুরের সাহায্যে, কোথাও হয়ত তাহার জন্য আবশ্যক হয় গোলামের দল। অর্থাৎ গোলামী কিম্বা স্বাধীন মজুরের ব্যবস্থাকে কোনো যন্ত্রপাতির ফল বিবেচনা করা চলিতে পারে না। আবার একই পুঁজিনিষ্ঠা নানা ঠাঁইয়ে বর্ত্তমান, কিন্তু কোথাও গণতন্ত্র আর কোথাও যথেচ্ছশাসনশীল রাজতন্ত্র। অপর দিকে প্রাচীন গ্রীসে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপে আর অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে তিন বিভিন্ন ঢঙের আর্থিক জীবন প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই তিন আর্থিক আবহাওয়ায় দর্শন গজিয়াছে কিরূপ? প্রায় একাকার—যথা প্লেটো, স্পিনোজা আর হেগেল।

মার্কিণ ঐতিহাসিক বিয়ার্ড্ তাঁহার "ইকনমিক ইণ্টারপ্রেটেশন অব দি কন্‌ষ্টিটিউশন অব দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্" (মার্কিণ শাসন-ব্যবস্থার আর্থিক ব্যাখ্যা) গ্রন্থে (১৯১৩) বলিয়াছেন যে, পয়সাওয়ালা জমিদার ও বেপারীরা প্রস্তাবিত শাসন-প্রণালীর স্বপক্ষে রায় দিয়াছিল আর তাহাদের বিপক্ষে ছিল চাষীরা অথবা অল্প বহরের জমির মালিকেরা। সোরোকিন এই আর্থিক ব্যাখ্যা খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন যে, চাষীদের ভিতরেও অনেকে প্রস্তাবিত শাসন-প্রণালীর স্বপক্ষে ছিল আর পুঁজিপতিদের ভিতরেও অনেকে ইহার বিরোধী ছিল।

কন্‌ফিউশিয়ান ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম,—সকল ধর্ম্মেই গরীব লোকও আছে, ধনী লোকও আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশেই দারিদ্র্যের যুগও গিয়াছে, সম্পদের যুগও গিয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মের

ক্রমবিকাশেই ধনোৎপাদনের আদিম কর্ম্মকৌশলও দেখা গিয়াছে আবার জটিলতর উন্নততর কর্ম্মকৌশলও দেখা গিয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশেই গোলাম এবং স্বাধীন মানুষ দুই-ই দেখা যায়। অপর দিকে সমান আর্থিক অবস্থার লোকেরাও ধর্ম্মহিসাবে বিভিন্ন, রীতিনীতি হিসাবে বিভিন্ন, জীবনের দর্শন হিসাবেও বিভিন্ন হইয়া থাকে। কাজেই ধর্ম্ম, দর্শন, রীতিনীতির উপর আর্থিক ব্যবস্থার একচেটিয়া প্রভাব দেখিতে বসা আহাম্মুকি।

এক-একটা দেশের বা জাতির উত্থান-পতন ঘটে কি-কি কারণে? কেহ-কেহ বলেন যে, সম্পদবৃদ্ধিতে চরিত্রহানি ঘটে এবং তাহার ফলে জাতকে জাত লোপাট হয়। আবার ঠিক উল্টা মতও আছে। অনেকে বলেন যে দারিদ্র্যই আধি-ব্যাধির জনক এবং শেষ পর্য্যন্ত দেশসুদ্ধু লোকের সর্ব্বনাশের কারণ। অর্থাৎ আথিক কারণের সঙ্গে জাতির উত্থান-পতন জড়াইয়া রাখা বিজ্ঞানসেবীদের দস্তুর। সোরোকিন বলিতেছেন যে, রোমাণ সাম্রাজ্য অনেকবার আর্থিক দুর্গতির ভিতর দিয়া চলিয়াছিল কিন্তু তবুও ঘাল হয় নাই। কিন্তু পশ্চিম রোমাণ সাম্রাজ্য খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তখন তাহার আথিক দুরবস্থা অসীম। অর্থাৎ আর্থিক অবনতিকে সর্ব্বদা জাতীয় পতনের কারণ বিবেচনা করা সম্ভব নয়। চরম দারিদ্র্যের অনেক যুগ চীনের উপর দিয়া গিয়াছে। কিন্তু চীনারা আজও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল না।

রুশ-মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী সিম্‌খোভিচ রোমাণ সাম্রাজের পতন সম্বন্ধে একটিমাত্র কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই কারণই এই পতনকাণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট। কারণটা জার্ম্মাণ পণ্ডিত মহলে প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সিমখোভিচ বলেন যে, জমির উৎপাদনী শক্তির

ক্ষয়প্রাপ্তি রোমাণ সাম্রাজ্য ধ্বংসের একমাত্র কারণ। রোমাণ নরনারীর চরিত্র, তাহাদের সু-কু, তাহাদের লোকহ্রাস, তাহাদের আর্থিক বিশৃঙ্খলা কিছুই এই ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল না। সোরোকিন বলিতেছেন যে, রোমাণ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই যে জমির উৎপাদনী শক্তি বিলকুল কমিয়া গিয়াছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য নয়। আর যদিও এই কথাটা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও সিম্‌খোভিচের যুক্তি টেঁকসই নয়। চীনদেশের জমি অনেকবার উৎপাদনী শক্তি হারাইয়া বসিয়াছে কিন্তু চীনা জাতি এখনো খাড়া আছে। ইয়োরোপের বহুদেশেই মধ্যযুগে অনেকবার দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া কোনো জাত বিলকুল উপিয়া যায় নাই। কাজেই জমির উৎপাদনী শক্তির ক্ষয়প্রাপ্তিকে রোমাণ সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এইরূপ নানা কর্ম্মক্ষেত্র ও চিন্তাক্ষেত্র হইতে তথ্য ও সংখ্যার জোরে সোরোকিন বুঝাইতেছেন যে, মানুষের জীবনে বোধ হয় এমন-কোনো অনুষ্ঠান নাই যাহার সঙ্গে আর্থিক শক্তির পুরাপূরি "কোরেলেশন" বা যোগাযোগ আবিষ্কার করা সম্ভব। অতএব জ্ঞানবিজ্ঞানের মুল্লুকে একটা তথাকথিত "আর্থিক ব্যাখ্যা"র রেওয়াজ বিলুপ্ত হওয়া উচিত।

সোরোকিনের বিচারে মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের সূত্রের ভিতর যেটুকু গ্রহণীয় তাহার সবই মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ও বলিয়াছেন। এই বিষয়ে মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের মৌলিকতা কিছুই নাই। এই সূত্রের ভিতর যেটুকু নতুন বা মৌলিক সেইটুক একদম যুক্তিসঙ্গত এবং টেঁকসই নয়।

মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের "আর্থিক ব্যাখ্যা" অদ্বৈতবাদের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এই অদ্বৈতবাদ যে যুক্তিহীন তাহা এঙ্গেলস্‌-প্রণীত গ্রন্থের বাংলা

তর্জ্জমার ভূমিকায় বর্ত্তমান লেখক কর্তৃক স্পষ্টাস্পষ্টি বলিয়া দেওয়া আছে। তর্জ্জমার নাম "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (১৯২৬)।

সমাজসেবার অর্থশাস্ত্রী পেথিক-লরেন্স, পিগু ও হব্‌সন

পুঁজির উপর কর বসাইবার আন্দোলনটা বিলাতে লড়াইয়ের পর প্রবল আকার ধারণ করে। "ক্যাপিট্যাল লেভি" নামে এই ব্যবস্থা সুপরিচিত। ১৯১৮ সনে পেথিক-লরেন্সের "এ লেভি অন্ ক্যাপিট্যাল" বাহির হয়। তাঁহার মোটা কথা নিম্নরূপ :—"লড়াইয়ের যুগে ধনী লোকেরা বিনা বিশেষ মেহনতে নিজনিজ সম্পদ্ অতি মাত্রায় বাড়াইতে পারিয়াছেন। গোটা দেশের সম্মুখে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল সেই সমুদয় সমস্যা উপস্থিত না হইলে তাঁহাদের সম্পদ বাড়াইবার সুযোগ সৃষ্ট হইত না। কাজেই আজ যদি দেশের লোক তাঁহাদের এই বাড়্তির কিছু হিস্যা অথবা এমন কি সমস্তটা দেশের হাতে দিতে বলে তাহা হইলে তাঁহাদের ইহাতে আপত্তি করা উচিত হইবে না।" অনেকের ধারণা এই যে, পুঁজিপতিরা বুঝি বৎসর-বৎসর অতিমাত্রায় কর দিতে বাধ্য হইবে। পেথিক-লরেন্স বলিতেছেন,—"কাণ্ড অত গুরুতর নয়। করটা মাত্র একবার আদায় করা হইবে। এই আদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিবে সরকারী ঋণ-শোধ। এই ঋণের পরিমাণ ৬,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। পুঁজি-পতিদের নিকট হইতে এত বড় একটা কর তুলিলে দেশের ভিতরকার ছোটখাটো অনেক কর লোপ করা যাইতে পারিবে।"

এই সম্বন্ধে মোডেন ১৯২০ সনে "লেবার অ্যাণ্ড ন্যাশন্যাল ফিনান্স" (মজুরদল ও সরকারী রাজস্ব) কেতাবে বলিতেছেন :—"পুঁজির উপর কর স্থায়ী কর হইবে না। এইরূপ করকে স্থায়ী করিলে পুঁজি

জমা করিবার প্রবৃত্তি কমিয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু বণিক্-শিল্পীরা সর্ব্বদা উদ্বেগে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে।” অনেকে সন্দেহ করে যে, বুঝি বা একমাত্র শিল্পকারখানার মালিকদের উপর পুঁজি-কর চাপানো হইবে। স্নোডেন বুঝাইয়া বলিতেছেন যে, এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয়। যতপ্রকার পুঁজি আছে,—জমিজমা, খনি, বাড়ীঘর, কোম্পানীর কাগজ, অলঙ্কার, ছবি ইত্যাদি—সব-কিছুই এই লেভির অন্তর্গত।

দেশের ধনসম্পদ পরিমাণে কতখানি ইহাই পিগুর অর্থশাস্ত্রে আসল কথা নয়। আসল কথা,—ধনসম্পদের বিতরণ বা বণ্টন কোন্ প্রণালীতে সাধিত হইতেছে। এই বণ্টনকে দেশের মঙ্গলসাধনের উপায়স্বরূপ গড়িয়া তুলিবার জন্য পিগু সরকারী হস্তক্ষেপ, সাহায্য ও শাসনের পক্ষপাতী। ১৯২৭ সনে প্রকাশিত “ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ফ্লাক্‌চুয়েশন্‌স্” (শিল্প-তুনিয়ায় তেজী-মন্দা বা সঙ্কোচ-প্রসার) গ্রন্থে পিগু বলিতেছেন যে, লোকেরা স্বাধীনভাবে এই তুর্য্যোগ নিবারণের পথ মাড়াইতে রাজি হইবে কি না সন্দেহ। পথ অনেকটা সোজা। *যে-সকল জিনিষপত্র গৃহস্থদের কাজে লাগে সেই সব এক সময়ে একসঙ্গে* না কিনিয়া নানা সময়ে নানা অবস্থায় কিনিবার ব্যবস্থা করা হইল তেজীমন্দাকে তাঁবে আনিবার কর্ম্মকৌশল। গৃহস্থরা যখন এই কর্ম্মকৌশল আপনাআপনি কাজে লাগাইবে না তখন গবর্মেণ্টের পক্ষে এই দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। গবর্মেণ্টের দপ্তরগুলা বহুবিধ ও বিচিত্র রকমের। এই সমুদয়ের চাহিদাও বহুবিধ আর বিচিত্র রকমের। কাজেই বাজারে যখন জিনিষপত্রের কেনাবেচা কম অর্থাৎ মন্দা চলিতেছে সেই সময়ে যদি গবর্মেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ হইতে বাজারে মাল কিনিবার হুকুম আসে তাহা হইলে মন্দা কাটিয়া যাইতে

পারে। কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট মাসে বা সপ্তাহে সরকারী দপ্তরগুলাকে মাল কিনিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কাজেই মন্দার সময়ে যদি গবর্মেণ্টের চাহিদাগুলা বাজারে আসিয়া হাজির হয় তাহা হইলে বণিকশিল্পীরা মজুর খাটাইবার কাজে লিপ্ত থাকিতে পারে। বেকার-সমস্যা নিবারণে গবর্মেণ্টের এইরূপ সাহায্য-আশা করা যায়।

লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে,—"একালে", জন হব্‌সনের "ইকনমিক্‌স্ অব আন্-এম্‌প্লয়মেণ্ট" (বেকার-সমস্যার অর্থশাস্ত্র) বাহির হইয়াছিল (১৯২২)। এই বইয়ের সঙ্গে সুরের যোগ আছে তাঁহার ১৯০৯ সনে প্রকাশিত "ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল সিষ্টেম" (শিল্প-ব্যবস্থা) বইয়ের। বস্তুতঃ হব্‌সনের প্রাণের কথা পাওয়া যায় আরও পুরাণা বইয়ে। সেইটার নাম "ইকননিক্‌স্ অব ডিষ্ট্রিবিউশন" (ধন-বিতরণের অর্থশাস্ত্র)। সে ১৯০০ সনের কথা।

ক্লাসিক-পন্থীদের,—রিকার্ডো-মিল-মার্শ্যালের, চিন্তপ্রণালীতে আর্থিক লেনদেন স্বাধীন টক্করের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জন হব্‌সন বলিতেছেন যে, টক্কর অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন নয়। টক্কর হামেশাই বাধা পাইয়া থাকে। এই অ-স্বাধীনতাগুলা, এই বাধাগুলা ধনদৌলতের উৎপাদন-বিতরণে এত বেশী যে, এই সমুদয়কে মামুলি ব্যতিরেক হিসাবে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

টক্কর যদি পূরাপূরি স্বাধীন হইত তাহা হইলে মজুরদের কষ্টের সীমা থাকিত না। মজুরেরা সাধারণতঃ দলে পুরু। টক্করের দরুণ তাহাদের মজুরির হার কমিতে বাধ্য থাকিত। কিন্তু মজুরেরা দলবদ্ধভাবে দর কষাকষি করিতে পারে বলিয়া টক্করের "কু"টা কথঞ্চিৎ নিবারিত হয়।

হব্‌সনের বিচারে প্রত্যেক আয়ের তিনটা করিয়া হিস্যা থাকে।

প্রথম হিস্সা যায় কর্ম্মশক্তিকে বজায় রাখিবার জন্য। দ্বিতীয় হিস্সা কর্ম্মশক্তি বজায় রাখার "অতিরিক্ত।" এই উদ্বর্ত্তের সাহায্যে কর্ম্মশক্তির বিকাশ সাধিত হয়। তৃতীয় হিস্সা এই উদ্বর্ত্তেরও অতিরিক্ত অংশ। এই অতিরিক্ত অংশ বা উদ্বর্ত্ত লইয়াই শ্রেণীবিবাদ উপস্থিত হয়। মজুর ছাড়া সমাজের অন্যান্য সকলে উদ্বর্ত্তটাকে নিজ তাঁবে রাখিতে আর নিজ মতলবমাফিক কাজে লাগাইতে সমর্থ। কাজেই মজুরদের স্বার্থে উদ্বর্ত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্র বা সুযোগ কম। বড় বড় কোম্পানীগুলা সহজেই বাজার দখল করিয়া বসে। কাজেই উদ্বর্ত্তের হিস্সা তাহাদের তাঁবেই যায় বেশী। মজুরদের কপালে উদ্বর্ত্ত ত জুটেই না। এমন কি কর্ম্মশক্তি বজায় রাখার হিস্সাই অনেক সময়ে জুটে না।

উদ্বৃত্ত কতকগুলা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর তাঁবে গিয়া জড় হইতে থাকে। এইসকল লোক জমার বাড়্তির সঙ্গে-সঙ্গে খর্চ্চা বাড়াইতে অভ্যস্ত নয়। উদ্বর্ত্তকে যখের মতন ধরিয়া রাখা তাহাদের দস্তুর। অর্থাৎ ধনদৌলতের সদ্ব্যবহার আটক থাকে। পুঁজি বাড়িয়া চলে। হরেক কারবারে পুঁজির পর পুঁজি আসিয়া জুটে। মাল উৎপন্ন হয় বেশী বেশী। কিন্তু বাজারে নাই লোকজনের ক্রয়শক্তি। খরিদদারের অভাব যৎপরোনাস্তি। "অতি-উৎপাদনের" অপর পিঠ হইল 'দুর্য্যোগের' সৃষ্টি বা 'চক্রের' সূত্রপাত।

হব্সনের রাজস্ববিষয়ক বই ১৯১৯ সনে লড়াইয়ের পর বাহির হইয়াছে। বইটার নাম "ট্যাক্সেশন ইন দি নিউ ষ্টেট" (নয়া রাষ্ট্রের কর-ব্যবস্থা)। কর বহন করিবার শক্তি আছে কোন্-কোন্ আয়ের? এই প্রশ্নের জবাবে হব্সন বলিতেছেন,—"অতিরিক্ত আয়ের বা উদ্বর্ত্তের।" যে সকল আয় কর্ম্মশক্তি বজায় রাখিবার জন্য অথবা

কর্ম্মশক্তি বাড়াইবার জন্য আবশ্যক হয় না সেই সকল আয়কে অতিরিক্ত বা উদ্বর্ত্ত বলা হয়। জমির খাজনা "অতিরিক্ত" আয়ের অন্তর্গত। পুঁজির সুদ, মগজ বা পুঁজি ব্যবহারের ফল স্বরূপ লভ্যাংশ ইত্যাদি আয়ও অতিরিক্ত আয়ের অন্তর্গত। এই সকল আয় না থাকিলেও কর্ম্মশক্তি বজায় রাখা অথবা বাড়ানো সম্ভব। কাজেই এই সমুদয় আয় গবর্মেণ্টের কব্জায় আসা উচিত।

আয়-শাস্ত্রী বোলে

ইংরেজ সংখ্যাশাস্ত্রী আর্থার বোলে ১৯২৭ সনে জোসাইয়া ষ্ট্যাম্পের সঙ্গে একত্রে ইংরেজ নরনারীর "জাতিগত" আয়ের বহর জরীপ করিয়াছেন। বইটার নাম "ন্যাশন্যাল ইন্‌কাম ১৯২৪"। দেশ সুদ্ধু লোকের আয় বা "জাতিগত" আয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষে গবেষণা অতি অল্পই হইয়াছে। বিশেষ কথা,—বাঙালী অর্থশাস্ত্রীর মেজাজ বোধ হয় এই কোঠে একদম খেলে নাই। এই সম্বন্ধে ১৯৩১ সনে বর্ত্তমান লেখকের এক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রস্তাবমাফিক কাজ সুরু হইতে পারে নাই। বহুসংখ্যক জনপদ ও পেশা হইতে অনেকগুলা সংখ্যা সংগ্রহ করিতে না পারিলে এই কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ সংগ্রহ অনেক লোকের সমবেত মেহনতের উপর নির্ভর করে। অধিকন্তু বলা বাহুল্য লোকজন বাহাল করিতে রূপচাঁদের দরকারও হয় বিস্তর। কাজেই উল্লেখযোগ্যরূপে জাতিগত আয়ের বহর জরীপ করা মুখের কথা নয়।

নানা প্রণালীতে জাতিগত আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। আর্থার বোলে কর্ত্তৃক ব্যবহৃত প্রণালীর নমুনা দেখাইতেছি। "আয়" বলিলে সম্পত্তি, পুঁজি, মূলধন ইত্যাদি বুঝিতে হইবে না।

সম্পত্তি, পুঁজি ইত্যাদি খাটাইলে তাহা হইতে ফি বৎসর যে ফল পাওয়া যায় তাহার নাম আয়। বুঝিতে হইবে যে, জাতিগত "আয়" ("ইনকাম্") আর জাতিগত সম্পদ্ ("ওয়েল্‌থ্") দুই বিভিন্ন বস্তু। আর একটা কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। ফি বৎসর সম্পদ্ খাটাইবার সময় কিছু-কিছু ফল দেশের বাহিরেও চলিয়া যায়। যতটুকু ফল দেশের ভিতর থাকে তাহাই হইল দেশ সুদ্ধু লোকের আয় বা জাতিগত আয়। কাজেই কোন্ কোন্ ফল বা আয় দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে তাহার হিসাব রাখা চাই। সেই সব অংশ বাদে যাহা বাকি থাকে তাহার পরিমাণ ঠাওরানোই জাতিগত আয়ের বহর জরীপ করার আসল কথা। অর্থাৎ মোটের উপর যোগবিয়োগের মামলা।

বোলের হিসাবে জাতিগত আয়ের যোগ-বিয়োগ নিম্নরূপ :—

জাতিগত আয়

= (১। মজুরি + ২। বেতন + ৩। ভাড়া + ৪। মুনাফা + ৫। সুদ)

— খ (বিদেশে মালিকদের নিকট রপ্তানি)

+ গ (*বিদেশ হইতে পুঁজি খাটাইবার আয় আমদানি*)

— ঘ (যে সকল মুনাফা আইনসঙ্গত মালিকদের ভিতর বিতরিত হয় নাই অথচ হইবার কথা)

— ঙ (লড়াইয়ের কর্জ্জের উপর সুদ)।

এই গেল বোলে ব্যবহৃত সাধারণ ফর্মুলা বা সূত্র।

তাহার পর আয়গুলা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া বাহির করা হইয়াছে। আয় বাহির করা সকল দেশেই মাথা-ফাটাফাটির কাণ্ড। বিলাতে একটা সুবিধা আছে। আয়কর বিষয়ক সরকারী তথ্য প্রচুর পাওয়া যায়।

ঐ দেশে আয়কর যাহারা দেয় তাহাদের সংখ্যা আর আয় দুইই বহরে অপেক্ষাকৃত বড়। কিন্তু আয়কর দেয় না এমন লোকের সংখ্যাও খুব বেশী। বলা বাহুল্য জাতিগত আয়ের পরিমাণ কষিবার জন্য আয়কর বিষয়ক অঙ্ক ও তথ্যের উপর নির্ভর করাই উৎকৃষ্ট পথ। কিন্তু আয়করের চৌহদ্দির বহির্ভূত নরনারীর আয় বাহির করাও আবশ্যক। কাজেই বেশী আয়ের লোকজন সম্বন্ধে আয়-কর বিষয়ক সংখ্যার সাহায্য লওয়া বোলের দস্তুর। আর আয়করের বহির্ভূত লোকজনের আয় সম্বন্ধে বোলে প্রত্যেক পেশারই ভিতরকার প্রত্যেক উপার্জ্জনকারীর আয় রগ্‌ড়াইয়া রগ্‌ড়াইয়া বাহির করিতে অভ্যস্ত।

আসল কথা,---অধিকাংশ দেশেই আয়কর বিষয়ক সংখ্যা পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণি বিলাত আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র,—এই তিন দেশে আয়কর বিষয়ক সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু অন্যান্য দেশ এই সংখ্যা সম্বন্ধে দরিদ্র। এ হিসাবে ফ্রান্স নেহাৎ কানা। কাজেই ফ্রান্সের মত দেশে,—প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় সকল দেশেই, প্রত্যেক পেশার ভিতরকার উপার্জ্জনকারী প্রত্যেক লোকের আয় খুঁটিয়া-খুঁটিয়া বাহির করাই দস্তুর।

তাহা ছাড়া আর এক প্রকার কায়দাও আছে। দেশের ভিতর ধনদৌলত উৎপন্ন হয় কত তাহা জরীপ করিয়া দেশের জাতিগত আয় বাহির করাও চলিতে পারে। মার্কিণ মুল্লুকে এই কায়দাও প্রচলিত।

যাহা হউক, এইবার বোলে ও ষ্ট্যাম্প প্রণীত ১৯২৭ সনের গ্রন্থ খুলিয়া ধরিতেছি। তাহার ভিতর মোটা মোটা চার শ্রেণীতে আয়গুলা সাজানো হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপ :—

১। আয়কর দিতে বাধ্য যে সকল আয়।

২। "মাঝারি" আয়। (১) আয়কর দিতে বাধ্য নয় যে সকল

আয় (অর্থাৎ বার্ষিক ১৫০ পাউণ্ড বা প্রায় ২০০০ টাকার কম) (২) আবার যে সকল আয়কে "মজুরির" অন্তর্গত করা হয় না সেই সকল আয় পারিভাষিক হিসাবে "মাঝারি" আয়ের অন্তর্গত।

মাঝারি আয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(ক) বেতন।

(খ) মালিক বা নিয়োগকর্ত্তার আয়।

(গ) স্বাধীন জীবিকা হইতে আয়।

পেশা হিসাবে এই তিন শ্রেণীর মাঝারি আয় নিম্নলিখিত দশ বর্গে ভাগ করা হইয়াছে।

(১) চাষ ও মাছ ধরা (২) শিল্প, (৩) বাণিজ্য, (৪) "মস্তিষ্ক-জীবীর" কার্য্য, (৫) পল্টনের কাজ, (৬) যান বাহান, (৭) কেন্দ্র গবর্মেণ্ট, (৮) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, (ক) শিক্ষা বিভাগ, (খ) অন্যান্য, (৯) পারিবারিক কাজ (১০) বিবিধ।

৩। মজুরি। এই আয়ের বহর মাপিবার জন্য নিম্নলিখিত কারবারের হিসাব করা হইয়াছে :—(১) কয়লা, (২) অন্যান্য খাদের কাজ, (৩) লোহা আর অন্যান্য ধাতু, (৪) তুলা, (৫) পশম, (৬) রঞ্জন, (৭) অন্যান্য বয়নশিল্প, (৮) চীনামাটি, (৯) জুতা, (১০) পোষাক, (১১) চামড়া, (১২) খাদ্যদ্রব্য, (১৩) কাগজ, (১৪) ছাপাখানা, (১৫) কাঠ, (১৬) ঘরবাড়ী তৈয়ারি, (১৭) অন্যান্য শিল্পকর্ম্ম, (১৮) চাষ, (১৯) যানবাহান, (২০) সার্ব্বজনীন সুযোগ সৃষ্টি (জল গ্যাস বিজলী ইত্যাদির কারবার), (২১) দাসদাসীর কাজ, (২২) অন্যান্য কারবার।

(৪)। অন্যান্য আয়

(ক) লড়াইয়ের পেন্‌শ্যন

(খ) বুড়ো বয়সের পেন্‌শ্যন

(গ) সমাজ-বীমা ভাণ্ডারে নিয়োগকর্ত্তাদের দেওয়া চাঁদার হিস্যা।

এই চার দফা আয়ের মোট হইতে কতকগুলা খরচ বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই খরচ-বর্গের ভিতর পরে তিন প্রকার দেনা :—

(ক) বিদেশী মালিকদের আয়

(খ) লড়াইয়ের ঋণ বাবদ মার্কিণ মুল্লুককে দেয় টাকা। কিন্তু জার্ম্মাণির নিকট হইতে লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্য টাকা জমার হিসাবে দেখানো হইয়াছে। কাজেই ঋণ বাবদ দেয় টাকার পরিমাণ মোটের উপর কম দাঁড়াইয়াছে।

(গ) দক্ষিণ আয়ল্যাণ্ডকে দেয় টাকা।

জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কশাস্ত্রী হেল্‌ফেরিখ ১৯১৪ সনে "ডয়েচলাণ্ডস্ ফোল্কস্-ভোল্‌ষ্টাণ্ড ১৮৮৮-১৯১৩' গ্রন্থে ১৮৮৮ হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির "সম্পদ্" জরীপ করিয়াছিলেন। তাহাতে আয়কর বিষয়ক সংখ্যা-দপ্তরের তথ্য ও অঙ্কগুলা ব্যবহার করিয়া দেশসুদ্ধু লোকের "আয়" দেখানো হইয়াছিল।

১৯১৬ সনে ম্যকিণ সংখ্যাশাস্ত্রী কিং "ওয়েল্‌থ্ অ্যাণ্ড ইনকম অব দি পীপ্‌ল্ অব দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্" গ্রন্থে মার্কিণ নরনারীর সম্পদ ও আয় জরীপ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্লেষণে ধনোৎপাদনের তথ্য ও অঙ্ক প্রধান বা একমাত্র প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালী বিশদ ও সুস্পষ্ট। নিউইয়র্কে "ন্যাশন্যাল বিউরো অব ইকনমিক রিসার্চ্চ" নামক ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের তদ্‌বিরে এই বই বাহির হইয়াছে। চক্রশাস্ত্রী ওয়েজ্‌লি মিচেল এই পরিষদের পরিচালক।

ফরাসী অর্থশাস্ত্রী পুপ্যাঁ ১৯১৬ সনে "লা রিশেস্ দ্য লা ফ্রাঁস দেভাঁ লা গেয়ার" গ্রন্থে লড়াইয়ের মুখোমুখি ফরাসী জাতির সম্পদ্

জরীপ করেন। পুপ্যা-পরিচালিত জরীপের যন্ত্র ছিল পেশামাফিক উপার্জ্জনকারীদের আয়।

দেখা যাইতেছে যে, ফ্রান্সে, আমেরিকায় আর জার্ম্মাণিতে তিন ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। বোলে-ষ্ট্যাম্পের প্রণালীতে আছে খানিকটা জার্ম্মাণ কায়দা আর খানিকটা ফরাসী কায়দা। "বৃটিশ সেন্সাস অব প্রোডাকশন ১৯০৭" নামে বৃটিশ গবর্মেণ্টের তদবিরে একটা জরীপ চালানো হইয়াছিল। তাহাতে মার্কিণ রীতি দেখিতে পাই। অর্থাৎ ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী আর সরকারী মহলে সকল প্রকার কায়দাই কায়েম হইয়াছে।

ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী মুল্হাল ১৮৯৬ সনে "ইণ্ডাষ্ট্রীজ অ্যাণ্ড ওয়েল্থ্ অব নেশ্যন্স্" (দেশবিদেশের শিল্পবাণিজ্য ও সম্পদ) গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে "ফরাসী কায়দা" ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। অর্থাৎ প্রত্যেক পেশার অন্তর্গত নরনারীর আয় খুঁটিয়া-খুঁটিয়া বাহির করা হইয়াছে। ১৯১৬ সনে জোসাইয়া ষ্ট্যাম্প "বৃটিশ ইন্কম্স্ অ্যাণ্ড প্রপার্টি" বইয়ে ইংরেজ জাতির আয় ও সম্পত্তি বিশ্লেষণ করেন। তাহাতে ১৯২৭ সনে বোলে-ষ্ট্যাম্প কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত জার্ম্মাণ-ফরাসী প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯১৪ সনে ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী কিওজা ম্যানি "দি নেশ্যন্স্ ওয়েল্থ্" (দেশের সম্পদ) গ্রন্থ বাহির করেন। তাহাতে খানিকটা আয়কর আর খানিকটা পেশার ভিতরকার উপার্জ্জনকারীদের আয় এই দুই তরফের প্রমাণ লওয়া হইয়াছিল।

বোলে সংখ্যাশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা-কিছু লিখিয়াছেন সেই সব টেক্স্ট্ বুক হিসাবে ভারতে সুপরিচিত। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের নানা কোঠে তিনি পায়চারি করিতে অভ্যস্ত। এই কথাটাও জানা আবশ্যক। আর সর্ব্বত্রই তাঁহার আলোচনায় সংখ্যার প্রয়োগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। ১৯০০ সনে বাহির হয় উনবিংশ শতাব্দীর বিলাতী মজুরি বিষয়ক বই। উনবিংশ শতাব্দীর বিলাতী বহির্ব্বাণিজ্য বিষয়ক বই তিনি ১৯০৫ সনে প্রকাশ করেন। জনগণের আয় সম্বন্ধে তাঁহার একাধিক রচনা আছে। ১৯২৫ সনে তাঁহার "হ্যাজ পভার্টি ডিমিনিশ্‌ড্‌?" (দারিদ্র্য কমিয়াছে কি?) বাহির হয়। ১৯৩০ সনে প্রকাশিত হইয়াছে "স্তম্‌ ইকনমিক কন্‌সিকোয়েন্সেজ অব দি ওয়ার" নামে মহালড়াইয়ের আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব বিষয়ক গ্রন্থ। বইটা ছোট। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে সংখ্যপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে রচনাটা অতি উপাদেয়।

সরকারী কর্জ্জ সম্বন্ধে বোলে বলিতেছেন যে, ইহার সুদ শুধিবার জন্য গবর্মেণ্ট লোকজনের উপর নতুন কর বসাইতে বাধ্য। কিন্তু এই নতুন কর দেয় কাহারা? পয়সাওয়ালা লোকেরা। অপর দিকে সরকারী কর্জ্জ পাওয়া গিয়াছে কাহাদের নিকট হইতে? এমন কি যাহারা মধ্যবিত্ত তাহারাও গবর্মেণ্টকে কর্জ্জ দিয়াছে। অর্থাৎ গবর্মেণ্ট যদি সরকারী দেনা শুধিতে অরাজি হয় তাহা হইলে অনেক মধ্যবিত্ত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সুতরাং সরকারী কর্জ্জনীতির ফলে শেষ পর্য্যন্ত বড় লোকেরা মধ্যবিত্তদের সেবকে পরিণত হয়। লড়াইয়ের প্রভাবে ধনীরা নানা পরোক্ষ উপায়ে আইনতঃ সমাজ সেবা করিতে বাধ্য হইতেছে।

"একালের" জন্য সাপ্তাহিক ৪০ শিলিঙকে বোলে দারিদ্র্যের সীমানা সমঝিতে অভ্যস্ত। বোলে দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজ সমাজে ১৯১৩ সনের যুগে হপ্তায় ৪০ শিলিঙের কম আয় ছিল বহুসংখ্যক পরিবারের। পরিবার বলিলে পাঁচমুখী বা "পঞ্চানন" প্রতিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। আর "একালে",—অর্থাৎ ১৯২৪ সনের যুগে,—ইংরেজ সমাজে ৪০

শিলিঙের কম সাপ্তাহিক আয়ওয়ালা পরিবার একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। তবে লণ্ডনের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। তবুও ৪০ শিলিঙের উপরেই লণ্ডনবাসী পরিবারগুলার অবস্থান।

"একালে" ধনী লোকেরা চড়া হারে মামুলি আয়কর দিতে বাধ্য হইতেছে। অধিকন্তু *"সুপার-ট্যাক্স্"* নামক "অতিরিক্ত" আয়করও তাহাদের উপর চাপানো হইয়াছে। আর এই অতিরিক্ত আয়-করের হারও চড়া। এই দুই প্রকার আয়করের হার চড়া শুধু নয়। আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আয়করের হারও বাড়্তির পথে চলিয়াছে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, পয়সাওয়ালা লোকেরা গবর্মেণ্টকে বেশী-বেশী কর দিয়া প্রকারান্তরে নিজ-নিজ ধনদৌলত দেশের স্বার্থে খরচ করিতে বাধ্য হইতেছে। কাজেই গরীব লোকেরা "পরের ধনে পোদ্দারি" করিবার সুযোগ পাইতেছে। বুঝিতে হইবে যে, অতি-ধনীদের আতিশয্য খানিকটা খর্ব্ব হইতেছে আর গরীবদের দারিদ্র্যও খানিকটা ঘাটতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রকারান্তরে আপেক্ষিকভাবে আর্থিক সমতা দাঁড়াইয়া যাইতেছে। বোলের মতে যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে ধনদৌলত বিষয়ক বৈষম্যের আংশিক লোপ-সাধন বিলাতী সমাজের একটা মস্ত কথা।

"একালে" মধ্যবিত্ত নরনারীর আয় অপেক্ষা খরচ কম। ইহা আর্থিক উন্নতির লক্ষণ সন্দেহ নাই। কর্ম্মকুশল মজুরদের "আসল" মজুরি সেকালের তুলনায় "একালে" বেশী কিনা সন্দেহ। কিন্তু "মামুলি" মজুরদের আসল মজুরি একালে খুব বেশী বাড়িয়াছে। "আসল" মজুরি শব্দে বুঝিতে হইবে মুদ্রায় প্রাপ্ত মজুরির ক্রয়শক্তি। অর্থাৎ "একালে" যে মজুরি পাওয়া যাইতেছে তাহা দিয়া কর্ম্মকুশলদের চেয়ে মামুলি মজুরেরা আপেক্ষিক ভাবে বেশী-বেশী মাল কিনিতে সমর্থ। যুদ্ধের পূর্ব্ব-

বর্ত্তী যুগে কর্ম্মকুশলেরা নিজ মজুরি দিয়া যত জিনিষ-পত্র খরিদ করিতে পারিত একালে তাহার চেয়ে বেশী খরিদ করিতে পারে সত্য ; কিন্তু এই বেশীর মাত্রা কম। অপর দিকে মামুলি মজুরেরা সেকালের তুলনায় একালে খুব বেশী জিনিষপত্র কিনিতে পারিতেছে। লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগ মামুলি মজুরদের পক্ষে স্বর্ণ যুগ। এই তথ্য সামাজিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। মামুলি মজুরেরা একালে এত বেশী "আসল" মজুরি ভোগ করিতেছে কেন ? এই প্রশ্নের জবাবে বোলে বলিতেছেন যে, বিলাতে আজকাল ট্রেড ইউনিয়ন বা মজুর সমিতিগুলা যারপর নাই ক্ষমতাশালী। মজুর-মাত্রের জন্য স্বচ্ছন্দ জীবনধারণোপযোগী মজুরি দাবী করা তাহাদের পক্ষে অ-আ-ক-খ বিশেষ। দ্বিতীয়তঃ বেকার-বীমার আইনে মজুরেরা কর্ম্মহীন হইবা মাত্র ভাতা পাইয়া থাকে। যাহারা ভাতা পায় তাহারা যখন-তখন শীঘ্র-শীঘ্র নকরি ঢুঁড়িতে প্রবৃত্ত হয় না। অনেক দিন ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া লোকেরা মজুরির হার যথাসম্ভব বাড়াইতে চেষ্টা করিতে পারে। আর এক কথা, একালে যন্ত্রপাতির রেওয়াজ খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। কলকব্জার সাহায্যে যে-কোনো মজুর আজকাল ভাল-ভাল কাজ দেখাইতে সমর্থ। নেহাৎ "ম্যাড়াকান্ত" যে মজুর আর মহাদিগ্‌গজ ওস্তাদ যে মজুর তাহাদের দুই জনে একালে যেন ফারাক ঢুঁড়িয়াই পাওয়া যায় না বলা চলে। ঠিক যেন মুড়ি-মুড়কির দর সমান হইয়া গিয়াছে বলিতে পারি। কাজেই মজুরির বাজারে নিয়োগকর্ত্তারা তথাকথিত কর্ম্মকুশল মজুরদেরকে বেশী হারে মজুরি দিতে রাজি নয়। ফলতঃ মামুলিরা যে-মজুরি পায় সেই হার বেশ সন্তোষজনক দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বোলের এই আলোচনায় একটা মজার কথা বাহির হইয়া

পড়িয়াছে। দুনিয়া সুদ্ধ লোকের ধারণা ছিল এই যে, কর্ম্মদক্ষতা, কর্ম্মকৌশল ইত্যাদি গুণ মজুরদের, কেরাণীদের বা অন্যান্য কর্ম্মীদের ব্যক্তিগত গুণ। এখন বুঝা যাইতেছে যে, লোকগুলা নিজ হাতপার জোরে আর মাথার জোরে ওস্তাদ কি আহম্মুক তাহাতে বড়-কিছু আসে যায় না। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদির উৎকর্ষের উপরই মজুরদের কাজের পরিমাণ, কাজের উৎকর্ষ ইত্যাদি বস্তু নির্ভর করে। অর্থাৎ কর্ম্মদক্ষতা, "এফিশ্যেন্সি" ইত্যাদি শব্দে ব্যক্তির বহির্ভূত যন্ত্রপাতি, পুঁজির বহর ইত্যাদি বস্তুর প্রভাবও দেখিতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় মজুর-কেরাণী-কর্ম্মচারীদের উপর যদি মাথা-পিছু বেশী পুঁজি খরচ করা যায় আর চোস্ত-চোস্ত লোহা-লক্কড়, কলকব্জা ইত্যাদি ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ম্ম-দক্ষতা অর্থাৎ মাথাপিছু কাজের পরিমাণ বেশ উঁচুদরের মালুম হইতে পারিবে। এমন কি, লেখাপড়ার কোঠে তাহারা বাড়তির পথে যাউক বা না যাউক, চরিত্রবত্তার মাপে তাহারা উন্নত হউক বা না হউক, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির সুযোগ প্রচুর পরিমাণে পাইলেই ভারতীয় নর-নারী উচ্চ অঙ্গের কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়া ছাড়িতে সমর্থ। এইরূপ চিন্তা করিতে শিখিলেই ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীরা যুক্তিসঙ্গত বিচারের অধিকারী হইতে পারিবেন।

উদারীকৃত পুঁজিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রী কেইন্‌স্

ধনবিজ্ঞানে "স্বাধীনতা" শব্দ একটা বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না থাকিলেই অবস্থাটাকে স্বাধীন অবস্থা বলা হইয়া থাকে। ফরাসী পারিভাষিকে ইহার নাম "লেস্‌সে-ফেয়ার" (অর্থাৎ কর্‌তে দাও, হ'তে দাও বা যেতে দাও ইত্যাদি)।

ইংরেজিতে ফরাসীর তর্জ্জমা "লেট্-অ্যালোন" (ঘাঁটাঘাঁটি করোনা, যা চল্‌ছে চলুক)।

ইংরেজ পণ্ডিত জন মেনার্ড কেইন্‌স্ ৫৪ পৃষ্ঠায় একখানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। নাম তাহার "স্বাধীনতার অবসান" (দি এণ্ড্ অব লেস্‌সে-ফেয়ার)। প্রকাশক লণ্ডনের হোগার্থ প্রেস। ইংরেজি ধনবিজ্ঞানের সাহিত্যে সেকালের রিকার্ডো খুব প্রচুর পরিমাণে আর একালের মার্শ্যাল কিছু-কিছু,—উভয়েই কটমট রচনাপ্রণালী চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেইন্‌সের রচনা ঝরঝরে ও প্রাঞ্জল। কোনো-কোনো বিষয়ে বেজহটের লিপিচাতুর্য্য কেইন্‌সের প্রবন্ধ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও এই সদগুণ বর্ত্তমান।

বিলাতী সমাজ-সাহিত্যে "স্বাধীনতা"-তত্ত্বের ধারা খুবই প্রবল। রাষ্ট্রের একতিয়ার হইতে ব্যক্তিকে মুক্তিপ্রদান করার কথা দার্শনিক লক এবং হিউম প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে বেন্থাম এই মতের প্রচারক। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার-প্রবর্ত্তিত সমাজ-বিজ্ঞান এই মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সকল দার্শনিক আবহাওয়ায়ই আর্থিক কাণ্ডেও স্বাধীনতার তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। "নিজ নিজ স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্য ক্রেতারা, বিক্রেতারা, মজুরেরা, মালিকেরা, যাহা-কিছু করিতেছে তাহাতেই প্রত্যেকের লাভ হইতেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের বা সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হইতেছে ;—অতএব মানুষের আর্থিক লেন-দেনে, টাকাকড়ির কারবারে গবর্মেণ্টের কোনো কানুন জারি বা শাসন কায়েম করিবার প্রয়োজন নাই,"—এই উপদেশ ধনবিজ্ঞানের প্রায় সকল বিলাতী অধ্যাপকই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

কেইন্‌স্ কোনো-কোনো ইংরেজ বিজ্ঞানবীরের রচনায় এই মতের স্বপক্ষে বেশী কিছু পান নাই। ফরাসী পণ্ডিত বাস্তিয়া অবশ্য কট্টর

স্বাধীনতাবাদী। ইংরেজ ম্যাক্-কালক এবং সিনিয়র এই পথেরই পথিক। কিন্তু কেইন্‌সের মতে ইংরেজদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা এই দিকে বেশী চলেন নাই। অ্যাডাম স্মিথ, ম্যাল্‌থাস এবং রিকার্ডোর রচনায় স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি কমই পাওয়া যায়। এই কথাটা কেইন্‌সের রচনায় প্রথম শুনা যাইতেছে, কেন না ইংরেজি ধনবিজ্ঞানের এই ত্রিবীরকে স্বাধীনতাবাদী বলিয়াই লোকে জানে। তবে একথা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, জন ষ্টুয়ার্ট মিল "স্বাধীনতা"র বিরুদ্ধেই বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিলেন। আর মার্শ্যালের রচনাবলীর ভিতর জটিল মারপ্যাচের সংখ্যা এবং ব্যতিরেকের তালিকা বিপুল হইলেও তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে "স্বাধীনতা"র উল্টা দিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেইন্‌স্ এই গ্রন্থে স্বাধীনতার উল্টা দিকেই দেখা দিতেছেন। চুক্তি করিবার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মজুরেরা সুখী একথা আর বিশ্বাস করা চলে না। ফ্যাক্‌টরির মালিকেরা পরস্পর টক্কর দিয়া মাল তৈয়ারী করিতেছে বলিয়াই যে দাম কমিবে আর সমাজের নর-নারীর উপকার হইবে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একচেটিয়া একতিয়ার দু-চার-দশ-বিশ জন লোকের তাঁবে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। কাজেই ব্যক্তিগুলাকে স্বাধীন জীব বলিয়া ছাড়িয়া দিলেই তাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে "হেসে খেলে" জীবন চালাইতে পারিবে এমন কোনো কথা নাই। অতএব কোনো-কোনো ব্যক্তিকে অপর কোনো-কোনো ব্যক্তির দৌরাত্ম্য, অত্যাচার, একচেটিয়া অধিকার ইত্যাদি সামাজিক চাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ "স্বাধীনতা"র খর্ব্বতা বা লোপ-সাধন না করিলে অনেক সময়েই দুনিয়ার নরনারীর সুখবৃদ্ধি অসম্ভব। কথাটা শুনাইতেছে অতি নিষ্ঠুর, কঠিন-কঠোর।

কিন্তু এই নির্ম্মম দর্শনের ভিতরকার কথাটা কি? "স্বাধীনতার অবসান" বলিলে আর্থিক দুনিয়ার কোন্ তথ্য নজরে পড়িতেছে? এইখানে কেইন্‌স এক জবর মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। এতদিন ধরিয়া আমরা জানি ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের প্রভাব বসাইলেই স্বাধীনতার অবসান হয়। বাজার দরে আইন কায়েম কর, ফ্যাক্টরির পরিচালনায় সরকারী কানুন জারি কর, জমিজমার স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট জমিদারদের বিপক্ষে আর চাষীদের স্বপক্ষে বিধিব্যবস্থা করুক, —তাহা হইলেই আমরা বুঝিতাম যে, "যা চলছে চলুক" বা "যেতে দাও" ইত্যাদি নীতির খতম হইল। রাষ্ট্র আসিয়া নরনারীর ভাগ্যনিয়ন্তা, সুখদুঃখের কর্ত্তা হইল।

এক কথায়, মামুলি মতে—সোশ্যালিজ্‌ম্ বা সমাজ-তন্ত্র স্বাধীনতা-তত্ত্বের উল্টা পক্ষ। ভাবিয়াছিলাম কেইন্‌স্ বুঝি এইবার সোশ্যালিষ্টদের খাতায় নাম লেখাইলেন। রাধামাধব! ইনি সোশ্যালিজমের কট্টর দুস্‌মন। এমন কি রাষ্ট্র-প্রবর্ত্তিত সংরক্ষণ-নীতিও ইনি কোনো দেশের শুল্ক-ব্যবস্থায় পছন্দ করেন না। স্বাধীনতার ঠাঁইয়ে তিনি যে-ধরণের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ চাহিতেছেন তাহা কিছু অদ্ভুত ধরণের। কিন্তু কথাগুলার ভিতরে গ্রহণীয় এবং আলোচনাযোগ্য অনেক তত্ত্বই আছে।

রাষ্ট্র আর ব্যক্তির মাঝখানে কেইন্‌স্ কতকগুলা নিমস্বরাজী সঙ্ঘ বা কর্ম্মকেন্দ্র ঢুঁড়তেছেন। এই সকল কর্ম্মকেন্দ্রে কোনো ব্যক্তি বা দল-বিশেষের স্বার্থ পুষ্ট হইতে পারিবে না, পুষ্ট হইবে একমাত্র গোটা দেশের স্বার্থ। এই সঙ্ঘ বা কর্ম্মকেন্দ্র কোথাও আছে কি? আছে বৈ কি। কেইন্‌সের মতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলা এইরূপ প্রতিষ্ঠান, বিলাতের ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড এইরূপ প্রতিষ্ঠান, পোর্ট অব লণ্ডন নামক

লণ্ডন-বন্দরের কর্ম্মকেন্দ্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান। এমন কি, রেলওয়ে কোম্পানীগুলাকেও এইরূপ নিম-স্বরাজী দেশ-স্বার্থ-পোষণকারী সঙ্ঘ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেইন্‌স্ বিবেচনা করেন যে, উন্নত দেশগুলার শিল্পবাণিজ্য সবই ক্রমশঃ এই আদর্শের দিকে ধাপে-ধাপে উঠিতেছে। লভ্যাংশ ক্রমেই বাঁধা হারে শৃঙ্খলীকৃত হইতেছে। অংশীরা কারবারের শাসনক্ষমতা একপ্রকার ভোগ করিতেই পায় না। আসল শাসনকর্ত্তা হইতেছে ডিরেক্টারেরা। এঁদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে কারবারটাকে ব্যবসা হিসাবে কৃতকার্য্য করিয়া তুলিবার দিকে। ইংল্যাণ্ডের বিপুলায়তন কারবারগুলা সবই ক্রমশঃ এই মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে থাকিবে বলিয়া কেইন্‌সের বিশ্বাস।

রাষ্ট্র তাহা হইলে কি করিবে? ব্যক্তিরা যাহা-কিছুই আজকাল করিতেছে রাষ্ট্র তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। অবশ্য এই সমুদয়ের ভিতর কোনো-কোনোটা গভর্মেণ্টের হাতে থাকিলে কিছু-কিছু সুফলই ফলিতে পারে। কিন্তু কোনো মতেই গবর্মেণ্টকে কেইন্‌স্ এই সব কাজের ভার লইতে দিবেন না। তাহা হইলে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য থাকিবে কিরূপ? যে-সব কাজ আজকাল একদম কেহই করিতেছে না, একমাত্র সেই সব কাজ সামলানো হইবে গবর্মেণ্টের ধান্ধা।

একটা দৃষ্টান্ত বাণিজ্য-সঙ্কট। বার্ষিক কালবৈশাখীর মতন কয়েক বৎসর পর-পর "ক্রাইসিস" নামক শিল্প-সঙ্কট, বাণিজ্য-সঙ্কট আর্থিক দুনিয়ায় লণ্ডভণ্ড সৃষ্টি করে। এই নিয়মিত ধূমকেতুটাকে বশে আনিয়া ঘাল করিবার প্রণালী আজ পর্য্যন্ত কেহ খুঁজিয়া পান নাই। বস্তুতঃ, তাহার জন্য কাহারও মাথাব্যথাই নাই। কেইন্‌স্ বলিতেছেন,—"বহুত আচ্ছা! এই ধূমকেতুটাকেই গবর্মেণ্টের ঘাড়ে চাপানো যাউক। দেশের টাকাকড়ি আর কর্জ্জ লেনাদেনা শাসন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট

মোতায়েন থাকুক। আর গবর্মেণ্টের হাতে এইজন্য একটা যন্ত্র দিয়া দেওয়া যাউক। তাহার নাম কেন্দ্রীয় কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান।"

গবর্মেণ্টের পক্ষে দ্বিতীয় দফা কাজের-মতন-কাজ কেইন্‌সের মতে হইতেছে—দেশব্যাপী প্রপাগাণ্ডা। গবর্মেণ্ট আর্থিক সংবাদ সংগ্রহ করুক এখান-ওখান-সেখান হইতে আর ডাইনে-বাঁয়ে এখানে-ওখানে-সেখানে এই সংবাদগুলা ছড়াইবার ভার লউক। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক আর বার্ষিক রোজনামচা লোকেরা নির্ভুলভাবে ধরিতে পারিলে সংসারে অনেক অপব্যয় ও শক্তিক্ষয় নিবারিত হইবে। আর্থিক দুনিয়ার ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বা তথ্য ও সংখ্যা বাঁটিয়া গবর্মেণ্ট দেশের সেবা করুক।

কেইন্‌স্ গবর্মেণ্টের ঘাড়ে তৃতীয় বোঝা চাপাইতেছেন টাকাকড়ির সঞ্চয়-লগ্নি কারবার। তাঁহার মতে দেশের লোক প্রতি বৎসর কত টাকা জমাইবে তাহা মাপিয়া জুকিয়া জরীপ করিয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য। কেবল তাহাই নয়। টাকাকড়ি জমা হইবার পর কোন্ শিল্পে কোন্ বাণিজ্যে কোথায় কবে কত লাগানো যাইবে সেই সম্বন্ধেও গবর্মেণ্টের শাসন থাকা আবশ্যক।

চতুর্থ দফায় কেইন্‌স্ বলিতেছেন যে, এক মাত্র ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প, টাকাকড়ি, ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদির কথা ভাবিলে চলিবে না। গবর্মেণ্টকে আর একটা বড় কাজের জিম্মা লইতে হইবে। সে হইতেছে মানুষগুলাকে দুরস্ত করা। পৃথিবীতে লোক পয়দা হইতেছে অহরহ,—যেখানে-সেখানে। এই লোক-সংখ্যার উপর গবর্মেণ্টকে চৌকিদারি করিতে হইবে। লোক-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, নরনারীর চলাফেরা, দেশ-বিদেশে গমনাগমন ইত্যাদির উপর শাসন রাখা সম্ভব একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষে। সকল দিক হইতে মানুষের জন্ম-

মৃত্যুর উপর কর্ত্তামি করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য থাকিবে। আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে গুণ হিসাবে অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষায়, চরিত্রবত্তায় আর কর্ম্মদক্ষতায় উন্নত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও থাকিবে গবর্মেণ্টের অন্যতম বড় ধান্ধা।

দেখা যাইতেছে যে, কেইন্‌স্ গতানুগতি সোশ্যালিষ্টের যম হইয়াও সোশ্যালিজ্‌মের ইতিহাসের এক নবীন অধ্যায় খুলিয়া দিলেন। এই যেসকল গঠনমূলক প্রস্তাব কেইন্‌সের গ্রন্থে পাইতেছি তাহার স্বপক্ষে-বিপক্ষে অন্যান্য যে যুক্তিই থাকুক না কেন মার্ক্‌স্-পন্থী লেলিন্-পন্থী কট্টর সোশ্যালিষ্টরাও সেইগুলাকে জাতি হিসাবে সোশ্যালিজ্‌মের অন্তর্গতই বিবেচনা করিবে। যাহা হউক, কেইন্‌স্ নিজেকে অ-সোশ্যালিষ্ট রূপে বাজারে দাঁড় করাইবার জন্য একটা নয়া পারিভাষিক সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দর্শনকে "সাব্লিমেটেড ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্" বা "উদারীকৃত পুঁজিতন্ত্র" নামে প্রচার করিলেন।

মূল্যশাস্ত্রী মার্শ্যাল

যে কয়জন অর্থশাস্ত্রীর মুড়ো খাইয়া ভারতসন্তান কিঞ্চিৎ-কিছু ধন-বিজ্ঞানের বিদ্যা দখল করিতে পারিয়াছে তাহার ভিতর কাল অনুসারে পয়লা নম্বরের হইল জন ষ্টুয়ার্ট মিল আর দ্বিতীয় নম্বরের হইল মার্শ্যাল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জন ষ্টুয়ার্ট মিল ছিলেন যুবক ভারতের ধনবিজ্ঞান-গুরু। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সেই ঠাঁই ছিল মার্শ্যালের। এখনও বহুকাল মার্শ্যালের ইজ্জৎ থাকিবে। মার্শ্যাল তিনখানা মোটা-মোটা বইয়ের গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধ।* বই তিনটার নাম নিম্নরূপঃ—(১) প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অব ইকনমিক্‌স্ (ধন-

বিজ্ঞানের মূলসূত্র), (২) ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড (আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের সংগঠন), (৩) ম্যানি, ক্রেডিট অ্যাণ্ড কমার্স (টাকা-কড়ির লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য)। প্রথম বইটা সুপরিচিত। অন্য দুইটার মাল ক্রমে-ক্রমে পরিচিত হইতেছে। প্রথমটার অধিকাংশই "দার্শনিক" তত্ত্বে পরিপূর্ণ। "তত্ত্বাংশ" অপর দুইটার প্রধান কথা নয়। "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যে ধরণের তথ্য থাকে মোটের উপর সেই ধরণের তথ্যই শৃঙ্খলীকৃতরূপে মার্শ্যালের শেষ দুই গ্রন্থে ঠাঁই পাইয়াছে। "বস্তুনিষ্ঠ" অর্থনৈতিক সাহিত্য হিসাবে এই দুই গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান্। কিন্তু মার্শ্যালের আসল ক্ষমতা বুঝিতে হইলে "প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্"টাই ঘাঁটিতে হইবে।

অন্যান্য ধনবিজ্ঞানসেবীর মতন মার্শ্যালকেও বিভিন্ন সরকারী তদন্তে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে। এই জবানবন্দীগুলার ভিতর মার্শ্যালের দার্শনিক পাণ্ডিত্য আর কার্য্যকরী বিদ্যা দুই-ই এক সঙ্গে পাকড়াও করিতে পারা যায়। বিলাতের রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটি নামক ধন-বিজ্ঞান-পরিষৎ এই সব রচনাকে "ওফিশ্যাল পেপার্স" (সরকারী রচনা) নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল রচনা নিম্নলিখিত ছয় উপলক্ষ্য লইয়া প্রণীত :—

(১) ১৮৮৬ সনে বিলাতী শিল্প-বাণিজ্যের "মন্দা" আলোচনা করিবার জন্য মুদ্রা ও মূল্য বিষয়ক তদন্ত বসে। সেই তদন্তে মার্শ্যাল ছিলেন অন্যতম সাক্ষী। তাঁহার সেই সময়কার কথাগুলা আজও অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

(২) ১৮৮৭ সনে অনুষ্ঠিত সোনা ও রূপা বিষয়ক তদন্ত-কমিটির নিকট মার্শ্যালের জবানবন্দি।

(৩) ১৮৯৩ সনে অনুষ্ঠিত দরিদ্র-বৃদ্ধদের আর্থিক জীবন বিষয়ক তদন্ত-কমিটির নিকট সাক্ষ্য।

(৪) ভারতীয় মুদ্রা-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য (১৮৯৮)।

(৫) সাম্রাজ্যিক ও স্থানীয় করসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও ফলাফল নির্ণয় (১৮৯৯)।

(৬) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের শুল্ক-নীতি-বিষয়ক গবেষণা (১৯০৩)।

মার্শ্যালের মগজের একটা বড় কথা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৩ সনে "বুড়ো গরিব"দের সম্বন্ধে বিলাতে একটা কমিশন বসে। সেই কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় মার্শ্যাল বলিয়াছিলেন,—

"বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আমি দারিদ্র্যের সমস্যা লইয়া চিন্তা করিয়াছি। আর আজ পর্য্যন্ত আমি এমন খুব কম গবেষণাই করিয়াছি যাহাতে দারিদ্র্যবিষয়ক আলোচনার ঠাঁই নাই।" বুঝিতেছি যে, অর্থশাস্ত্রী মার্শ্যাল শেষ পর্য্যন্ত আগাগোড়া দারিদ্র্য-শাস্ত্রী ছাড়া আর কিছু নন। কথাটার দাম লাখ টাকা। মার্শ্যালের মগজ শুঁকিবার সময় যুবক ভারতের অর্থশাস্ত্রীদের পক্ষে এই কথাটা হামেশা মনে রাখা আবশ্যক।

মার্শ্যালের মেজাজের আর একটা নমুনা দিতেছি। গরিবেরা সরকারী সাহায্য বিষয়ক শাসন সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করে এই সম্বন্ধে মার্শ্যালকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তাঁহার জবাবের সঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যানের মতের পার্থক্য দেখা দেয়। চেয়ারম্যান বলেন,—"অমুক অঞ্চলের গরিবেরা প্রত্যেক বারই সাহায্য বিষয়ক শাসন বিভাগে এক প্রকার প্রতিনিধি পাঠাইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় না কি যে তাহারা শাসন বিভাগের কর্ম্মপ্রণালী কুচোখে দেখে

না?" মার্শ্যালের জবাব নিম্নরূপ:—"ইহাতে এরূপ বুঝিবার কারণ নাই। অতি সামান্তই এই তথ্যে প্রমাণিত হইতেছে। মজুরদের স্বাধীন ও সোজা মতামত যতক্ষণ না সংগ্রহ করা হইতেছে ততক্ষণ কিছু বুঝা যায় না বলিব। আমি মজুরদের সঙ্গে অনেকবার কথা-বার্ত্তা বলিয়া দেখিয়াছি। এই জন্যই আমার মত এইরূপ। এই কমিশন অথবা অন্যান্য কমিশন আজ পর্য্যন্ত যে সকল সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে বড় জোর মাত্র আধা দুনিয়ার কথা জানা গিয়াছে। আর সেই আধাটা আসল আধা নয়। সেই আসল আধা হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাক্ষ্য সংগৃহীত না হয় ততক্ষণ আলোচ্য সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না।" দেখা যাইতেছে যে, মজুর-দুনিয়াই মার্শ্যালের মতে দুনিয়ার বৃহত্তর অর্দ্ধ। অথচ "ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড" পড়িলেই জানা যায় যে, মার্শ্যাল নাম-লেখানো সোশ্যালিষ্ট নন।

এইবার আর এক তরফ হইতে মার্শ্যালের মুড়োটা খুঁটিয়া দেখা যাউক।

যে মার্শ্যালকে সাধারণ অর্থশাস্ত্র বিষয়ক তত্ত্বকথার বা "থিয়োরির" সেরা পণ্ডিত বিবেচনা করা দস্তুর সেই মার্শ্যালের আলো-চনা-প্রণালী যার পর নাই মূল্যবান্। ১৮৯৮ সনে ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ক বিলাতী কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে ডাকা হইয়াছিল। সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি নিজের কথা কিছু বলিয়াছেন,—যথা, "পনর বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন অক্‌সফোর্ডে ছিলাম তখন ভারতীয় মূল্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলাম। নানা প্রকার অনুসন্ধানের উপলক্ষ্যে আমাকে কতকগুলা রেখা-তরঙ্গের ছবিও প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলা আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। আমার ভয় হইতেছে যে, এতগুলা ছাপিতে আপনাদের অনেক খরচ পড়িবে।"

এই ধরণের আত্ম-জীবন-চরিত বিষয়ক তথ্যে মার্শ্যালের মগজের ভিতরকার ঘী সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় কথা পাকড়াও করিতে পারি। সেই কথাটা অতি সোজা। মার্শ্যাল চোপর দিনরাত "বস্তু"র ভিতর ডুবিয়া থাকিতেন। বস্তুগুলার আবহাওয়া হইতেই, বস্তুর সমুদ্র হইতেই, তাঁহার হাতে তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম ইত্যাদি চিজ বাহির হইয়া আসিয়াছে।

তাঁহার বিবৃত রেখাসমূহ নিম্নরূপ :—

১। ভারতীয় ও বিলাতী মূল্য-রেখা :—বিলাতে সাধারণ জিনিষ-পত্রের দর (সোনার মাপে ও রূপার মাপে) ১৮৪৬ হইলে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত; বিলাতে রূপার দর ১৮৪৬ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত; ভারতে সাধারণ জিনিষ পত্রের দর ও মজুরির হার (১৮৬১—৯৬); ভারতের আমদানি (১৮৭৩-১৮৯৮); ভারতের রপ্তানি (১৮৭৩-১৮৯৮)।

২। ভারতে খাদ্য-দ্রব্যের দাম (১৮৬১-১৮৯৫); ভারতের বৃষ্টি-পাত (১৮৬১-১৮৯৬); কলিকাতায় ডিস্কাউণ্টের হার (ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল), ১৮৬০ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত, বিলাতের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হার (১৮৬১-১৮৯৮)।

৩। ভারতে সোনা ও রূপা আমদানির রেখা (১৮৬০-১৮৯৭); বিলাতের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হার (১৮৬০-১৮৯৯); লণ্ডনে রূপার দর (১৮৬০-১৮৯৭)।

৪। বিলাতের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হার (১৮৭০-১৮৯৭); ভারতে তূলার কাপড়ের আমদানি (১৮৭০-১৮৯৬); ভারত হইতে গম রপ্তানি (১৮৭৩-১৮৯৭)।

৫। ভারতে জওয়ার শস্যের মূল্যরেখা (১৮৬১-১৮৯৬)।

৬। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মজুরি ও মূল্যের রেখা (১৮৬০-১৮৯১)।

বস্তুনিষ্ঠা, অঙ্কনিষ্ঠা, তথ্যনিষ্ঠা ইত্যাদি যে শব্দই কায়েম করি না কেন,—মার্শ্যালের মগজে সেই নিষ্ঠা আসল শক্তি। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই—আসল কথা,—মার্শ্যালের রচনাবলীর প্রত্যেক পৃষ্ঠার ভিতরে আর পশ্চাতে—এইরূপ তথ্যনিষ্ঠা আর বস্তুনিষ্ঠাই সর্ব্বদা দেখিতে পাই। এমন কি "প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌"টার বেলায়ও এই কথা খাটে।

এইবার আরও মজার কথা বলিব। ইংরেজ নরনারী মার্শ্যালের মুড়োটা চিবাইয়া কি কি পাইয়াছে বা পাইতেছে?

মার্শ্যালের বইগুলা মুখস্থ করার জোরে কোনো ইংরেজ গ্র্যাজুয়েট যদি ব্যাঙ্ক কায়েম করিবার দিকে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহাকে হতাশ হইতে হইবে। বীমা-কোম্পানী চালাইবার হদিশ যদি কোনো ইরেজ পাঠক মার্শ্যালের বইসমূহ হইতে আশা করে, তাহা হইলে তাহার মতন বেয়াকুব আর কেহ নাই। সিগারেটের দোকান খোলা অথবা রেষ্টরাণ্ট-হোটেল পরিচালনা করা, কয়লার খাদের ম্যানেজারি করা অথবা রেল-দপ্তরের মাতব্বরি করা কিছুই মার্শ্যালের বই হজমকারী ইংরেজ ছোকরাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমদানি-রপ্তানির আড়ৎ খুলিয়া টাকা-পয়সা রোজগার করিতে যে চায় অথবা কাপড়ের কলের শেয়ার বেচা যাহার জীবনের ধান্ধা, এইরূপ ইংরেজও মার্শ্যালের বইয়ের ভিতর কোনো পাঁতি পাইবে না।

আসল কথা, রেল সম্বন্ধে, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে, মুদ্রা সম্বন্ধে, কারখানা-পরিচালনা সম্বন্ধে, জাহাজ সম্বন্ধে, বন্দর সম্বন্ধে, পশম সম্বন্ধে, রেশম সম্বন্ধে, চাষ-আবাদ সম্বন্ধে, জীবন-বীমা সম্বন্ধে, বার্দ্ধক্য-বীমা সম্বন্ধে, মজুর-সঙ্ঘ সম্বন্ধে মার্শ্যালের বইগুলায় এত কম তথ্য আছে যে, সে সব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। এই সকল কথা ভারতীয় কর্ম্মী ও লেখক-সমাজে বিশেষরূপে বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত-অর্দ্ধশিক্ষিত-নিরক্ষর সকল সমাজেই অর্থশাস্ত্র বিষয়ক একটা বাতিক দেখা যায়। ভারতীয় নরনারীর বিশ্বাস যে, কোনো একটা লোক যখন ধনবিজ্ঞান-সেবক বা অর্থশাস্ত্রীরূপে পরিচিত, তখন সেই লোকটা মাছের বাজারে, আলু-পটলের বাজারে, তেলের বাজারে, কাপড়ের বাজারে, পাটের বাজারে, আখের বাজারে, কয়লার বাজারে এবং অন্যান্য বাজারে লাভবান হইবার হদিশগুলা দিতে সমর্থ। যদি দিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে নেহাৎ বেয়াকুব ও আহাম্মুক ছাড়া আর কিছু বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু, এমন কি ধনবিজ্ঞানবিদ্যার অন্যতম "জগদ্‌গুরু" মার্শ্যালের বইগুলার ভিতরও যখন ইংরেজরা এইরূপ হদিশ পায় না, তখন অর্থশাস্ত্রীদের দৌড় বা সীমানা সম্বন্ধে সকলেরই মাথা পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। মার্শ্যালের মতন বিলাতে আরও অনেক অর্থশাস্ত্রবিষয়ক কেতাবের লেখক আছে। আমেরিকায় আছে, ফ্রান্সে আছে, জার্ম্মাণিতে আছে, জাপান আছে। সকল দেশের সব মিঞাই ভারতীয় জনগণের পরীক্ষায় ফেল মারিতে বাধ্য।

অর্থাৎ স্বীকার করা দরকার যে, জগতের অর্থশাস্ত্রীগুলা হয় সকলেই একদম ম্যাড়াকান্ত, না হয় অর্থশাস্ত্রীদের লেখাপড়ার, পঠন-পাঠনের, অনুসন্ধান-গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা ভ্রমাত্মক। মার্শ্যালের বইগুলা আবার পাড়া যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল রচনায় রেল, জাহাজ, ব্যাঙ্কিং, ষ্টক-এক্সচেঞ্জ, মুদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আবাদ, শিল্পকারখানা, বীমা, মজুরসঙ্ঘ ইত্যাদি বস্তু সম্বন্ধে বিলাতবিষয়ক তথ্যই নেহাৎ কম। অন্যান্য দেশের তথ্য ত আরও কম বটেই। যে-কোনো অধ্যায়ের যে-কোনো অংশ ছুঁইলেই দেখা যাইবে যে, মার্শ্যাল আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রের নেহাৎ

চ্যাংড়ারও পেট ভরাইতে সমর্থ নন। সবই "নমোনমঃ" করিয়া দু'এক কথায় সারা হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রীদের রচনাসমূহের ভিতর তাহা হইলে পাওয়া যায় কি চিজ? এত মোটা-মোটা ঢাউস বইয়ের ভিতর কোন্ কোন্ মাল থাকে? এক কথায়, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার তুলনা, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ। অর্থশাস্ত্রীরা বস্তুগুলার বর্ত্তমান আকার-প্রকারের কারণ বিশ্লেষণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলার অতীত অবস্থার আর ভবিষ্যগতির ইঙ্গিত প্রদান করিতে অভ্যস্ত। ব্যাঙ্কে, বীমায়, কারখানায়, চাষ-আবাদে, মুদ্রায় "কত ধানে কত চাল" এইটুকু বুঝানো ছাড়া অর্থশাস্ত্রীদের কেতাব-রচনার আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। জিনিষপত্রের দাম, বাজার-দর, সুদ, মজুরি, মুনাফা, বাড়ী-ভাড়া, ডাক্তারের ফী, টাকার বাজার, বিনিময়ের হার, আর্থিক গতিভঙ্গীর "রেখা-তরঙ্গ", জীবনযাত্রার ওঠানামা, দেশে-দেশে আর্থিক টক্কর, সম্পদবৃদ্ধির উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে দুনিয়াখানাকে বুঝিবার সুযোগ দিয়াই অর্থশাস্ত্রীরা খালাশ। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহকে "বুঝিয়া লওয়া", মূল্য-বৃদ্ধি বা মূল্য-হ্রাসের কারণগুলা "বুঝিয়া লওয়া", সংসারের "চক্র" বা "তেজী-মন্দার" ধারাগুলা "বুঝিয়া লওয়া", দেশোন্নতির উপায়গুলা "বুঝিয়া লওয়া", সংসারের "ভবিষ্য-পুরাণ" ঠারে-ঠোরে কথঞ্চিৎ "বুঝিয়া লওয়া", সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশলগুলা কিছু-কিছু "বুঝিয়া লওয়া" ইত্যাদি নানাপ্রকার "বুঝিয়া লওয়া"র বেশী-কিছু অর্থশাস্ত্রীদের নিকট আশা করিলেই পাঠকেরা "পত্রপাঠ বিদায়" পাইতে বাধ্য। এই সকল "বুঝিয়া লইবার" পর বা সঙ্গে-সঙ্গে যাও খেত-খনিতে, জলে-জঙ্গলে, কারখানায়-কুটিরশিল্পে, ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্ব্বাণিজ্যে, চরিয়া খাও গিয়া। তাহার পর মাঝে-মাঝে কচিৎ-

কখনো আলমারির সব-চেয়ে উঁচু থাকের ধূলা ঝাড়িয়া অর্থশাস্ত্রবিষয়ক কান-কাটা বইগুলা দু'একবার ঘাঁটিতে চাও ঘাঁটিও। কেহ বাধা দিবে না। ব্যস্। এই পর্য্যন্ত অর্থশাস্ত্রীদের মুরদ ও প্রভাব।

ধনবিজ্ঞানের আসল কথা মূল্য, মূল্যনির্দ্ধারণ, মূল্যতত্ত্ব। মূল্যকাণ্ডের একদিকে ক্রেতার দল আর একদিকে বিক্রেতার দল। যেখানে বা যে-সময়ের ভিতর এই দুই দলে দর-কষাকষি চলিয়া থাকে অর্থাৎ মূল্য নির্দ্ধারিত হয় সেই স্থান বা কালের নাম বাজার। কাজেই ধনবিজ্ঞানকে সহজে বাজার-বিজ্ঞান বলা চলে। এই বাজার-বিদ্যা সম্বন্ধে মার্শ্যাল বিলকুল বস্তুনিষ্ঠ। তাঁহার বিশ্লেষণে একটা তথাকথিত সার্ব্বজনিক বা সনাতন মূল্যতত্ত্ব ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বেলায় ভিন্ন ভিন্ন মূল্যতত্ত্ব স্বীকার করা তাঁহার দস্তুর।

বস্তুগুলা বিচিত্র ও বিভিন্ন। বস্তুগুলার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধও বিচিত্র এবং বিভিন্ন। অর্থাৎ বাজারগুলাই বিচিত্র ও বিভিন্ন। বাজারগুলার চৌহদ্দি ছোট-বড়-মাঝারি হিসাবে বিভিন্ন। আবার একদিনের বাজার, না দশ দিনের বাজার, না দশ মাসের বাজার, না দশ বৎসরের বাজার হিসাবেও বাজারগুলার চৌহদ্দি বিভিন্ন। এত সব বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যে-গবেষকের মাথায় নাই তাহার পক্ষে বাজার-গবেষণা, মূল্য-গবেষণা, ধনবিজ্ঞান-গবেষণা অসম্ভব। মার্শ্যাল আর্থিক দুনিয়ার এই বৈচিত্র্যের আবিষ্কারকর্ত্তা। মার্শ্যাল-মতের ইহাই চরম গৌরব।

বাজারগুলার বৈচিত্র্য বুঝিবার জন্য মোটের উপর সহজে নিম্নের চিত্র প্রদর্শিত হইতে পারে।

বাজার দ্বিবিধ:—(১) স্থান হিসাবে, (২) কাল হিসাবে। স্থান *হিসাবে বাজারগুলা ত্রিবিধ:*—(ক) *মামুলি* বাজার, (খ) অবরুদ্ধ

বাজার, (গ) বিশ্ববাজার। কাল হিসাবেও বাজারগুলাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(ক) দৈনিক বাজার ও অল্প-মেয়াদের বাজার, (খ) মাঝারি বা লম্বা-মেয়াদের বাজার, (গ) অতিলম্বা-মেয়াদের বাজার। এই ছয় প্রকার বাজার নিম্নে দেখানো হইতেছে :—
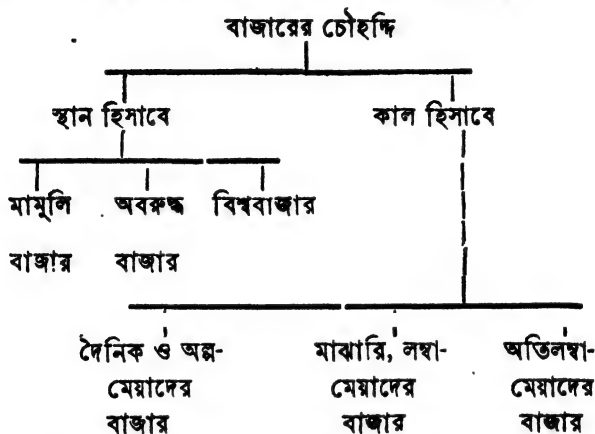
মামুলি বাজারের কথা সকলেরই জানা আছে। চাউল ডাল হইতে তেল নুণ পর্য্যন্ত সব-কিছুই এই বাজারে সওদা করা গৃহস্থ-মাত্রের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির অন্তর্গত। খরিদ্দারেরা বাজারে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ "সীমান্ত-সুখ" বা সীমান্ত-ভোগের কথা ভাবিতেছে। খরিদ্দারদের ভিতর চলিতেছে টক্কর,—সীমান্ত-সুখে সীমান্ত-সুখে। শেষ পর্য্যন্ত অনেক খরিদ্দারই মাল কিনিতে রাজি হইতেছে না। যাহারা রাজি হইতেছে তাহারা "সীমান্ত-ক্রেতা।" অতএব বাজারের একদিক হইল সীমান্ত-ক্রেতার সীমান্ত-সুখ। ইহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয় মালের চাহিদা-মূল্য ("ডিমাণ্ড-প্রাইস")। অপর দিকে মামুলি বাজারের সওদাগুলা পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ।

দোকানে যে চাউল, আটা, মশলা, চিনি ইত্যাদি আছে তাহা বাড়িতেছে না। এই সব মালের জোগান পরদিন হয়ত বাড়িতে পারে,—কমিতেও পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে উহা বাড়াইবার-কমাইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই মালগুলা জোগাইবার জন্য বাস্তবিক কত খরচ পড়িয়াছে তাহা খতাইয়া দেখা দোকানদারের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই অবস্থায় "জোগান-মূল্য" ("সাপ্লাই-প্রাইস") সম্বন্ধে নির্ব্বিকার থাকিয়া দোকানদারেরা চাহিদা-মূল্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অভ্যস্ত। সোজা কথায় খরিদ্দারদের টান মাফিক মামুলি বাজারের মূল্য সাব্যস্থ হইয়া থাকে।

কিন্তু এমন অনেক মাল আছে যেগুলা ফরমায়েস মাফিক তৈয়ারি মালের অনুরূপ। অথবা হয়ত দুএক দিনের ভিতর এই সব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই বাজারের চৌহদ্দি বেশী বিস্তৃত নয়। অর্থাৎ অনেক দূর হইতে ক্রেতারা আসিতে পারে না। আবার বহু দূরের বিক্রেতাও এই বাজারে দেখা যায় না। এমন কি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়ত মালগুলা কতকগুলা দোকানদারের একচেটিয়া জিনিষ। বাহিরের জোগানদারেরা আসিয়া টক্কর চালাইতে অসমর্থ। এইরূপ হইতেছে অবরুদ্ধ বাজারের প্রকৃতি।

এই সব জিনিষের মূল্য সম্বন্ধে মার্শ্যাল "চাহিদা-মূল্যে"র কথা ভাবিতে প্রস্তুত নন। তাঁহার বিচারে এমন কি "জোগান-মূল্য"ও আলোচনা করিবার দরকার নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মূল্যটা কৃত্রিম বা খেয়ালি বা একচেটিয়া মূল্য ছাড়া আর-কিছু নয়। খরিদদারদের নিকট হইতে যা-কিছু আদায় করা সম্ভব তাহাই আদায় করিতে দোকান-দারেরা প্রবৃত্ত। এই গেল অবরুদ্ধ বাজারের মূল্যতত্ত্ব। মামুলি বাজারে আর অবরুদ্ধ বাজারে প্রভেদ বিস্তর।

এইবার বিশ্ববাজারে প্রবেশ করা যাউক। কোম্পানীর কাগজের বাজার, কারখানার শেয়ারের বাজার, সরকারী কর্জ্জের বাজার, সোনারূপার বাজার ইত্যাদি বাজারগুলা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সব বস্তুর খরিদদারও জুটে দেশ-বিদেশ হইতে। এই সব মাল নষ্ট হয় না। আর যখন-তখন যেখানে-সেখানে এই সব কিনিবার জন্য হুকুম দেওয়াও চলে। এই সমুদয় বস্তু টেলিফোনে-টেলিগ্রাফেও কেনা-বেচা চলিতে পারে।

বিশ্ববাজারের মালগুলা সম্বন্ধে চাহিদার তরফ হইতেও টক্কর চলে জবর ভাবে, আবার জোগানের তরফ হইতেও টক্কর চলে চরম রূপে। আন্তর্জ্জাতিক কেনাবেচার কাণ্ড সার্ব্বজনীন টক্করের লীলাক্ষেত্র। জোগান বাড়িবামাত্র বা কমিবামাত্র চাহিদার উপর একটা প্রভাব দেখা যায়। আবার চাহিদার বাড়্‌তি-ঘাট্‌তি দেখিয়াও জোগানদারেরা নিজ নিজ কর্ম্মকৌশল নিয়ন্ত্রিত করে। চাহিদায় আর জোগানে সম্বন্ধটা পারস্পরিক। কাজেই দুনিয়ার সর্ব্বত্র একটা সার্ব্বজনীন বা আন্ত-র্জ্জাতিক মূল্য দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। এই মূল্য বড়-বেশী নড়ে-চড়ে না। শেষ পর্য্যন্ত "জোগান-মূল্যে"র উপরই বিশ্ববাজারের বস্তুগুলার মূল্য নির্ভর করে।

দৈনিক ও অল্প-মেয়াদের বাজারে দুধ, মাছ, শাকসব্জী ইত্যাদি তাজা জিনিষ একমাত্র মাল নয়। শিল্পদ্রব্যও ইহার অন্তর্গত। তাহা ছাড়া কৃষিজাত দ্রব্যও ত আছেই।

অল্প-মেয়াদের অর্থ এই যে, সময়ের পরিমাণ বেশী নয়। কাজেই মালের জোগান বাড়ানো কঠিন। মালের জোগান বাড়াইতে হইলে মালটা তৈয়ারি করিবার সরঞ্জাম সমূহ বাড়ানো আবশ্যক। এই সরঞ্জাম নানা শ্রেণীর অন্তর্গত। কোনো-কোনো সরঞ্জাম অল্প

সময়ে বাড়ানো সম্ভব। কোনো-কোনো সরঞ্জাম বাড়াইতে অনেক সময় লাগে।

অল্প সময়ের ভিতর হয়ত কুদরত্তি মালের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে। মজুরের সংখ্যা বাড়ানোও সম্ভব। অধিকন্তু যতখানি পুঁজি খাটানো হইতেছে তাহার চরম সদ্ব্যবহার করাও সম্ভবপর। কিন্তু অল্প মেয়াদের ব্যবস্থায় কারবারের জন্য নতুন কলকব্জা, যন্ত্রপাতি বা বিশেষত্বপূর্ণ সরঞ্জাম কায়েম করা অসম্ভব। স্থায়ী আকারে শাসন-দপ্তরের জন্য লোকজন বাহাল করা অসম্ভব। বিজ্ঞাপনের জন্য লম্বা ব্যবস্থা করা চলিতে পারে না। নতুন-নতুন জনপদের অথবা নতুন-নতুন কারবারের সঙ্গে লেনদেন বাড়াইয়া নিজ কারবারের প্রভাব বৃদ্ধি করাও সম্ভবপর নয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাল তৈয়ারি করিবার জন্য যে সব সরঞ্জাম আবশ্যক তাহার একটা অংশ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইতে পারে অপর অংশ আকারে-প্রকারে যে-কে সেই থাকিতে বাধ্য। অতএব চাহিদার প্রভাবে জোগান পুরাপুরি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, আংশিক-রূপে নিয়ন্ত্রিত হয় মাত্র।

অল্প মেয়াদের বাজারে তাহা হইলে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় কিরূপে? মার্শ্যালের বিবেচনায়,—"জোগান-মূল্য" এই বাজারের নিয়ন্তা। তবে জোগান-মূল্যেরও সবটুকু নয়,—একটা অংশ মাত্র এই বাজারের মূল্য নিরূপিত করে। সেই অংশের নাম "প্রাথমিক" খরচ ("প্রাইম কষ্ট্")। ইহার প্রথম দফা হইল কুদরত্তি মালের দাম। মজুরদের মজুরি দ্বিতীয় দফা। আর যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও ক্ষয়জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ হইল তৃতীয় দফা। এই তিন প্রকার খরচ অল্প-মেয়াদের বাজারে প্রভাব বিস্তার করে।

এই বাজারের উপর অন্যান্য খরচের প্রভাবও আছে। তবে বেশী নয়। সেই খরচকে মার্শ্যালের ভাষায় "স্পেশ্যালাইজ্‌ড্‌" বা বিশেষী-কৃত পুঁজির খরচ বলা হয়। ইহার ভিতর পড়ে নতুন-নতুন যন্ত্রপাতি কায়েমের খরচ, স্থায়ী দপ্তরের খরচ, স্থায়ী বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থার খরচ, নতুন-নতুন যোগাযোগ কায়েমের খরচ ইত্যাদি। এই সকল দফা "সাপ্লিমেণ্টারি" বা "পরিশিষ্ট"-খরচের অন্তর্গত। পরিশিষ্ট-খরচের অতি সামান্য অংশমাত্র অল্পমেয়াদি বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

মার্শ্যাল বলিতেছেন যে, অল্প-মেয়াদের বাজারে সময় এত কম যে, মালের উৎপাদন সামান্য মাত্র বাড়িতে পারে—কিন্তু উৎপাদনের বহর বাড়ে না বলিয়া ঊর্দ্ধগ ফলের ("ইন্‌ক্রীজিং রিটার্ণ্‌স্‌"এর) নিয়ম কাজ করিতে পারে না। অর্থাৎ জোগান-মূল্যের ঘাটতি দেখা দেয় না। সুতরাং চাহিদা বাড়িলে জোগান-মূল্য বাড়িয়া যায়।

অপর দিকে অল্পমেয়াদি বাজারে সময় এত কম যে, উৎপাদনের বহর কমানো অসম্ভব। কাজেই চাহিদা কমিলে জোগানমূল্য কমে না। যথাপূর্ব্বং তথাপরম্‌ থাকে।

মাঝারি-লম্বা মেয়াদের বাজার কিরূপ? সময় বেশ প্রচুর বলিয়া মাল তৈয়ারি করিবার সকল প্রকার সরঞ্জামই বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ পুঁজিকে পুঁজি, মজুরকে মজুর, আর কুদরত্তি মালকে কুদরত্তি মাল সবই আকারে-প্রকারে বাড়িয়া যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়িলে জোগান বাড়িয়া যায়। জোগানের উপর চাহিদার প্রভাব চরম।

এই বাজারে জোগান-মূল্যই মূল্য-নিয়ামক। জোগান-মূল্য বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সকল প্রকার খরচের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ প্রাথমিক খরচ এবং পরিশিষ্ট-খরচ,—দুই খরচের প্রভাবই প্রত্যেক

জিনিষের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। চাহিদা বাড়িলে জোগান-মূল্য কমিয়া যায়। কেননা বিশাল বহরের উৎপাদন কায়েম করা সম্ভব আর তাহার ফলে উর্দ্ধগ ফলের নিয়ম কাজ করিতে থাকে। কিন্তু চাহিদা যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে জোগান-মূল্য না বাড়িতেও পারে। কেন না, এত সময় পাওয়া যায় যে, তাহার ভিতর উৎপাদনের বহর কমাইয়া দেওয়া চলিতে পারে।

মাঝারি-লম্বা মেয়াদি বাজার সম্বন্ধে যে সকল কথা খাটে অতি-লম্বা —"সেকিউলার" (যুগব্যাপী) বাজার সম্বন্ধেও সেই সব কথাই খাটে। তবে আরও বেশী জবর রূপে। অর্থাৎ চাহিদা বাড়িলে জোগান-মূল্য কমে। কিন্তু চাহিদা কমিলে জোগান-মূল্য বাড়ে না।

স্থান হিসাবে তিন প্রকার আর কাল হিসাবে তিন প্রকার এই ছয় প্রকার বাজার বিষয়ক সূত্র বা ফর্ম্মুলাগুলা মার্শ্যালের "কল্পনাশক্তি" হইতে উদ্ভুত হয় নাই। বাজারে-বাজারে ভবঘুরে-গিরি করিতে-করিতে আর বাজার-বিষয়ক পত্রিকা ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে হরেক রকম মালের সন্ধান জুটিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুকে বাজাইয়া দেখিয়া তাহার কোষ্ঠী গণনা করা মার্শ্যালের আলোচনা-প্রণালীর গোড়ার কথা। এই জন্যই বস্তুমাত্রকে কোনো চির সত্য নিয়মের বশবর্ত্তী রূপে প্রচার করা তাঁহার মূল্যতত্ত্বে সম্ভবপর হয় নাই! ধনবিজ্ঞানে এই জন্যই মার্শ্যাল-রীতি একটা যুগান্তর আনিয়াছে।

বাড়্তিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রী এডুইন কেনান

ইংরেজ অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর এডুইন কেনান ভারতে যথেষ্ট নামজাদা নন মনে হইতেছে। সেকালে তাঁহাকে আমরা আডাম-স্মিথ-প্রেমিক বলিয়া জানিতাম। লড়াইয়ের যুগে তাঁহাকে বিলাতী অর্থনৈতিক

চিন্তার ইতিহাস-লেখক হিসাবে দেশবিদেশের লোক জানিতে পারে। কেননা ১৯১৭ সনে তিনি ধনোৎপাদন এবং ধন-বিতরণ বিষয়ক আধুনিক মতামতের (১৭৭৬-১৮৪৮) ধারা প্রকাশিত করেন।

মুদ্রাবিষয়ক একাধিক বইয়ের লেখক হিসাবেও তাঁহার নাম আছে। "মডার্ণ কারেন্সি" নামক বই বাহির হইয়াছে সেদিন। ১৯৩২ সনে। এই বইয়ে তিনি সাধারণ্যে প্রচলিত মতের চরম সমালোচক। জন্মহার, বৃদ্ধিহার ইত্যাদি লোকবল-বিষয়ক গবেষণায়ও তাঁহার মাথা খেলিতেছে অনেকদিন ধরিয়া। বর্ত্তমানে দেশ-বিদেশের লোকসমস্যা যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহার পূর্ব্বাভাষ তিনি ১৮৯৫ এবং ১৯০২ সনেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। ১৯৩৩ সনে প্রকাশিত "ইকনমিক স্কেয়ার্স্" (বা অর্থনৈতিক আতঙ্ক) নামক বইয়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে লোকসংখ্যা বিষয়ক নয়া-পুরাণা আলোচনা আছে।

কিন্তু কেনানের এইসকল রচনার কথা ছাড়িয়া আর একটা রচনার দিকে নজর ফেলিতে চাই। ১৯২৯ সনে তাঁহার "এ রিভিউ অব ইকনমিক থিওরি" (অর্থনৈতিক মতামত সমালোচনা) প্রকাশিত হইয়াছে। বইটা আকারে বেশ বড়। ধনবিজ্ঞানের মোটামোটা কয়েকটা সমস্যা—উৎপাদন, লোকবল, মূল্য, আয়, সুদ, মজুরি,—এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। প্রত্যেক সমস্যা সম্বন্ধে "মান্ধাতার আমল" হইতে আজ পর্য্যন্ত কে কি বলিয়াছে তাহার সংগ্রহ এই রচনার মাল। সংগ্রহের সঙ্গে-সঙ্গে টীকা-টিপ্পনী এবং সমালোচনাও দেওয়া হইয়াছে। মতে-মতে তুলনা পাইতেছি। প্রধানতঃ ইংরেজ অর্থশাস্ত্রীদের চিন্তাই আছে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে বিদেশী চিন্তার বহরও মন্দ নই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাল পর্য্যন্ত চিন্তাধারায় বিদেশীদের নামকাম বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না।

মোটের উপর বইটাকে ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে ইহা মতামতের ইতিহাস, মতপ্রচারক বা অর্থ-শাস্ত্রীদের ইতিহাস নয়। অধিকন্তু অর্থশাস্ত্রের অনেক বিভাগ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয় নাই। গ্রন্থের পরিধি ব্যাপক নয়।

কিন্তু এই রচনার উপকারিতা ঢের। ধনবিজ্ঞানসেবীরা বাজে কথার জঙ্গলে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয় না। প্রথমেই সরাসরি সমস্যাটার ভিতর ঢুকিয়া তাহার আলোচনায় যোগ দেওয়া সম্ভব হয়। কাজেই অর্থশাস্ত্রের একমাত্র তত্ত্বাংশ বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবে কেনানের বইটা যার পর নাই মূল্যবান্। ভারতবর্ষে এই বইয়ের ইজ্জৎ বাড়িলে আমাদের ধনবিজ্ঞান-গবেষকেরা লাভবান হইবেন। যাঁহারা বাংলায় অথবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অর্থ নৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখিতে অগ্রসর হইবেন তাঁহাদের পক্ষে কেনানকে অতি বিচক্ষণ পথপ্রদর্শক সমঝিতেছি।

গ্রন্থের উপসংহারে কেনান বর্ত্তমানের "অ্যাস্পিরেশন্‌স্ অ্যাণ্ড টেণ্ডেন্সীজ্" (লক্ষ্য ও গতি) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই অংশ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলে কেনানের মতি-গতি বুঝিতে পারা যাইবে। এক কথায় কেনানকে বাড়তি-নিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রী বলা যাইতে পারে।

কেনান বলিতেছেন যে, একালের আর্থিক জগতে সেকালের চেয়ে বেশী পরিমাণে সাম্য দেখা যায়।

বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক আর সার্ব্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে গরীবেরা বড় লোকদের কাছাকাছি উঠিবার সুযোগ পাইতেছে। পূর্ব্বে এই সকল সুযোগ ছিল না। কাজেই শ্রেণীতে-শ্রেণীতে অসাম্য আজ-কাল খানিকটা কমিয়া আসিয়াছে।

গরীবদের উপর একালে যে-হারে কর চাপানো হইয়া থাকে ধনীদের উপর তাহার চেয়ে চড়া হারে কর চাপানো হয়। কাজেই ধনদৌলতের বিতরণে যে-অসাম্য সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে তাহার কিছু-কিছু খণ্ডন সম্ভবপর হইয়াছে।

কেনান বলিতেছেন,—অবশ্য আজও একটা কথা সর্ব্বদা চোখে পড়িতেছে। আয়ের উপর যতই চড়া হারে কর চাপানো হউক না কেন সে সব দিবার পরও সর্ব্বোচ্চ আয়গুলা অতি উঁচু থাকিয়া যায়। সর্ব্বোচ্চ আর সর্ব্বনিম্ন আয়ে ফারাক্‌ অসম্ভব রকমের। কিন্তু এই ফারাকটা দেখিবামাত্র আয়ের অসাম্য বাড়িতেছে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক হইবে না। সর্ব্বোচ্চ আর সর্ব্বনিম্নগুলার কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই যে, এই এই দুই সীমানার ভিতরকার আয়গুলা অনেকটা ঘেঁশাঘেঁশি করিয়া মাঝখানে আসিয়া জমিয়াছে। "গড়" হইতে সর্ব্বোচ্চের আর সর্ব্বনিম্নের প্রভেদ বিপুল সন্দেহ নাই। কিন্তু গড়টা নিজেই বেশ উঁচু। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ধনদৌলতে,—আয়ের পরিমাণে—সমতা-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

কেনানের বিবেচনায়,—একালের অবস্থাটা সোশ্যালিষ্টদের কল্পিত অবস্থার ঠিক উল্টা। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ধনদৌলত ক্রমে ক্রমে দুচার জন লোকের হাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইতে থাকিবে, অপর দিকে "রুটি-সীমা"য় অর্থাৎ দারিদ্র্যের কোঠে বিরাজ করিবে লক্ষ লক্ষ নরনারী।

কেনান বলেন,—বাস্তবিক পক্ষে দেখা যাইতেছে যে, আর্থিক ক্রম-বিকাশের ফলে "মধ্যবিত্তে"র বহর যারপরনাই বাড়িয়া গিয়াছে।

আর এক কথা। একাল-সেকালের তুলনায় ধনী আর গরীবের ভিতর আয়ের পরিমাণে প্রভেদ মাত্র লক্ষ্য করা ঠিক হইবে না।

কেনান বলেন,—সেকালের গরীব লোক আর একালের গরীব লোক আয়ের বহর হিসাবে হয়ত অনেকটা একপ্রকারের জীব। কিন্তু একালের নির্দ্ধন নরনারী জীবনযাত্রার খুঁটিনাটিতে মানুষের মতন বাঁচিয়া রহিয়াছে। সেকালের নির্দ্ধনেরা পশুর মতন ঘৃণ্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত। বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে কেনান-প্রচারিত এই মতটা হজম করা সহজ নয়। কেন না একালের গরীবেরাও অশেষ আর্থিক দুর্গতি ভুগিতেছে।

বর্ত্তমানের আর্থিক জগৎ সম্বন্ধে কেনানের দ্বিতীয় কথা হইল সাহস-বৃদ্ধি ও নিরাপদ এবং স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রসার।

আজকালকার দিনে সম্পত্তি নিরাপদ করিবার অথবা রাখিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। একালে ধনীরা, পুঁজিপতিরা, বেপারীরা এক সঙ্গে নানা কারবারে টাকা খাটাইতে অথবা গচ্ছিত রাখিতে সমর্থ। কাজেই প্রত্যেকের ঝুঁকি—অর্থাৎ লোকসানের সম্ভাবনা—অনেক কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উপর ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য অল্পমাত্র পুঁজির মালিকের পক্ষে এইরূপ ঝুঁকি-বণ্টন সুসাধ্য নয়।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখিবার ফলে মজুরেরাও অনেক সময়ে ঝুঁকি বণ্টনের সুফল ভোগ করিতে সমর্থ। অর্থাৎ দরকার হইলে এক কারবারে নকৃরি ছাড়িয়া অথবা এক কারবার হইতে বরখাস্ত হইয়া অন্য কারবারে নকৃরি ঢুঁড়িতে যাওয়া,—আসল কথা নকৃরি পাওয়া অসম্ভব নয়।

ঝুঁকি-বণ্টন বা ঝুঁকি-বিস্তার একমাত্র ব্যক্তিগত রূপে সাধিত হইতেছে এইরূপ ভাবিবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ ঝুঁকি-বণ্টনকে প্রধানতঃ সঙ্ঘবদ্ধ আকারেই দেখিতে পাই। বীমা-ব্যবসাটা বহু কারবারে এক-একটা লোকসানের দায়িত্ব বাঁটিয়া .দেওয়া ছাড়া

আর কিছু নয়। সমুদ্রবীমা, অগ্নিবীমা, জীবনবীমা ইত্যাদি সব-কিছুর ফলে একালের আর্থিক জীবনে একটা নিশ্চিন্ত অবস্থা আসিয়াছে। এই কথাটার উপর জোর দিয়া কেনান নৈরাশ্যবাদীদের চোখ খুলিয়া দিয়াছেন বলা যাইতে পারে।

সঙ্ঘবদ্ধ বীমা-ব্যবসা আবার সরকারী তাঁবেও পরিচালিত হইতেছে। একদিকে ব্যাধিবার্দ্ধক্য-বীমা অপর দিকে বেকার-বীমা মানুষকে অনেকটা "হেসে-খেলে" জীবন ধারাণ করিবার সুযোগ দিতেছে। সমাজ-বীমার কারবার ক্রমশঃ গবর্মেণ্টের অধীনে আসিয়া পড়িয়াছে। সকল দিক হইতেই বলা যাইতে পারে যে, নিশ্চিন্ত জীবন বা উদ্বেগহীন কাজকর্ম একালের অন্যতম বিশেষত্ব। কেনানের বই পড়িলে মনে হইবে যে, একমাত্র ভারতেই নয়, এমন কি বিলাতেও একালের "সু"গুলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করা আবশ্যক হয়।

কেনানের বিবেচনায়, একালের আর্থিক জগৎ সম্বন্ধে তৃতীয় কথা এই যে, নরনারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে। মান্ধাতার আমল হইতে ফরাসী অর্থশাস্ত্রী কাঁতিলঁ আর এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির জন ষ্টুয়ার্ট মিল পর্য্যন্ত মজুর মাত্রকেই "পরাধীন" জীব,—ঠিক যেন অনেকটা গোলাম—বিবেচনা করা হইত। তাহারা মুনাফা ভোগ করিতে অধিকারী নয় বলিয়া তাহাদিগকে গোলাম শ্রেণীর সামিল করা হইত। এই পরাধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য মিল সমাবায়-প্রথায় ধনোৎপাদনের কাজ ফাঁদিবার উদ্দেশ্যে নরনারীকে পরামর্শ দিতেন। মুনাফার হিস্যা দেওয়া নীতিও মিলের পাঁতি মাফিক কাজ বিবেচিত হইত।

কেনান বলিতেছেন যে, "একালে" মজুর ও কেরাণীদিগকে পরাধীন বা গোলাম বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। রেলে আর ডাকঘরে যত

লোক কাজ করে বিলাতের আর কোনো কারবারে তত লোক কাজ করে না। অথচ রেলের বড়-কর্ত্তারা কিম্বা ডাকঘরের বড়-কর্ত্তারা এই দুই কারবারে মুনাফার হিস্যা ভোগ করিতে অধিকারী নয়। অপরদিকে রেলের কুলী আর ডাকঘরের পিয়নও যে-হিসাবে "নওকর" বা কোম্পানীর চাকর, বড়-কর্ত্তাও ঠিক সেই হিসাবেই "নওকর" বা কোম্পানীর চাকর। বস্তুতঃ কারবারগুলার উচু-নীচু কোনো প্রকার চাকরকেই পরাধীন বা গোলাম রূপে বিবৃত করা সাজিবে না। মিল-মজুরি-ভোগী অথবা বেতনভোগী মানুষমাত্রকে গরীব, নির্য্যাতিত পদ-দলিত জীব বিবেচনা করিতেন। আজকাল এইরূপ করিতে বসিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এইরূপ হইল মিল বিষয়ক কেনানের সমালোচনা।

অপর দিকে মিলের বিবেচনায় নিয়োগকর্ত্তা মাত্রই ধনী লোক। কেনান বলিতেছেন, "একালে" এইরূপ বিবেচনা করা নেহাৎ ছেলে-মানুষি। সরকারী দপ্তরগুলায় যাহারা ছোট-বড়-মাঝারি চাকরি করে তাহাদের নিয়োগকর্ত্তা বা মনিব কে বা কাহারা? যাহারা ট্যাক্স দেয় তাহারা। প্রত্যেক দেশেই ট্যাক্স দেয় নেহাৎ গরীব ও মধ্যবিত্ত নরনারী। বুঝিতে হইবে যে, একালের নিয়োগকর্ত্তারা সকলেই মস্ত মস্ত ধনী লোক নয়। সরকারী, মিউনিসিপ্যাল এবং অন্যান্য "নিম্"-সরকারী দপ্তরের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক কোম্পানীগুলা চালাইতেছে কাহারা? তাহারা সকলেই "খুদ কুড়াইয়া বেলে"র মালিক। অর্থাৎ "ক্ষুদে" পুঁজিপতিরা প্রত্যেকে পাঁচ-সাত-দশ-বিশ টাকার শেয়ার কিনিয়া কোম্পানী খাড়া করে আর তাহারাই কোম্পানীর কুলী-কেরাণী-কর্ম্মচারীর নিয়োগকর্ত্তা। দেখা যাইতেছে যে, একালের চাকুরেরা কোনো ধনী বিশেষের অথবা সঙ্ঘবিশেষের

স্বার্থে নিজের গতর খাটাইতে বাধ্য হয় না। অর্থাৎ চাকরেদের "রক্ত শোষণ" করা হইতেছে এরূপ বলা ঠিক নয়। বস্তুতঃ চাকরেরা যদি কোনো লোকের স্বার্থ দেখিতে বাধ্য থাকে তবে তাহা মাল-ক্রেতাদের, খরিদ্দারদের অর্থাৎ সমগ্র সমাজের স্বার্থ। আর সেই সমাজের অন্তর্গত লোক তাহারা নিজেই। কেনানের এইরূপ চিন্তাপ্রণালী জগতের সর্ব্বত্রই মঙ্গলকর।

অধিকন্তু কেনেনের মতে আগেকার দিনে,—এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিও ঝী-রাঁধুনিদের কষ্টের সীমা ছিল না। মেজের তলা হইতে তাহারা চার তলার উপর কয়লা আর লাকড়ি ঠেলিয়া তুলিতে অভ্যস্ত ছিল। আর তখনকার দিনে কলের জল থাকিত নীচ তলায়। জল ঠেলিতে হইত চার তলা পর্য্যন্ত। সেই দুর্দ্দিন বর্ত্তমানে আর নাই। তঙ্খাভোগী মজুরেরা ক্রমেই আর্থিক স্বচ্ছন্দতার বাড়্তি চাখিতে-চাখিতে অগ্রসর হইতেছে।

কেনান বর্ত্তমান-নিষ্ঠার চরম দেখাইতেছেন। মজুর-কেরাণীর শ্রেণীতে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি ঘটিয়াছে একথা আজকাল অনেকেই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ধনীদের তুলনায় অ-ধনীদের অবস্থা, উপরওয়ালাদের তুলনায় নীচুদের অবস্থা অনেকটা যে-কে-সেই রহিয়া গিয়াছে কিনা তাহার বস্তুনিষ্ঠ ও সংখ্যানিষ্ঠ গবেষণা চালানো আবশ্যক। অবস্থাটা যে প্রায় পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে তাহা বোধ হয় ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহ বুঝিবে না। একালের বিলাতী "চাকর-বাকর" তাহাদের "গিন্নী-মা"কে আর কেরাণী-কর্ম্মচারী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক "বড়বাবু"কে কি চোখে দেখে তাহা কেনান পুরাপূরি বুঝিয়াছেন কি না সন্দেহ। হয়ত জন ষ্টুয়ার্ট মিল "সেকালে" যে-প্রভেদ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন একালেও সেই প্রভেদের কাছাকাছি অবস্থাই বিরাজ

করিতেছে। বিষয়টা তর্কা-তর্কির সমস্যায় ভরা। অন্যান্য অনেক বিষয়ে কেনানকে যতটা সুবিবেচক সমঝিয়াছি এই উচ্চ-নীচের সামাজিক সম্বন্ধ বিষয়ক বিশ্লেষণ ব্যাপারে তাঁহাকে ততটা সুবিবেচক মনে করিতে পারি কি না সন্দেহ। তবে কেনান বর্ত্তমানের অবস্থাকে আদর্শ অবস্থা বিবেচনা করেন না এই কথাটাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান লেখক প্রণীত "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" (১৯৩২) আর "বাড়্তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) গ্রন্থাবলীতে উন্নতির লক্ষণগুলা খুঁটিয়া-খুটিয়া দেখানো হইয়াছে। "গ্রীটিংস টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (১৯২৭) বইয়েও তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া অস্বাস্থ্য, পাতিত্য, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ইত্যাদি দুরবস্থাগুলা সম্বন্ধে অন্ধ থাকা সম্ভবপর হয় নাই। সেই সবও সর্ব্বদাই চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইয়াছে। এইরূপ অনুসন্ধান-প্রণালী লইয়া একালের বিলাতী অথবা অন্যান্য ইয়োরামেরিকান দেশের বিশ্লেষণ সুরু করিলে যে-কোনো গবেষকের পক্ষে আধুনিক গরীবদের হাজার প্রকার "আধি-ব্যাধি"-গুলা সম্বন্ধে অন্ধ থাকা সম্ভবপর হইবে না।

এই সম্বন্ধে একালের মার্শ্যাল, হব্সন, পিগু আর কেনান সকলেই পাকা সমঝদার। কেহই একচোখো বাড়্তি-নিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি নন। সমাজ-ও-রাষ্ট্রশাস্ত্রী হবহাউসও এই দলেরই অন্তর্গত। প্রত্যেকেরই চিন্তাক্ষেত্র এবং আলোচনা-প্রণালী বিভিন্ন। কিন্তু উন্নতিতত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠায় তাঁহারা সকলেই এক জাতের লোক। অর্থাৎ প্রত্যেকেই উন্নতির ফিরিস্তি দিবার সময় "অপর পিঠ" দেখিতেও অভ্যস্ত।

সমসাময়িক বিলাতী অর্থশাস্ত্রের ও সমাজশাস্ত্রের ইহা একটা মস্ত কথা। ইংরেজ সমাজশাস্ত্রী ও অর্থশাস্ত্রীদের এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে সজাগ

হইলে ভারতীয় সমাজশাস্ত্রী ও অর্থশাস্ত্রীদের আত্মিক উপকার সাধিত হইবে বিস্তর।

জাপানী অর্থশাস্ত্রীর দল

বিলাতে আছে "রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল অ্যাফেয়ার্স" (রাজকীয় আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা পরিষৎ)। আমেরিকানরা কায়েম করিয়াছে "ফরেণ অ্যাফেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন" (বিদেশী ঘটনা সমিতি)। ইয়োরামেরিকার প্রায় দেশেই এইরূপ সভা বা সঙ্ঘ আছে। জাপানীরাও একটা কায়েম করিয়াছে। ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে তোকিওর "ফরেণ অ্যাফেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশান অব জাপান" (জাপানের বিদেশী ঘটনা পরিষৎ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের তদবিরে একটা ত্রৈমাসিক চলিতেছে। নাম "কন্‌টেম্পোরারি জাপান" (সমসাময়িক জাপান)। ইংরেজিতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক।

সোবুন ইয়ামামুরো ১৯২৩ সন হইতে মিৎসুবিশি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাহার পূর্ব্বে তিনি এই ব্যাঙ্কের নিউয়র্ক আর লণ্ডনের শাখায় কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। "জাপানের টাকার বাজার" আর "আমেরিকা ও বিলাতের টাকার বাজার" ইত্যাদি রচনার জন্য ও ইয়ামামুরোর নাম আছে। তোকিও হইতে প্রকাশিত "কণ্টেম্পোরারি জাপান" পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৯৩২, জুন) তিনি আর্থিক দুর্য্যোগ সম্বন্ধে জাপানের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়াছেন।

লড়াইয়ের যুগে (১৯১৪-১৮) জাপানীরা আমদানির চেয়ে ১,৪৪০, ০০০,০০০ ইয়েন বেশী মূল্যের মাল রপ্তানি করিয়াছিল। কিন্তু লড়াইয়ের পর ১৯১৯ হইতে ১৯২৯ পর্য্যন্ত রপ্তানির চেয়ে আমদানি

ছিল মোটের উপর ৪,২০০,০০০,০০০ ইয়েন বেশী। এই গেল প্রথম দুর্য্যোগ। দ্বিতীয় দুর্য্যোগ দেখা যায় শিল্পবাণিজ্যে পুঁজি খাটাইবার ক্ষেত্রে। লড়াইয়ের যুগে কারখানায়-কারখানায় যে পরিমাণ পুঁজি লাগানো হইতেছিল পরবর্ত্তী যুগেও সেই পরিমাণ পুঁজি খাটানো চলিতেছিল। অর্থাৎ "অতি-পুঁজি"র (ওভার-ক্যাপিট্যালিজেশন) ব্যাধি কারবারের দুনিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য পুঁজির অনুপাতে লভ্যাংশ জুটিত না।

তৃতীয় দুর্য্যোগ সোনার আমদানি-রপ্তানি সম্বন্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা। ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত "এম্বার্গো" (রপ্তানি-নিষেধ) ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সনের জানুয়ারি মাসে নিষেধ রদ করা হয়। সোনা বাহির হইয়া যাইতে থাকিল। ১৯৩০ সনের জানুয়ারি মাসে ব্যাঙ্ক অব জাপানের মজুদ সোনা ছিল ১,০৮০,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের। কিন্তু এম্বার্গো-রদের ফলে ১৯৩১ সনের আগষ্ট মাসে মজুদ নামিয়া আসে ৮১০,০০০,০০০ ইয়েন পর্য্যন্ত। কাজেই ব্যাঙ্ক নোট-জারি কমাইতে বাধ্য হয়। ১,২০০,০০০,০০০ ইয়েন হইতে নোটের পরিমাণ ৯০০,০০০,০০০ ইয়েন পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকে।

নোট-জারিতে ঘাটতির ফলে বাজারের জিনিষপত্রের দামও কমিতে থাকে। ১৯২৯ সনের জুলাই মাসে মূল্যসূচী ছিল ১৭৪·৬ কিন্তু ১৯৩১ সনের আগষ্ট মাসের সূচী ১২০·৭এ আসিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ বাজার-দর শতকরা ৩১ কমিয়া যায়। মূল্য-হ্রাস আর আর্থিক মন্দা প্রায় একার্থক। *যাহা বাজারে দর-কমা তাঁহা শিল্প-বাণিজ্যে উৎরাই।*

১৯২৯ সনে ব্যাঙ্কের চেক-খালাস হইত ৬৩,১০০,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের। ১৯:১ সনে খালাস হইয়াছিল মাত্র ৪৫,৯০০,০০০,০০০ ইয়েন।

অধিকন্তু আমদানি-রপ্তানিও শতকরা ৫০ অংশ কমিয়া গিয়াছিল। ১৯২৯ সনে আমদানি-রপ্তানির সমবেত কিম্মৎ ছিল ৪,৬০০,০০০,০০০ ইয়েন। ১৯৩১ সনে কিম্মৎ দাঁড়ায় মাত্র ২,৪০০,০০০,০০০ ইয়েন।

আমদানি-রপ্তানির ঘাট্‌তি সুরু হইবামাত্র মাল-উৎপাদনের কারবারেও ঘাট্‌তি দেখা দেয়। ফলতঃ কারখানায়-কারখানায় লোক বরখাস্ত-কাণ্ড অর্থাৎ বেকার সমস্যা। সঙ্গে-সঙ্গে গবর্মেণ্টও ব্যয়-সঙ্কোচ পর্ব্বে হাত দিতে থাকে। কাজেই লোকজনের হাতে ক্রয়শক্তি কমিয়া আসে। সুতরাং অর্থনৈতিক দুর্য্যোগের ষোলকলা পূর্ণ হইতে আর কিছু বাকি রহিল না।

এই অবস্থায় লোকেরা দিশেহারা হইয়া পড়িল। ঘটনাচক্রে ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাতী গবর্মেণ্ট সোনা-ছাড়া বন্ধ করিয়া করিয়া দিল। দেখা-দেখি জাপানেও আন্দোলন সুরু হইল। ফলতঃ মন্ত্রি-পরিবর্ত্তন। নয়া মন্ত্রিপরিষৎ গদিতে বসিয়া সোনা-ছাড়া বন্ধ করিয়া দিল (ডিসেম্বর ১৯৩১)।

"কণ্টেম্পোরারি জাপান" ত্রৈমাসিকের ১৯৩২ সনের জুন সংখ্যায় দেখিতেছি যে,—জাপানীদেরও একটা "ফাইভ-ইয়ার-প্ল্যান" বা বর্ষপঞ্চকের মোসাবিদা আছে। এই মোসাবিদা সুরু হইয়াছিল সেই-য়ুকাই দলের মন্ত্রীপরিষদের তাঁবে ১৯৩০ সনে। এই বিষয়ে অনুসন্ধান-গবেষণার জন্য যে কমিটি বাহাল হইয়াছিল, তাহার কর্ত্তা ছিলেন জোতারো ইয়ামামোতো। ইনি মিৎসুই বুস্‌সান কাইশা নামক বিপুল বণিক্‌-কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। বর্ষপঞ্চকের বৃত্তান্ত নিম্নরূপ। গবর্মেণ্টের তহবিল হইতে ফি বৎসর ৫০,০০০,০০০ ইয়েন করিয়া পাঁচ বৎসরে ২৫০,০০০,০০০ ইয়েন খরচ করা হইবে।

শিল্পনিষ্ঠার বাড়্‌তি-সাধন অন্যতম বড় লক্ষ্য। এই জন্য বিদেশ

হইতে আমদানি কমাইতে হইবে স্থির হইয়াছে। মোসাবিদা নিম্নরূপ—

	মাল	বর্ত্তমানে আমদানি কত ইয়েন (০০০)	স্বদেশী মালের উৎপাদন কতটা বাড়ানো সম্ভব (০০০)
১।	লোহা	৯৫,৫৩৩	৯৫,৫৩৩
২।	যন্ত্রপাতি, অটোমোবিল, ষ্টীমার ইত্যাদি	১২০,০৯০	৮৩,১৪৫
৩।	অ্যালুমিনিয়ুম, দস্তা	১৪,৫৫৩	১২,০৫৫
৪।	রাসায়নিক দ্রব্য	৭১,৮২৯	৫৭,৩২৩
৫।	সুতা ও সুতার জিনিষ	৪২১,০২৩	৭১,৪২৪
৬।	চিনি, তামাক, কাঠ	১৩৬,১২৪	৮২,৮৪৮
৭।	কৃষিজাত দ্রব্য ও জানোয়ার	২৫১,৭৬৯	১৯৫,১০৩
৮।	সার	৯৮,৭০০	৪৭,৭৯০
	মোট	১,২০৯,৬২১	৬৪৫,২২১

শিল্প-কারখানাই বর্ষ-পঞ্চকের মোসাবিদার একমাত্র দফা নয়। অন্যান্য দিকেও নজর আছে।

কোন্ কারবারে গবর্মেণ্টের অর্থ-সাহায্য কত তাহার ফর্দ্দ ইয়ামামোতোর প্রবন্ধে নিম্নরূপ—

কারবার	বার্ষিক সরকারী সাহায্য কত ইয়েন (০০০,০০০)	বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি কত ইয়েন (০০০,০০০)
১। চাউল, গম ইত্যাদি	৩০	১৫০
২। পশম ও কাঁচা রেশম	২০	২০০
৩। জানোয়ার	১০	১০
৪। সামুদ্রিক দ্রব্য	১০	৫০
৫। বনজ দ্রব্য	১০	৪০
৬। ধাতু	১০	৪০
৭। শিল্প-কারখানা	২৪	৪০০
৮। বয়ন-শিল্প	৬	১০০
মোট	১২০	১,০০০

ইয়ামামোতো বলিতেছেন যে, জাপান সরকারকে ফি বৎসর পাঁচ কোটি ইয়েন তুলিবার জন্য বেশী মাথা ঘামাইতে হইবে না। কিছু অতিরিক্ত হারে কর বসাইলেই চলিবে। ইয়োরামেরিকার অধিকাংশ দেশেই এইরূপ কর চাপানো হইয়া থাকে। জাপানের বড় লোকেরা এই সব কর দিতে নারাজ হইবে না।

সেইচি কোজিমা তোকিওর হোজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। "জাপানের ব্যাঙ্ক-পুঁজি", "বিলাতের ব্যবসা-প্রণালী", "শিল্পক্ষেত্রে যুক্তিযোগ" ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে কোজিমা জাপানে সুপরিচিত। অন্যান্য অনেক-কিছুর ভিতর মাঞ্চুকুও'র সঙ্গে জাপানের আর্থিক "জোট" কায়েম করায় তাঁহার আগ্রহ খুব বেশী। এই জন্য

জাপানী পুঁজিপতিদিগকে তিনি মাঞ্চুকুঅ'র চাষ-আবাদে, খনিতে, রেলে, শিল্প-কারখানায় টাকা ঢালিতে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

জাপানের অন্যতম ভারত-বিশেষজ্ঞের নাম সেইতারো কামিসাকা। ইনি "জাপান কটন স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন" নামক তুলার সূতার কল বিষয়ক সঙ্ঘের সম্পাদক। "ভারতবর্ষে উঁকি-ঝুঁকি" নামক একখানা বই তাঁহার লেখা। "আধুনিক জাপানের তুলার কল ও মজুর-নামক আর একখানা বইও সুপরিচিত। ভারতবর্ষে যে জাপানের বিরুদ্ধে চড়াহারে শুল্ক বসানো হইয়াছে এই বিষয়ে জাপানী নরনারীকে খবর দেওয়া তাঁহার রচনাবলীর অন্যতম মুদ্দা। এই জাপান-বিরোধী শুল্কের জোরে ভারতীয় বয়নশিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে না এইরূপই তাঁহার বিশ্বাস। অধিকন্তু তাহাতে জাপানী তুলা-মজুর আর ভারতীয় তুলাচাষীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

রাজস্বশাস্ত্রী ওহুচি

১৯৩২ সনের মে মাসে অ্যাডমিরাল সাইতো মন্ত্রি-পরিষৎ কায়েম করিয়াই যে বাজেটের ফর্দ্দ জারি করেন তাহাতে তিন বৎসরে ৮০০,০০০,০০০ ইয়েন অতিরিক্ত খরচ হইবার কথা। এই অতিরিক্ত খরচ করা হইবে গবর্মেণ্টের তাঁবে নতুন-নতুন কারবার অথবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য। কারবার ও প্রতিষ্ঠানগুলা তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্বশাস্ত্রী হিয়োয়ে ওহুচি নিম্নের তালিকায় বিবৃত করিয়াছেন ("কন্‌টেম্পোরারি জাপান", ডিসেম্বর ১৯৩২):—

১। রাস্তাঘাট তৈয়ারি, বাড়ানো বা মেরামত ইত্যাদি।

২। সামরিক সরঞ্জাম, জাহাজ ও রেল।

৩। প্রাথমিক পাঠশালার জন্য সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি।

সাধারণতঃ ৮৫,০০০,০০০ ইয়েন এই জন্য ফি বৎসর খরচ হয়। এই বৎসর আরও ১৩,০০০,০০০ ইয়েনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ভিতর ১,০০০,০০০ ইয়েন খরচ হইবে গরীব ছেলেদেরকে ইস্কুলে তুপুর বেলা খাবার জোগাইবার জন্য।

৪। গবর্মেণ্টের ভাণ্ডারে চাউল কিনিয়া রাখিবার ব্যবস্থা বাড়ানো হইয়াছে। চাউলের দাম অত্যধিক কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া চাষীরা হায়-হায় করিতেছিল। এই তুর্য্যোগ নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট ৩৫০,০০০,০০০ ইয়েন খরচ করিয়া চাষীদের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ ন্যায্য দামে চাউল কিনিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এখন অতিরিক্ত বাজেটের ফলে আরও ১০০;০০০,০০০ ইয়েন এই উদ্দেশ্যে খরচ করা সম্ভব হইবে।

অধিকন্তু আরও ৮০০,০০০,০০০ ইয়েন তিন বৎসরের ভিতরই খরচ করা হইবে। এই খরচের মতলব ঋণগ্রস্ত চাষী, শিল্পী ইত্যাদি লোক-জনকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া। ওহুচির ফর্দ্দে দেখিতেছি নিম্নরূপ হিসাব :—

১। জেলা, শহর বা পল্লীর সরকারী ও নিম-সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈয়ারি বা মেরামত করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট হইতে শতকরা ৪২ ইয়েন হিসাবে কর্জ্জ পাইবে।

২। স্থাবর সম্পত্তি খালাস করিবার জন্য লোকেরা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে অল্প সুদে কর্জ্জ পাইবে।

৩। পল্লীশিল্প বা কুটির-শিল্প বিষয়ক সঙ্ঘগুলার পুঁজির পঞ্চমাংশ আটক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরিমাণ প্রায় ৩০০,০০০,০০০ ইয়েন। সঙ্ঘগুলার গচ্চা মিটাইবার জন্য গবর্মেণ্ট ৩০,০০০,০০০ ইয়েন পর্য্যন্ত খয়রাত করিতে প্রস্তুত আছে! তাহা ছাড়া অল্প সুদে কর্জ্জ দিয়াও তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে।

৪। চাষী, কুটিরশিল্পী ও পল্লী-বণিকেরা পুরানা দেনা শুধিতে অসমর্থ। এই সকল দেনা যাহাতে তাহারা কিছু কালের জন্য শুধিতে বাধ্য না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদিগকে অল্প সুদে সরকারী কর্জ্জ দেওয়াও হইবে।

৫। পল্লী-বণিক্ ও কুটীর-শিল্পীদিগকে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলা টাকা ধার দেয় না। এই জন্য গবর্মেণ্ট মফঃস্বলের সরকারী কর্ম্মকেন্দ্রের মারফৎ অল্প সুদে কর্জ্জ দিবার ভার লইয়াছে। জন প্রতি ৫,০০০ হইতে ১০,০০০ ইয়েন পর্য্যন্ত এইরূপ কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারিবে।

দেখা যাইতেছে যে, সাইতো মন্ত্রি-পরিষদের অতিরিক্ত বাজেটের মূল্য দুই দফায় ১,৬০০,০০০,০০০ ইয়েন। প্রথম দফা সরকারী তাঁবে কারবার চালানো। দ্বিতীয় দফা অল্প সুদে কর্জ্জ দেওয়া। দ্বিতীয় দফাটাকে মোটের উপর ঋণগ্রস্ত অথবা মূল্যহ্রাসের দরুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত চাষীর জন্য গবর্মেণ্টের দরদরূপে বিবৃত করা উচিত।

তাহার উপর আর এক দফা আছে। কাঁচা রেশম বস্তাবন্দি-রূপে পড়িয়া রহিয়াছে। বিক্রী হইতেছে না। ৯,৮০০ গাঁটের কোনো গতি হইতেছে না। ব্যাঙ্ক সমূহের নিকট এই সমুদয় বন্ধক রহিয়াছে। এইগুলার ক্রেতা জুটিতেছে না বলিয়া গবর্মেণ্ট স্বয়ং খরিদ করিতে প্রস্তুত আছে। গাঁট প্রতি ৪৫০ ইয়েন দেওয়া হইবে। গবর্মেণ্ট এই বাবদ ৪০,০০০,০০০ ইয়েন খরচের দায়িত্ব লইয়াছে।

ওহুচি সরকারী রাজস্বনীতির স্বপক্ষে মত দিতে রাজি নন। তিনি বলিতেছেন যে, চাষীদের মা-বাপ সাজিয়া গবর্মেণ্ট ৮০০,০০০,০০০ ইয়েন অল্প সুদে কর্জ্জ ছড়াইতে ঝুঁকিয়াছেন বটে। কিন্তু ইহাতে চাষীদের উপকার হইবে কিনা সন্দেহ। ১৯২৯ সনে হিপথেক ব্যাঙ্কের তদন্তে জানা যায় যে, জাপানী চাষীদের কর্জ্জের পরিমাণ

৭,০০০,০০০,০০ ইয়েন। কিন্তু প্রথম বৎসর গবর্মেণ্টের মুরোদ মাত্র ২৯০,০০০,০০০ ইয়েন পর্য্যন্ত কর্জ্জ দেওয়া। কাজেই খুব কম লোকেরই উপকার হইবে। অধিকন্তু একমাত্র স্থাবর সম্পত্তিওয়ালারাই কর্জ্জের অধিকারী হইতে পারিবে বুঝা যাইতেছে। ১,৫০০,০০০ চাষীর কোনো উপকার হইবে না। অর্থাৎ সমগ্র চাষী সমাজের শতকরা ২৬·৩ অংশ একদম বাদ পড়িবে। পরিবার প্রতি ইহাদের কর্জ্জের পরিমাণ ৬০২ ইয়েন। তাহা ছাড়া রহিয়াছে ২,৩০০,০০০ ছোট্ট মালিক। তাহাদের কর্জ্জ ফি পরিবারে ৮৭৩ ইয়েন। সমগ্র চাষী সমাজের ইহারা শতকরা ৪২·৩ অংশ। নতুন রাজস্বের ব্যবস্থায় ইহাদেরও কোনো লাভ হইবে না।

সরকার হইতে দেওয়া কর্জ্জের টাকা প্রথম অবস্থায় জমির মালিকদের ঘরে গিয়া হাজির হইবে। তাহারা ব্যাঙ্কের মারফৎ নিজ নিজ জমি খালাস করিতে পারিবে। শেষ পর্য্যন্ত টাকাগুলা গিয়া ঠেকিবে শহরের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানে। ব্যাঙ্কগুলাও এত টাকা লইয়া কি করিবে? তাহারা হিপথেক ব্যাঙ্কের জারি-করা কর্জ্জ-পত্র কিনিয়া ঐ ব্যাঙ্কের পায়া ভারী করিয়া দিবে। ইহাতে শহুরে লোকের সম্পদ্ বাড়িবে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু চাষীর আর্থিক উন্নতি অনেক দূরের কথা।

অধিকন্তু সরকারী রাজস্বনীতির ফলে টাকার চলাচল প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। ইহার নাম "ইন্‌ফ্লেশ্যন" (টাকাকড়ির অতি-জোগান)। ফলতঃ মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কৃষিজাত দ্রব্যের দামও বাড়িবে বটে, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের দামও বাড়িয়া যাইবে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র দেখা গিয়াছে যে, শিল্পজাত দ্রব্যের দাম যে-হারে বাড়ে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম সেই হারে বাড়ে না। সুতরাং চাষীরা সার, যন্ত্রপাতি

ইত্যাদি যে সকল জিনিষ কিনিতে বাধ্য সেই সমুদয়ের দাম যত বাড়িবে তাহারা যে-সকল জিনিষ বিক্রী করে সেই সমুদয়ের দাম তত বাড়িবে না। কাজেই চাষীদের পক্ষে জীবনযাত্রা কষ্টকর হইতে বাধ্য।

ইংরেজি ভাষায় জাপানী অর্থশাস্ত্রীদের রচনার পরিমাণ ক্রমে-ক্রমে বাড়িতেছে। কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের মারফৎ জাপানীদের ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য পুষ্ট হইতেছে। একটার নাম ইন্‌ষ্টিটিউট অব প্যাসিফিক রেলশন্‌সের জাপানী কাউন্‌সিল। প্রশান্ত মহাসাগর পরিষৎ ১৯২৫ সনে কায়েম হয়। এই আন্তর্জ্জাতিক পরিষদের কেন্দ্র-দপ্তর হাওয়াই দ্বীপের হনলুলু নগরে অবস্থিত। দুই-দুই বৎসর পর-পর পরিষদের বৈঠক বসে। এই সকল বৈঠকে জাপানীরা মগজ খাটাইতে বাধ্য। কেন না প্রশান্ত মহাসাগরের আসল সমস্যাই জাপানী সমস্যা। এই সূত্রে জাপানীদের অর্থ-ও রাষ্ট্রশাস্ত্র ইংরেজিতে দেখা দিতেছে। পরিষদের জন্য লিখিত রচনাবলীকে পত্রিকা বিবেচনা করা চলিবে না। কিন্তু নিয়মিতরূপে বাহির হয় বলিয়া রচনাসমূহকে সাময়িক অর্থ-সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়া লওয়া চলে। সম্প্রতি একটা রচনার দিকে নজর ফেলিব, সেটা তেইজিরো উয়েদার লেখা।

জাপানী লোকশাস্ত্রী উয়েদা

১৯২৮ সনে তোকিওর বাণিজ্য-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক তেইজিরো উয়েদা ইয়োরোপ হইতে স্বদেশে ফিরিবার সময় ভারত হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সূত্রে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দেওয়ানো হইয়াছিল। তিনি ইংরেজি লিখিতে অভ্যস্ত। ১৯৩৩ সনের আগষ্ট মাসে কানাডার বান্‌ফ্‌ নগরে

ইন্‌ষ্টিটিউট অব প্যাসিফিক রেলেশন্‌স্‌ বা প্রশান্ত-পরিষদের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে উয়েদা "ফিউচ্যর অব জাপানীজ পপিউলেশন" (বা জাপানী লোকবলের ভবিষ্যৎ) সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। রচনাটা ইন্‌ষ্টিটিউটের "জাপানীজ কাউন্সিল" কর্ত্তৃক পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

জাপানের লোকসংখ্যা ১৯২০ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপে বাড়িয়াছে:—

১৯২০	...	...	৫৫,৯৬৩,০৫৩
১৯২৫	...	...	৫৯,৭৩৬,৮২২
১৯৩০	...	...	৬৪,০৬৭,০৫০

উয়েদার মতে জাপানী লোকসংখ্যা কোনো দিনই ১০০,০০০,০০০ পর্য্যন্ত উঠিবে না। বোধ হয় ৮০,০০০,০০০ এর বেশী হইবে কি না সন্দেহ।

জাপানী নারী পূর্ব্বের চেয়ে কম সন্তান প্রসব করিতেছে। সন্তান প্রসব করিবার ক্ষমতাই কমিয়া আসিতেছে। কাজেই "বালক-বালিকাদের" সংখ্যায় বাড়্‌তি দেখা যাইবে না। অবশ্য "শিশু"-মৃত্যুর হারে উন্নতি সাধিত হইতেছে বলিয়া বালক-বালিকাদের সংখ্যা নেহাৎ কমিবেও না।

উয়েদার আর একটা কথা বিশেষত্বপূর্ণ। তাঁহার হিসাবে উপার্জ্জনশীল অথবা উপার্জ্জনক্ষম নরনারীর সংখ্যা ১৯৫০ সনে ১৯৩০ সন অপেক্ষা ১০,০০০,০০০ বেশী হইবে। উপার্জ্জনক্ষম বলিলে বুঝিতে হইবে ১৫ বৎসর হইতে ৫৯ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের নরনারী। এই সংখ্যার অন্ততঃ আধাআধির জন্য নতুন-নতুন নক্‌রির ব্যবস্থা সৃষ্টি করা চাই। অর্থাৎ ফি বৎসর ২০০,০০০ হইতে ২৫০,০০০ অতিরিক্ত লোকের জন্য কর্ম্মের

ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইবে। এই সমস্যা অতি গুরুতর। বর্ত্তমানে জন্মনিরোধ চালাইলেও এই সমস্যার মীমাংসা হইবে না। কেননা এই সব লোক ইতিমধ্যেই জন্মিয়া রহিয়াছে। ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত জাপানীদের লোকসংখ্যা হিসাব করিবার সময় "ব্যর্থ-কণ্ট্রোল" দাওয়াই সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়া কর্ম্মসৃষ্টি সম্বন্ধে বেশী সজাগ হওয়া আবশ্যক।

জাপানের আর একটা পরিষৎ সম্প্রতি বিশ্ববাসীর নজরে পড়িতেছে। ইহার নাম "তোকিও অ্যাসোসিয়েশন ফর লিবার্টি অব ট্রেডিং" অর্থাৎ তোকিওর অবাধ বাণিজ্য সভা। ১৯২৭ সনে জেনীভায় আন্তর্জ্জাতিক ধনদৌলত সম্মেলন উপলক্ষ্যে অবাধ বা অশুল্ক বাণিজ্যের স্বপক্ষে মত প্রচারের নতুন সূত্রপাত করা হয়। সেই ধুয়া অনুসারে জাপানী অর্থশাস্ত্রীদের কেহ-কেহ জাপানে "লিবার্টি অব ট্রেডিং" পুষ্ট করিবার জন্য সভা কায়েম করিতে অগ্রসর হন। ১৯২৮ সনে তোকিও, ওসাকা, কিয়োতো ইত্যাদি নগরে এই উদ্দেশ্যে "অ্যাসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই বৎসরই বিভিন্ন সভার "ন্যাশন্যাল ফেডারেশন" অর্থাৎ অবাধবাণিজ্য "সভা-সঙ্ঘ"ও গড়িয়া উঠে। এই সভাগুলা আর সভা-সঙ্ঘের মারফৎ ইংরেজিতে জাপানী আর্থিক চিন্তার বিকাশ সাধিত হইতেছে।

তোকিওর সভা হইতে তিনখানা পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে। কোনোটাতেই লেখকের নাম নাই। সন তারিখও কোনোটার গায়ে দেখিতেছি না। তবে বুঝিতেছি যে, প্রথমটা ১৯৩৩ সনের আগষ্ট মাসে কানাডার প্রশান্ত-পরিষদের অধিবেশন খতম হইবার পর লিখিত হইয়াছে। এইটার নাম "দি জাপানীজ পপিউলেশন প্রবলেম অ্যাণ্ড ওয়ার্লড-ট্রেড" (জাপানী লোক-সমস্যা ও বিশ্ববাণিজ্য)। প্রবন্ধটায় উয়েদার মতামতই বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইয়াছে।

মার্কিণ অধ্যাপক টম্প্‌সন তাঁহার "ডেঞ্জার-স্পট্‌স্ ইন্ ওয়ার্লড-পপিউলেশন" (বিশ্ব-লোকের বিপদ-কেন্দ্র) গ্রন্থে আর অকস্‌ফোর্ডের অর্থশাস্ত্রী ক্রকার তাঁহার "জাপানীজ পপিউলেশন প্রব্‌লেম" গ্রন্থে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে যাহাতে জাপানীরা উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে তাহার জন্য ইয়োরামেরিকার নিকট প্রস্তাব তুলিয়াছেন। এই প্রস্তাবে জাপানী প্রবন্ধ-লেখক সুখী। কিন্তু তাঁহার মতে লোক-রপ্তানির সুযোগ পাইলেই জাপানী লোক-সমস্যার মীমাংসা হইবে না। কেননা ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত সময়ের ভিতর ১০,০০০,০০০ নরনারী বিদেশে চালান করা অসম্ভব।

কাজেই জাপান হইতে মালের রপ্তানি বাড়াইয়া স্বদেশের ধনসম্পদ্ বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। আর সেই আর্থিক উন্নতির জোরেই অতিরিক্ত লোকের ভরণপোষণ চালানো সম্ভবপর হইবে। কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্যে সুযোগ খুব কম। জাপানী লেখক ১৯৩০ সনের মার্কিণ শুল্ক আর ১৯৩২ সনের বিলাতী অটাওয়া-চুক্তি বা সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত দেখিয়া বুঝিতেছেন যে, জাপানের পক্ষে রপ্তানির বাড়্‌তি ঘটানো অতি কঠিন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম "জাপান্‌স্ ট্রেড উইথ অষ্ট্রেলিয়া অ্যাণ্ড নিউজীল্যাণ্ড" (অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের সহিত জাপানের বাণিজ্য)। এই প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের জের বা ভাষ্য দেখিতেছি। বিলাতী সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো হইয়াছে। আমদানি-রপ্তানি হিসাবে অষ্ট্রেলিয়া আর নিউজীল্যাণ্ডকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিলে এই দুই দেশের ক্ষতি। বাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে জাপানেরও উপকার।

তৃতীয় প্রবন্ধটার নাম "অকিউপেশন্যাল চেঞ্জেস্ ইন জাপান" (জাপানে পেশা-বিষয়ক উঠা-নামা)। জাপানীরা ১৯৩১ সনের

পরবর্ত্তী কালে তুনিয়ার বাজারে-বাজারে রপ্তানি বাড়াইতে পারিয়াছে। জাপানী মাল এত শস্তা যে কোনো মাল ইহার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে না। বিদেশীরা সর্ব্বত্র রটাইয়া বেড়াইতেছে যে,—"জাপানী মাল তুনিয়ায় অতি শস্তা হইবার কারণ অতি সোজা; জাপানে মজুরেরা নির্য্যাতিত হইতেছে; মজুরদেরকে মানুষের মতন ব্যবহার করা হয় না; মজুরির হারও অমানুষিক, ইত্যাদি। জাপানী মজুরদেরকে অতিমাত্রায় শোষণ করা হইতেছে বলিয়া অন্যান্য দেশের পুঁজিপতিরাও নিজ-নিজ মজুরদের তন্খা কমাইবার দিকে মাথা খেলাইতেছে। সভ্যতার এই তুর্দ্দৈব ও সামাজিক অবনতি নিবারণ করিবার জন্য বিদেশীরা জাপানের বিরুদ্ধে ব্রতবদ্ধ হউক।" জাপানীদের মজুরি-হ্রাস নীতিকে "সোশ্যাল ডাম্পিং" রূপে বিবৃত করা হইতেছে। বিদেশী মুদ্রার মাপে কোনো মুদ্রার মূল্য কমাইলে যেমন কারেন্সী বিষয়ক "ডাম্পিং" ঘটে সেইরূপ মজুরির হার কমাইয়া জাপানীরা সামাজিক "ডাম্পিং" চলাইতেছে। এই জাপান-বিরোধী মতামতের বিরুদ্ধে তৃতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক বলিতেছেন যে, জাপানী মজুরি বিদেশী মজুরির চেয়ে কম। কিন্তু মজুরি কম বলিয়া জাপানী মজুরের "কর্ম্মদক্ষতা" কম নয়। কর্ম্ম-দক্ষতা কম নয় বলিয়াই জাপানের মাল অন্য দেশের চেয়ে শস্তায় তৈয়ারি হইতেছে। এই প্রবন্ধের ভিতরও উয়েদার যুক্তিই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতেছি। বুঝিতে হইবে যে, উয়েদাকে একালের জাপানী অর্থশাস্ত্রীরা অন্যতম বড় খুঁটারূপে কাজে লাগাইতেছে।

ডাকাহাশি

একালের জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রীরা যেমন ঝালে-ঝোলে-অম্বলে

ভার্সাইয়ের সন্ধি মাফিক লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের বিরুদ্ধে মাথা খেলাইতে অভ্যস্ত, জাপানী অর্থশাস্ত্রীরাও সেইরূপ তাহাদের লোক-সংখ্যার বাড়্‌তি আর বিদেশে জাপানী লোক-রপ্তানির আবশ্যকতা হামেশা আলোচনা করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে এক নয়া কোঠে জাপানী লোকসংখ্যার কথা উঠিতেছে। তোকিওর অর্থশাস্ত্রী কামেকিচি তাকাহাশি "ওরিয়েণ্টাল ইকনমিষ্ট" নামক ইংরেজিতে আর্থিক পত্রিকা চালাইয়া থাকেন। "জাপান টাইম্‌স্‌" দৈনিকে সম্প্রতি তাঁহার একটা রচনা বাহির হইয়াছে। তাহার ভিতরকার যুক্তি বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

তাকাহাশি বলিতেছেন যে, কোনো-কোনো দেশে কুদরুত্তি মাল প্রধানতঃ প্রকৃতির দান। কাজেই সে সব শস্তা। কিন্তু জাপানের কপাল এই দিকে ভাল নয়। ইয়োরোপ আর আমেরিকার নানা দেশে পুঁজি প্রচুর। অতএব টাকা ধার পাওয়া যায় শস্তায় অর্থাৎ স্থদের হার নীচু। কিন্তু জাপানের অবস্থা উল্টা। এই দেশে পুঁজির দাম চড়া অর্থাৎ স্থদের হার উঁচু, পুঁজির পরিমাণ জাপানে বেশী নয় বলিয়া।

দেখা যাইতেছে যে, দুনিয়ার নানা দেশে নানা দাম। কুদরুত্তি মালের দাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন, আবার পুঁজির দামও সর্ব্বত্র এক নয়। কাজেই মজুরের দামও নানা দেশে নানাপ্রকার হইবে ইহা ত স্বাভাবিক। অর্থাৎ মজুরির হার ভিন্ন ভিন্ন মুল্লুকে ভিন্ন ভিন্ন। সারা জগৎ ভরিয়া একাকার মজুরির হার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। জাপানে কুদরুত্তি মালের দাম উঁচু, আবার পুঁজির দামও উঁচু। এই অবস্থায় ঘটনাচক্রে মজুরির হার যদি নীচু না হইত, তাহা হইলে জাপানের নরনারীকে আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে পটল তুলিতে হইত।

আজকাল তুনিয়ার লোকেরা বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকানরা জাপান সম্বন্ধে বলিতে সুরু করিয়াছে:—"জাপানীরা বিশ্ববাজারে অন্যান্যের চেয়ে খুব বেশী শস্তায় মাল ছাড়িতেছে। এইরূপ টক্কর অন্যায়। অসাধু প্রতিযোগিতায় ইয়োরামেরিকান বেপারী পঞ্চত্ব পাইতে বাধ্য। জগতের অলিতে-গলিতে জাপানীরা যাহাতে অতি-শস্তা মাল ছাড়িতে না পারে তাহার জন্য ব্রতবদ্ধ হইয়া আবশ্যক।"

তাকাহাশি প্রশ্ন তুলিতেছেন:—জাপানী মালকে "অতি-শস্তা" বলা কি যুক্তসঙ্গত? জাপানের তরফ হইতে টক্করকে "অন্যায়" বলা চলে কি? "অসাধু" প্রতিযোগিতার দোষে জাপানীকে একঘরে করিতে চেষ্টা করা ইয়োরামেরিকানদের সাজে কি? বস্তুতঃ এই সকল প্রশ্ন জাপানী অর্থশাস্ত্রীদের প্রধান সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে।

তাকাহাশির মতে জাপানী টক্করকে "অসাধু" বা "অন্যায় বলিয়া তিরস্কার করাটাই অন্যায় ও যুক্তিহীন। ইয়োরামেরিকার দেশগুলা শস্তায় পুঁজি পাইয়া থাকে। শস্তায় পুঁজি পায় বলিয়া তাহারা যত সহজে মাল প্রস্তুত করিতে ও দেশবিদেশের বাজারে ছাড়িতে পারে, *তাহার তুলনায় মাগ্‌গি পুজিওয়ালা দেশের* অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু মাগ্‌গি পুঁজিওয়ালা দেশের লোকেরা শস্তা পুঁজিওয়ালা দেশের টক্করকে "অসাধু" বা অন্যায় বলিয়া থাকে কি? কোনো দিন ত বলে নাই। কাজেই মজুরির হারে জাপানীরা ইয়োরামেরিকানদের চেয়ে খাটো বলিয়া ইয়োরামেরিকানদের পক্ষে জাপানী টক্করকে 'অসাধু' বা অন্যায় ঠাওরাইতে বসা অনুচিত।

জাপানে মজুরির হার নীচু কেন? জাপান কৃষি-প্রধান দেশ। জাপানী মজুর বলিলে চাষী আর চাষ-মজুরই বেশী বুঝায়। কাজেই জাপানী মজুরির হার চাষীদের মজুরির উপরই প্রধানভাবে নির্ভর

করে। চাষীদের মজুরি নির্ভর করে কিসের উপর? তাহাদের উৎপন্ন মাল ও উৎপাদন-শক্তির উপর। অনেক দিন হইতেই দেখা গিযাছে যে, জাপানী চাষীরা ইয়োরামেরিকান চাষীদের চেয়ে জনপ্রতি কম ফসল পায়। কিন্তু ফসলের অল্পতার জন্য দায়ী কে? জাপানী চাষীরা ইয়োরামেরিকান চাষীদের চেয়ে বেশী কুঁড়ে, নিষ্কর্ম্মা, আহাম্মুক বা অপটু নয়। জাপানী চাষীরা নাক গুণ্‌তিতে অনেক। জাপানের চৌহদ্দিতে যত নরনারী বাস করে সেই পরিমাণ চৌহদ্দিতে ইয়োরামেরিকায় তাহার চেয়ে কম সংখ্যক নরনারী বাস করে। লোক-সংখ্যার আতিশয্য জাপানী চাষ-আবাদের মস্ত দুর্ভাগ্য। এদেশে জনপ্রতি ফসলের পরিমাণ থাকে কম। যতদিন পর্য্যন্ত লোকসংখ্যা জাপানে বর্ত্তমান বহরের থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত চাষীর ভাগ্যে ফসলের অল্পতা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ততদিন পর্য্যন্ত জাপানে মজুরির হারও নীচু থাকিতে বাধ্য।

জাপানের চৌহদ্দিতে লোকসংখ্যা কমাইবার উপায় কি? এই বিষয়ে জাপানী অর্থশাস্ত্রীরা প্রায় এক সুরে বলিয়া থাকেন :—"বিদেশে লোক-রপ্তানির সুযোগ চাই। জাপানীরা বিভিন্ন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে সুরু করুক। তাহাদের বহির্গমনে ইয়োরামেরিকানরা বাধা দেওয়া বন্ধ করুক। তাহা হইলে জাপানী চৌহদ্দিতে লোকসংখ্যা কমিতে থাকিবে।" এই প্রায়-সার্ব্বজনিক জাপানী মতের উপর তাকাহাশি বলিতেছেন—"তখন বিঘা প্রতি কম চাষী দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে জনপ্রতি বেশী ফসলও লক্ষ্য করা সম্ভবপর হইবে। অতএব চাই বিদেশে লোক-রপ্তানির সুযোগ ও স্বাধীনতা।"

ইয়োরামেরিকানরা যদি জাপানীদের মজুরির হার বাড়াইবার

জন্য সত্যসত্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা জাপানকে বিদেশে উপনিবেশ কায়েম করা হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে কেন? বিদেশে জাপানী লোক-রপ্তানি যদি তাহাদের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে জাপানে লোক-সংখ্যার অতিবৃদ্ধি বা আতিশয্য থাকিয়াই যাইবে। সুতরাং জাপানী মজুরির হার নীচু রহিয়া যাইবে এবং ইয়োরামেরিকার মাল জাপানী মালের সঙ্গে টক্কর দিতে যাইয়া পরাস্ত হইতে থাকিবে।

কিন্তু ইয়োরামেরিকানদের আবদার অতি-বিচিত্র। তাহারা জাপানী মালকে বিদেশ হইতে খেদাইয়া দিতেই আগ্রহান্বিত। উঁচু সংরক্ষণ-শুল্কের দেওয়াল গড়িয়া তাহারা জাপানী মাল বয়কটের আন্দোলন রুজু করিতেছে। অর্থাৎ তাহারা জাপানী লোক-আমদানিও চায় না, আবার জাপানী মাল-আমদানিও তাহাদের চক্ষুঃশূল। তাহারা জাপানের তরফ হইতে কোনো প্রকার টক্করই চায় না। অতি সাধু, স্বাভাবিক ও ন্যায্য প্রতিযোগিতাও তাহারা অসাধু বিবেচনা করিতেছে।

বুঝা যাইতেছে যে, ইয়োরামেরিকায় যদি অর্থশাস্ত্রী আর রাষ্ট্র-নায়কেরা এতই অবুঝ হয়, তাহা হইলে জগতে অশান্তি ডাকিয়া আনিবার জন্য তাহারাই দায়ী থাকিবে। এই সুরের অর্থশাস্ত্রে নবীন এশিয়ার বাণী শুনা যাইতেছে।

গুজরাত-বোম্বাই-মাড়োয়ারের প্রভুত্ব হইতে বাঙালী অর্থশাস্ত্রীদের মুক্তিলাভ (১৯২৫)

১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, ১৯১৪ সনের এপ্রেল মাসে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙালী জাতির যে

দুরবস্থা ছিল, তখনও প্রায় তদ্রূপ। অর্থশাস্ত্রবিষয়ক "গ্রন্থকার" বাঙ্লায় পূর্ব্বে যে দুএকজন দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহার উপর আর বাড়্তি ঘটে নাই মনে হইয়াছিল। আর "প্রবন্ধ-লেখকদের" সংখ্যাও বিশেষ-কিছু বাড়িয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। বাড়্তির হার ছিল অতি-সামান্য। বস্তুতঃ পূর্ব্বে যাহাদিগকে চিনিতাম না, এমন কোনো লেখালেখিতে অভ্যস্ত নতুন অর্থশাস্ত্রী আসরে দেখা দিয়াছিল কি না সন্দেহ।

বাঙালী অর্থশাস্ত্রীরা কে কতটা জানিতেন বা কে কোন্ বই ও পত্রিকা পড়িতেন তাহার কথা বলিতেছি না। বলিতেছি বাঙালী ধনবিজ্ঞান-সেবকদের হাতে কতখানি বা কিরূপ "লেখা" বাহির হইত সেই সম্বন্ধে। বিজ্ঞান-জগতে বাঙ্লার নরনারীর ঠিকানা ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে হইলে লেখালেখির সন্ধানই লইতে হইবে। কাহার বাড়ীতে কয়খানা বই আছে বা কে কয়খানা বইয়ের নাম জানে তাহার তল্লাস করিলে চলিবে না।

কি ইংরেজি, কি বাংলা,—দুই ভাষার কোঠ সম্বন্ধেই বাঙালীর এই দারিদ্র্য বিষয়ক কথা প্রযোজ্য। খনি, রেল, জাহাজ, ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক, বহির্ব্বাণিজ্য, মজুর, চাষী, বীমা, মূল্য, সিক্কা ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙালী লেখক ইংরেজিতেই ছিল বিরল, বাংলায় ত কথাই নাই,—কেননা "সেকালের" মতন "একালে"ও বাংলা ভাষা অনেকটা "অস্পৃশ্য"ই রহিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু বাঙালী-সম্পাদিত ধনবিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকাও ছিল না।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতন বাঙলায়ও সুধীবৃন্দের মেজাজ তখন প্রধানতঃ গান্ধী-নিষ্ঠায় ভরপুর। যন্ত্রপাতিকে জাহান্নমে পাঠানো, কলকব্জাকে বিষ বিবেচনা করা, শিল্প-নিষ্ঠার নিন্দা করা, শহরে

জীবনকে পদাঘাত করা, পল্লী-পঞ্চায়ৎকে স্বর্গ সমঝিয়া রাখা,—এই সব ছিল সেই মেজাজের গোড়ার কথা।

বর্ত্তমান লেখকের বিচারে যন্ত্রপাতি শালসা বিশেষ। অধিকন্তু

"পল্লী নয় গো গুড়-মাখানো আর আস্তাকুঁড় নয় শহরগুলা,
রাজধানী নয় সোণার তৈরী, মফস্বল নয় পায়ের ধূলা।"

কাজেই শিল্পনিষ্ঠার নিন্দা ধ্বংস করিবার জন্য আর সঙ্গে-সঙ্গে "একচোখো" পল্লীনিষ্ঠার এবং একতরফা কুটির-শিল্প-প্রীতির ঘাড় মটকাইবার জন্য বর্ত্তমান লেখককে ১৯২৫ এর ডিসেম্বর হইতে ১৯২৬ এর ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত দুই মাসের ভিতর নানাস্থানে কতকগুলা বক্তৃতা দিতে হয়। তাহার ভিতর সাতটা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যাদবপুরের কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজি এবং "জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে"র তদ্‌বিরে। প্রথমটার আলোচ্য বিষয় ছিল "নবীন দুনিয়ার সূত্রপাত" (১৫ ডিসেম্বর)। তাহার পর আলোচিত হইয়াছিল "আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ"। এই জন্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল নিম্নরূপ:—(১) ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতি, (২) ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈববীমা, (৩) জমিজমার আইন-কানুন, (৪) শিল্প-কারখানায় মজুর-রাজ, (৫) ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ, (৬) আর্থিক জগতে আধুনিক নারী। সারমর্ম্মে এবং প্রবন্ধাকারে এই সকল বক্তৃতা বহুসংখ্যক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। "গ্রীটিংস টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (কলিকাতা ১৯২৭) নামক ইংরেজি বইয়ে এবং "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" প্রথম ভাগে (১৯৩২) এই সব আজকাল সহজে পাওয়া যায়।

১৯২৬ সনে গবর্ণমেণ্টের তদবিরে চলিতেছিল ভারতীয় মুদ্রানীতির আলোচনা। বিনিময়ের হার কিরূপ হইবে,—রূপেয়ায় ষোল পেনী

না আঠার পেনী,—এই ছিল তর্কাতর্কির মুদ্দা। দেখা গেল যেন বাঙালীরা প্রায় সকলেই গুজরাত ও বোম্বাইয়ের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। আর গুজরাতী ও বোম্বাইওয়ালাদের প্রতিনিধিস্বরূপ যে দুএকজন "মাড়োয়ারি" কলিকাতার বাজার দখল করিয়া বসিয়া আছে, তাহারা বাঙালী জাতিকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে।

ঘটনাচক্রে বর্ত্তমান লেখককে গুজরাত-বোম্বাই-মাড়োয়ারের বিরুদ্ধে জোরের সহিত মত প্রচার করিতে হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে ১৯২৬ সনে যে যুক্তি দেখানো গিয়াছিল, সেই যুক্তিই ১৯৩৩ সনের মুদ্রা-তর্কের সময়েও বাঙালী সমাজের কাজে লাগিয়াছে। লেখকের "ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক প্রব্‌লেম্‌স্‌ (কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৪) এবং "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) এই অবস্থা ও ব্যবস্থার সাক্ষী।

বোধ হয় ভবিষ্যতে বাঙালী ধনবিজ্ঞান-সেবকেরা মাড়োয়ারি, গুজরাতী ও বোম্বাইওয়ালাদের পাগ্‌রী দেখিয়া কারেন্সী-লড়াইয়ের মাঠে আর থতমত বা ভ্যাবাচ্যাকা খাইবে না। গুজরাত-বোম্বাই-মাড়োয়ারের আধিপত্য ও অত্যাচার হইতে বাঙালী অর্থশাস্ত্রীরা মুক্তিলাভ করিয়াছে। কয়েক বৎসরের ভিতরই সিক্কা সম্বন্ধে স্বাধীন-ভাবে আলোচনা করিতে সমর্থ কয়েকজন বাঙালী দাঁড়াইয়া যাইবে। বাঙালী জাতির বাড়্‌তির ইহা অন্যতম লক্ষণ। বাঙালী জাতির কোনো-কোনো মহলে অর্থশাস্ত্রবিষয়ক দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য কিছু-কিছু কর্ত্তব্য-বোধ জাগিয়াছে। বাঙালীর মগজে ঘীর অভাব ছিল না। অভাব ছিল কর্ত্তব্যবোধের। যুবক বাঙ্‌লার এই কর্ত্তব্য-জ্ঞান যখন কথঞ্চিৎ জাগিয়াছে, তখন কারেন্সীর কটমট অঙ্কগুলায় বাঙালীর আর মার নাই। বহির্ব্বাণিজ্য, শুল্ক-ব্যবস্থা, কারখানা-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি

ধনবিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও বাঙালী জাতির গবেষণা-নিষ্ঠা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর এই কর্ত্তব্যবোধ ও গবেষণা-নিষ্ঠার অনেক সুফল অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাইবে।

ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের ধরণ-ধারণ

বাঙ্‌লাদেশের এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ধনবিজ্ঞানের নানা শাখা লইয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার "প্রধান অংশ" ঐতিহাসিক। বইগুলা খুলিলেই দেখা যায় যে, লেখকেরা যুগের পর যুগ ধরিয়া আর্থিক ভারতের নানা অঙ্গের ইতিহাস লিখিয়া চলিয়াছেন। মুদ্রানীতির বইয়ে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, শুল্কনীতির বইয়েও ঐতিহাসিক তথ্যই থাকে আসল কথা। অন্যান্য বইগুলারও "মুদ্দা" সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত তথ্যের ঐতিহাসিক ধারা লইয়া গঠিত। প্রাচীন বা মধ্য যুগের আর্থিক ভারত সম্বন্ধে যে-সকল বই লিখিত সেই সমুদয় এই ধরণের "প্রত্নতত্ত্বে" পরিপূর্ণ থাকিবে, ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের আর্থিক ভারত সম্বন্ধে যে-সকল রচনা বাহির হইয়াছে তাহার অনেকাংশই এক প্রকার উনবিংশ শতাব্দীর আর বিংশ শতাব্দীর "প্রত্নতত্ত্ব" ছাড়া আর কিছু নয়।

আর্থিক জীবনের প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া যায় প্রধানতঃ ঈষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অথবা তাহার উত্তরাধিকারী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় ও বিলাতী রিপোর্ট ও অন্যান্য দলিলে। বিদেশী চেম্বার অব কমার্স বা বণিক্-সঙ্ঘ, ব্যাঙ্ক ও বেপারীদের পুরাণা খাতাপত্র, আর সেকালের সংবাদপত্র ইত্যাদি দলিলসমূহ এই জন্য ব্যবহার করিতে হয়।

আর একপ্রকার দলিলও উল্লেখযোগ্য। যেদিন হইতে ভারত-

গবর্ণমেণ্টের তদবিরে আর্থিক ও শাসনবিষয়ক তথ্য ও অঙ্কসমূহ নিয়মিতরূপে সংগ্রহ করা হইতেছে, সেদিন হইতে প্রদেশে-প্রদেশে সংখ্যা-দপ্তর কায়েম হইয়াছে। এই সকল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল দপ্তরের প্রকাশিত অঙ্কগুলা আর্থিক প্রত্নতত্ত্বের জন্য যার পর নাই মূল্যবান্। বর্ত্তমান ভারতে যে সমুদয় আথিক ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক কেতাব বাহির হইয়াছে, তাহার ভিতর সংখ্যাবিভাগের প্রকাশিত অঙ্কের পরিমাণ এখনও খুব কমই দেখা যায়। তবে লেখকদের ভিতর সংখ্যার দিকে নজর ক্রমে-ক্রমে পড়িতেছে। এই তথ্যও বাড়্‌তির পথে বাঙালীর আর এক লক্ষণ।

এই গেল ভারতীয় লেখকদের অর্থশাস্ত্র-চর্চ্চার প্রথম ও প্রধান দিক্। এইরূপ চর্চ্চার ফলে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় আর্থিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের লিখিয়ে-পড়িয়েদের জ্ঞান কথঞ্চিৎ বস্তুনিষ্ঠ হইতেছে। অধিকন্তু ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য টেক্‌ষ্ট বুক লেখা হইয়াও যাইতেছে। যথা লভ্যম্।

ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের রচনাবলীর আর একটা দিক্‌ও প্রথম হইতেই লক্ষ্য করা যায়। ইঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্ব-সেবী সন্দেহ নাই। কিন্তু বোধ হয় প্রায় প্রত্যেকের মাথায়ই রাজনীতি অল্প-বিস্তর আছে। কেন না ঐতিহাসিক তথ্যগুলা মাঝে-মাঝে রাষ্ট্রিক তরফ হইতে সমালোচনা করিবার ঝোঁক তাঁহারা দেখাইতে অভ্যস্ত। বিশেষতঃ একদম "একাল" সম্বন্ধে তথ্য বা অঙ্ক দেখাইবার সময় তাঁহারা প্রায় সকলেই পুরাপুরি রাষ্ট্রিক পণ্ডিতরূপে দেখা দেন। অর্থাৎ একদম কাঠখোট্টা "রাগদ্বেষবহিষ্কৃত" ধনবিজ্ঞানসেবী ভারতে একপ্রকার নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, সকলেই প্রকারান্তরে অর্থশাস্ত্রকে রাষ্ট্রশাস্ত্রের অঙ্গ বা দাস বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

এই সঙ্গে আর একটা কথাও লক্ষ্য করা সম্ভব। ভারতের রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রীরা প্রায় সকলেই গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত আইন-কানুনের অর্থাৎ সরকারী আর্থিক রাষ্ট্রনীতির বিরোধী। কেহ কম বিরোধী, কেহ বেশী বিরোধী। কিন্তু সকলের অর্থশাস্ত্র-চর্চ্চাই শেষ পর্য্যন্ত সরকারী অর্থনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনায় চাঙ্গা হইয়া উঠে। যে-সকল লেখকের রচনায় গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী মতামত প্রচারিত হয় না সেই সকলের রচনা বোধ হয় সাধারণতঃ নেহাৎ "জলীয় পদার্থ" বা অখাদ্য-রূপে বিবৃত হইয়া থাকে।

হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ভারতের রাষ্ট্রসেবক বা রাষ্ট্রিক জননায়কগণ অথবা শিল্প-ব্যবসার ধুরন্ধরেরা পুরুষ দেড়-দুইয়েক ধরিয়া লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লিতে যে-সকল মত প্রচার করিয়া আসিতেছেন, সেই সকল মতের স্বপক্ষে বই লেখাই বর্ত্তমানে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের আর্থিক প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার অন্যতম প্রধান উৎপ্রেরণা। কাজেই কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারা যে-সকল কথা চোপর দিনরাত বলিয়া বেড়াইতেছেন এবং দৈনিক কাগজে প্রকাশ করিতেছেন, সেই সকল কথাই কতকগুলা ফুটনোটের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-সেবার মস্ত লক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে।

"ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" (১৯২০-২৬)

বর্ত্তমান লেখকের ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা ভারত-প্রচলিত এই দুই পথের কোনো পথই মাড়াইতে অভ্যস্ত নয়। প্রথম কথা,—আর্থিক প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার দিকে এই অধমের ঝোঁক দেখা যায় না। তাহা ছাড়া অর্থ-নৈতিক গবেষণাকে রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের বা কর্ম্মপ্রণালীর এবং দলাদলির অন্তর্গত করা এই আলোচনা-প্রণালীর দস্তুর নয়।

রাষ্ট্রনীতি বাদ দিয়াও অর্থশাস্ত্র আলোচনা করা সম্ভব, এই ধারণা ইহার ভিতর প্রবল। রাষ্ট্রিক আন্দোলন চালাইবার জন্য খাঁটি ধনবিজ্ঞানের সেবক না হইলেও চলিতে পারে। আবার রাষ্ট্রিক দলাদলিতে নাক না গুঁজিয়াও খাঁটি ধনবিজ্ঞানের সেবক হওয়া যায়। এই ধরণের মতের উপর বর্ত্তমান লেখকের অর্থশাস্ত্র-সেবা প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ অরাষ্ট্রিক ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াও দেশের আর্থিক উন্নতি আর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি পুষ্ট করা সম্ভব, ইহাই হইল এই গবেষণা-রীতির ভিত্তি।

কয়েকটা কথা এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, বর্ত্তমান লেখকের অর্থ-নৈতিক আলোচ্য বিষয় দেশ ও দুনিয়া। বাঙলা দেশ আর অবশিষ্ট ভারত ত বটেই, জগতের কোনো জনপদই এই গবেষণার বহির্ভূত রহে নাই। কোনো সময়ে বাঙলা দেশ বা ভারতবর্ষ মুখ্য আলোচ্য বস্তু। কখনো বা গৌণভাবে স্বদেশের আলোচনা করা গিয়াছে। সেইরূপ বিদেশও কখনো গৌণ আবার কখনো মুখ্য আলোচ্য রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যখন যেখানে বর্ত্তমান লেখকের জীবনযাত্রা অথবা কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে, তখন সেইখানে যেরূপ সমস্যা উপস্থিত হয় তাহার বিশ্লেষণ করা আর তাহা হইতে স্বদেশের জন্য মুখ্য বা গৌণভাবে "হদিশ" সংগ্রহ করা এই আলোচনা-প্রণালীর আসল কথা। সমস্যার আলোচনা এক জিনিষ আর কোনো ঘটনার বা বস্তুর বা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস কিম্বা প্রত্নতত্ত্ব আর এক জিনিষ। সমস্যাগুলা কোনো সময়ে বীমার আইনবিষয়ক, কোনো সময়ে পুঁজিগঠন-বিষয়ক, কোনো সময়ে বাণিজ্যবিষয়ক, কোনো সময়ে মজুরবিষয়ক বা মূল্য-বিষয়ক ইত্যাদি।

১৯১৭-১৮ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করিবার সময় দেখা গেল

যে, আমেরিকার এক বিপুল আর্থিক সমস্যা হইতেছে লোকজনের আমদানি-রপ্তানি, মজুর-চলাচল। ইয়োরোপ ও এশিয়ার নানাদেশ হইতে নরনারী না আসিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাষ, খাদ, কারখানা অচল থাকিতে বাধ্য। মার্কিণ ধনসম্পদের গোড়ার কথা এই "ইমিগ্রেশন" বা লোক-প্রবেশ-সমস্যা। কাজেই এইদিকে আলোচনা চালাইয়া মার্কিণ ত্রৈমাসিকে সন্দর্ভ প্রকাশ করা গেল (১৯১৯)।

১৯১৫-১৬ সনে চীনে থাকিবার সময় অন্যান্য অনেক-কিছু দেখিবার-বুঝিবার সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড় সমস্যা নজরে আসিয়াছিল। সে হইতেছে চীন-মুল্লুকে বিদেশী পুঁজির প্রভাব। এই পুঁজি-চলাচলের অর্থকথা সমস্যাস্বরূপ আসিল। ১৯২১ সনে এই ক্ষেত্রে গবেষণার ফল আমেরিকায় ছাপা হইল। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, চীনের মত "নিম-স্বাধীন" দেশে বিদেশী পুঁজির ফল রাজনৈতিক হিসাবে মারাত্মক। কিন্তু ভারতের মতন পূরা-পরাধীন দেশে মনিব-জাতীয় বিদেশী পুঁজি রাজনৈতিক হিসাবে মারাত্মক নয়। উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিহীন দেশ হিসাবে বিদেশী পুঁজি আর্থিক উন্নতির জন্য ভগবানের আশিষ বিশেষ। ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে ইতালির বোল্‌ৎসানো হইতে ভারতের জন্য "আর্থিক মোসাবিদা" প্রচার করিবার উপলক্ষে কলিকাতার "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় এই মত প্রচার করিয়াছি। সেই মত আজও চলিতেছে।

যাহা হউক, এইরূপে ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, ইতালিতে, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে ইত্যাদি নানা দেশে ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত শুল্ক, মুদ্রা, রেল, ভূমি, বীমা, বহির্ব্বাণিজ্য, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি নানা সমস্যার সংস্পর্শে আসা গিয়াছিল। তাহার কোনো-কোনোটার আলোচনায় যোগ দেওয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভানিয়া থাকে। বর্ত্তমান লেখককে "সিন্ধুনীরে" ভাসিতে হইয়াছে আর "ভূধর-শিখরে"ও উৎরাই-চড়াই করিতে হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এই ব্যক্তি বঙ্গ-চন্দ্র, ভারত-সন্তান। কাজেই বঙ্গবাণী আর ভারতকথা, বাঙালীর সমস্যা আর ভারতবাসীর ওঠানামা কোনো মুহূর্ত্তেই মগজের আর হৃদয়ের আর সঙ্গে-সঙ্গে হাত-পা'রও বহির্ভূত থাকিতে পারে নাই। কাজেই আমেরিকার মজুর-সমস্যা, চীনের পুঁজি-সমস্যা, জার্ম্মাণির মুদ্রা-সমস্যা, বিলাতের চাষ-সমস্যা, জাপানের লোক-সমস্যা, বল্কান জনপদের ভূমি-সমস্যা, ইতালির শিল্প-সমস্যা, রুশিয়ার ব্যাঙ্ক-সমস্যা আর ফ্রান্সের রাজস্ব-সমস্যা,—সব-কিছুর আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতের জন্য সম্পদ্-বৃদ্ধির হদিশ আর বাঙালীর জন্য আর্থিক উন্নতির পাঁতি ছিলই ছিল।

রচনাগুলার কোনো-কোনোটা ১৯১৮ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত ভারতেরও বিভিন্ন পত্রিকায় বাহির হইতেছিল। এই সমুদয়ের কোনো-কোনোটায় ভারত-কথা প্রধান অংশ অধিকার করিত না। আর, কোনোটাই প্রত্নতত্ত্বের ও ইতিহাসের "সেকেলে" কথায় পরিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু সবই ছিল বর্ত্তমান জগতের আর বর্ত্তমান ভারতেরও দেশোন্নতিবিষয়ক হদিশ। সবই "একালের" সমস্যার আলোচনায় পরিপূর্ণ। ফলতঃ ১৯২৬ সনের প্রথম দিকে মাদ্রাজে যখন বর্ত্তমান লেখকের "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" বাহির হয়, তখন এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালীতে আর অন্যান্য ভারতীয় ধনবিজ্ঞানসেবীর আলোচনা-প্রণালীতে প্রভেদটা যে অতি গভীর, তাহা হাতে-হাতে ধরা পড়িয়াছে।

অবশ্য "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" বইয়ে একমাত্র ভারতীয় কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক অঙ্ক আর তথ্য লইয়াও কতকগুলা

যে, আমেরিকার এক বিপুল আর্থিক সমস্যা হইতেছে লোকজনের আমদানি-রপ্তানি, মজুর-চলাচল। ইয়োরোপ ও এশিয়ার নানাদেশ হইতে নরনারী না আসিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাষ, খাদ, কারখানা অচল থাকিতে বাধ্য। মার্কিণ ধনসম্পদের গোড়ার কথা এই "ইমিগ্রেশন" বা লোক-প্রবেশ-সমস্যা। কাজেই এইদিকে আলোচনা চালাইয়া মার্কিণ ত্রৈমাসিকে সন্দর্ভ প্রকাশ করা গেল (১৯১৯)।

১৯১৫-১৬ সনে চীনে থাকিবার সময় অন্যান্য অনেক-কিছু দেখিবার-বুঝিবার সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড় সমস্যা নজরে আসিয়াছিল। সে হইতেছে চীন-মুল্লুকে বিদেশী পুঁজির প্রভাব। এই পুঁজি-চলাচলের অর্থকথা সমস্যাস্বরূপ আসিল। ১৯২১ সনে এই ক্ষেত্রে গবেষণার ফল আমেরিকায় ছাপা হইল। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, চীনের মত "নিম-স্বাধীন" দেশে বিদেশী পুঁজির ফল রাজনৈতিক হিসাবে মারাত্মক। কিন্তু ভারতের মতন পূরা-পরাধীন দেশে মনিব-জাতীয় বিদেশী পুঁজি রাজনৈতিক হিসাবে মারাত্মক নয়। উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিহীন দেশ হিসাবে বিদেশী পুঁজি আর্থিক উন্নতির জন্য ভগবানের আশিষ বিশেষ। ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে ইতালির বোল্ৎসানো হইতে ভারতের জন্য "আর্থিক মোসাবিদা" প্রচার করিবার উপলক্ষে কলিকাতার "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় এই মত প্রচার করিয়াছি। সেই মত আজও চলিতেছে।

যাহা হউক, এইরূপে ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, ইতালিতে, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে ইত্যাদি নানা দেশে ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত শুল্ক, মুদ্রা, রেল, ভূমি, বীমা, বহির্ব্বাণিজ্য, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি নানা সমস্যার সংস্পর্শে আসা গিয়াছিল। তাহার কোনো-কোনোটার আলোচনায় যোগ দেওয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভানিয়া থাকে। বর্ত্তমান লেখককে "সিন্ধুনীরে" ভাসিতে হইয়াছে আর "ভূধর-শিখরে"ও উৎরাই-চড়াই করিতে হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এই ব্যক্তি বঙ্গ-চন্দ্র, ভারত-সন্তান। কাজেই বঙ্গবাণী আর ভারতকথা, বাঙালীর সমস্যা আর ভারতবাসীর ওঠানামা কোনো মুহূর্ত্তেই মগজের আর হৃদয়ের আর সঙ্গে-সঙ্গে হাত-পা'রও বহির্ভূত থাকিতে পারে নাই। কাজেই আমেরিকার মজুর-সমস্যা, চীনেব পুঁজি-সমস্যা, জার্ম্মাণির মুদ্রা-সমস্যা, বিলাতের চাষ-সমস্যা, জাপানের লোক-সমস্যা, বল্কান জনপদের ভূমি-সমস্যা, ইতালির শিল্প-সমস্যা, রুশিয়ার ব্যাঙ্ক-সমস্যা আর ফ্রান্সের রাজস্ব-সমস্যা,—সব-কিছুর আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতের জন্য সম্পদ্-বৃদ্ধির হদিশ আর বাঙালীর জন্য আর্থিক উন্নতির পাঁতি ছিলই ছিল।

রচনাগুলার কোনো-কোনোটা ১৯১৮ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত ভারতেরও বিভিন্ন পত্রিকায় বাহির হইতেছিল। এই সমুদয়ের কোনো-কোনোটায় ভারত-কথা প্রধান অংশ অধিকার করিত না। আর, কোনোটাই প্রত্নতত্ত্বের ও ইতিহাসের "সেকেলে" কথায় পরিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু সবই ছিল বর্ত্তমান জগতের আর বর্ত্তমান ভারতেরও দেশোন্নতিবিষয়ক হদিশ। সবই "একালের" সমস্যার আলোচনায় পরিপূর্ণ। ফলতঃ ১৯২৬ সনের প্রথম দিকে মাদ্রাজে যখন বর্ত্তমান লেখকের "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" বাহির হয়, তখন এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালীতে আর অন্যান্য ভারতীয় ধনবিজ্ঞানসেবীর আলোচনা-প্রণালীতে প্রভেদটা যে অতি গভীর, তাহা হাতে-হাতে ধরা পড়িয়াছে।

অবশ্য "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" বইয়ে একমাত্র ভারতীয় কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক অঙ্ক আর তথ্য লইয়াও কতকগুলা

অধ্যায় ছিল। অধিকন্তু দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার আলোচনা, "অর্থনৈতিক সেনাপতি-সঙ্ঘ" (ইকনমিক জেনার‍্যাল ষ্টাফ) প্রতিষ্ঠা, জেলায় জেলায় "স্কীম" বা "প্ল্যান" (লক্ষ্য)-মাফিক কর্ম্মপ্রবর্ত্তন—এইসব প্রচার করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার কোথাও না ছিল রাষ্ট্রিক মতামত আর কোথাও না ছিল চাষ-আবাদের ইতিহাস অথবা মুদ্রানীতির প্রত্নতত্ত্ব।

প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখিতেছি যে, এই "প্ল্যান"টা বগলদাবা করিয়াই বিদেশ হইতে বোম্বাইয়ে নামিয়াছিলাম (সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞানসেবার যখন যে-কোঠেই চলাফেরা করি না কেন, সেই প্ল্যানটার এপিঠ-ওপিঠ উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া থাকি। ভারতবর্ষে (আর বাঙলা দেশেও) যাহা-কিছু আর্থিকক্ষেত্রে ঘটিতেছে সবই সেই "স্কীম" আর সূত্র মাফিক বা হদিশ মাফিকই ঘটিতেছে। ভবিষ্যতেও আর্থিক ভারত সেই প্ল্যান অনুসারেই অনেকদিন ধরিয়া চলিবে।

ভারতের সকল বণিক্-শিল্পী অথবা সকল রাষ্ট্রিক সেই "মোসাবিদা", "স্কীম" বা "পাঁতি" দেখিয়া নিজ-নিজ ব্যবসা চালাইতেছেন অথবা কর্ম্মকৌশল কিম্বা অর্থনীতি প্রচার করিতেছেন, এইরূপ বলা হইতেছে না। বলা হইতেছে এইমাত্র যে, সেই মোসাবিদার ভিতর আর্থিক বাড়্‌তি সম্বন্ধে যে-সকল সূত্র, ধারা ও কর্ম্ম-প্রণালী দেখানো হইয়াছে ভারতীয় (আর বঙ্গীয়) সম্পদবৃদ্ধির জন্য সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতে সকলেই সেই পথের পথিক হইতে বাধ্য। এই কয় বৎসরের ভিতরই তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকল করিৎকর্ম্মা লোকই সেই সূত্র ও ধারাসমূহ নিজ-নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যে পরিণত করিয়া ছাড়িবেন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।"

"সমস্যা" শব্দে হাতী-ঘোড়া বুঝিতে হইবে না। মতলব অতি সোজা। বিগত দুচার মাস অথবা বৎসর দুইতিনেকের ভিতর যাহা কিছু আর্থিক ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ করা এবং ব্যাখ্যা করা অথবা এমন কি তাহার বিবরণ প্রদান করা হইল সমস্যা-গবেষণার অঙ্গ। আর আগামী দুচার মাস অথবা বৎসর দুইতিনেকের ভিতর আর্থিক ক্ষেত্রে যাহা কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা তাহার বিশ্লেষণ করা ও ইঙ্গিত প্রদান করা অর্থাৎ এক কথায় ভবিষ্য গণনা করা এই সমস্যা-গবেষণার অন্য অঙ্গ। অবশ্য সমস্যার গবেষণাসমূহ ইচ্ছা করিলে সূত্রাকারে তিন লাইনে সারা সম্ভব। আবার তিন পৃষ্ঠায়ও এই সকল প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইতে পারে। আর ত্রিশ পৃষ্ঠার বহর লইয়াও সমস্যা-গবেষণার প্রবন্ধসমূহ দেখা দিতে সমর্থ। সব রকমই কিছু-কিছু করিয়া দেখা গিয়াছে। কোনো প্রবন্ধে দেশী মাল বেশী, কোন প্রবন্ধে বেশী মাল বিদেশী।

তুলনা-সাধন ও "সাম্য-সম্বন্ধ"

"ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট"-নির্দ্দিষ্ট পথেই "আর্থিক উন্নতি" মাসিকের সম্পাদন চলিতেছে। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচনাবলীও খানিকটা এই পথেই চলিয়া থাকে। নিজ রচনা-সমূহের জন্যও আজ পর্য্যন্ত সেই পথই স্থির রহিয়াছে। এইজন্য "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থের দুই খণ্ডের সঙ্গে "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের দুইখণ্ড আর "বাড়তির পথে বাঙ্গালী" গ্রন্থ একত্রে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। দেশের আলোচনায় আসে দুনিয়ার কথা আর দুনিয়ার আলোচনায় আসে দেশের কথা। ভারতবর্ষ জগতের বহির্ভূত নয়, আবার

জগতের বিদেশগুলাও ভারতের বহির্ভূত নয়। একের কথা বলিতে বলিতে অপরের কথা পাড়া খুবই প্রাসঙ্গিক। দেশটাকে ঠেলিয়া তুলিবার কাজে সর্ব্বদাই চাই "দৃষ্টান্ত", অপরের সঙ্গে তুলনায় মাপাজোকা।

তবে আর একটা মস্ত কথা এইখানে আসিয়া পড়িতেছে। বিদেশগুলার ভিতর কোন্ বিদেশটার অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মপ্রণালী হইতে বর্ত্তমানে তিন, পাঁচ, সাত, দশ বৎসরের ভিতর ভারতে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইতে বাধ্য তাহার মীমাংসায় সাহায্য পাওয়া সম্ভব? অর্থাৎ দুনিয়ার কোন্ কোন্ দেশ ভারতের কাছাকাছি আর্থিক কাঠামোয় রহিয়াছে? দেশে-দেশে "কাছাকাছি" সম্বন্ধ, "ইকুয়েশন্" বা সাম্য-সম্বন্ধগুলা আবিষ্কার করা ভারতীয় অর্থনৈতিক কর্ম্মকৌশলের আসল কথা। দেশে-দেশে "সাম্যসম্বন্ধ" কষিয়া বাহির করার দিকে বর্ত্তমান লেখকের অর্থ নৈতিক গবেষণা-প্রণালীর দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। বস্তুতঃ ইহাই হইল এই লেখকের প্রচারিত "ইকনমিক প্ল্যানিং"য়ের গোড়ার কথা। এই কারণেই বাঙলা দেশের আর্থিক উন্নতি অথবা ভারতের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে পাঁতি প্রচার করিবার সময় বর্ত্তমান লেখককে অন্যান্য অর্থশাস্ত্রী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পথে চলিতে হয়।

ভারতের গবেষক ও লেখক-মহলে বিদেশ-চর্চ্চা কিছু-কিছু ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভাল কথা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত "সাম্য-সম্বন্ধে"র দিকে লোকজনের নজর পড়ে নাই, কেন না তুলনা-সাধন গভীরতর মাপ-জোকের উপর প্রতিষ্ঠিত। ততখানি মাপিয়া-জুকিয়া অঙ্ক কষিয়া রেখা টানিয়া তুলনায় লাগা সময়সাপেক্ষ। ইয়োরামেরিকার "বাঘা বাঘা" দেশগুলায় যখন যে আর্থিক কর্ম্মকৌশলটা নামজাদা হয়, গোটা ভারতের লোকেরা খাঁ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্মকৌশলটা স্বদেশে

লাগাইবার আন্দোলন রুজু করিতে প্রলুব্ধ হইতেছেন। কিন্তু প্রথমতঃ বিদেশী ঘটনা বা বস্তু বা প্রতিষ্ঠানের সব-কিছুই, অথবা দ্বিতীয়তঃ যে-কোনো বিদেশের অভিজ্ঞতাই যখন-তখন ভারতবর্ষের পক্ষে "দৃষ্টান্ত" বা অনুকরণীয় হইতে পারে না। এই জ্ঞান ভারতীয় অর্থশাস্ত্রী মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে আর বোধ হয় বেশী দিন লাগিবে না। "অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স্"-বিদ্যার তুলনামূলক সিদ্ধান্তগুলা অল্পকালের ভিতরেই দেশের লোকের মাথায় বসিবে, বিশ্বাস করি।

বর্ত্তমানে আর্থিক ভারতের পক্ষে বিলাতী কর্ম্ম-কৌশল বেশী আবশ্যক না বল্কান কর্ম্ম-কৌশল বেশী আবশ্যক, জার্ম্মাণ কায়দা বেশী চাই না জাপানী কায়দা বেশী চাই, মাকিণ পাঁতি বেশী কাজে লাগিবে না ইতালিয়ান পাঁতি বেশী কাজে লাগিবে, ফরাসী নীতি বেশী কার্য্যকরী হইবে না রুশ নীতি বেশী কার্য্যকরী হইবে—এই প্রশ্নগুলার জবাব দেওয়া অর্থনৈতিক "ইকুয়েশন' বা সাম্য-সম্বন্ধবিষয়ক গবেষণার উদ্দেশ্য। "ইকনমিক ডেভেলপ্মেণ্ট" গ্রন্থের (১৯২৬) জন্মকাল (১৯২০-২৫) হইতেই অর্থাৎ ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, সুইট্সার্ল্যাণ্ড ও ইতালিতে প্রবাসের সময় হইতেই এই সকল "ইকুয়েশনের" কথা পাড়িয়া আসিতেছি। কাজেই অন্যান্য ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীর ধরণ-ধারণ হইতে বর্ত্তমান লেখকের ধরণ-ধারণ বিলকুল স্বতন্ত্র।

অর্থশাস্ত্রে মত-বহুত্ব ও পথ-বৈচিত্র্য

দুনিয়ার রকমারি অর্থশাস্ত্রী ও রং-বেরঙের ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-সেবীদের ভিতরও যে হরেক রকম পথের পথিক আছে, এই কথাটা বিনা গোঁজামিলে জানিয়া রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমানে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যে-সকল গভীর

ও বিপুল বিরোধ দেখা যাইতেছে, সেইসব সম্বন্ধে সপূর্ণরূপে সজাগ হইলেই "পরবর্ত্তী ধাপের" জন্য ধনবিজ্ঞানের সেবকগণ নিজনিজ কোঠ বাছিয়া অথবা গড়িয়া লইতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, ক্রমশই নতুন-নতুন আলোচ্য বিষয় বা "মুদ্দা", নতুন-নতুন আলোচনা-"প্রণালী" আর নতুন-নতুন "সিদ্ধান্ত", বাণী, সূত্র বা মত ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের আখড়ায় বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে থাকিবে। প্রথম হইতেই আর প্রত্যেক বিদ্যার আলোচনা-গবেষণা-পঠন-পাঠনেই বর্ত্তমান লেখক বৈচিত্র্যের পৃষ্ঠপোষক এবং অদ্বৈতবাদের মুগুর। অর্থশাস্ত্রেও বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব সৃষ্টি এই আদর্শ মাফিক উন্নতির লক্ষণ।

মূল্যতত্ত্বের নানা বিভাগে বাঙালী গবেষকদের হাঁটাহাঁটি করা সুরু হউক। বর্ত্তমান গ্রন্থের ভিতরকার মাল এখানে-ওখানে কামড়াইতে সুরু করিলেই বাঙালী অর্থশাস্ত্রীদের জন্য নতুন-নতুন চিন্তাক্ষেত্র সহজেই মালুম হইবে। বাঙালী আর অ-বাঙালী ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের দৌড় কতখানি তাহা জরীপ করিয়া দেখিবার একটা প্রয়াস শিবচন্দ্র দত্ত প্রণীত "কন্‌ফ্লিক্‌টিং টেণ্ডেন্‌সীজ্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক থট্‌" (অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তায় মত-বহুত্ব) নামক গ্রন্থের (১৯৩৪) অন্যতম অধ্যায়। ইহাতে ১৮৯৮ হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ভারতীয় ছোট-বড়-মাঝারি অর্থনৈতিক রচনার ফিরিস্তি আছে। ফিরিস্তিটা বহরে বড়-বড় পাতার ২৫ পৃষ্ঠা দখল করে। এইটা দেখিলেই কতধানে কত চাল বুঝিয়া আমরা নিজেদের অসম্পূর্ণতাগুলা শুধ্‌রাইবার পথে খাড়া হইতে পারিব।

ধনবিজ্ঞানের দুনিয়ায় ঠিকানা কায়েম

প্রথম ভাগের ভূমিকা লেখা হইয়াছিল জার্ম্মাণির মিউনিক শহরে

১৯৩০ সনের নবেম্বর মাসে। তখন বলিয়াছিলাম "পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের অনেক-কিছুই আগামী পাঁচ বৎসরে বহুবিধ শাখা-প্রশাখায় প্রসার লাভ করিবে সম্ভাবনা আছে। আশাও করা যায়" (পৃষ্ঠা ৩৬)।

আজ ১৯৩৫ সনের মাঝামাঝি। বোধ হয় সেই আশা কিছু-কিছু ফলিয়াছে।

সেই ভূমিকায় আর একটা কথা ছিল নিম্নরূপ :—"১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী যুবক-ভারত অন্যান্য চিন্তাক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্ব-বাসীর যতটা সম্বর্দ্ধনা লাভ করিতে পারিয়াছে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা ও সাহিত্য-সৃষ্টিক্ষেত্রে ততটা পারে নাই। এই সংবাদে যদি যুবক ভারতের রাষ্ট্রিক ও অ-রাষ্ট্রিক মহলে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কর্ত্তব্যজ্ঞান কথঞ্চিৎ জাগিয়া উঠে তাহা হইলে ১৯৩৫ সনে যে যুগ সুরু হইবে তাহা গৌরবময় হইবার কথা।" ১৯৩৫ সনেও ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আবার সেই সুরেই গাহিয়া রাখিলাম। বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ বাঙালী সুধীগণের খেয়াল "লেখালেখির" দিকে খেলাইবার জন্যই এই সকল হাঁকাহাঁকি ও বকাবকি। লেখালেখি ছাড়া কোনো প্রকার বিজ্ঞানের দুনিয়ায়ই "ঠিকানা" কায়েম করা অসম্ভব।

রাণাডে ও রমেশ দত্ত

আধুনিক ধনবিজ্ঞানে যে সকল বস্তু আলোচিত হয় সেইসব প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি-মণ্ডলে ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতিশাস্ত্র), অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র আর শিল্পশাস্ত্র এই কয় শাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। ভারতে আধুনিক ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার প্রবর্ত্তক ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তাঁহার আমলে ভারতীয় পণ্ডিতেরা "সেকেলে" স্মৃতি-বার্ত্তা-নীতিশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। রামমোহনকে একসঙ্গে ভারতীয় ও

পাশ্চাত্য বা "আধুনিক" দুই প্রকার স্মৃতি-নীতি-বার্ত্তা শাস্ত্রের দিকেই নজর দিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ গৌতম-কৌটল্য হইতে মনু-যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ-বৃহস্পতি হইতে বিজ্ঞানেশ্বর-হেমাদ্রি, চণ্ডেশ্বর-মাধবাচার্য্য হইতে রঘুনন্দন-আবুলফাজ্‌ল আর মিত্রমিশ্র-জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পর্য্যন্ত ধারার সঙ্গে রামমোহনের মগজে আসিয়া জুটিয়াছিল আরিষ্টটল হইতে রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) পর্য্যন্ত চিন্তা-ধারার সম্পদরাশি। এই কারণে ভারতীয় ধনবিজ্ঞানের কোঠে রামমোহন প্রাচীনের শেষ আর নবীনের প্রথম বীর।

রামমোহনের পর ভারতে আধুনিক ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংবাদপত্রে এবং মাসিক ও অন্যান্য পত্রিকায় অর্থ নৈতিক আলোচনা বেশ চলিত। বাঙালী-সম্পাদিত ইংরেজি সংবাদপত্র সমূহও এই চর্চ্চায় উৎসাহী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের ভিতর "মারাঠা" পণ্ডিত মহাদেও গোবিন্দ রাণাডে ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় যুবক ভারতের অন্যতম পথপ্রদর্শক। ১৮৯৮ সনে তাঁহার ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে বাহির হয়। তাঁহার সমসাময়িক বাঙালী পণ্ডিত-গণের ভিতর রমেশচন্দ্র দত্ত ঠিক তাঁহারই মতন ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় যুবক ভারতের আর একজন পথ-প্রদর্শক।

সতীশ মুখোপাধ্যায় ও অম্বিকা উকিল

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-১০) যুবক বাংলা রমেশচন্দ্রের অর্থ নৈতিক মতসমূহকে আত্মিক জীবনের অন্যতম প্রধান খাদ্য বিবেচনা করিত। এই সময়ে যুবক বাংলাকে অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডে এবং কর্ম্মকাণ্ডে আর যাঁহারা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতর সতীশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় আর অম্বিকাচরণ উকিল (১৮৬৬-১৯২৩) সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সতীশচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে "ডন" নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন (১৮৯৮)। ১৯০৩ সনে তিনি ডন সোসাইটি নামক আলোচনা-সমিতি কায়েম করেন। তাহার সঙ্গে-সঙ্গে পুরাণা "ডন" পত্রিকা ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিন নামক মাসিক রূপে চলিতে থাকে। এই সমিতি আর পত্রিকার মারফৎ সতীশ মুখোপাধ্যায় বহুসংখ্যক বাঙালী যুবকের ভিতর আধুনিক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণা-বিষয়ক সোআদ বাঁটিতে পারিয়াছিলেন। কৃষিশিল্পবাণিজ্যের কাজে যুবাদের হাতে-কলমে অভ্যাস সৃষ্টি করানোও তাঁহার অন্যতম ধান্ধা ছিল। ১৯০৭ সনে কলিকাতায় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। এই পরিষদের পাঠচর্চ্চায় যন্ত্রবিদ্যা, ফলিত বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক অর্থকরী টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার উপর যাহাতে ঝোঁক বেশী পড়ে তাহার জন্য তিনি সহযোগীদের মত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে এই ধরণের যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত বার্ত্তা-শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্বে আর বোধহয় ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গে দেশী-বিদেশী ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যায় গবেষণা ও গ্রন্থপ্রকাশ যাহাতে সহজেই সিদ্ধ হয়, সেইদিকেও জাতীয় শিক্ষাপরিষদে ব্যবস্থা করা হয়। এই বিষয়ে তাঁহার প্রচুর আগ্রহ ছিল। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলী গ্রন্থাকারে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। "ডন"-পত্রিকার সম্পাদকীয় অর্থাৎ অনামী রচনাবলীর ভিতর অনেকগুলাই তাঁহার নিজের লেখা।

অম্বিকা উকিল ১৮৯৮ সনে "সমুত্থান" নামে একটা সমবায়-বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক বাহির করেন। সমবায় সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য তাঁহার

জীবনের নেশা ছিল। প্রচার তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল না। কলিকাতায়, কাশীতে, আর মান্দ্রাজে সমবায়-নিয়ন্ত্রিত কারবার চালাইয়া তিনি যুবক ভারতের অন্যতম আদর্শস্থানীয় হন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অম্বিকা উকিল হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌শিওর্যান্স কোম্পানী (১৯০৭) আর কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক (১৯০৮) প্রতিষ্ঠা করেন। সেই যুগে কর্ম্মযোগী অর্থশাস্ত্রী বলিলে বাঙালীরা ব্যবসা-"ধুরন্ধর" অম্বিকা উকিলকে বুঝিত। বইয়ের আকারে অম্বিকা উকিলের লেখাগুলা সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার প্রচারিত পুস্তিকা-বলী সেই যুগের যুবক বাঙলাকে ধনবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডে রোজ-রোজ নতুন-নতুন হদিশ দিয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগের বাঙালী-অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইতে হইলে কর্ম্মবীর সতীশ মুখোপাধ্যায় আর কর্ম্মবীর অম্বিকা উকিলের ডাক পড়িতে বাধ্য। এই দুই জনের সঙ্গেই বর্ত্তমান লেখকের এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের নিবিড়তম আত্মীয়তা ছিল।

কৌটল্য-শুক্র-আবুল ফাজ্‌ল্-রামমোহনের বংশধরগণ

বাঙালীর ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা যুগে-যুগে নতুন-নতুন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। একালের মূর্ত্তিগুলাই একমাত্র মূর্ত্তি নয়। সতীশ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা উকিল আর রমেশ দত্তের পশ্চাতে রহিয়াছে গোটা উনবিংশ শতাব্দী। আর উনবিংশ শতাব্দীর মাথা আগ্‌লাইয়া আছেন রামমোহন। অধিকন্তু রামমোহনের মুড়োটা দখল করিবার জন্য চাই কৌটল্য, মনু, শুক্রাচার্য্য ও আবুল ফাজ্‌লের অর্থ-স্মৃতি-নীতি-আইন-বার্ত্তা। একালে আমরা মিল-মার্ক্‌স্‌-মেঙ্গার-মিচেল মুখস্ত

করিতেছি আর ইয়োরামেরিকার সব-কিছু হজম করিয়া জীবনের বাড়্তি সাধন করিতেছি। কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক যে, যুবক বাঙলার অর্থশাস্ত্রীরা শেষ পর্য্যন্ত কৌটিল্য-শুক্র-আবুল ফাজ্ল্-রামমোহনেরই বংশধর। "একাল"কে আমরা যতই গৌরবজনক করিয়া তুলি না কেন "সেকালের" গৌরবগুলায় ও আমরা দৌলতমন্দ্।

বস্তুতঃ একমাত্র ইয়োরামেরিকার দৌলতে একালের বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় অর্থশাস্ত্র গড়িয়া উঠিত না। নেহাৎ শিয়াল-কুকুরের বাচ্চা হইলে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারত-সন্তান জগতে উল্লেখ-যোগ্য কিছুই খাড়া করিতে পারিত না। আমাদের ঠাকুরদাদাদের সৃষ্টিগুলা একালের যুবক ভারতের কর্ম্ম ও চিন্তা রাশিকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্ট করিয়াছে। একালের বাঙালী-অর্থশাস্ত্রের আলোচনা-প্রণালী, পরিভাষা ও সিদ্ধান্ত সমূহ কৌটিল্য-শুক্র-আবুলফাজ্ল্-রামমোহনের নিকট বেশ-কিছু ঋণী। নয়া বাঙলার ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা কৌটিল্য-শুক্র-আবুল ফাজ্ল্-রামমোহনের ধারাকেই বাড়াইতে-বাড়াইতে আগুয়ান হইতেছে।

"জয় কৌটিল্যের জয়", "জয় শুক্রাচার্য্যের জয়", "জয় আবুল ফাজ্লের জয়", "জয় রামমোহনের জয়",—এই মন্ত্রেই মঙ্গলাচরণ করিবার পর অথবা সঙ্গে-সঙ্গে অর্থশাস্ত্র-গবেষণায় প্রবৃত্ত যুবক বাঙলার মুখে শোভা পাইবে "নমো রিকার্ডবে নবীন-ধনবিজ্ঞান-ভগীরথায়" আর "নমো বিস্মার্কায় ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা-প্রবর্ত্তকায়"।

"আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী

"আর্থিক উন্নতি"র দুই বৎসর খতম হইল (১৯২৮)। এবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ।

ইয়োরামেরিকা (১৮৬০)=যুবক ভারত (১৯২৮)

বলা বাহুল্য, দেশ আজকাল যেরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক অবস্থায় রহিয়াছে সেই অবস্থার উপযোগী সম্পদ্-বৃদ্ধির হদিশ আবিষ্কার ও প্রচার করা অপেক্ষা "আর্থিক উন্নতি"র সম্মুখে আর কোনো মহত্তর লক্ষ্য থাকিতে পারে না। দুইবৎসর ধরিয়া আমরা সর্ব্বদাই সংবাদ-প্রবন্ধ-মোলাকাতের সাহায্যে এই "কর্ম্মকাণ্ডে"র নয়া-নয়া পথ "যথাসাধ্য" দেখাইয়া আসিতেছি।

ইয়োরামেরিকা আজকাল যাহা-কিছু আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে সাধন করিতেছে তাহার অনেক-কিছুই বাঙালীর পক্ষে বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়। ইয়োরামেরিকার নরনারী ১৮৬০ সনের সমসমকালে অথবা এদিক্ ওদিক্ যে-ধরণের আর যে-গড়নের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য চালাইয়াছে বর্ত্তমান ভারতের নরনারী আজ ১৯২৮ সনে মোটের উপর তাহারই উপযুক্ত।

এখানে "ইয়োরামেরিকা" শব্দে ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি শিল্প-নিষ্ঠায় পাশ্চাত্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় জনপদগুলা বুঝিতে হইবে।

অতএব দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিগুলার বিগত ৬০।৭০ বৎসরের রোজনামচাটা যদি যুবক বাঙলা শক্ত মুঠার ভিতর পাকড়াও করিতে পারে তাহা হইলেই আমাদের আর্থিক উন্নতির পথ পরিষ্কার ও চওড়া

হইয়া আসিবে। এই সকল কথা "আর্থিক জীবনে পরের ধাপ" এবং "যুবক বাঙ্‌লার অর্থশাস্ত্র" নামক প্রবন্ধে খুলিয়া বলা হইয়াছে। প্রত্যেক সংখ্যায় "দুনিয়ার ধনদৌলত" নামক অধ্যায়ের সঙ্গে "বাংলার সম্পদ্‌" ও "আর্থিক ভারত" অধ্যায় দুইটা তুলনা করিয়া পড়িলেই যে-কোনো পাঠক আমাদের এই "ফর্ম্মুলার" তাৎপর্য্য সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ধনবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড

তৃতীয় বৎসরের জন্য হালখাতা খুলিবার সময় আজ সেই কথার পুনরুক্তি আর করিতে চাই না। এইবার ধনবিজ্ঞানের "জ্ঞান-কাণ্ড" সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিব।

বাঙলাদেশে আজ হাজার অভাব। তাহার ভিতর একটা হইতেছে আর্থিক জীবন সম্বন্ধে চর্চ্চার অভাব। অর্থনৈতিক চিন্তায় মাথা খেলানো বা ঘামানোর দিকে বাঙালী জাতির খেয়াল নেহাৎ কম। বাংলার নরনারীকে এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে মগজ চালাইবার কাজে উদ্বুদ্ধ করা "আর্থিক উন্নতি"র এক বড় ধান্ধা। বাঙালীর মেজাজ এ দিকে ঘুরিলেই "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম লক্ষ্য সাধিত হইবে।

চাই পঞ্চাশটা আর্থিক পত্রিকা

"আর্থিক উন্নতি"র আটটা আলাদা-আলাদা বিভাগ। তা ছাড়া প্রবন্ধ বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ লইয়াই এক একটা স্বাধীন মাসিক চালাইবার দায়িত্ব বাঙালী জাতিকে লইতে হইবে। "বাংলার সম্পদ্‌", "আর্থিক ভারত", "দুনিয়ার ধনদৌলত", "অর্থনৈতিক সাহিত্য"

ইত্যাদি বিষয়গুলা আমরা কোনো মতে "নমো" "নমো" করিয়া সারিতেছি। তাহাতে দেশের জন্য বেশী কাজ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়েই বিপুল সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে। দেশে আজ তাহার প্রয়োজনও আছে।

আর এক কথা। কি "আর্থিক ভারত," কি "দুনিয়ার ধনদৌলত",—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বহুসংখ্যক বিভিন্ন রকমের কারবার আলোচনা করা "আর্থিক উন্নতি"র কাজ। ব্যাঙ্ক, বীমা, ফ্যাক্টরি, মজুর, আবাদ, চাষী, রেল, খনি, বন, দালালি, আমদানি-রপ্তানি, বন্দর, জাহাজ, ট্রাম, নৌকা, নদী, খাল, ঘর-বাড়ী, ধর্ম্মঘট, ট্যাক্স, নগর-শাসন, সম্পত্তির আইন-কানুন, ইত্যাদি নানা প্রকার আর্থিক তথ্য প্রত্যেক সংখ্যায়ই আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে পেট ভরে না,—কেন না কোনো দফায়ই বেশী-বেশী ঘটনা, সমস্যা বা মীমাংসার বৃত্তান্ত আনিয়া হাজির করা সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যকে আজ ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধে বীমা, সম্বন্ধে, মজুর সম্বন্ধে, চাষী সম্বন্ধে, বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে, এক কথায় আর্থিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পত্রিকা চালাইবার কথা ভাবিতে হইবে।

প্রায় পাঁচ কোটি বাঙালী আমরা। কম্‌সে-কম পঞ্চাশখানা বাঙালী-পরিচালিত আর্থিক পত্রিকা বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হইলে আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা হইতে পারে। সেই ইজ্জৎ রক্ষার কাজে বাংলার নরনারীকে চাঙ্গা করিয়া তোলা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম ধান্ধা।

ধনবিজ্ঞানের এম, এ পাঠ্য

"আর্থিক উন্নতি"র বিভিন্ন অধ্যায়ে কি দরের মাল বাহির হয় তাহা

কোনো-কোনো পাঠকের হয়ত বুঝিবার সুযোগ নাই। যাঁহারা ধন-বিজ্ঞানে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে এম্, এ পাশ করিয়াছেন অথবা যাঁহারা এই সকল বিষয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়াইয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে দরটা কষিয়া দেওয়া সহজ। যে ধরণের তথ্য ও তত্ত্ব এই পত্রিকার মারফৎ সংক্ষেপে সংবাদ-সমালোচনা-প্রবন্ধের আকারে বাহির হইতেছে সেই ধরণের তথ্য ও তত্ত্ব ছাড়া এম, এ ক্লাশের পাঠ্যপুস্তকে আর কোনো মাল থাকে না। ধন-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যে সব টেক্স্ট্ বুক চলিতেছে তাহার লেখকেরা এই সব তথ্য ও তত্ত্বই সাজাইয়া-গুছাইয়া ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থস্থ করিতে অভ্যস্ত। বস্তুতঃ, টেক্স্ট্‌বুকের মালগুলা অনেক সময়ে নীরস ও "সেকেলে" চীজ, কম্‌সেকম্ দশ-বার বৎসরের বাসি জিনিষ। "আর্থিক উন্নতি"র তাজা তথ্যের সাহায্যে পাঠ্য পুস্তকগুলার সজীব হইয়া উঠিবারই কথা। প্রকৃত পক্ষে, বইগুলা যেখানে খতম, "আর্থিক উন্নতি" সেইখানে সুরু হয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এম্, এ'র পরবর্ত্তী ধাপের পঠন-পাঠনে সাহায্য করা "আর্থিক উন্নতি"র স্বাভাবিক কর্ম্ম-গণ্ডীরই অন্তর্গত।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। এম, এ'র বই বলিলে বুঝিতে হইবে যে, দুনিয়ার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধন-সাহিত্যের কথা বলা হইতেছে। তবে এম, এ ক্লাশে ছাত্রেরা পড়িবার সুযোগ পায় মাত্র দশ-বিশ খানা বাছা-বাছা বই। একমাত্র তাহার জোরে দুনিয়ার আর্থিক সমস্যা সহজে কব্জায় আনা সম্ভবপর নয়। তাহার জন্য ঐ ধরণের এবং ঐ শ্রেণীর আরও অনেক বই মুখস্থ করা দরকার। যে সকল এম, এ উপাধিধারী যুবা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর এই সমুদয় বই "অনেকগুলা" হজম করিতে চেষ্টা করে

তাহারাই যথাসময়ে সংসারে ধন-বিজ্ঞানের ওস্তাদরূপে দাঁড়াইয়া যাইতে সমর্থ। অন্যান্য দেশের দস্তুর এইরূপ। আমাদের দেশেও এইরূপ দস্তুর দাঁড়াইয়া গেলেই সুখের কথা হইবে।

এই সর্ব্বোচ্চ মাপকাঠি হাতে লইয়াই "আর্থিক উন্নতি" চালানো যাইতেছে। এখানে-ওখানে ঢুঁ মারিয়া একদিকে খবর রাখিতেছি দেশে-বিদেশে, বাঙালী-অবাঙালী, ভারতীয়-অভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা কি দরের বই মুখস্থ করিতেছে আর মুখস্থ করিয়া ডিগ্রী পাইতেছে। অপরদিকে খোঁজ লইতেছি কবে কোথায় কোন্ ভাষায় কি বই বাহির হইল। এই দুই তরফের কিছু-কিছু খতিয়ান "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের সম্মুখেও নিয়মিতরূপেই ধরা হইয়া থাকে।

"আর্থিক উন্নতি" সম্পাদনের মাপকাঠি

আর একটা উপায়ে মাপকাঠিকে লম্বা রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে যে-কয়খানা নং ১ শ্রেণীর পত্রিকা বাজার-প্রসিদ্ধ, সেইসবের অনেকগুলাই আমাদের নিত্য-ভক্ষ্য পদার্থ। তাহা হইতে নিংড়াইয়া-নিংড়াইয়া "কস"টা উদরস্থ করা হইতেছে সম্পাদকের আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। আর তাহার ভিতর যা-কিছু "রস" সবই বাঁটিয়া দেওয়া হইতেছে বাঙালী জাতিকে "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ। এই কাগজগুলা প্রতিদিন না পড়িলে আর পড়িয়া রোজ-রোজ খানিকটা বিদ্যা না বাড়াইলে "আর্থিক উন্নতি"র সাদা পাতাগুলা কাল হরপে ভরিয়া দেওয়া অসম্ভব। বলা বাহুল্য কাগজটা বছরে মাত্র ৮০ পৃষ্ঠা। কাজেই আমাদের সীমানা সম্বন্ধে জ্ঞানটা আমাদের সর্ব্বদাই টন্‌টনে।

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, "পত্রিকা-জগৎ" অংশটার কথাই

বোধ হয় বলা হইতেছে। তাহা নয়। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেখানে যতটুকু তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে তাহার প্রায় বার আনা চৌদ্দ আনা আসে ফরাসী-জার্মাণ-ইতালিয়ান-জাপানী-ইংরেজ-মার্কিণ পত্রিকাবলী হইতে। অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বইগুলার লেখক যাঁহারা তাঁহাদের সাপ্তাহিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক রচনাবলীর সঙ্গেই "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের মাস-মাস মোলাকাৎ হইতেছে। অবশ্য "ডোজ"টা হোমিওপ্যাথিক বটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়

"আর্থিক উন্নতি" যে আদর্শে পরিচালিত হইতেছে সেই আদর্শে যদি বাঙালী লেখকেরা পঞ্চাশখানা পত্রিকা চালাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে তাহা হইলে কি দেখিতে পাইব? দেখিব যে, ইস্কুল-পাঠশালার বাহিরে এক সঙ্গে পঞ্চাশ-পঁচাত্তর হাজার বাঙালী নরনারী বাংলা ভাষার সাহায্যে নিয়মিতরূপে ধনবিজ্ঞান বিদ্যার ক্ষেত্রে এম, এ পড়িতেছে। এতগুলি বাঙালীকে এক সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে ঘরে-ঘরে এম, এ পড়ানো যেদিন সম্ভবপর হইবে সেইদিন বাঙ্‌লার স্বদেশ-সেবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট নিজেদের ঋণ পরিশোধ করিবার অধিকারী হইবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ' কয়েক ছাত্র-ছাত্রীর উপর বাংলার ধন-সাহিত্য, অর্থনৈতিক গবেষণা, বা আর্থিক উন্নতি নির্ভর করিবে না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেই একটা বিপুল বিশ্ববিদ্যালয় বিরাজ করিতে থাকিবে। আগামী আট-দশ বৎসরের ভিতর বাংলা দেশে সেই অবস্থা ঘটাইয়া তোলাই "আর্থিক উন্নতি" একটা কাজের মতন কাজ বিবেচনা করে।

মফঃস্বলের পত্রিকা

ফরাসী-জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান ইত্যাদি নানা বিদেশী ভাষায় প্রচারিত গ্রন্থ-পত্রিকার রস-কস গলাধঃকরণ করা আমাদের দৈনিক কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু চোখ আমাদের ভারতমুখো, বাস্তবিক পক্ষে বাংলা-মুখো একথা বলাই বাহুল্য। কাজেই বাংলা আর ভারতীয় গ্রন্থ-পত্রিকাদির ইজ্জৎ দেওয়া আমাদের স্বধর্ম্ম। বস্তুতঃ মফঃস্বলের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলাকে "আর্থিক উন্নতি" প্রকারান্তরে "নিজ সংবাদদাতা"রূপে সদ্ব্যবহার করিতেই অভ্যস্ত। দুঃখের কথা, বাঙালী, অবাঙালী, ভারতীয় দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকে তথ্যনিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠা সংখ্যানিষ্ঠা, এখনো বড কম। বক্তৃতার ঝোঁক, লম্বা-লম্বা কর্ত্তব্য-তালিকা প্রচার করা, দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য মত জাহির করা, না বুঝিয়া-শুনিয়া কর্ম্মপ্রণালী বাত্‌লানো অথবা সমালোচনা করা আজও ভারতীয় সুধী-অসুধী সকল সমাজেই বেশ চলিতেছে। কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র বাংলা আর ভারতীয় অধ্যায় দুইটা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অভাবে খানিকটা খাটো থাকিয়া যাইতেছে। বাঙ্‌লার জেলায়-জেলায় আজকাল অনেক সুশিক্ষিত এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বদেশসেবক আছেন। তাঁহারা খানিকটা "গা করিয়া" যদি নিরেট কাজের তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের দিকে মাথা খেলাইতে রাজি হন তাহা হইলে যুবক বাঙ্‌লার আর্থিক সাহিত্য অচিরেই যারপর নাই পুষ্ট হইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আর্থিক গতিভঙ্গীর ফটোগ্রাফ

এই বিষয়ে আমরা আমাদের পাঠকদের নিকট হইতেও নানাপ্রকার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। নিজ চোখে দেখিয়া অথবা কানে শুনিয়া

তাঁহারা নিজ এলাকার ভিতরকার গরু, ক্ষেত, মাঠ, শাকসব্জী, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, খাল, দরিয়া, রেল, নৌকা, তাঁতী, মজুর, কারখানা, ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয়ক বাড়া-কমা বা অন্য কোনো পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে "সংবাদ" পাঠাইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। সংবাদ রচনায় ভাব-প্রবণতা অথবা "দেশোদ্ধারের" ফরমায়েস দরকার হয় না। আর্থিক জীবনের গতিভঙ্গীগুলা,—ঠিক যেন ফটোগ্রাফের সাহায্যে,—যেমনটি তেমন ধরিয়া রাখিতে পারিলেই সংবাদিকদের কাজ হাসিল হইবে। ব্যাখ্যা-সমালোচনা-টীকা-টিপ্পনীর ক্ষেত্র "বাঙলার সম্পদ" অথবা "আর্থিক ভারত" নামক দুই অধ্যায়ে বিলকুল নাই।

চাই নং ১ শ্রেণীর ডজন-ডজন গবেষক

এই গেল "আর্থিক উন্নতি"র এক তরফের সাধনার কথা। বাংলা ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর ধন-সাহিত্য সৃষ্টি করা আর হাজার-হাজার বাঙালী পাঠকের পাতে এই সাহিত্য নিয়মিতরূপে পরিবেষণ করা যাহাতে সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য আন্দোলন জাগাইয়া রাখা আমাদের এক প্রধান লক্ষ্য। শক্তি ও সুযোগ আমাদের কতটা আছে সেদিকে অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করা আমাদের দস্তুর নয়। দেশে এই অভাবটা আছে, অতএব সেই অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেই হইবে এই হইতেছে "আর্থিক উন্নতি"র মূলমন্ত্র। পারা না পারা পরের কথা।

আর এক তরফের সাধনাও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করিবে কাহারা? আজকালকার বাংলায় এইরূপ লেখক ত বড় একটা চোখে পড়িতেছে না। থাকিলেও তাঁহাদের লেখালেখির স্বভাব বোধ

হয় নাই অথবা হয়ত খুবই কম। কাজেই সমস্যা দাঁড়াইতেছে বাঙালী সমাজে একদল উচ্চশ্রেণীর গবেষক, লেখক, অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-স্রষ্টা গড়িয়া তোলা। এমন লোক চাই যাহারা ইয়োরামেরিকান ধন-বিজ্ঞানসেবীদের মোটা-মোটা বই দেখিবা মাত্র আঁৎকাইয়া উঠিবে না, যাহারা তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে তর্কাতর্কি চালাইতে পারিবে, যাহারা তাহাদেরই মতন সকল প্রকার আর্থিক ও অর্থনৈতিক রচনা প্রকাশ করিয়া বাঙালী মগজের কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইবে। অন্যান্য বিষয়ের মতন এই বিষয়েও আমাদের মাপকাঠি বেশ লম্বা। জগতের ধনবিজ্ঞান-সভায় বাঙালী মুড়োকে লড়িতে হইবে দুনিয়ার অন্যান্য মুড়োর সঙ্গে। সেই ধরণের মুড়ো, সেই ধরণের পঠনপাঠন, সেই ধরণের অনুসন্ধান-গবেষণা, সেই ধরণের প্রবন্ধ-গ্রন্থ-প্রকাশ আগামী আটদশ বৎসরের ভিতর বাঙালী চিন্তাক্ষেত্রের একটা নতুন বিশেষত্ব হওয়া চাই।

পাঁচকোটি বাঙালীর দেশে অন্ততঃ পক্ষে একশ'জন গবেষক উচ্চতম ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় হামেশা মোতায়েন থাকিলে একটা চলনসই কাজ চলিতে পারে। আট-দশ বৎসরের ভিতর এইরূপ লেখক-গবেষকের সংখ্যা গোটা শ'য়ে আসিয়া যাহাতে ঠেকিতে পারে তাহার দিকে নজর রাখা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম মস্ত ধান্ধা। অবশ্য নজর রাখিলেই যে পয়লা নম্বরের ডজন-ডজন ধনবিজ্ঞানগবেষক হাজির হইবে এমন কোনো কথা নাই। কেননা এখানে টাকাকড়ির মামলা। খরচ-পত্র করিতে পারিলে লোক তৈয়ারি করা হয়ত কঠিন নয়। তবে এই শ্রেণীর লেখক কোন্ উপায়ে সৃষ্ট হইতে পারে তাহার আধ্যাত্মিক হদিশগুলি ঠারে-ঠোরে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে "আর্থিক উন্নতি"র পাতায়-পাতায় প্রচার করা যাইতেছে।

উচ্চাঙ্গের গবেষণা-প্রণালী

নং ১ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-গবেষক বা ধন-সাহিত্যস্রষ্টা বা অর্থনৈতিক রচনার লেখক কাহাকে বলে? জবাব অতি সোজা। দুনিয়ায় এই বিভাগে যে সকল লোক হোমরা-চোমরা তাহাদের নাম করিলেই হইল। সেই সব নাম আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজে কতকগুলা জানা আছেই আছে। কাজেই পয়লা নম্বরের লোক কী চীজ তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বুঝা যাইতেছে না একটা আসল কথা। পয়লা নম্বরের লেখক-গবেষক হওয়া যায় কি করিয়া? তাহাদের ভিতরকার কথাটা কি? সেইটাই হইতেছে সমস্যা। যে দিন কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম হইয়াছে সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যুবক বাঙলার অনেক লোকই পয়লা নম্বরের ধনসাহিত্য-স্রষ্টাদের নাম-কামের সহিত পরিচিত রহিয়াছে। কিন্তু এই নামজাদা গবেষকগুলা "কি খাইয়া" নামজাদা হইল তাহার সন্ধান করা বোধ হয় কোনো বাঙালী নিজ কর্ত্তব্য বিবেচনা করে নাই। করিলেই পয়লা নম্বরের গবেষকদের "হাঁড়ীর খবর" আমরা পাইতাম। আর তাহা হইলে এই শ্রেণীর গবেষক এতদিনে বাংলা দেশেও হয়ত অনেক পায়দা হইতে পারিত।

আবার বলিয়া রাখি যে, বিদেশী গবেষকেরা যে-যে প্রণালীতে মানুষ হইয়াছে, সেই প্রণালীগুলার কথা জানা থাকিলেই যে বাঙালী সমাজেও আপনা-আপনি উচ্চ শ্রেণীর গবেষক দেখা দিতে বাধ্য জোর করিয়া এমন কথা বলা আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত নয়। বাঙালী সমাজে ধনসাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল লোক ঝুঁকিতেছে না কেন তাহার কারণ হয়ত একাধিক। এই জটিল প্রশ্নের আলোচনা সম্প্রতি করিতেছি না। কিন্তু যদি দু-চার জন ঝুঁকিতে চায় অথবা ঝুঁকিয়া

থাকে তবে তাহাদের ধনবিজ্ঞান চর্চ্চাটা উচ্চশ্রেণীর হইবে কিনা তাহাই সম্প্রতি বিবেচনার বস্তু। এই বিচারে বসিলে বলা যাইতে পারে যে, পয়লা নম্বরের বিদেশী গবেষকদের ধরণধারণগুলা রপ্ত করাই হইতেছে পয়লা নম্বরের গবেষক হইবার প্রধান উপায়। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ৬০।৭০ বৎসর ধরিয়া আমরা নামজাদা ধনবিজ্ঞানসেবীদের কেতাব মুখস্থ করিয়া আসিতেছি মাত্র কিন্তু তাঁহাদের কেতাব-রচনা-প্রণালী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালীটা পাকড়াও করিতে সচেষ্ট হই নাই। এই জন্যই যেটুকু বাঙালী-লিখিত ইংরেজি বা বাংলা ধনসাহিত্য আছে তাহার অধিকাংশেরই দর বেশী উঁচু নয়। বাঙালী মগজকে আজ বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে কথঞ্চিৎ উচ্চাঙ্গের পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। এই জন্য চাই উচ্চ শ্রেণীর গবেষণা-প্রণালীর সঙ্গে ঘন-ঘন মোলাকাৎ আর সেই আলোচনা-পদ্ধতির সদ্ব্যবহার।

অতএব আবশ্যক ধনবিজ্ঞান বিষয়ক মহত্ত্বের চাবীটা ঢুঁড়িয়া বাহির করা। জিজ্ঞাস্য, বড় বড় গবেষক হইবার কলকব্জা কিরূপ? কোন্ কোন্ কৌশল কায়েম করিয়া নামজাদা ধনবিজ্ঞান-বীরেরা বীরত্ব লাভ করিয়াছে? পয়লা নম্বরের গবেষণা-পদ্ধতির যন্ত্রপাতি কি কি? উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনার ভিতর "মিষ্ট্রি", গুপ্তবিদ্যা, রহস্যটা কোথায়?

ফিশারের সাজঘর

"ম্যাথ্ম্যাটিক্যাল ইকনমিক্স্" বা গণিত-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করিবার সময় দু'একবার মার্কিণ পণ্ডিত ফিশারের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ফিশার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দেখা যাউক ফিশার কি খাইয়া মানুষ।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক সকল প্রকার কাগজেই ফিশারের কলম চলে। একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি আছে। "ইণ্ডেক্স্-নাম্বার" (সূচী-সংখ্যা) বিষয়ক বিদ্যায় ফিশার একজন ওস্তাদ। "পার্চেজিং পাওয়ার অব ম্যনি" (টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি) নামক তাঁহার অন্যতম বই ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। এইটা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১১ সনে। এই বই লিখিবার পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে ফিশার "নেচার অব ক্যাপিট্যাল অ্যাণ্ড ইনকাম" (পুঁজি ও আয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ) গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "রেট অব ইণ্টারেষ্ট" (সুদের হার) নামক বইও "টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি"র পূর্ব্বে দেখা দিয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল অধ্যায় আছে তাহার কোনো কোনোটা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক এবং সংখ্যাবিজ্ঞান বা ষ্ট্যাটীষ্টিক্স্ বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটা প্রবন্ধ ১৮৯৪ সনে ছাপা হইয়াছিল। অর্থাৎ কমসে-কম সতের বৎসরের লেখালেখির অভিজ্ঞতা এই বইটার ভিতর দেখা যাইতেছে। বইটা মোটা হরপের শ'পাঁচেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বইটার সমালোচনা করা অথবা চুম্বক প্রকাশ করা সম্প্রতি আমাদের মতলব নয়। আমরা চাই ফিশারের মগজের ভিতরকার ঘী'টা বাহির করিয়া তাহার গতিবিধির ধরণ-ধারণ বিশ্লেষণ করিতে। বিজ্ঞান-সাধনার জন্য কিরূপ সরঞ্জাম লইয়া ফিশার সাহিত্য-সংসারে দাঁড়াইয়াছিল তাহাই এই ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। যে-সব লোক আত্মজীবন-চরিত লিখিয়া থাকে আর বেশ খুঁটিনাটির সহিত নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনাটা বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত তাহাদের বই হাতে ধরিলেই তাহাদের মগজের ঢঙ্ ও গড়ন পাঠকদের নিকট খোলসা হইয়া আসে। কেননা লেখকেরা নিজেই নিজ-নিজ ল্যাবরেটরীর

সাজগোছ, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা সব-কিছুই খুলিয়া দেখাইতেছেন। কিন্তু আত্মজীবনচরিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। আর প্রত্যেক বইয়েই একটা করিয়া আত্মজীবনচরিত জুড়িয়া দেওয়া সম্ভবপর ও নয়। অধিকন্তু অনেক সময়েই লেখকেরা ফুটনোটের সাহায্যে প্রত্যেক আলোচ্য বস্তুর অথবা আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তের জন্মকোষ্ঠী দিতে অভ্যস্ত নয়। তাহা হইলে লেখকদের মাথাটা জরীপ করা অসম্ভব কি? কখনই নয়। জরীপ করা খুবই সম্ভব। লেখাটা ছুঁইবা মাত্রই অথবা লেখাটার ভিতর প্রবেশ করিলেই তাহার ওজন মালুম হইতে থাকে। আর তাহার আগাপাছা,—"অলিখিত অংশ', "সাজঘরের আসবাবপত্র", ইত্যাদি ল্যাবরেটারি-সংক্রান্ত অনেক-কিছুই জানা হইয়া যায়। এই গুলাকে "ইণ্টার্ণ্যাল এভিডেন্স" বা আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলীর সামিল করিতে পারি।

ফিশারের বইয়ে অবশ্য ফুটনোট দস্তুর মতনই আছে। সেইগুলির পিছু-পিছু ছুটিলেই "টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি"র "রহস্য"টা একদম জলবৎ তরল হইবারই কথা। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি-হাটাহাটির অভ্যাস যাহাদের নাই তাহারা একমাত্র "আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলীর" উপর ভর করিলেই ফিশারের সাজঘরের আসবাবপত্র অনেকটা আন্দাজ করিতে পারিবে।

টাকা-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী

ফিশার গণিতনিষ্ঠ বটে। কিন্তু কটমট গাণিতিক যাহা-কিছু সবই "পরিশিষ্টে" দ্রষ্টব্য। মামুলি শুভঙ্করী আর ধারাপাতের জোরেই তাঁহার মোটা কথাগুলির প্রায় সবই বুঝা যায়। টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি যাহাকে বলে তাহারই আর এক নাম হইতেছে বাজার-দর। এই বাজারদর সম্বন্ধে বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবার জন্য ফিশারের কিরূপ

আদানুণ দরকার হইয়াছিল? দেখিতেছি যে, খুঁটিয়া-খুঁটিয়া হাজার বৎসর ব্যাপী বাজার-দরের ওঠানামাগুলা রপ্ত করা হইতেছে প্রধান কাজ। এই জন্য সোনারূপার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে যেখানে যাহা কিছু লিখিয়াছে সেই সবই ফিশারকে হজম করিতে হইয়াছে। ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ কোনো তথ্যবিদের অঙ্কগুলা বাদ যায় নাই। তাঁহাকে মায় ভারতের বাজার-দর, জাপানী বাজারের ওঠানামা, এবং অন্যান্য 'রূপার" দেশের দর-দস্তুর সবই ঘাঁটিতে হইয়াছে। সোনা রূপা তামা ইত্যাদি ধাতুই একমাত্র টাকাকড়ি নয়। একালে কাগজী টাকার আবির্ভাব হইয়াছে। কাজেই কাগজী টাকার আওতায় বাজার-দর আমেরিকা, ফ্রান্স, বিলাত ইত্যাদি নানা দেশে কবে কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে তাহাও ফিশারের মগজে ঠাঁই পাইয়াছে। এই সংখ্যাগুলা নানা ভাবে সাজানো। সাজাইয়া সেগুলাকে গ্রাফ-ছবির আকারে ধরিয়া রাখা, আর একটা ছবির সঙ্গে অন্য একটা ছবির তুলনায় সমালোচনা করা, এই হইতেছে প্রধান বা একমাত্র কাজ।

আর্থিক "কার্ভ্" বা উৎরাই-চড়াই

মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন ওঠানামার বা হ্রাস-বৃদ্ধির কাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয় বাজার-দরটাও সেইরূপ কখনো বাড়িতেছে কখনো নামিতেছে। এই হইতেছে বাজারের প্রাণস্বরূপ। নরনারীর জীবনকে ছবিতে ধরিয়া রাখিতে হইলে আবশ্যক হয় পাহাড়ী শিখর-রেখার গতিভঙ্গীর মতন উৎরাই-চড়াই আঁকিয়া রাখা। বাজার-দরের বেলায়ও ঠিক সেইরূপ উৎরাই-চড়াইয়ের রেখা টানা সম্ভব। সেই রেখার ঢেউ-পরম্পরাই হইতেছে আর্থিক দুনিয়ার "কার্ভ্"। ফিশারের ল্যাবরেটরী এইরূপ 'কার্ভের" পর "কার্ভ্"। কার্ভ্গুলা এখান-ওখান-

সেখান হইতে ঢুঁড়িয়া বাহির করা আর সেইগুলাকে পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের ঢেউয়ের তুলনা করা টাকা-বিজ্ঞানের আর মূল্য-বিজ্ঞানের সাধনায় প্রধানতম অনুষ্ঠান।

বাজারে-বাজারে গন্ধ শুঁকা

দেখিতেছি ফিশারকে চৌপর দিনরাত পনর সতের বৎসর ধরিয়া মাছের দর, রুটির দর, মাংসের দর, মজুরির দর, কেরাণীগিরির দর, সুদের হার ঘাঁটিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। বাজারে-বাজারে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, বাজারের হাটুয়া-বেপারী-আড়ৎদার-দালাল ইত্যাদির সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করা ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের মশলা। সোনা-রূপা-তামা-দস্তা ওজন করা, ব্যাঙ্কের নোট চেক হুণ্ডি ইত্যাদি গুনিয়া বস্তাবন্দি করা এই ধরণের "চিনির বলদের" মতন খাটুনি ছিল নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি। এদেশ-ওদেশ-বিদেশ সকল প্রকার বাজারের গন্ধ শুঁকিতে-শুঁকিতে ফিশার মানুষ হইয়াছে। আর নানা দেশের নানা লোক বিভিন্ন বাজার সম্বন্ধে যখন যাহা-কিছু লিখিয়াছে-বলিয়াছে তাহার সঙ্গে নিবিড়তম আত্মীয়তা কায়েম করা ছিল তাঁহার দস্তুর।

মনে রাখিতে হইবে,—ফিশার "সেকেলে" টাকাকড়ি বা বাজার-দরের "ইতিহাস" লিখিতেছেন না অথবা একালের টাকাকড়ির আর বাজার-দরের "ভৌগোলিক" বৃত্তান্ত প্রকাশ করাও তাঁহার লক্ষ্য নয়। তিনি বাজার-দরের "বিজ্ঞান-বস্তু" বা মূল্যতত্ত্বের দর্শন বিশ্লেষণ করা ছাড়া অন্য কোনো মতলব লইয়া কাজে নামেন নাই। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সূত্র, বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম, দার্শনিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি আবিষ্কার করিবার জন্যই সর্ব্বদা জমির দর, শেয়ারের দর, সুদের হার,

কেরাণীর বেতন, মজুরের মাহিয়ানা, দুধের দাম, রুটির দাম ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইয়াছে।

কথাটা সহজেই বুঝা যাইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ওস্তাদ বা নগর-শাসন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে যেমন পায়খানার গন্ধ শুঁকিয়া বেড়াইতে হয়ই হয়, ফিশারকেও তেমনি বাজার হইতে বাজারে ঘুরাফিরা করিয়া সকল প্রকার মালের গন্ধ শুঁকিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। প্রশ্ন করিয়াছি,—ফিশার কি খাইয়া টাকা-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিল? জবাব পাইতেছি,—রোজ-রোজ বাজারের গন্ধ শুঁকিয়া, বাজারে বাজারে আড্ডা কায়েম করিয়া, বাজারী নরনারীর সঙ্গে মোলাকাৎ আর দহরম-মহরম চালাইয়া ফিশার মূল্যতত্ত্বের সঙ্গে টাকাকড়ির যোগাযোগ কায়েম করিতে পারিয়াছে। এই গেল অর্থ-সাধনার এক পাকা রাস্তা। যুবক ভারতকেও এইরূপ তথ্যের শান-বাঁধানো কাটখোট্টা বস্তুময় রাস্তায়ই হাঁটিতে হইবে।

টাওসিগের রচনাবলী

এইবার আর এক মহলের এক জন "বাঘা" পণ্ডিতের মগজে প্রবেশ করা যাউক। তিনিও ভারতে সুপরিচিত। নাম টাওসিগ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি অধ্যাপক। আগামী বৎসর তাঁহার বয়স হইবে সত্তর।

গত বৎসর,—১৯২৭ সনে বাহির হইয়াছে তাঁহার "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রেড" (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য)। তাঁহার প্রথম বই বাহির হইয়াছিল ১৮৮৮ সনে। তখনও তিনি ত্রিশ পার হন নাই। বইয়ের নাম "টারিফ হিষ্টরি অব্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্স" (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের ইতিহাস)। এই দুইটা বইয়ের ভিতর কাটিয়াছে চল্লিশ বৎসর।

সাধারণতঃ ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক টেক্‌ষ্ট্‌ বুক বলিলে যাহা বুঝা যায় সেইরূপ একখানা দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ বড় বই তাঁহার এই যুগের রচনা। অধিকন্তু "স্যম্ আস্‌পেক্‌স্ অব্ দি টারিফ কোয়েস্‌চ্যন" (শুল্ক-সমস্যার কয়েক দিক্) প্রথম বাহির হইয়াছে ১৯১৫ সনে। সেই বৎসরই বাহির হয় "ইন্‌ভেণ্টর্‌স্ অ্যাণ্ড মানি-মেকার্স" (আবিষ্কারক ও অর্থোপার্জ্জন-কারী)। ১৯২০ সনে "ফ্রী ট্রেড, টারিফ অ্যাণ্ড রেসিপ্রসিটি" (অবাধ-বাণিজ্য, শুল্ক ও পারস্পরিক সমানাচরণ নীতি) প্রকাশিত হইয়াছে।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রেরা যে-যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখাপড়া করে সেই সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুরাণা মৌলিক বইগুলা তাহাদিগকে নিজ হাতে ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু অনেক সময়েই গোটা বইগুলা কাজে লাগে না, কোনো-কোনো অংশ মাত্র পড়িলেই পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী হওয়ার কাজ চলিয়া যায়। এই ধরণের অংশ-সঙ্কলনের দায়িত্ব থাকে অধ্যাপকদের হাতে। টাওসিগকে একখানা এই শ্রেণীর "সোর্স্ বুক" বা প্রমাণ-পঞ্জী জাতীয় বই সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। নাম "সিলেক্‌টেড রীডিংস্ ইন্ ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রেড অ্যাণ্ড টারিফ প্রব্‌লেমস্" (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক-সমস্যা সম্বন্ধে নির্ব্বাচিত পাঠ-সংগ্রহ)। অবশ্য এই সঙ্কলন-বইয়ে টাওসিগের নিজস্ব কিছুই নাই। তবে নিজ রচনাবলী হইতে কয়েক অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে—এই যা।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্কনীতি

ফিশার যেমন টাকাকড়ি, হুণ্ডি, চেক, ব্যাঙ্কের জমা, বেতন, মাহিয়ানা, মজুরি, সোনারূপার দাম, মালপত্রের দাম ইত্যাদি লইয়া

কারবার করেন, টাওসিগ সেইরূপ বহির্ব্বাণিজ্যের লেনদেন, আমদানি-রপ্তানির গতিবিধি, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-বিষয়ক রাষ্ট্রনীতি লইয়া মগজ পাকাইয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ দুই ধনবিজ্ঞানসেবীর কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন। তবে টাওসিগের মতন ফিশারের লেখা "ধনবিজ্ঞানবিষয়ক সংক্ষিপ্তসার" নামক টেক্স্ট্‌বুকও আছে। কিন্তু এই দুই জনে আর একটা প্রভেদও দেখিতে পাই। টাওসিগ আর্থিক ইতিহাসের অন্তর্গত একখানা গোটা বই লিখিয়াছেন। ফিশার প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ কোনো ঐতিহাসিক রচনায় সময় দেন নাই।

আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। ফিশার অঙ্কে একজন বড় পণ্ডিত। অঙ্কে টাওসিগের দৌড় অল্প। এইখানে অঙ্ক বলিলে বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। ধারাপাত আর ত্রৈরাশিকের জোরে যতখানি ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ চলে তাহা অবশ্য ফিশারের মতন টাওসিগেরও দখলে আছে। কাজেই সংখ্যার শ্রেণী, গ্রাফ্‌, চিত্র আর "কার্ভের" উৎরাই-চড়াই টাওসিগ ব্যবহার করিতে অপটু নন।

এইবার বইগুলার ভিতর পায়চারি করিব। খাঁটি ঐতিহাসিক বইটার ভিতর অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে একাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক আইন বিবৃত হইয়াছে। তুলার কারখানা, পশমের কারখানা, লোহার কারখানা সবেরই উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইতেছি। আজ চিনির উপর, কাল তামার উপর, পরশু চীনের বাসনের উপর কতহারে শুল্ক চাপানো হইল এসব কথার জন্যই বইয়ের উৎপত্তি। কাজেই লেখককে ঘাঁটিতে হইয়াছে যুগের পর যুগ ধরিয়া, বস্তুতঃ প্রায় দশকের পর দশক ধরিয়া আমেরিকার দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্র আর সরকারী দলিল-দস্তাবেজ। দেখা যাইতেছে যে,

ইতিহাস রচনার পক্ষে সমসাময়িক সংবাদ, সমসাময়িক সমালোচনা, তর্ক-প্রশ্ন আর হাতাহাতি হইতেছে আসল প্রমাণ-পঞ্জী। এই সবে সিদ্ধহস্ত হইবার জন্য টাওসিগকে প্রত্যেক বৎসরের বা দশকের অবাধ বাণিজ্য বনাম শিল্প-সংরক্ষণনীতি সম্বন্ধে যত প্রকার আন্দোলন চলিয়াছে সবগুলার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে হইয়াছে। আর আইন-গুলার ধারাসমূহ মুখস্থ করা ত আছেই। তথ্যনিষ্ঠা হইতেছে অন্যান্য ইতিহাসের মতন আর্থিক ইতিহাসেরও প্রাণ। তবে খাঁটি ইতিহাসের ভিতর ব্যাখ্যা কার্য্যও আছে অনেক। তাহাতে বিজ্ঞান বা দর্শন-জাতীয় দস্তুল আবশ্যক হয়। তাহার কিছু-কিছু টাওসিগ বিতরণ করিয়াছেনও।

কারখানা হইতে কাষ্টম-হাউস, কাষ্টম-হাউস হইতে কারখানা

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক শুল্কনীতির ইতিহাস রচনা করাই টাওসিগের একমাত্র বা প্রধান কৃতিত্ব নয়। আমদানি-রপ্তানির ভিতর দর্শন বা বিজ্ঞান কতখানি আছে তাহা নিংড়াইয়া বাহির করাই তাঁহার বড় কাজ। বস্তুতঃ অশুল্ক বনাম সশুল্ক বাণিজ্যের তত্ত্বকথা বিশ্লেষণই টাওসিগের বিজ্ঞানসাধনার মর্ম্মকথা। এই সাধনার ভিতর যন্ত্রপাতি কিরূপ কায়েম হইয়াছে তাহা জানিয়া রাখাই যুবক বাঙ্‌লার পক্ষে বিশেষরূপে দরকারী। অতএব ১৯১৫ সনে প্রকাশিত "শুল্ক-সমস্যার কয়েক দিক্" আর ১৯২৭ সনের "আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য" এই বই দুইটার ল্যাবরেটরী কিরূপ তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য। টাওসিগের সিদ্ধান্ত বা সূত্রগুলার কথা সম্প্রতি বলিতেছি না। জানিতে চাহিতেছি মাত্র তাঁহার গবেষণা-প্রণালীটা। প্রশ্ন :—

কি খাইয়া টাওসিগ মানুষ হইল? আবার "ইণ্টার্ণ্যাল এভিডেন্সে"র শরণাপন্ন হইতেছি।

দেখিতেছি,—লোকটা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নিজের দেশের আমদানি-রপ্তানি, বিলাতের আমদানি-রপ্তানি, ফ্রান্সের আমদানি-রপ্তানি, জার্ম্মাণির আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি নানা দেশের আমদানি-রপ্তানির বহর জরীপ করিয়াছে। কখনো জরীপ করিয়াছে মালের নাম অনুসারে, কখনো জরীপ করিয়াছে মালের কিম্মৎ অনুসারে, কখনো জরীপ করিয়াছে মালের ওজন অনুসারে। বিনিময়ের হার কখন কিরূপ তাহার হিসাবও রাখিতে হইয়াছে দেশ হিসাবে, মাল হিসাবে, যুগ হিসাবে। টাওসিগকে আজ চিনির বস্তা ঝাড়িতে হইতেছে, কাল লোহালক্কড়ের মালগুদামে প্রবেশ করিতে হইতেছে, পরশু কয়লার খাদে নামিতে হইতেছে। তুলার কাপড়, রেশমের কাপড়, পশমের কাপড় যে-যে কারখানায় তৈয়ারী হয়, তাহাদের কলকব্জা কোথায় কতখানি পচিয়া রহিয়াছে, কোথায় মেরামৎ করা হইতেছে তাহার সন্ধান রাখাও টাওসিগের এক আধ্যাত্মিক কর্ম্ম।

এই সব তথ্য একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পল্লী ও জেলা হইতে সংগৃহীত হইতেছে না। বিলাতী, জার্ম্মাণ, ফরাসী সকল জাতীয় তাঁতী, জোলা, কামার, কুমারের জীবনযাত্রাপ্রণালী টাওসিগকে সর্ব্বদা নখদর্পণে রাখিতে হইতেছে। সকল দেশেরই কাষ্টম-হাউসের বড় বাবু, ছোট বাবু, কেরাণী, কুলী, "ক্রেণ-যন্ত্র", ছিপ্, বজরা, লঞ্চ, জাহাজ, রেল ইত্যাদির গতিবিধিও তাঁহার চির সহচর। কোথায় হনলুলু আর কোথায় কেম্‌নিট্‌স্‌, সর্ব্বত্রই টাওসিগের গৃহস্থালী। এক সঙ্গে নানা জাতীয় নরনারীর, নানা শ্রেণীর নরনারীর জীবনের ওঠানামা বা "কার্ভ্" হইতেছে টাওসিগের খেলার সামগ্রী।

এই সকল ক্ষেত্রে ইতিহাস লেখাও উদ্দেশ্য নয়, ভূগোল লেখাও উদ্দেশ্য নয়, কোনো খবরের কাগজের সংবাদদাতা রূপে টাকা রোজগার করাও উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ইতিহাস-ভূগোল ছাড়া, দৈনিক সংবাদ-পত্রের কাটিং বা উদ্ধৃতাংশ ছাড়া, কারখানাগুলার বার্ষিক রিপোর্ট ছাড়া, আমদানি-রপ্তানির ত্রৈমাসিক, বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট ছাড়া, আর লোহালক্কর, তূলা, পশম, ছাই-ভস্ম ইত্যাদি বিষয়ক কারখানার লাভ-লোকসান, কুলী-কেরাণী, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির বিবরণ ছাড়া টাওসিগের আত্মা আর কিছুতে মস্‌গুল নয়।

বস্তুনিষ্ঠা ও দুনিয়ানিষ্ঠা

যাঁহা ফিশার তাঁহা টাওসিগ,—আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও। ফিশারের জীবন কাটে হাটে-বাজারে। টাওসিগকে জীবন কাটাইতে হয় কারখানায়, খনিতে অথবা কাষ্টম-হাউসে। কারখানা হইতে কাষ্টমহাউসে আর কাষ্টমহাউস হইতে কারখানায় হাঁটাহাঁটি করা হইতেছে টাওসিগের অর্থ সাধনা। তথ্যনিষ্ঠা বা বস্তুনিষ্ঠা হইতেছে উভয়েরই *স্বধর্ম*।

অধিকন্তু কি ফিশার, কি টাওসিগ দুইজনকেই এক সঙ্গে গোটা দুনিয়ার "সাংবাদিক", সংবাদ-ভক্ষক বা সংবাদ-পরিবেষকরূপে জীবন যাপন করিতে হয়। একমাত্র মার্কিণ মুল্লুকের তথ্যের জোরে তাঁহারা কেহই বিজ্ঞান বা দর্শন পদবাচ্য অর্থশাস্ত্র কায়েম করিতে পারেন নাই। দুনিয়ানিষ্ঠা হইতেছে প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রাণের কথা। বাঙালীকে ধনবিজ্ঞানের কোনো-কোনো বিভাগের নং ১ শ্রেণীর পণ্ডিতরূপে ইজ্জৎ পাইতে হইলে সেইরূপ দুনিয়া-নিষ্ঠায়ই পাকিয়া উঠিতে হইবে। দেশ ও দুনিয়া দুইই এক সঙ্গে প্রত্যেক ধনবিজ্ঞান-

সেবীর উপাস্য হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞান-সাধনার পথ মার্কিণের পক্ষে যা বাঙালীর পক্ষেও তাই।

একমাত্র কয়েকটা ভারতীয় কারখানায় ঘুরাফিরা করার জোরে অথবা কয়েকখানা ভারতীয় রিপোর্ট বগলদাবা করিয়া রাস্তায় হাঁটিবার জোরে কোনো. বাঙালী লেখক ধনবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখাইতে পারিবেন না। চাই এক সঙ্গে বিদেশী "কার্ভের" সহিত ভারতীয় "কার্ভের" মেলমেশ। ফিশার-টাওসিগ আমেরিকার স্বদেশ-সেবক বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অজস্র অমার্কিণ তথ্য, অমার্কিণ দলিল, অমার্কিণ সংবাদ, অমার্কিণ নরনারীর জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ থাকিতে হয়। দুনিয়ার ধনদৌলত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে অথবা অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে অথবা খানিকটা ভাসা-ভাসা জ্ঞান অর্জ্জন করিলে কোনো ভারত-সন্তান ফিশার-টাওসিগের কোঠায় উঠিতে পারিবেন না।

এই বুঝিয়া ভারতীয় ইস্কুল-কলেজের পঠন-পাঠনে সংস্কার সাধন করা আবশ্যক। আর যাঁহারা যুবক ভারতকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার পাইয়াছেন তাঁহাদের মগজও পরিষ্কার রূপে চাঁছিয়া-ছুলিয়া মেরামত করা আবশ্যক। অধিকন্তু যাঁহারা ধনবিজ্ঞানের কোনো না কোনো বিভাগে অল্প-বিস্তর "লেখা-পড়া", অনুসন্ধান, গবেষণা চালাইতেছেন তাঁহারাও "কেঁচে গণ্ডূষ" করিয়া দুনিয়াখানার আর্থিক গতিবিধি, কার্ভ্, উৎরাই-চড়াইয়ের সঙ্গে কুটুম্বিতা কায়েম করিতে অগ্রসর হউন।

আর্থিক দুনিয়ার "পারিপ্রেক্ষিকে" আর্থিক ভারতখানাকে যাঁহারা দেখিতে অভ্যস্ত নন তাঁহারা বিজ্ঞান-সেবক ত ননই, ভারত-সেবক হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের বিবেচনায়

"কম্পারেটিভ ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্" (তুলনামূলক তথ্য ও সংখ্যাবিজ্ঞান) বিজ্ঞান-সাধনার আর স্বদেশ-সেবার, উভয়েরই একমাত্র যন্ত্র। এক সঙ্গে বহু দেশের "কার্ভ্" বা জীবনের উৎরাই-চড়াই নিজ তাঁবে আনা, অর্থাৎ "কম্পারেটিভ্ কার্ভ্-তত্ত্ব" দখল করা যুবক ভারতের পক্ষে সব চেয়ে জরুরি জীবন-সাধনা।

দুর্যোগ ও চক্র

আজকালকার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে "ক্রাইসিস" (সঙ্কট, দুর্যোগ বা ধূমকেতু), "সাইক্‌ল্" (চক্র) ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা জোরের সহিত চলিতেছে। এই বিষয়ে আমরা "আর্থিক উন্নতি"তে একাধিক বার আলোচনা করিয়াছি। "চক্র-তত্ত্ব" বা "সঙ্কট-তত্ত্ব" সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কে কোথায় কিরূপ গবেষণা-প্রণালী কায়েম করিতেছেন তাহার খোঁজ লইলেও যুবক বাঙলার গবেষকদের নতুন-নতুন হদিশ জুটিবে। ফরাসী পণ্ডিত লেনোআ-প্রণীত "এতুদ স্যির লা ফর্মাসিওঁ দে প্রি" (দাম-গঠন-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী) ১৯১৩ সনে বাহির হইয়াছিল। আফতালিওঁ-প্রণীত "ক্রীজ পেরিওদিক্ দ্য স্যির-প্রোদুক্‌সিওঁ" (অতি-উৎপাদন-ঘটিত মন্বন্তর) ফরাসী সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মার্কিণ পণ্ডিত মিচেলপ্রণীত "বিজ্‌নেস সাইক্‌ল্‌স্" (শিল্প-বাণিজ্যের চক্র) ও ঐ সময়কার বই। ১৯১৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছে মার্কিণ পণ্ডিত মুর প্রণীত "ইকনমিক সাইক্‌ল্‌স্" (আথিক চক্র)।

এই সকল রচনা বাহির হইবার সঙ্গে-সঙ্গে পণ্ডিতমহলে চক্র-বিষয়ক স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম করিবার খেয়াল উপস্থিত হয়। ১৯১৯ সনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা "বিউরো" স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পরিচালক হইতেছেন অধ্যাপক প্যার্স‌ন্‌স্। এই বিউরো হইতে "রিভিউ

অব ইকনমিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্" (আর্থিক তথ্য ও অঙ্ক পত্রিকা) সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে মুর-প্রণীত "ফোরকাষ্টিং দি য়ীল্ড অ্যাণ্ড দি প্রাইস অব কটন" (তুলার পরিমাণ ও দাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী) নামক বই বাহির হয় (১৯১৭)। প্যর্সন্স্ এবং অন্যান্য কয়েকজনে মিলিয়া ১৯২৪ সনে "প্রব্লেম অব্ বিজনেস ফোরকাষ্টিং" (আর্থিক ভবিষ্যদ্বাণীর সমস্যা) সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ সম্পাদন করেন। ফরাসী পণ্ডিত লাকঁব্ প্রণীত "লা প্রেভিজিওঁ আঁ মাতিয়্যার দে ক্রীজ একোনোমিক্" (আর্থিক চক্র বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী) বাহির হয় ১৯২৫ সনে। ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণির বার্লিন শহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে "ইন্‌ষ্টিটুট ফ্যির কোন্‌য়ুক্‌টুর-ফর্শুঙ্" (চক্র-গবেষণা-পরিষৎ)। তাহার মাথায় আছেন অধ্যাপক ভাগেমান। ১৯২৭ সনে এই ধরণের এক পরিষৎ কায়েম হইয়াছে অষ্ট্রিয়ার জন্য ভিয়েনায়। সেই বৎসরই ইংরেজ পণ্ডিত পিগুর বই বাহির হইয়াছে "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফ্লাক্‌চুয়েশ্যন্স্" (শিল্প-দুনিয়ায় ওঠানামা) নামে। বিলাতেও মার্কিণ-জার্ম্মাণ ঢঙের চক্র-পরিষৎ আছে। ইতালিয়ান ভাষায় ব্রেশ্যানি-প্রণীত "কন্‌সিদেরাৎসিঅনি সুই বারমেত্রি একনমিচি" (অর্থনৈতিক চাপ-মান যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা) নামক প্রবন্ধ "জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি" নামক পত্রিকায় ধারাবাহিক-রূপে বাহির হইতেছে (১৯২৮)।

এই পরিষৎ আর বইগুলার কার্য্য-প্রণালীই সম্প্রতি আমাদের লক্ষ্য করিবার বস্তু। মিচেল ও পিগুর বই সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।*

মতামত গুলার দিকে এখন আমাদের মেজাজ খেলিতেছে না। আমরা চক্র-গবেষণার হদিশ ঢুঁড়িতেছি মাত্র।

---

*পৃষ্ঠা ৩৮-৪০, ৫১৬-৫১৯।

হার্ভার্ড-বার্লিনের চক্র-পরিষৎ

হার্ভার্ডের ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীত হইতেছে তিন শ্রেণীর "কার্ড্"। "ক"—কার্ডের মতলব হইতেছে "স্পেকিউলেশ্যন" বা কর্জ্জ লেনা-দেনার, লগ্নী-কারবারের ওঠানামা ধরিয়া রাখা। "খ"—কার্ডের সাহায্যে আর্থিক আবহাওয়ার গবেষকেরা শিল্প-বাণিজ্য-ঘটিত অর্থাৎ মালের বাজার-সম্পর্কিত হ্রাস-বৃদ্ধি জরীপ করিতেছেন। আর "গ"—কার্ড হইতেছে টাকার বাজার বা সুদের হারের উৎরাই-চড়াই বুঝিবার জন্য গঠিত। পৃথিবীর জলবায়ু সম্বন্ধে যথার্থ অবস্থা বুঝিবার জন্য আর বুঝিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই "মেটেওরলজিক্যাল" বা আবহাওয়ার কর্ম্মকেন্দ্র আছে। ঝড়ঝাপ্টা, বৃষ্টি, বরফ ইত্যাদি কবে কোথায় কতটুকু হইবে মেটেওরলজিষ্ট বা আবহাওয়া-তত্ত্ববিদেরা সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ। ঠিক সেইরূপ সামর্থ্য দেখাইবার জন্যই চক্র-তত্ত্ববিদেরা হার্ভার্ডের ল্যাবরেটরীতে বসিয়া আর্থিক দুনিয়ার আবহাওয়াটা জরীপ করিতেছেন। এই কাজে তাঁহাদের হাতিয়ার মাত্র তিন প্রকার "কার্ড্"। এই সকল কার্ড্ টানার মতলব প্রতি মুহূর্ত্ত আর্থিক দুনিয়ার নানা প্রকার ওঠানামা বস্তুনিষ্ঠরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। কেম্ব্রিজ-বার্লিন-ভিয়েনার পরিষদেও চোপর দিনরাত এই ধরণের "সংবাদ"ই সংগৃহীত, শ্রেণীবদ্ধ ও কার্ড্-বদ্ধ হইতেছে। প্রভেদ এই যে, হার্ভার্ডে সব কিছুই তিন কার্ডের অন্তর্গত করা হয়। অন্যত্র কোনো এক, দুই বা তিন কার্ডের মায়ায় পণ্ডিতেরা ধরা পড়েন নাই।

ভ্যাগেমান-পরিচালিত বার্লিনের পরিষদের কার্য্য-প্রণালী দেখিলেই প্রভেদটা বুঝা যাইবে। তাঁহার ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীত হয়,—(১)

কর্জ্জ বিষয়ক সকল প্রকার তথ্য, (২) ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকাকড়ির হ্রাস-বৃদ্ধি, (৩) সুদ আর ডিস্কাউন্টের হার, (৪) শেয়ারের বাজার, ধাতু, খনি, যানবাহান ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল প্রকার বড়-বড় কারখানার শেয়ারের দর, (৫) মাল-উৎপাদনের সূচী-সংখ্যা, (৬) কুদরতী মালের সূচী, (৭) শিল্প-কারখানার সূচী, (৮) বেকার-সূচী, (৯) বড়-বড় কারখানার রোজনামচা :—কৃষি, খনি, ধাতু, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, কাগজ, চামড়া ইত্যাদি ঘটিত শিল্প-ফ্যাক্টরির আকার-প্রকার ও বর্ত্তমান অবস্থা, (১০) পাইকারী ও খুচরা দোকানদারি, (১১) যান-বাহনের কারবার, (১২) বিভিন্ন বিদেশের সকল প্রকার সূচীসংখ্যা ও কার্ভ্,—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইতালি, রুশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, স্কাণ্ডিনাভিয়া, সুইট্সার্ল্যাণ্ড, এবং হল্যাণ্ড এই কয় দেশ নিয়মিতরূপে বিবৃত হইয়া থাকে।

দেখিতেছি আবার তথ্য-নিষ্ঠা আর দুনিয়া-নিষ্ঠা। মিচেল, লার্কঁব্ বা পিগুর বই খুলিয়া ধরিলে তাহার প্রত্যেক পাতায়ই বৈজ্ঞানিক-সুলভ এই দুই নিষ্ঠা দেখা যাইবে। অসংখ্য জাতীয় কার্ভের সঙ্গে ঘরকন্না যে করে না, তাহার পক্ষে "শিল্প-বাণিজ্যের ওঠানামা"-বিষয়ক বিজ্ঞান রচনা করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্ত্তে সাঁতার কাটা চাই নিছক নীরস বস্তুর দরিয়ায়।

"আর্থিক উন্নতি"র প্রবর্ত্তিত গবেষণা-প্রণালী

যুবক বাঙ্লার অর্থশাস্ত্রী মহলে এই বস্তু-নিষ্ঠা আর দুনিয়া-নিষ্ঠা প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই "আর্থিক উন্নতি"র জন্ম। এই দুই দিকেই বাঙালী সমাজের অভাব খুব বেশী। "আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী হয়ত কিছু-কিছু অভাব মোচন করিতেছে।

বস্তু-নিষ্ঠার নিদর্শন "আর্থিক উন্নতি"র "বাংলার সম্পদ্", "আর্থিক ভারত", "দুনিয়ার ধনদৌলত" নামক তিন অধ্যায়। এই সকল অধ্যায়ে কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচী, মাঝা, তাঁতী, দোকানদার, হাটুয়া, আড়তদার, জোতদার, জমিদার, আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, খালাসী, আধুনিক ব্যাঙ্ক-বীমা-বাণিজ্য-কারখানার পরিচালক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নরনারীর আর্থিক জীবনযাত্রা আলোচিত হয়। চতুর্থ অধ্যায় ("ব্যক্তি ও সঙ্ঘ") ও বস্তুনিষ্ঠারই প্রতিমূর্ত্তি। ইহার আলোচ্য বিষয়,—দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা-পরিচালক, ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, রাজস্ব-সচিব, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিশিক্ষার ধুরন্ধর, মজুর-সঙ্ঘের নায়ক ইত্যাদি ব্যক্তি-গণের গতিবিধি ও কথাবার্ত্তা আর সমবায়-সমিতি, শিল্প-সঙ্ঘ, গবেষণা-পরিষৎ, কিষাণ-সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যাবলী। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায়ও বস্তুনিষ্ঠা আছে। দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ নরনারীর সঙ্গে সম্পাদকীয় "মোলাকাৎ" এবং মৌখিক কথোপকথনের সাহায্যে কৃষিশিল্পবাণিজ্য ও ধনবিজ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত এই অধ্যায়ে বিবৃত হয়। তাহার ভিতর সম্পাদকের নিজ মত বা সমালোচনার ঠাঁই নাই। এই সকল অধ্যায়ের তথ্যসমূহ দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রণালীতে "সংবাদের" আকারে বিলকুল "নিরপেক্ষ" ভাবে "রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত" রূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে। অধিকন্তু প্রবন্ধাংশে যে-সব রচনা বাহির হয় তাহার ভিতর হা-হুতাশ আর ভাবোচ্ছ্বাসের ঠাঁই নাই। যথাসম্ভব তথ্যমূলক রচনা ছাড়া আর কিছু বাহির করা "আর্থিক উন্নতি"র অভিপ্রেত নয়।

দুনিয়া-নিষ্ঠার জন্য "আর্থিক উন্নতি"র একটা গোটা অধ্যায় স্বতন্ত্র-ভাবে চলিতেছে। এই অধ্যায়ে "দুনিয়ার ধনদৌলত" এবং বিদেশের

সঙ্গে বাঙালীর ব্যবসা বাড়াইবার সুযোগ আলোচিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু "ব্যক্তি ও সঙ্ঘ" অধ্যায়ের প্রায় আধাআধি বিদেশ-সম্পর্কিত লোকজন ও প্রতিষ্ঠান-পরিষদের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। "মোলাকাৎ" অধ্যায়েও কখনো-কখনো বিদেশী নরনারীর মতামত প্রচার করা হইয়া থাকে। এই গেল কর্ম্মকাণ্ডের কথা। জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ থিয়োরি, চিন্তা, দর্শন ইত্যাদির ক্ষেত্র আলাদা। তাহার জন্য আছে গ্রন্থপঞ্জী আর গ্রন্থ-সমালোচনা। বাংলা সাহিত্য আর অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য অথবা ভারত-সন্তান-প্রণীত ইংরেজি সাহিত্য ধনবিজ্ঞানের মহলে এত কম যে এই দুই অধ্যায় প্রায় ষোল আনাই অ-ভারতীয় দুনিয়াকে ভারতবাসীর পায়ে আনিয়া হাজির করে। চিন্তা ও দর্শন সম্বন্ধে আর একটা অধ্যায় আছে। তাহাতেও এক প্রকার সব-কিছুই বিশ্ববাণী। সেটার নাম "পত্রিকা-জগৎ"। তাহাতে প্রচারিত হয় ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, জাপানী, মার্কিণ ও ইংরেজি কৃষিশিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক এবং ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার সারাংশ। "আর্থিক উন্নতি"র প্রবন্ধাংশেও দুনিয়া-নিষ্ঠা কিছু-কিছু পাওয়া যায় প্রবন্ধের আকারে আর তর্জ্জমার আকারে।

বাঙালীর ইজ্জৎ বাড়াইয়া দাও

মনে রাখিতে হইবে,—ফিশার, পিগু, ভাগেমান, লার্ক্‌ব, ব্রেশ্যানি ইত্যাদির বস্তুনিষ্ঠা ও দুনিয়া-নিষ্ঠার পশ্চাতে আছে পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, একশ' বা দেড়শ' বৎসর ব্যাপী হাজার-হাজার একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সেবীর সাধনা। কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র মতন দু'চারখানা কাগজের জোরে আর গোটা কয়েক বস্তুনিষ্ঠ ও দুনিয়ানিষ্ঠ গবেষকের দৌলতে যুবক বাঙলা বড় শীঘ্র এই সব নং ১ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞানসেবীদিগের সঙ্গে

টক্কর দিতে পারিবে না। সুতরাং "আর্থিক উন্নতি"র সংস্রবে দুই বৎসরে প্রকাশিত হাজার দুয়েক পৃষ্ঠায় কতটুকু সাধিত হইল তাহার জরীপ করিতে বসা আজ নেহাৎ আহাম্মুকি।

আগামী আট-দশ বৎসরের ভিতর গোটা শ'য়েক বাঙালী গবেষক যদি ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতী হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমানের এই অকিঞ্চিৎকর তে, রে, কা, টা সাধা কথঞ্চিৎ সার্থক হইয়াছে এইরূপ বলিব। তবে অল্পকালের ভিতরই বাঙালী ধনবিজ্ঞান-গবেষকেরা দুনিয়ার যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-গবেষকের সঙ্গে খোলা মাঠে দাঁড়াইয়া পাঞ্জা কষিতে সমর্থ হইবে সেই আশা, সেই আদর্শ এবং তদুপযোগী কর্ম্মপ্রণালী আর আলোচনাপ্রণালী প্রচার করা "আর্থিক উন্নতি"র নিকট মামুলী ডাল-ভাত মাত্র।

আমাদের মন্তর আমরা খোলাখুলি আওড়াইয়া থাকি। "আর্থিক উন্নতি"র কপালেই খুদিয়া রাখিয়াছি :—

অহমস্মি সহমান উত্তরোনাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি, শ্রেষ্ঠতম নামে আমায় জানে সবে ধরাতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী, জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

সেই বিপুল ভবিষ্যতের গোড়া-পত্তনের কারবারে যুবক বাঙলার সকল অর্থশাস্ত্রীকে সমবেত হইবার জন্য ডাকাডাকি করিতেছি। এস ভায়ারা, যে যেখানে আছ, লাগিয়া যাও কাজে, জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্ম্ম-কাণ্ডে, বাঙালীর ইজ্জৎ রক্ষা কর, বাঙালীর ইজ্জৎ বাড়াইয়া দাও। জগতের বিজ্ঞান-সম্পদ্ বাঙালীর কৃতিত্বে পরিপূর্ণতর হইয়া উঠুক।

পরিশিষ্ট

ধনবিজ্ঞানে পরিভাষার মামলা

(১)*

সম্প্রতি কতকগুলা ধনবিজ্ঞানবিষয়ক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাইবার জন্য এক ব্যক্তি পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যেরূপ জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহার এক নকল প্রকাশ করা যাইতেছে। আলোচনাটা হয়ত অন্যান্য লোকেরও কাজে লাগিতে পারে।

প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশী পারিভাষিক শব্দের জন্য "এক কথা"য় বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া সহজ নয়। অনেক সময়ে এক কথায় প্রতিশব্দ জোগাইতে যাওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়।

আসল কথা,—বিদেশী সাহিত্যেও পারিভাষিক শব্দের জন্ম হয় অনেকখানি,—কয়েক প্যারাগ্রাফ-ব্যাপী বা কয়েক পৃষ্ঠা-ব্যাপী,—লেখালেখির পর। সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনা-বাক্‌-বিতণ্ডার আবহাওয়ায় পারিভাষিক শব্দগুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাংলা ভাষায়ও সেইরূপ হইবে। অনেক-কিছু লেখালেখি করিতে করিতে আলোচ্য বিষয়টা যখন খানিকটা সহজ-সরল হইয়া পড়ে তখন লেখকরা আলোচনার ভিতর হইতে নিজ নিজ মর্জ্জি-মাফিক কতকগুলা শব্দ বাছিয়া সাহিত্যের বাজারে সেইগুলাকে কোনো "নির্দ্দিষ্ট" অর্থে চালাইতে অধিকারী। তাহা না করিলে বিদেশী শব্দের আক্ষরিক তর্জ্জমার সাহায্যে বাংলা পারিভাষিক গজাইয়া উঠিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য বিষয়টার সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁহাদের নাই

---

*আর্থিক উন্নতি, পৌষ ১৩৩৫ (ডিসেম্বর ১৯২৮-জানুয়ারি ১৯২৯)

তাঁহারা কি বিদেশী পারিভাষিক কি স্বদেশী পারিভাষিক কোনোটাই সহজে পাক্‌ড়াও করিতে পারিবেন না। বিদেশীরাও যে-বিষয়ে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ সেই বিষয়ের বিদেশী পারিভাষিকে দন্তস্ফুট করিতে অসমর্থ।

আর এক কথা। কোনো-কোনো শব্দ আমাদের দেশী বেপারী-মহলে হাটমাঠের শব্দরূপে চলিয়া গিয়াছে। সেইগুলার কোনো কোনোটাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি। গ্রহণ করা উচিত ও।

বিদেশীরা নিজেদের সুপরিচিত মামুলি শব্দগুলাকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকটা মন-গড়া বাঁধাবাঁধি-নিয়ন্ত্রিত অর্থে চালাইয়া দিয়াছেন। আমাদের বেলায়ও এই নীতিই চলিবে।

যে সকল শব্দ গড়িয়া এই সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি সেইগুলার কোনো কোনোটা সহজে বুঝা যাইবে না বলা বাহুল্য। প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লিখিবার সময় সুদীর্ঘ আলোচনা চালাইবার সুযোগে শব্দগুলা আনুষঙ্গিকরূপে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। কোনো-কোনোটার অদল-বদলও দরকার হইবে। শব্দগুলা নিম্নরূপ:—

ক্যাপিট্যাল,—পুঁজি।

কন্‌জাম্প্‌শ্যন-ক্যাপিট্যাল,—ভোগ-পুঁজি।

ক্রেডিট,—ধার, কর্জ্জ, কর্জ্জ-ক্ষমতা, পশার, বাজার-সম্ভ্রম।

ইলাষ্টিসিটি অব্‌ ডিমাণ্ড—চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-শক্তি।

জয়েন্ট ডিমাণ্ড,—সংযুক্ত চাহিদা (বা সহ-চাহিদা)।

ডিরাইভ্‌ড্‌ ডিমাণ্ড,—পর-নির্ভর চাহিদা।

ম্যানিউফ্যাক্‌চার,—শিল্পজ দ্রব্য বা শিল্পোৎপন্ন মাল।

নেট প্রডাক্‌ট্‌ অব্‌ লেবার,—মেহনতের "নিট্‌" বা খাঁটি ফল।

রেপ্রেজেণ্টেটিভ্‌ ফার্ম্ম,—প্রতিনিধি-স্থানীয় কারবার বা কোম্পানী।

অ্যাক্‌সেপ্টিং হাউস,—হুণ্ডি ভাঙাইবার ব্যাঙ্ক।

আর্বিট্রাজ,—পরোক্ষ বিনিময় (বা পরোক্ষ হুণ্ডি-ভাঙানো)।

স্পেকিউলেশ্যন,—ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয় ঝুঁকির কারবার।

ম্যানরিয়্যাল সিষ্টেম,—"মানর"-জমিদারি প্রথা।

রেণ্ট্ অব্ এবিলিটি,—কর্ম্মদক্ষতার কর।

ক্রাইসিস,—সঙ্কট।

ক্লীয়ারিং হাউস,—চেক কাটাকাটির ব্যাঙ্ক (চেক-শোধক ভবন)।

কলেক্‌টিভিজম্‌,—সমূহ-নিষ্ঠা বা সমূহ-তন্ত্র।

ট্রাষ্ট,—সঙ্ঘ, ট্রাষ্ট।

কমিউনিজম্‌,—সমাজ-তন্ত্র, রাষ্ট্র-নিষ্ঠা, ধন-সাম্য (অবস্থাভেদে)।

কমিউটেশ্যন অব্ সার্ভিস,—গতর খাটানো রেহাইয়ের মূল্যপ্রদান।

কন্‌সলিডেটেড ফাণ্ড,—একত্রীকৃত ভাণ্ডার, "থোক্"।

কন্‌ভার্শ্যন অব্ লোন্‌স্‌,—কর্জ্জ-রূপান্তর।

গিল্ড-শোশ্যালিজম্‌,—"শ্রেণী"-নিষ্ঠ সমাজ-তন্ত্র।

স্পেশ্যালিজেশ্যন অব্ লেবার,—বিশেষত্বশীল মজুর, মেহনতের বিশেষত্ব বিধান বা বিশেষীকরণ।

ডাম্পিং,—বিদেশে অতি-সস্তায় মাল ঢালা; "ডাম্পিং" শব্দটাই বাংলায় চালানো আবশ্যক।

ইম্পীরিয়্যাল প্রেফরেন্স,—সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত।

ষ্ট্যাণ্ডার্ডিজেশ্যন,—মাপ-মোতাবেক মালোৎপাদন, মাপ-মোতাবেক যন্ত্রসৃষ্টি ইত্যাদি।

রেসিপ্রসিটি,—পারস্পর্য্য।

ওয়েজেস-ফাণ্ড,—মজুরি-ভাণ্ডার (বা মজুরি-তহবিল)।

ডেফার্ড রিবেট্‌স্‌,—ভবিষ্যতে মূল্যের অংশ ফেরৎ (বা ভবিষ্যতে মাশুলের অংশ ফেরৎ)।

বাই-প্রডাক্ট,—আনুষঙ্গিক মাল (বা ফল)।

ফেয়ার ট্রেড,—"ন্যায্য" বাণিজ্য।

পেগিং—ঝুলানো, ঠেকানো, ঠেকা দেওয়া ইত্যাদি (অবস্থাভেদে বিভিন্ন শব্দ কায়েম করা দরকার)।

মার্ক্যাণ্টিলিজম্,—বাণিজ্য-নিষ্ঠা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ কম্ফর্ট,—আরামভোগের মাপকাঠি।

ম্যানেজ্ড্ কারেন্সী—রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা-ব্যবস্থা।

মীডিয়াম অব্ এক্সচেঞ্জ,—বিনিময়ের বাহন।

মেতেয়ার সিষ্টেম,—"আধিয়ার" ব্যবস্থা।

সিঙ্কিং ফাণ্ড,—কর্জ্জশোধক ভাণ্ডার (বা তহবিল)।

মরাটরিয়াম,—দেনাপাওনার কারবার নিষেধ (টাকা-কড়ির লেন-দেন সম্বন্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞা)।

শ্লাইডিং স্কেল,—ওঠানামা-সূচক মাপকাঠি। এই শব্দের অর্থ বুঝা অবশ্য কঠিন।

ক্যাপিট্যালিজ্ম্,—পুঁজি-নিষ্ঠা, পুঁজি-তন্ত্র, পুঁজিশাহী।

সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক,—কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক।

রিডেম্প্শ্যন অব ডেট,—কর্জ্জশোধ।

ম্যানি, কন্ভার্টিবল,—স্বর্ণ-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা।

কোপার্ট্নারশিপ,—সহ-মালিকানা।

ফরেণ একস্চেঞ্জ,—বিদেশী টাকাকড়ির বিনিময় কারবার, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়।

প্রাইম কষ্ট্,—প্রত্যক্ষ খর্চ্চা, প্রাথমিক খরচ।

(২)

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক অধিবেশনে অর্থশাস্ত্রের পরিভাষা আলোচিত হয়।* এই আলোচনার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বলেন, "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা বাস্তবিক পক্ষে শব্দতত্ত্ব বিষয়ক কারবার নয়। একটি অভিধান হইতে কতকগুলা শব্দ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলেই পরিভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না।

"যে বিদ্যা সম্বন্ধে পরিভাষার সৃষ্টি করিতে হইবে, সেই বিদ্যার "বস্তু" ও "তত্ত্ব" সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলে পরিভাষার সৃষ্টি অসম্ভব।

"পরিভাষার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইহা বস্তু-বিজ্ঞানের তর্কশাস্ত্র মাত্র। প্রত্যেক বিজ্ঞানই নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কার করে এবং সেগুলি ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। ইহার ফলে কতকগুলি নতুন শব্দের ব্যবহার হয়। এই সবের ভাল-মন্দ যাচাই করিবার সময় শুধু ইহাই লক্ষ্য করা দরকার যে, তাহা বৈজ্ঞানিকের আলোচিত বিষয়গুলির যথার্থ ভাব প্রকাশ করিতেছে কিনা। এইভাবে পরিভাষা-সৃষ্টি কোনো বিশেষ কালের বা বিশেষ দেশের সমস্যা নহে; বিজ্ঞানমাত্রই ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত।"

পাশ্চাত্যেরা ধনবিজ্ঞান বিদ্যার বিশিষ্ট শব্দগুলা কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছে সে সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার একটা বিশদ বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, অ্যাডাম্ স্মিথ যে-সব শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন সেগুলা সবই তাঁহার সময়ে চলিত্ ছিল না। সুতরাং তিনি সঙ্গে

---

* "আর্থিক উন্নতি", শ্রাবণ ১৩৩৬ (জুলাই-আগষ্ট ১৯২৯, শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

সঙ্গে শব্দগুলার পারিভাষিক অর্থ বুঝাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু রিকার্ডো ও মিল ঠিক সেই শব্দগুলাই চলিত্ কথারূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হন। অ্যাডাম্ স্মিথ্‌কে কয়েক শ' শব্দ ঝাড়িয়া-বাছিয়া দেখিতে হইয়াছে।

"তাহার পর বিলাতী আর্থিক জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নতুন-নতুন শব্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ফলে ধনবিজ্ঞানের শব্দসম্পদ্ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। অ্যাডাম্ স্মিথের পর রিকার্ডোর পুস্তক পড়িলেই এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। রিকার্ডোর জীবনকালে ইংলণ্ডে জোরের সহিত শিল্প-বিপ্লব ঘটিতেছিল। ইহাতে নানাপ্রকার আর্থিক ও সামাজিক সমস্তার সৃষ্টি হয় এবং তাহা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। ফলে নতুন-নতুন শব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে। রিকার্ডোর পর জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ অর্থশাস্ত্রের বস্তুগত ও শব্দগত যে উন্নতি-সাধন করেন তাহারও মর্ম্ম এইরূপ।

"প্রত্যেক যুগেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ আর রাষ্ট্রও বাড়িয়াছে। এইরূপ জীবনের বাড়তি মাফিকই শব্দসম্পদ্ বাড়িয়া চলিয়াছে। নয়া-নয়া বস্তুর সঙ্গে-সঙ্গে নয়া-নয়া পারিভাষিক আসিয়া খাড়া হইয়াছে। এই হইল বিলাতী অর্থশাস্ত্রের পারিভাষিক-ধারা।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্ম্মাণ পণ্ডিত গস্‌সেন ধন-বিজ্ঞানের ভিতর মনস্তত্ত্ব-বিদ্যা ও অঙ্কবিজ্ঞান ঢুকাইয়া ধনবিজ্ঞানের শব্দসম্ভার বাড়াইবার পথ খুলিয়া দেন। সমসাময়িকেরা গস্‌সেনের আদর করেন নাই। গস্‌সেন ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, ধন-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত কার্য্যকলাপের অন্তরালে চিত্ত-ঘটিত কাণ্ড আছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই বিজ্ঞানবীর যে

চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভাষাও পুষ্ট হইয়াছে। এই শ্রেণীর লেখক-সম্প্রদায় ধনবিজ্ঞানকে অঙ্কের মাপজোকে ফেলিয়া ইহাকে নতুন রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

"বিশ বৎসর পরে জেভন্স্ (ইংরেজ), মেঙ্গার (অষ্ট্রিয়ান) ও ভাল্‌রা (সুইস) এই তিন পণ্ডিত কর্ত্তৃক গস্‌সেনের আলোচনা-প্রণালী একই সঙ্গে স্বাধীনভাবে নতুন করিয়া অনুসৃত হয়। ইতালিয়ান্ পণ্ডিত পান্তালেঅনি তাঁহার গ্রন্থে উপরোক্ত গস্‌সেন—জেভন্স্—মেঙ্গার প্রভৃতির সারমর্ম্ম প্রচার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইংরেজ অধ্যাপক মার্শ্যাল এমন একখানা বই লিখিলেন যাহাতে পূর্ব্বের গ্রন্থ-গুলা আর পড়িবার দরকার হয় না বলিলেই চলে। অ্যাডাম্ স্মিথ হইতে মিল পর্য্যন্ত বিলাতের সনাতন "ক্লাসিক্" ধারাকে জেভন্স-মেঙ্গার-ভাল্‌রার বিদ্যা দিয়া গুণ করিলে যে ফল দাঁড়াইতে পারে তাহাই হইতেছে মার্শ্যালের মাথা ও মাথাপ্রসূত গ্রন্থ। একটা সাম্য সম্বন্ধ ঝাড়া যাউক :—

মার্শ্যাল = ক্লাসিক (রিকার্ডো-মিল) × চিত্তবিজ্ঞান (জেভন্স্-মেঙ্গার-ভাল্‌রা)।

"মার্শ্যালই দুনিয়ার শেষ পীর নন। তাঁহার পরবর্ত্তী যুগ আজ-কাল চলিতেছে। নতুন-নতুন সমস্যা ও নতুন-নতুন মীমাংসা দেখা দিয়াছে।

"বর্ত্তমানে বিলাতের পিগু ও জার্ম্মাণির ভেবার ইত্যাদি পণ্ডিত প্রথম শ্রেণীর ধনতত্ত্ববিৎ। মার্শ্যালের সময় হইতে আর্থিক জীবনে ও তত্ত্বে যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তদনুযায়ী শব্দ ও ভাষা ইহারা লইতেছেন।"

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক সরকার নিজেকে কোনো-কোনো বিষয়ে হার্ম্স্-পন্থী বলিয়া জ্ঞাপন করেন। হার্ম্স্-প্রবর্ত্তিত "ভেল্ট্‌ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌লিখেস্ আর্খিফ্" নামক বিপুল বিশ্বকোষ-সদৃশ ধনবিজ্ঞান-পত্রিকার আলোচনা-প্রণালীই তাঁহার নিকট আদর্শ স্বরূপ। তিনি ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সভ্য বটে। তাঁহার রচনায় ফরাসী কাগজপত্রের ছাপ কম নয়। অর্থশাস্ত্রে তিনি "স্বাধীনতা"-পন্থী। কিন্তু পঠন-পাঠনের আর গবেষণার অনেক কাজেই তাঁহাকে জার্ম্মাণ চিন্তাধারার বেশী সাহায্য লইতে হয়।

বাঙ্‌লায় ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি কবে আরম্ভ হইয়াছে? বিনয় বাবুর মতে,—যেদিন বাঙ্গলায় খবরের কাগজ জন্মিয়াছে। কারণ, খবরের কাগজের অর্থ ই হইতেছে সরকারী তথ্যের আলোচনা আর গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা। গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করিতে হইলে অর্থনৈতিক আলোচনা বাদ দেওয়া চলে না।

বিনয়বাবুর মতে বাংলায় ধনবিজ্ঞানের আলোচনা একেবারে অভিনব বস্তু নহে। তিনি বলেন, "যেদিন বাঙ্গলায় আধুনিক আর্থিক জীবনের সুরু হইয়াছে সে দিন হইতে স্বতই এই আলোচনা ও তাহার ফলে আর্থিক পরিভাষার সৃষ্টি হইতেছে। এই পরিভাষার গোড়া পাকড়াও করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ে গিয়া ঠেকিতে হইবে। 'স্বদেশী যুগের' আর্থিক আন্দোলন এবং আলোচনাও ইহার আহার্য্য জোগাইয়াছে। বঙ্গভাষার আর্থিক জীবন-সম্বন্ধীয় শব্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই সব একসঙ্গে নানাদিক্ হইতে উদ্ভূত কিংবা আহৃত হইয়াছে।

"ফার্সী, সংস্কৃত, উর্দ্দু, হিন্দী আর ইংরেজী, কম্‌সেকম্ এই পাঁচ ভাষার শব্দসম্পদে আমাদের বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। ধন-বিজ্ঞানের পরিভাষা কায়েম করিতে গিয়াও একশ'-দেড়শ' বৎসর ধরিয়া

বাঙ্গালীরা সজ্ঞানে-অজ্ঞানে এই পাঁচ-পাঁচটা ভাষার সাহায্য লইতেছে।" বিনয়বাবু নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, তিনি সজ্ঞানেই হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজী এই তিন ভাষার ভাণ্ডার হইতে হামেশা শব্দ লুঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার উপর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষার দ্বারস্থ হওয়াও তাঁহার দস্তুর রহিয়াছে।

তাঁহার মতে,—দেড়শ' বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর এই যে অর্থনৈতিক পরিভাষা গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে উকিলের দপ্তরখানা, সরকারী আদালত, জমিদারের কাছারী, বেপারী-দালাল-আড়ৎদারদের ঘাঁটি, বহির্ব্বাণিজ্যের মুচ্ছুদ্দির আফিস ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্র বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তিনি বলেন যে, হাট-বাজার হইতে শব্দ আমদানি করিয়া সংবাদপত্রের লেখকেরা, উকিল-দালাল-হাকিমেরা বাংলায় ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা পুষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিনয়বাবু নিজেও এই সকল কর্ম্মকেন্দ্র হইতে শব্দ-সংগ্রহের কাজে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস,—পাড়াগাঁর নানা জাতির ও নানা পেশার নরনারী যে-সকল আটপৌরে শব্দ কায়েম করিতে অভ্যস্ত সেই সমুদায় হইতেও নানা শব্দ আপনা-আপনি আসিয়া জুটিয়াছে। এই ধরণের শব্দগুলার ভিতর যে-সব বেশ সরস ও জোরাল এবং সহজেই বোধগম্য হইতে পারে, সেই সব বাছিয়া চালাইয়া দিবার দিকে বিনয়বাবুর নিজে ঝোঁক খুব বেশী।

তাঁহার শেষ কথা নিম্নরূপ: "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা বাংলায় কৌলীন্যের দাবী করে না। ইহা একদম খিঁচুড়ী ও বর্ণ-সঙ্করের সন্তান। ইহা পুরাপুরি দো-আঁসলা ও আন্তর্জ্জাতিক। বাংলা ভাষার অন্যান্য ঘরের মতন ধনবিজ্ঞানের কোঠেও 'গুরু-চাণ্ডালীর' জয়-জয়কার চলিতেছে।"

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত*

"জীবামি শতবর্ষং তু নন্দামি চ ধনেন বৈ।"

(আমি একশ' বৎসর বাঁচিয়া থাকিব আর ধনসম্পদের সাহায্যে জীবন সুখময় করিব),—শুক্রনীতি ৩।১৭৬।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
অতোঽর্থায় যতেতৈব সর্ব্বদা যত্নমাস্থিতঃ।
অর্থাদ্ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্॥

(মানুষই অর্থের গোলাম, অর্থ কাহারও গোলাম নয়। অতএব অর্থের জন্য সর্ব্বদা সযত্নে চেষ্টা করিবে। অর্থ হইতেই ধর্ম্ম-পালন আর জীবনের সুখভোগ সম্ভবপর হয়। নরনারীর মোক্ষলাভও অর্থের উপরই নির্ভর করে),—শুক্রনীতি ৫।৩৮।

পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা

১। বাংলা ভাষায় (ক) ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা আর (খ) দুনিয়ার নানাদেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় এবং কর্ম্মকৌশল সম্বন্ধে আলোচনা, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ গঠিত হইল (আশ্বিন ১৩৩৫, অক্টোবর ১৯২৮)।

২। ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে প্রধানতঃ পাঁচ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হইতেছে :—

(১) কৃষি-বিষয়ক, (২) শিল্প-বিষয়ক, (৩) বাণিজ্য-বিষয়ক

---

* ১০ অক্টোবর ১৯২৮

(আমদানি-রপ্তানি, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত), (৪) সমাজ-বিষয়ক (লোকবল, জনগণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মদক্ষতা, বিভিন্ন-শ্রেণীর নরনারীর জীবনযাত্রা-প্রণালী, নগর-শাসন, পল্লী-সংস্কার ইত্যাদি বিষয় এই সামাজিক ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত) (৫) রাষ্ট্র-বিষয়ক (জমি, মুদ্রা, শুল্ক, মজুরি ইত্যাদি সংক্রান্ত আর্থিক আইন-কানুন আর রাজস্ব-নীতি ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত)।

৩। প্রত্যেক বিভাগেই আলোচনার ভৌগোলিক ক্ষেত্র দ্বিবিধ :—(ক) দুনিয়া, (খ) ভারতবর্ষ,—বিশেষতঃ বঙ্গদেশ। ভারতীয় তথ্যসমূহকে সকল বিষয়েই দুনিয়ার আবেষ্টনে বিশ্লেষণ করা হইবে আর দুনিয়ার মাপে বিচার করা হইবে। দেশ ও দুনিয়ার যুগপৎ আলোচনা এই পরিষদের অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।

৪। এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন আর স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞানকে আর্থিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা করা এই পরিষদের দস্তুর থাকিবে।

৫। স্থায়ী গবেষক ও লেখক নিযুক্ত করা এই পরিষদের অন্যতম মুখ্য কর্ম্ম-প্রণালী।

৬। "আর্থিক উন্নতি" মাসিক পত্রিকার নিম্নলিখিত লেখকগণ সম্পাদকের সাহচর্য্যে কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিতরূপে গবেষণা করিতেছেন :—

(১) শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল (মরিয়ানি, আসাম),

(২) শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, "টাকার কথা"-প্রণেতা (দিনাজপুর),

(৩) শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল (কলিকাতা),

(৪) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল (হাজারিবাগ),

(৫) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল (কুচবিহার)।

৭। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ তাঁহারা পরিষদের অবৈতনিক গবেষকরূপে ভবিষ্যতেও ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে রাজি আছেন।

ধন্যবাদসহ তাঁহাদিগকে গবেষক নিযুক্ত করা হইল।

পরিষদের জন্ম-কথা

১। পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ" নামক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত এক প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধ ১৩৩১ সনের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ, ১৯২৫) "প্রবাসী"তে বাহির হইয়াছিল। লেখক তখন ইতালিতে ছিলেন—বোল্‌ৎসানোয়। পরে এই রচনা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইহা তাঁহার "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায় (গ্রন্থ বাহির হইয়া গিয়াছে)।

২। ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীতে "বস্তু-নিষ্ঠা" ও "দুনিয়া-নিষ্ঠা"র সদ্ব্যবহার করার দিকে এই পরিষদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। এই দুই "নিষ্ঠা" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার-প্রণীত "মেথডলজি অব্‌ রীসার্চ্চ ইন্‌ ইকনমিকস্" (ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী) নামক ইংরেজি প্রবন্ধ আর "আর্থিক উন্নতির গবেষণা-প্রণালী" নামক বাংলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইংরেজি প্রবন্ধটা লেখকের জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া ও সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে ভ্রমণকালে ১৯২৪ সনের "মডার্ণ রিভিউ"তে বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা মাদ্রাজ হইতে ১৯২৬ সনে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" (আর্থিক ক্রমবিকাশ) নামক ইংরেজি

গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়। বাংলা প্রবন্ধটা "আর্থিক উন্নতি"র তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৫ বৈশাখ, ১৯২৮ এপ্রিল) বাহির হইয়াছে। এক্ষণে ইহা লেখকের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের এক অধ্যায় (বর্ত্তমান গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৬০৮)।

৩। দেশবিদেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় ও কর্ম্মকৌশল আলোচনা করিবার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ব-দৌলতের আবহাওয়ায় ভারতীয় আর্থিক উন্নতির পথসমূহ বিশ্লেষণ করা অতি প্রাসঙ্গিক। বঙ্গীয় ধন বিজ্ঞান পরিষৎকে এই সকল উপায়, কর্ম্মকৌশল ও পথ ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। এই কর্ম্মক্ষেত্রের আলোচনায় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "এ স্কীম অব ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট ফর্ ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের জন্য আর্থিক ক্রমোন্নতির মোসাবিদা) প্রবন্ধ দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। লেখকের ইতালিতে অবস্থান কালে এই প্রবন্ধ ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। পরে এই রচনা কলিকাতায় স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়, এবং মান্দ্রাজে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" (১৯২৬) গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়রূপে বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধের বাংলা সংস্করণ ("সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল") লেখকের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র"* নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়। বিশ্ব-দৌলতের আবহাওয়ায় ভারতীয় সম্পদবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স-ভবনে বিনয়বাবুর এক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় (মার্চ্চ, ১৯২৭)। পরে এই বক্তৃতার ইংরেজি সারাংশ তাঁহার সম্পাদিত চেম্বার-প্রকাশিত ত্রৈমাসিক "জার্ণ্যালে" এবং বাঙ্গলা শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত "আর্থিক উন্নতি"

*বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম ভাগ (১৯৩০) দ্রষ্টব্য।

পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। "আর্থিক জীবনে পরের ধাপ" নামে সেই বক্তৃতা এক্ষণে "নয়া বাঙ্গলার গোড়া-পত্তন" গ্রন্থের অন্তর্গত (দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য, ১৯৩২)।

৪। ১৩৩৩ সনের বৈশাখে (১৯২৬, এপ্রিল) "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্, এ, বি, এল, পি, আর, এস, পি-এইচ, ডি (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন রায় চৌধুরী, বি, এ (রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, এম, এ, বার-অ্যাট-ল (শ্রীরামপুর), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী, এম, এ, বি, এল (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি-এইচ, ডি, (কলিকাতা), এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ (উত্তরপাড়া) পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।* সম্পাদক হন শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে বিগত আড়াই বৎসরের "আর্থিক উন্নতি" হইতে তাহার কিছু-কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

৫। "আর্থিক উন্নতি" সম্পাদনের জন্য জার্ম্মাণির ভেল্ট্‌ভির্ট্‌-শাফ্‌ট্‌লিখেস্‌ আর্খিফ্‌", ফ্রান্সের "জুর্ণাল দেজ্‌ একোনোমিস্ত্‌" ও "রেভি্য দেকোনোমী পোলিটিক", ইতালির "জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা", বিলাতের "ইকনমিক জার্ণ্যাল", "ইক-নমিকা" ও "জার্ণ্যাল অব্‌ দি রয়্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটি', এবং আমেরিকার "আমেরিকান্‌ ইকনমিক্‌ রিভিউ", "জার্ণ্যাল অব্‌ পোলিটিক্যাল ইকনমি" (শিকাগো), "আনাল্‌স্‌ অব্‌ দি আমেরিকান অ্যাক্যাডেমি অব পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স", "কোআর্টার্লি

*বর্ত্তমানে কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা একাকী "আর্থিক উন্নতি" পরিচালনার ভার বহন করিতেছেন।

জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিক্স্" (হার্ভার্ড), "পোলিটিক্যাল সায়েন্স কোআর্টার্লি", "আমেরিকান্ পোলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ", "আমেরিকান্ জার্ণ্যাল অব্ সোসিঅল্জি", "সোসিঅলজি অ্যাণ্ড সোশ্যাল রীসার্চ্চ" ইত্যাদি ত্রৈমাসিক ও মাসিক পত্রিকা সর্ব্বদা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এবং তথ্য ও তত্ত্বের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "আর্থিক উন্নতি"র অধ্যায়-বিভাগে এক সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী কায়েম করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিদেশী পত্রিকার বিশেষত্বগুলা যথাসম্ভব একত্র করিয়া ভারতীয় অবস্থার উপযোগিরূপে ব্যবহার করিবার প্রয়াস লক্ষিত হইবে।

৬। তাহা ছাড়া ফরাসী "জুর্ণে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল্" (দৈনিক), জার্ম্মাণ "ড্যয়চে আলগেমাইনে ৎসাইটুঙ্" (দৈনিক), ইতালিয়ান্ "করিয়েরে দেল্লা সেরা (দৈনিক), লণ্ডন "টাইম্সের" "এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ট্রেড্ সাপ্লিমেণ্ট" (সাপ্তাহিক), "ফারাইন ড্যয়চার ইঞ্জেনিয়রে" নামক বার্লিনের জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার-পরিষদের সাপ্তাহিক "নাখ্রিখ্টেন", মার্কিণ "ব্যাঙ্কার্স্ ট্রাষ্ট কোম্পানীর" সাপ্তাহিক "পত্র", বিলাতী "ষ্টেটিষ্ট্" (সাপ্তাহিক) ও "নেশ্যন্" (সাপ্তাহিক), জার্ম্মাণ মহিলা-পত্রিকা "ফ্যিস্র্ হাউস" (সাপ্তাহিক), বার্লিনের "ডাস বাঙ্ক্-আর্খিফ্" (পাক্ষিক), লণ্ডনের "ব্যাঙ্কার্স্ ম্যাগাজিন" (মাসিক), জার্ম্মাণ মাসিক "টেখ্নিক উণ্ড্ ভির্ট্শাফ্ট্", জেনীভার "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল লেবার রিভিউ" (মাসিক), ওয়াশিংটনের "মান্থ্লি বুলেটিন অব্ লেবার" (মাসিক), জার্ম্মাণ মাসিক "ড্যয়চে রুণ্ডশাও", বিলাতী মাসিক "একস্পোর্ট ওয়ার্ল্ড্", মার্কিণ মাসিক "গার্যাণ্টি সার্ভে", "মিড্মান্থ রিভিউ অব্ বিজ্নেস্", নিউইয়র্কের ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক-প্রকাশিত মাসিক "চিঠি", ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের মাসিক "বুল্তাঁ", বিভিন্ন দেশের "চেম্বার অব্ কমার্স"-পত্রিকা, রোমের "আন্তর্জ্জাতিক কৃষি-

পরিষদে"র বার্ষিক পঞ্জিকা ইত্যাদি পত্রিকাসমূহ "আর্থিক উন্নতি"র ল্যাবরেটরি বা গবেষণালয়ে নিয়মিতরূপে রসদ জোগাইয়া থাকে।

৭। জাপান-গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত শাসন-সক্রংান্ত ও অন্যান্য তথ্যমূলক পুস্তকাবলী, ওসাকার "আসাহি"-দৈনিকের আফিস হইতে প্রচারিত বর্ত্তমান জাপান বিষয়ক গ্রন্থ, "জাপান ইয়ার-বুক" ইত্যাদি বই ব্যবহার করিয়া জাপান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাহা ছাড়া তুর্কী ও বল্কান অঞ্চলের জন্য "দি নিয়ার ঈষ্ট ইয়ার-বুক" (লণ্ডন), দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য "ওফিশিয়্যাল ইয়ার-বুক অব্ দি ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা", চীনের জন্য "চায়না ইয়ার-বুক", এবং মার্কিণ মুল্লুকের জন্য "আমেরিকান্ ইয়ার-বুক" আর অন্যান্য দেশের জন্য "ষ্টেট্স্ম্যান্স ইয়ারবুক" ও "লণ্ডন অ্যাণ্ড কেম্ব্রিজ ইকনমিক সার্ভিস বুলেটিন্স্" ইত্যাদি গ্রন্থ জনপদগত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হইয়া থাকে।

৮। বাঙ্গলা দেশের জেলায়-জেলায় যেসকল সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয় তাহার প্রায় সব কয়টাই "আর্থিক উন্নতি"র জন্য নিয়মিতরূপে পঠিত ও যথাসম্ভব ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পত্রিকাবলী হইতে বঙ্গদেশের বহির্ভূত ভারতবর্ষের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। প্রাদেশিক আর সমগ্র-ভারতীয় গবর্মেণ্টের প্রকাশিত সংখ্যা ও তথ্যমূলক গ্রন্থাদি এবং শাসনসংক্রান্ত কার্য্যবিবরণীও আর্থিক অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হয়।

৯। তাহা ছাড়া ভ্রমণ, কথোপকথন, মোলাকাৎ ইত্যাদির সাহায্যে গবেষণার ব্যবস্থা করা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম কর্ম্মপ্রণালী।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতি

মেজর বামনদাস বসু আই, এম, এস (অবসর প্রাপ্ত)।*

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা

১। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল, এম, বি, প্যারিসের "বিদেশী রোগতত্ত্ব পরিষদে"র সভ্য, অধ্যাপক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, কলিকাতা।

২। শ্রীবাণেশ্বর দাস, বি, এস্ (ইলিনয়), রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা।

৩। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, অধ্যাপক, কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র ও কৃষি-বিদ্যালয়, চুঁচুড়া।

৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্, এ, বি, এল, পি, আর, এস্, পি, এইচ, ডি, সম্পাদক, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স্, কলিকাতা।

৫। শ্রীনলিনী মোহন রায় চৌধুরী, বি, এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কলিকাতা।

৬। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বি, এস্ (প্যাডু´), বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার, ডিরেক্টর, ইণ্ডো-অয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড, হাম্‌বুর্গ্ (জার্ম্মাণি)।

৭—১১। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সম্পাদক :—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি-এইচ, ডি, "প্রকৃতি"র সম্পাদক।

---

* ১৯৩০ সনে মেজর বামন দাস বসুর মৃত্যুর পর স্যার ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে সভাপতি করা হইয়াছে।

সহযোগী সম্পাদক :—

(১) শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল।

(২) শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল।

(৩) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীসত্যচরণ লাহা।

গবেষণাধ্যক্ষ :—শ্রীবিনয়কুমার সরকার, "আর্থিক উন্নতি"র ও "জার্ণ্যাল অব্ দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স"-পত্রিকার সম্পাদক, প্যারিসের "সোসায়িতে দেকোনোমী পোলিটিক" (ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষৎ) সভার সভ্য।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ

১। শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল।

২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ।

৩। অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল।

৪। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল।

৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল।

পরিষদের কার্য্যালয়

১০৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(বর্ত্তমানে ৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা)

---

* ১৯৩৫ সনে গবেষকবর্গের ভিতর আরও কয়েকজনের নাম আছে, যথা :— ৬। শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস এম, এ, ৭। শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু এম, এ, বি, এল, ৮। শ্রীব্রজবল্লভকৃষ্ণ সাহা, এম্, এ, ৯। শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক বি, এ (বর্ত্তমানে ইতালিতে রোম-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), ১০। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ১১। শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস সি, বি, এল, ১২। শ্রীশচীন সেন এম, এ, বি, এল, ১৩। শ্রীসন্তোষকুমার জানা, এস্ বি (বষ্টন, আমেরিকা), ১৪। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর এম, এ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের আলোচিত বিষয়সমূহ ও অর্থনৈতিক কর্ম্মকৌশল *

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ১৯২৮ সনের ১০ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ছয় বৎসরে যেসকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, একসঙ্গে "দেশ ও দুনিয়া" এই পরিষদের আলোচ্য বস্তু। নিম্নে তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে।

১৯২৮—২৯

১। ১০ অক্টোবর, ১৯২৮, ভারতবর্ষে বীজ-তৈল কারখানার ভবিষ্যৎ (শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)। ৪৫ পুলিশ হস্পিটাল রোড, কলিকাত. (শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের বাসা)।

২। ১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৮, সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যের অর্থকথা (ডাক্তার শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল)। ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা (ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার বাসভবন)।†

৩। ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২০, ভারতের বাণিজ্য-ভূগোল (মেজর বামনদাস বসু)। ৪৫ পুলিশ হস্পিটাল রোড, কলিকাতা।

৪। ২০ জানুয়ারি, ১৯২৯, বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙালী (বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)।

৫। ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯, কয়লার খনির মজুর (অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)।

* শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় লিখিত প্রবন্ধ ("ক্লাইভ ষ্ট্রীট" মাসিকে প্রথম প্রকাশিত, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩৪)।

† যেখানে ঠিকানা উল্লিখিত নাই সেখানে ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা বুঝিতে হইবে।

৬। মার্চ্চ, ১৯২৯, বাঙলায় কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ (শ্রীনরেন্দ্র নাথ অধিকারী)।

৭। মার্চ্চ, ১৯২৯, কিং জর্জ্জ ডকের আর্থিক মূল্য (শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)।

৮। ১৪ এপ্রিল ১৯২৯, ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা (শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৯২৯ সনের মে মাস হইতে ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত আড়াই বৎসর কাল পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার দ্বিতীয়বার ইয়োরোপে প্রবাসী ছিলেন।

৯। ১৬ জুন ১৯২৯, বঙ্গের কৃষি সমস্যা (শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক)।

১। ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০, পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন (শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়)।

২। মার্চ্চ, ১৯৩০, খদ্দরের অর্থকথা (অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।

৩। মার্চ্চ, ১৯৩০, মহাত্মা গান্ধির অর্থনৈতিক মতামত (অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)।

৪। ১৩ এপ্রিল, ১৯৩০, বোম্বাই ও তুলা-শুল্ক (শ্রীসুধাকান্ত দে)।

৫। ২১ জুন, ১৯৩০, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণা-প্রণালী (শ্রীসুধাকান্ত দে), বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, ২০ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

৬। ২১ জুন, ১৯৩০ ঋদ্ধিগঠন (ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত), বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, ২০ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

৭। ১০ আগষ্ট, ১৯৩০, সাইমন কমিশনে উপস্থাপিত আর্থিক সমস্যাসমূহ (শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস)।

৮। ১৭ আগষ্ট, ১৯৩০, ঐ ঐ ঐ

১৯৩০—৩১

১। ৩০ নবেম্বর, ১৯৩০, আর্থিক জরীপের মোসাবিদা (শ্রীসুধাকান্ত দে)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আড়াই বৎসর বিদেশে প্রবাসের সময় বিনয় বাবু মিউনিকের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩০-৩১) "অতিথি-অধ্যাপক"রূপে "আর্থিক ভারত ও বিশ্বদৌলত" সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ভাষায় একাশীটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার ৮১টা বিভিন্ন বিষয়ের নামের জন্য "জার্ন্যাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স" (১৯৩০-৩১) দ্রষ্টব্য।

তাহা ছাড়া জার্ম্মাণির লাইপসিগ, ষ্টুটগার্ট, কীল, য়েনা, বার্লিন, ন্যুর্ণব্যর্গ ইত্যাদি বার-তেরটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে যেসকল বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল সেই সমুদয়ও ভারতীয় কৃষিশিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক। অধিকন্তু সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জেনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসীতে এবং ইতালির মিলান, পাদুয়া ও রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালিয়ান ভাষায় ভারতের অর্থনৈতিক কথা লইয়াই তাঁহার বক্তৃতাবলী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক লোকবল-কংগ্রেসের অর্থনৈতিক বিভাগের অন্যতম প্রেসিডেণ্ট হিসাবেও তাঁহার ইতালিয়ান ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ ভারত-বিষয়কই ছিল। এই আড়াই বৎসরে তাঁহার তেইশটা রচনা ফরাসী, ইতালিয়ানও জার্ম্মান

ভাষায় বিভিন্ন অর্থশাস্ত্র বিষয়ক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। সবগুলাই ভারত-বিষয়ক। সকল ক্ষেত্রেই দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের আর্থিক যোগাযোগ ও আলোচিত হইয়াছিল।

আজকাল ইয়োরোপের কোন কোন দেশ হইতে ভারত-সন্তানগণ এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, চিকিৎসা, ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যায় উচ্চতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ছাত্র-বৃত্তি, পর্যটন-বৃত্তি ও গবেষণা-বৃত্তি পাইতেছেন। অধিকন্তু বক্তৃতা প্রদানের জন্য ও দুএক জন ভারতীয় অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইতেছেন। বিদেশে এই সকল সুযোগ-সৃষ্টির সঙ্গে বিনয়বাবুর প্রবাসকালীন বক্তৃতাবলী ও প্রবন্ধসমূহের কিছু কিছু যোগ আছে।

১৯৩১—৩২

১। ৭ নবেম্বর, ১৯৩১, দেশ-বিদেশের ধনবিজ্ঞানপরিষৎ এবং ইংরেজি ভাষার দাসত্ব হইতে বাঙলায় ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার মুক্তিলাভ (শ্রীবিনয়কুমার সরকার)। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের ভবনে (২০ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত চা-সভায় সম্বর্দ্ধনার উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতা।

২। ৯ এপ্রিল ১৯৩২, জার্ম্মাণ ক্ষতিপূরণ ও মিত্রশক্তিবর্গের ঋণ (শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস)। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, ২০ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

১৯৩২—৩৩

১। ২১ মে ১৯৩৩, বীমা-ব্যবসায় রুশিয়া (শ্রীমণীন্দ্র মোহন মৌলিক)। ২২ সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা (অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাসের বাস-ভবন)।

২। ২৮ মে, ১৯৩৩, বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের দান (শ্রীসুধাকান্ত দে)।

৩। ২৩ জুলাই, ১৯৩৩, পূর্ব্ববঙ্গের হাটবাজার (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহা)। জন-নায়ক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

৪। ২৭ আগষ্ট, ১৯৩৩, বাঙ্গলার মজুর (শ্রীবাদল গঙ্গোপাধ্যায়)।

৫। ২৭ আগষ্ট, ১৯৩৩, ভারতীয় ব্যাঙ্ক-বীমা-নৌবাণিজ্য বিষয়ক গবেষণা। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের পরিচালক ও গবেষকগণকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় কলিকাতা সেণ্ট্রাল হোটেল-ভবনে এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের স্যর লালুভাই সামলদাস এবং স্যার সোরাব্‌জি পোচ্‌খানাওয়ালা বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক বিশিষ্ট অতিথিরূপে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

৬। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩, মজুরদিগের আয়ব্যয় ও দৈনন্দিন জীবনের মাপকাঠি (শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু)।

৭। ৮ অক্টোবর ১৯৩৩, লাক্ষা ব্যবসায় বাঙ্গালী (শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায়)। ৪৫ পুলিশ হস্পিটাল রোড, কলিকাতা।

১৯৩৩—৩৪

১। ৫ নবেম্বর, ১৯৩৩, ছোট বহরের চিনির কল (অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাস)।

২। ১৯ নবেম্বর, ১৯৩৩, কাপড়ের কলে বাঙালী (শ্রীপ্রমোদকুমার দাশগুপ্ত)।

৩। ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৩, ব্যবসা-বৃদ্ধির গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী (শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়)।

৪। ১১ মার্চ্চ, ১৯৩৪, আন্তর্জ্জাতিক বেকার-কানুন (শ্রীপঙ্কজকুমার

মুখোপাধ্যায়)। ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। "হিতবাদী"র পরিচালকগণ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য নিজ ভবনে এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

৫। ১৮ মার্চ্চ, ১৯৩৪, বাঙলায় কয়লার নয়া প্রয়োগ (ডক্টর শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্ত রায়)।

৬। ৩ মে, ১৯৩৪, ভারতে কাগজ প্রস্তুত করা (শ্রীসন্তোষকুমার জানা)। ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ক্যালকাটা ফিনান্স্ কোম্পানীর জেনার‍্যাল ম্যানেজার মঁসিয়্যর অমিতাভ ঘোষ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

৭। ৮ জুলাই, ১৯৩৪, পেশা-বাছাইয়ের মার্কিণ রীতি (ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত)।

৮। ১২ আগষ্ট, ১৯৩৪, বিজলী-ভাণ্ডের কারখানা (শ্রীমধুসূদন মজুমদার)।

১৯৩৪-৩৫

১। ২১ নবেম্বর ১৯৩৪, বাঙ্গালী বণিক্ ও আর্থিক ইতালি। পরিষদের অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মৌলিক ইতালিয়ান প্রাচ্য পরিষদের বৃত্তি পাইয়া ইতালি যাত্রা করিতেছেন। এই উপলক্ষে পরিষৎকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ক্যালকাটা ফিনান্‌স্ কোম্পানীর জেনার‍্যাল ম্যানেজার মঁসিয়্যর অমিতাভ ঘোষ নিজ কার্য্যালয়ে (২ চ্যর্চ্চ লেন, কলিকাতা) চা-সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গের ভিতর ইতালির কন্সাল-জেনার‍্যাল কাউণ্ট জ্যুস্তি এবং আরও কয়েকজন ইতালিয়ান উপস্থিত ছিলেন।

২। ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৫, ভারতের মেয়ে-মজুর (শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়)।

৩। ২৪ মার্চ্চ, ১৯৩৫, জাপানের ব্যবসা-প্রণালী (শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার)।

৪। ১২ মে, ১৯৩৫, মন্দার যুগের বাজার দর (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ)।

বাঙালীর আর্থিক ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে?

"পরিকল্পনা" শব্দটা আজকাল ১৯৩৪ সনে ভারতবর্ষে বেশ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতের জন্য একটা "পরিকল্পনা" বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক ১৯২৫ সনের এপ্রিল মাসে ইতালিতে প্রবাসের সময় প্রস্তুত হইয়া জুলাই মাসে ভারতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। এইখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাহার প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পরে ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে রুশিয়ায় বর্ষ-পঞ্চকের পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

১৯২৫ সনের মধ্যভাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বিনয় বাবু বাঙ্গালী জাতির সমীপবর্ত্তী আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারই ভাষায় যে সকল "হদিশ" দিয়াছেন তাহার কয়েকটা নিম্নে প্রদর্শিত রচনাবলীর ভিতর দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রচনাগুলার প্রায় প্রত্যেকটাই ভারতের নানা প্রদেশে বহু পত্রিকায় বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় রচনা পুস্তিকার আকারেও পাওয়া যাইত এবং বোধ হয় এখনও পাওয়া যায়। অধিকন্তু

বৃহদাকার গ্রন্থের ভিতরও এই সমুদয়ের স্থান আছে। সংক্ষেপে তালিকা প্রকাশ করিতেছি :—

১। জুলাই, ১৯২৫, এ স্কীম অব ইকনমিক ডেভেল্প্‌মেণ্ট ফর ইয়ং ইণ্ডিয়া (দৈনিক "ফরওয়ার্ড", "মডার্ণ রিভিউ" ইত্যাদি)। সহজে প্রাপ্তব্য "ইকনমিক ডেভেল্প্‌মেণ্ট" গ্রন্থে, মাদ্রাজ, ১৯২৬, ৩৯২-৪১৭ পৃষ্ঠা। ইহার প্রধান আলোচ্য বস্তু বেকার-সমস্যা, "শিল্পনিষ্ঠা" আর জেলায় জেলায় "অর্থনৈতিক সেনাপতি-সঙ্ঘ" ("ইকনমিক জেনার‍্যাল ষ্টাফ") প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা।

২। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬, আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ,—

(১) ব্যাঙ্ক গঠন, (২) ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা, (৩) জমিজমার আইনকানুন, (৪) মজুর-দুনিয়ার নবীন স্বরাজ, (৫) ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ, (৬৷ আর্থিক জগতে আধুনিক নারী। "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের প্রথম ভাগের ১৬-১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (১৯৩২)।

৩। মার্চ্চ, ১৯২৭, আর্থিক জীবনে পরের ধাপ ("নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন," দ্বিতীয় ভাগ (১৯৩২), ২৭২—৩১৩ পৃষ্ঠা।

৪। মার্চ্চ, ১৯২৭, ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট স্‌ অ্যাণ্ড বিজ্‌নেস অর্গ্যানিজেশন ফর বেঙ্গল ক্যাপিট্যালিষ্ট্‌স্‌ ("জার্ণাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স")।

৫। আগষ্ট, ১৯২৭, যুবক বাংলার অর্থশাস্ত্র ("নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" দ্বিতীয় ভাগ, ১৫৭—২০৯ পৃষ্ঠা।

৬। মার্চ্চ, ১৯২৮, কম্পারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌ অ্যাণ্ড দি ইকুয়েশন্‌স্‌ অব অ্যাপ্‌লায়েড ইকনমিক্‌স্‌ ("জার্নাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স")।

৭। ডিসেম্বর, ১৯২৮, সম্পদবৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল। "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র," প্রথম ভাগ (১৯৩০), ৩২৬-৩৭৪ পৃষ্ঠা।

৮। ডিসেম্বর, ১৯৩০, র‍্যাশন্যালিজেশন ইন ইণ্ডিয়ান কটন মিল্‌স্, রেলওয়েজ্, ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড আদার এণ্টারপ্রাইজেস্। "অ্যাপ্-লায়েড ইকনমিক্‌স্," প্রথম ভাগ (১৯৩২), ২২১-২৬০ পৃষ্ঠা।

৯। এপ্রিল, ১৯৩২, বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার অর্থনীতি ("নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন", দ্বিতীয় ভাগ, ৪০০-৪৩৪ পৃষ্ঠা।

১০। সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, বাঙালীর ব্যাঙ্ক-দৌলত ("আর্থিক উন্নতি")।

১১। মার্চ্চ, ১৯৩৩, ইকনমিক প্ল্যানিং ফর বেঙ্গল। পাট-সমস্যা ও বিশ্বব্যাপী দুর্য্যোগ হইতে আরোগ্যলাভের উপায় আলোচনা এই রচনার উদ্দেশ্য ("ইন্‌শিওর‍্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স্ রিভিউ", কলিকাতা)।

১২। জুলাই, ১৯৩৩, বাঙ্গালী জমিদার ও বাঙ্গালীর কৃষিশিল্প-বাণিজ্য ("আর্থিক উন্নতি")।

১৩। জানুয়ারি, ১৯৩৪, বাড়তির পথে বাঙ্গালী ("আর্থিক উন্নতি")।

১৪। মার্চ, ১৯৩৪, প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অব ল্যাণ্ড মর্টগেজ্ ব্যাঙ্ক্‌স্ ("ক্যালকাটা রিভিউ")।

১৫। সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪, দি প্রব্‌লেম অব্ ষ্টেট কনট্রোল ইন ইণ্ডিয়ান কোল ইণ্ডাষ্ট্রি ("ক্যালকাটা রিভিউ)'।

১৬। অক্টোবর, ১৯৩৪, বঙ্গসমাজে চাষী-মধ্যবিত্ত-জমিদার ("সোনার বাংলা", ঢাকা)।

নং ১০, ১২, ১৩, ১৬, "বাড়তির পথে বাঙালী" গ্রন্থে (১৯৩৪) প্রাপ্তব্য।

ভারতীয় শুল্কনীতি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য "ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স ভিজ-আ-ভি ওয়ার্লড্-ইকনমি" নামক গ্রন্থ (১৯৩৪) এবং ভারতীয় মুদ্রা-নীতি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য "ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্লেম্স্" নামক গ্রন্থ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৪)।

"আর্থিক উন্নতি" পত্রিকা

১৯২৬ সনের বৈশাখ মাসে "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ইহার দ্বিতীয়াংশে প্রবন্ধ থাকে। বিগত সওয়া নয় বৎসরের সূচীপত্রে দেখা যায় যে, ভারত-কথা আর বঙ্গ-কথা "আর্থিক উন্নতি"র প্রাণের কথা। আর প্রথম অংশ আট অধ্যায়ে বিভক্ত থাকে। এই অধ্যায়গুলার একটায় আলোচিত হয় "দুনিয়ার ধনদৌলত"। অন্যান্য অধ্যায়গুলার অন্যতমের নাম "আর্থিক ভারত"। সর্ব্বপ্রথম অধ্যায় প্রধানতঃ পল্লীবিষয়ক এবং "মফস্বলের বাণী"তে পরিপূর্ণ। নাম "বাঙ্গলার সম্পদ"।

"গবেষক"-গণের গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের "গবেষক"গণ কর্ত্তৃক লিখিত কয়েকখানা গ্রন্থের নাম প্রদর্শিত হইতেছে :—

১। রিকার্ডোর অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ, শ্রীসুধাকান্ত দে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

২। টাকাকড়ি, শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ। বেঙ্গল জার্ণাল্‌স্ লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

৩। দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক, ডক্টর শ্রীনরেন্দ্র নাথ লাহা ও শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত (১৯৩০)।

৪। ভারতে পরদেশী ব্যাঙ্কের বনিয়াদ, শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত (১৯৩১)।

৫। ধনবিজ্ঞানে সাকৃরেতি, শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত (১৯৩২)।

৬। কন্‌ফ্লিক্‌টিং টেণ্ডেন্সীজ্ ইন্ ইণ্ডিয়ান্ ইকনমিক্ থট,—শ্রীশিব চন্দ্র দত্ত (১৯৩৪)।

গবেষকদের লিখিত রচনাবলী গ্রন্থকারে প্রকাশ করিলে কেহ কেহ একাধিক সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে বাঙ্গলার অর্থনৈতিক সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিবেন।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব*

ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা যে কয়টি সুফল লাভ করিয়াছি তাহার মধ্যে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ অন্যতম। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সম্মুখে যে অভিনব জগতের বার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্টিলাভ করিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় ও সৌষ্ঠববান্ করিয়া তুলিয়াছে।

এদেশে যখন ইংরাজী শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন আমাদের মাতৃভাষার এমন অবস্থা ছিল না যাহাতে শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার স্থান উর্দ্ধে ধারণ করিতে পারা যাইত। তখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই ইংরাজীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকারিরূপে বিরাজ করিতেছিল। আজ বাঙলা ভাষা বিকাশ লাভ করিতে করিতে যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তহোতে ইহাকে বি, এ, পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত বিষয়ের মধ্যে একটী অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত করিতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব হানি হয় নাই। কিন্তু এখনও আমাদের ভাষা-সম্পদ এত বৃদ্ধি পায় নাই যে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ই একমাত্র বাঙলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা

*ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে (১৯১১ এপ্রিল) শ্রীবিনয়কুমার সরকারের প্রস্তাব। সভাপতি ছিলেন বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

দেওয়া যাইতে পারে। বাঙলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো-দিন বাঙ্গালীর পক্ষে শিক্ষার একমাত্র বাহন রূপে বিবেচনা করিয়া তাহার পঠদ্দশার "সকল স্তরেই" ইহাকে মুখ্য ভাষার গৌরব প্রদান করিবেন কিনা—ইহা সম্প্রতি আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা ঠিক্ যে, আমরা ইচ্ছা করিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে আমাদের সকল শ্রেণীর সর্ব্ব প্রকার শিক্ষার মৌলিক অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। সাহিত্যের দারিদ্র্য এবং অযোগ্যতাই ইহাকে সকল শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়।

বাঙলা সাহিত্যের কোন সেবকই একথা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃতির সাহায্যে আমরা যে পরিমাণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি তাহাকে আমাদের কর্ম্মশক্তি ও সাধনার দ্বারা বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিয়া দরিদ্র ও সঙ্কীর্ণ সাহিত্যকে ক্রমশঃ নানা বিষয়ক ও উচ্চ চিন্তা-প্রকাশক করিয়া তুলিতে হইবে। সাহিত্যসেবিগণের ব্যক্তিগত বা সাময়িক চেষ্টার ফল অপেক্ষা করিয়া আর আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না। প্রয়োজন বোধ করিলে রাষ্ট্রনীতিক পণ্ডিতগণ যেমন সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া নিরক্ষরকে সুশিক্ষিত, এবং ধনহীন সমাজকে সম্পদ্‌বান ও ঐশ্বর্য্যশালী করিতে প্রয়াসী হন, আমাদিগকেও এখন প্রয়াস করিয়া, সংরক্ষণনীতির সাহায্যে প্রকৃতির কার্য্য এবং সাহিত্যিকগণের ব্যক্তিগত উদ্যমকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতে হইবে। কি উপায়ে এবং কতদিনে আমাদের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরাজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে—ইহাই আমাদের এখন প্রধানতম বিবেচনার বিষয়। যাহাতে আমাদের সাহিত্যসেবা এখন হইতে এই একমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত

হইতে পারে সাহিত্যিকগণের সাধনা ও আদর্শ সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে "এণ্ডাউমেণ্ট" ও ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া ধনশালী ব্যক্তিগণ অনন্যকর্ম্মা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত মাসিক অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হউন। এইরূপে সুধীবর্গের সাহিত্য-সাধনাকে সহজ ও নিরুদ্বেগ করিতে পারিলেই বাঙলা সাহিত্য সংরক্ষিত হইয়া শীঘ্রই উন্নত হইতে পারিবে। যদি বাঙ্গালা সাহিত্য সৌভাগ্য-ক্রমে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়গণের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি আকৃষ্ট করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং ইঁহাদের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী যুবক নিশ্চিন্ত হইয়া সমবেতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থগুলি আমাদের জাতীয় সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে; প্লেটো, গীজো, হেগেল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গবেষণা আমাদের স্বকীয় ভাষার ভিতর দিয়াই লাভ করিতে পারি; এবং অল্প কালের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ও জাতীয় হইয়া উঠিতে পারে।

অনেক সময়ে আকাডেমীর প্রভাবে এবং পরিপোষকগণের পরি-চালনায় সাহিত্য স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারাইয়া কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। কোন সমাজকে অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যে যেমন অনেক সময়ে যথেষ্ট

অর্থ ব্যয়ে "কমিশন" বা অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও সেইরূপ অর্থসাহায্যে একটী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে মাত্র। ইহার ফলে কয়েক জন উপযুক্ত সাহিত্যিককে অনন্যকর্ম্মা করিয়া দিয়া সাহিত্যে তাঁহাদের সম্পূর্ণ সময় ও সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে।.

পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান, সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ক যে কয়খানি উচ্চগ্রন্থ মানবজাতির সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা অত্যধিক নহে। কোন দেশেই কেবলমাত্র স্বজাতীয় পণ্ডিতগণের মৌলিক গবেষণা অবলম্বন করিয়াই শিক্ষা-কার্য্য সমাধা হয় না। বিশ্বসাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি সকল ভাষায় অনূদিত এবং তাহাদের আলোচ্য বিষয়গুলি সঙ্কলিত হইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং সেই কয়খানি গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া অনুবাদ ও সঙ্কলন আরম্ভ করিলে আমাদের বাঙ্‌লা সাহিত্য অতি সত্বরই অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সমকক্ষ হইতে পারে। এই অনুবাদ ও সঙ্কলনের ফলে কেবল যে সেই গ্রন্থগুলিই বাঙলা সাহিত্যে স্থান পাইবে এমন নহে, আনুষঙ্গিকভাবে আমাদের মাসিক সাহিত্য এবং সমালোচনাও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশের ভাবুকেরা বহু দূর-ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও বর্ত্তমানের নগণ্য আরম্ভের মধ্যেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা স্বভাবতই আশা করিতে পারি যে, যে কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্য প্রবল হইয়া উঠিবে তাহার জন্য আমাদের ধনিসম্প্রদায় এবং ভূম্যধিকারিগণ ভূমি ও স্থায়ী সম্পত্তি দান করিতে উৎসাহী হইবেন।

আমাদের দেশে অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ ১৫০৲ টাকায় কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। এইরূপ পাঁচজন অধ্যাপকের দশবৎসরব্যাপী অথবা দশজন অধ্যাপকের পাঁচবৎসরব্যাপী সমগ্র প্রয়াস ও শক্তি নিয়োজিত করা আবশ্যক। সঙ্গে-সঙ্গে ইহাদিগকে সহায়তা করিবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক। বৎসরে প্রত্যেক অধ্যাপক অন্ততঃ দুইখানি করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। এই সমুদয় গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা সংশোধন ও সম্পাদন করাইতেও অর্থের প্রয়োজন হইবে। মোটের উপর, যদি দশলক্ষ টাকা মূল্যের জমিদারী সাহিত্য-সংরক্ষণের জন্য সাহিত্য-পরিষৎকে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ইহার আয় কেবলমাত্র দশ বৎসরের জন্য খরচ হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ আমাদের কার্য্যের জন্য আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কেবল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নগদ খরচ করিতে হইবে। তাহার পরে আর সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না। ইহার ফলে যে-শক্তি জাগরিত হইবে তাহার দ্বারাই সাহিত্য স্বয়ং গন্তব্যপথ স্থির করিয়া লইয়া স্বাধীন ভাবে বিরাজ করিতে থাকিরে।

আর যদি এইরূপ জমিদারী লাভের আশা দুরাশা মাত্র হয়, অথবা *একসঙ্গে ৩,৫০,০০০৲ টাকা নগদ প্রাপ্তি একেবারে অসম্ভবই হয়*, তাহা হইলে সামান্য ভাবেই *সাহিত্য-সংরক্ষণ-কার্য্য* আরম্ভ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গ্রন্থের লিখন, সংশোধন ও মুদ্রনের জন্য যদি ১৫০০—২০০০৲ টাকা করিয়া ধার্য্য করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যেই কার্য্যের ফল বুঝিতে পারা যাইবে।

কিন্তু সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের দ্বারা যে সুফল লাভের আশা করা যাইতেছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে "অল্প কালের মধ্যেই

প্রচুর অর্থব্যয়" করিবার উৎসাহ ও সামর্থ্য বাঞ্ছনীয়। জাতীয় জীবনে সাহিত্যের স্থান ও প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধনিসমাজ একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করুন।*

* এই সঙ্গে ১৯৩১ সনের ৭ নবেম্বর তারিখে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স ভবনে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা ("ইংরেজি ভাষার দাসত্ব হইতে বাংলার ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার মুক্তি লাভ") দ্রষ্টব্য। "নয়া বাঙ্‌লার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের (১৯৩২) দ্বিতীয় ভাগের ২৬০-২৬৩ পৃষ্ঠায় এই বক্তৃতার সারমর্ম্ম পাওয়া যায়।

নির্ঘণ্ট

Works by Benoy Kumar Sarkar

INDIAN CURRENCY AND RESERVE BANK PROBLEMS

Second, Enlarged Edition. Fourteen Charts. Re. 1-8-0

Hindu (Madras): "On most questions Prof. Sarkar's views are not identical with those held by prominent businessmen in the country. * * * On every question he has attempted to substantiate his case by facts and figures. * * * One fails to see how the businessmen can pick holes in Prof. Sarkar's arguments. * * * A highly stimulating treatise on certain aspects of Indian monetary and banking problems."

People (Lahore): "Prof. Sarkar is an optimist. * * * The business community still continues to take a pessimistic view of the present rate of exchange. * * * Many of us think that the continued export of gold must sooner or later bring the country to the very verge of bankruptcy but Prof. Sarkar knows more than any one else. Prof. Sarkar approves of the Reserve Bank Bill and advises the business community to accept it."

Hindustan Review (Patna): "The Professor has treated tariff questions as integral parts of the currency problem and puts in a strong plea that a substantial portion of the Directorate in the Reserve Bank should represent the agricultural interests."

Commercial Gazette (Calcutta): "The eminent Professor usually holding views quite out of the ordinary and frequently perplexing our common notions of realities has given us a cause to demur from his point of view by his singular advocacy of the 1s. 6d, ratio in 1926."

Advance (Calcutta): "Special reference may be made to the author's attempt to present in a nutshell all the important

aspects of our currency and banking problems from the standpoint of an economic expert and not in terms of any definite party or school."

Federated India (Madras): "The views of Prof. Sarkar are unconventional, though on that account not any the less scientific."

Amrita Bazar Patrika (Calcutta): "Prof. Sarkar is the founder of the present-day Bengali school of economists who support the linking of Rupee to sterling at 18d. per Re. and the exports of gold from India. The arguments adduced are well-reasoned, interesting and educative. * * * Prof. Sarkar has done well by putting forward the claim that besides the three Bengali scheduled banks recognized in the proposed Reserve Bank Bill, a few more should be included."

Insurance and Finance Review (Calcutta): "It was Prof. Sarkar who first raised his voice against the "classical" economists, so to say, of India, for example, the Bombay mill owners. * * * In this monograph will be found the germ of the *formation of a new school of economic thought in Bengal* that approaches the economic problems of the day from an objective point of view without yielding to popular confusions or dictates of interested partisans in a controversy."

IMPERIAL PREFERENCE
vis-a-vis
WORLD ECONOMY

In Relation to the International Trade and National Economy of India.

With 15 Charts. Price Rs. 5/-

Journal of the Royal Institute of International Affairs (London): "An interesting attempt to show how present-day Imperial economic policy stands with relation to the world-economic system. The author has made a somewhat ambitious

attempt to elucidate the present chaotic condition of international economic relations, and to show the directions along which, in his opinion, these are developing. Naturally a very large part of the book is given to the special position of India, and the chapters devoted to this are valuable."

(Prof. Coatman)

Federated India (Madras): "Prof. Sarkar in his thoughtful and suggestive study is deliberately mild in manner. He is a typical representative of Bengali economists who are stout opponents of the attitude taken by economists and businessmen of the other provinces in matters relating to currency and trade. But Prof. Sarkar is to be congratulated on his courage in maintaining an unpopular point of view. The care and skill with which he has collected his data is wholly admirable."

Prof. A. E. Zimmern (Oxford and **Geneva):** "I am entirely at one with you in your approach to the subject as against the pure Free Traders on the one hand and the advocates of closed systems on the other. It seems to me axiomatic (though many have not grasped either the fact or its implications) that the old system of separate and distinct orbits for pure politics and for economics has passed away beyond reach. Trade policy has become a part of foreign policy and commercial treaties cannot be negotiated without an eye to larger considerations. The logic of facts is bringing this out. Many points in your book interested me and threw new light on situations."

Amrita Bazar Patrika (Calcutta): "He is definitely of opinion that in the tariff morphology of nations the Ottawa Agreement of 1932 is as great a landmark as the Cobden-Chevalier Treaty of 1860 and the *Deutscher Zollverein* of 1833. In this well documented and graphically illustrated monograph the eminent Professor of the Calcutta University with his characteristic erudition and level-headed judgment makes a threadbare and analytical study of India's foreign trade."

Commercial Gazette (Calcutta): "A detailed and exhaustive study of the trends in India's foreign trade since the

inauguration of the Ottawa Pact. Prof. Sarkar, as it is well known, is one of the very few economic thinkers who refuse to throw themselves headlong into the general stream of economic thought prevailing in this country and like to interpret things in an individualistic way. And in this case too the interpretation he gives of the results of the Ottawa Agreement runs counter to the generally held opinion on this subject in India. The judgment is marked by a breadth of outlook very rarely met with in the writings of Indian economists."

COMPARATIVE BIRTH, DEATH AND GROWTH RATES

A Study of the Nine Indian Provinces in the Background of Eur-American and Japanese Vital Statistics.

Nine Charts. Re. 1-0-0

Prof. Joseph-Barthelemy (Paris): Member of *Institut de France*: "The learned exposition awakens the most living interest and confers the greatest profit."

Louis J. Dublin, Statistician of the Metropolitan Life Insurance Co., **New York:** "It is an extremely valuable and interesting statement."

Prof. Jean-Brunhes (Paris): "This study is particularly useful to me and is being signalized in the bibliography of the next edition of *La Geographie Humaine*."

Prof. E. L. Bogart (Illinois): "It is packed with valuable and interesting facts. I am particularly interested in what you have to say about Europe."

Prof. Andre Siegfried (Paris): "This is a most fascinating and useful work and I shall use it widely for the preparation of my lectures on geographical economy at the *Ecole des Sciences Politiques*."

APPLIED ECONOMICS

Vol. I., 320 pages. Nine Charts. Rs. 6/-

La Vita Economica Italiana (Rome): "This is the first volume of a series of studies which the author intends to carry on on diverse economic problems (business organization, finance and technique). The present volume contains six studies on the following subjects: (1) principles of control relating to foreign insurance companies, (2) the reorganization of the *Reichsbank* and the *Banque de France*, (3) the bank capitalism of Young Bengal, (4) the railway industry and commerce of India in international railway statistics, (5) traces of rationalization in Indian industrial enterprises, (6) the world-crisis in its bearings on the regions of the second and the first industrial revolutions.

"Seeing that the author is an Indian, the studies relating to India, especially, the last four chapters possess a special importance. The chief aim of the author consists in continually comparing the development and the condition of the varied economic phenomena of India with those of European states. These comparisons are calculated in relative economic indices per inhabitant and per territory.

In the study entitled the "Bank capitalism of Young Bengal" a large part is given over to a rapid examination of the banking systems of principal European countries. Such an examination enables the author to calculate his equations relating to banking. The equations yield, first, the territorial index numbers, and then the year in which the same phenomena of certain European states correspond to the present condition of India. The author finds, for instance, that the average bank wealth of India per head in 1932 is equal to that of Germany in 1860-70, of Italy and Japan in 1900-05, and of the Balkan states in 1925-32.

"The most plentiful in comparison with other countries and often interesting is also the study on railway industry and commerce by which the author calculates the relative equations for India.

"A different character from these two studies presents the one on rationalization in which the author describes and examines the various fields of Indian economic life. He brings into relief the influence exercised by the Great War on rationalization in India.

"In the last chapter the author examines the characteristics of the world-economic depression on the basis of principal indices.

"The work of Sarkar has the merit of making some important economic problems of India known from the Indian standpoint." (**Prof. Vergottini**).

Weltwirtschaftliches Archiv (Jena): "Special significance is attached to the method of quantitative comparisons which Sarkar designates as 'comparative industrialism' or 'comparative capitalism'.

"Of the wide field of applied economics the most varied parts have been discussed in these chapters. Common to them all is the comparison of India with other countries and the tendency to draw the necessary conclusions for India from these comparisons, in order that India may be enabled to rise to the next higher stage of economic development.

"In the first chapter are discussed the laws of Germany, France, Italy, a number of Balkan states, etc. controlling the activities of of foreign insurance companies. The author invites attention to the foreign legislation in order that the Indian Insurance Companies Act may be modified in some important points.

"The most important pioneers of central and note banks namely, Great Britain, Germany and France have been studied in the second chapter. Of universal interest is, further, the exhibition of the development and present condition of Indian banking with a large amount of figures as well as of the role of foreign banking in India. The banking system of many countries is described in detail with especial reference to historical growth in each. In one of his equations we find that every Italian possesses 1·7 time as much bank deposit as every Bengali.

"Many readers will learn for the first time the fact that India is one of the greatest railway regions of the world. According

to some of Sarkar's railway equations, France=6·3 India, Germany=4·84 India, India=6·8 China or 9·5 Persia. In historical statistics India (1925)=Germany between 1850 and 1860 or=Italy between 1860 and 1870.

"According to Sarkar the Indian economy admits of rationalization in every form, but he is conscious of the limitatins that arise out of the actual conditions of industry. The examples he has cited from the textile industry, railway, iron and steel enterprise, the hydro-electric and chemical industries, as well as from agriculture furnish valuable insight into Indian economic life.

"In the chapter on the world-crisis Sarkar brings the conclusions together. Great Britain, Germany and other countries can recover if they can expand their markets, and this can happen only when the purchasing power of agricultural regions is restored. These latter are described as the "youngsters" in economic development. They are again not only dependent on the expansion of exports of their agricultural produce. But they are themselves getting industrialized and even industrializing their agriculture. Besides India, there is a large number of countries belonging to this complex which exhibits the stage of the "first industrial revolution". The old industrial countries will have to undertake a reorganization in the line of export of specialized industries as well as reagrarization in a certain sense. In this manner is described the complex of the "second industrial revolution".

"The work furnishes plenty of well worked-out Indian economic statistics. The statistics of other countries cited by the author are specially interesting because of the comparative method introduced. Certainly the economic equations calculated by Sarkar give a clear picture of India's economic position in the perspective of the countries compared with." (**Prof. Wehrle**).

Prof. Andre Siegfried (Paris): "In the chapters consecrated to capitalism in Bengal and rationalization in Indian industry are discussed the questions of mighty interest and I rejoice to study them under your direction."

F. W. Pethick-Lawrence M.P. (London): "It contains much valuable information."

President F. Zahn, Bavarian Institute of Statistics (Munich): "The book continues in a meritorious manner the previous world-economic investigations of the author. The linking up of Indian economic and social problems with the international developments indicates enduring influences as much on Western economy and culture as on India. The studies on European economic management and legislation will be valuable for Indian economic policy."

Allgemeines Statistisches Archiv (Jena): "The studies lying before me embody mostly the results of the economic investigations in Central, Southern and Eastern Europe which brought the author into contact, among others, with the representatives of national and international, official, academic and private statistics. In Germany he became known not only because of his public lectures and publications but specially because of the regular Guest-lectures at the *Technische Hochschule* (Technological University) of Munich.

"These essays on diverse fields of European and Indian economic life are mixed up in kaleidoscopic succession, being held together by the thought of promoting Indian economic policy. This is attempted in the study of the manner in which foreign insurance societies are controlled in Europe as well as of the currency and banking theories of the *Reichsbank* and the *Banque de France*. The latter investigations are of especial interest because of the proposed establishment of a Reserve Bank of India.

"In other chapters are described the economic developments in India as mirrored forth in the general trade and railway traffic as well as in the bank capitalism of Young Bengal. They show that India finds herself to-day in the conditions of the "first industrial revolution" such as consummated itself in England about 1785-1848 and in Germany and France about 1830-75. Consequently, as another chapter indicates, there are to be found in India nothing more than the traces of rationalization, which, according to Sarkar, is the important characteristic of the "second industrial revolution."

"Finally, the author deals with the relations between the regions of the "first and the second industrial revolutions" in

the world crisis of 1929-32. The export of capital and instruments of production from industrial adults to undeveloped regions is considered by him to be the foundation of a real world-economy. *In his theory that the industrialization of the undeveloped* is likely but to compel the adults to embark upon the specialization in quality-goods and reorganization of their industrial structure we find Zahn's idea corroborated.

"Plenty of statistical data are utilized by the author with the object of furnishing secure foundations for Indian economic statesmanship. His observations and conclusions in regard to the comparability of international statistics (p. 199), American statistics (p. 136), international bank satistics (p. 154), commercial (p. 293), railway (p. 168) and unemployment (p. 263) statistics, the interpretation of statistical data (pp. 158, 209) etc. *show that the author before making use of the figures has* taken care to examine their dependability and significance. It is because of this caution coupled with an international and synthetic survey of economic events that he has been able to offer a judgment on the topics in question that is faultless both in theory and economic policy." (**Prof. Henninger**).

American Economic Review: "Prof. Sarkar, a well known Indian scholar, endeavours to determine a proper economic policy for India. It would be a great mistake, he concludes, for his country to adopt the methods or machinery of contemporary Western Europe or the U.S., for they are in an advanced stage of industrial development, while India is only emerging from the handicraft stage. If Western methods must be found they should be sought in the Balkans, in Spain or in other countries now entering upon modern industrialism. There is something reminiscent of List's stages of economic development in Prof. Sarkar's position. That the industrialization of India has not proceeded very far is shown by the essentially primitive conditions in native banking, railways and insurance. Although traces of rationalization, the outstanding feature of modern American industrialism, are to be found in the cotton mills, the iron, the hydro-electric and oil industries, this movement in India is still largely exotic. The author believes

that fresh significance will be given to the study of economic organization and societal structure if the relationships between the regions of the "second" Industrial Revolution (England, France, Germany and the U.S.A.) and those now entering upon their first Industrial Revolution (India, China, the Balkans, South America etc.) are fully understood. He concludes that the standards of living in Western Europe and the U.S.A. can be raised only to the extent of a simultaneous development in the industrially less developed countries (India, China, Balkans, South America etc.)." (**Prof. Bogart**).

Prof. Toennies (Kiel): "Your observations are instructive. You are entirely right when you say in conclusion that the world-economic depression through which we have been passing appears to be but a station in the transition of entire mankind to a somewhat higher level of life and thought."

ECONOMIC DEVELOPMENT

Pages 464. Price Rs. 8/-

Sociological Review (London): "To the general student of economics this treatment should be suggestive; indeed at its best it is exemplary. This book is of interest to us Westerns on its own merits of extensive knowledge of us; as well as for its presentment of Indian outlook beyond those commonly current." **(Prof. Patrick Geddes).**

Technik und Wirtschaft (Berlin): "A most highly substantial work of the well known Indian scholar. * * * clearly written as well as rich in dependable materials for reference. * * * Of considerable use even to critical European theorists and practical men. * * * The technical side of the latest developments has also been plentifully exhibited." (**Prof. Hashagen**).

Bombay Chronicle: "We are in full agreement with the author's diagnosis of the disease and we approve of the prescription suggested. * * * S. divides the population of India into

eight groups and discusses with great ability the methods to increase their respective incomes."

Searchlight (Patna): "Perhaps a pioneer work * * * bears eloquent testimony to the deep and intelligent study of world movements in commerce, economic legislation, industrialism and technical education."

THE POLITICAL PHILOSOPHIES SINCE 1905

Pages 404. Price Rs. 4/-

Prof. Ernest Barker (Cambridge, Oxford and London): "Of genuine service to students in directing their attention to the scope of literature in our subject during the last quarter of a century. * * * I have found it singularly useful. What amazes me is the way in which you have kept abreast of all the most recent literature and sought to master its contents. You have put all who are interested in political philosophy under a great debt and I am glad to acknowledge myself, as I do most sincerely, your grateful debtor."

Prof. L. T. Hobhouse (London): "It is quite a useful book of reference and the different problems of arrangement are skilfully handled."

Prof. O. Spann (Vienna): "This extraordinarily comprehensive book arrested my special attention. * * * A splendid performance."

Geopolitik (Berlin): "Is surely to be appreciated by many because of its excellent review of Young Asia's intellectual life and its interpretations of Western political philosophy. * * * A complete man fully equipped with all preparatory work and qualified not only to see, touch and compile but also to penetrate, to examine and to feel stays behind the work." **(Prof. Karl Haushofer).**

Prof. Bougle (Paris): "A well-prepared survey calculated to render the greatest services."

Prof. Sorokin (Harvard): "Valuable, informing and stimulating in many ways."

Journal of Indian History: "The author has brought to bear all the resources of his scholarship in a variety of European languages. He has tried with success to be just to the views he expounds"

NAYA BANGLAR GODA-PATTAN

(*The Foundations of A New Bengal: Economic and Social*)

A Work in Bengali in Two Volumes

Vol. I. Theoretical

Pages 530. . Rs. 2-8-0

Principal Contents: The Beginnings of a New World. Banking and National Welfare. Sickness, Accident and Invalidity Insurance. New Tendencies in Land Legislation. New Democracy in the Works Councils. Vocational Education. The Economics of Modern Womanhood. Council and Assembly Election Expenses. The Hindu-Moslem Pact as an Economic Convention. The Economic Interpretation of History. The Writings of Engels and Lafargue. The Impact of China, Japan and Eur-America on Societal Reconstruction in Bengal.

Fifteen Illustrations

Vol. II. Practical

Pages 450. Rs. 2/-

Principal Contents: The Fields of Activity for Young Bengal. The Tools and Implements of Economic Welfare. The *Transformations in* Economics. The Home and the World in *Bengali Economic and Social* Studies. The Next Stage in Bengal's Economic Evolution. The Bengali in World-Economy. Socio-Economic Changes in Bengal. The Foundations and Methods of Economic Statesmanship.

BADTIR PATHE BANGALI

(*Bengalis in Progress*)

A Work in Bengali

Pages 636. Fortyfive Illustrations. Rs. 3-8-0

Principal Contents. Indices of Progress: Economic and Social. These Seven Years of Economic Transformation. Bengali Banking. Labour Force and National Welfare. The Thousand-handed Bengali People. The Coefficients of Railway Expansion at Home and Abroad. The Eighteen-Penny Rupee. The Demographic Statistics of the Bengalis. The Cultivator, the Middle-class and the Landholder in the Bengali Economy.

EKALER DHANA-DAULAT O ARTHA-SHASTRA

(*The Wealth and Economics of Our Own Times*)

A Work in Bengali in Two Volumes

Vol. I.

The Diverse Forms of New Wealth

Pages 440. Rs. 2-4-0

Contents: Machinery, Engineering and Industrial Research. The New Regulations in Land Policy. Housing Problems. The Milk Question. The Household and Womanhood of Today. The Trends in Labour Legislation and Workingmen's Movements. Exports and Imports of Population, Capital and Goods. The Finance, Risks and Administration of Banks. Currency Reform. Gold Standard and Reserve Banking. The New Tariff Policy of the United Kingdom. Types of State Aid. The British Finance of Today and Yesterday. Cartels and Trusts in Industry and Commerce. The Banking Experiences of Young Bengal. Economic and Societal Planning for India. The Epoch of the "Second Industrial Revolution."

Vol. II.

The New Foundations of Economics

Pages 710. Fortyone Illustrations. Price Rs. 4.

Contents: What is Rational Economics? Statistics *vs.* Mathematical Economics. Divisia's *Economie Rationnelle.* Chips of Economic History. Specimens of Economic Thought. Gonnard. Niceforo. Oppenheimer. Ansiaux. The Theories of Production. The Crisis. Rural Economics and the Farmer. Hainisch. Agriculture in Russia. Studensky's Researches. French investigations *in Agriculture. Population Problems and Population Science.* Mathematical Demography. Dublin. The Eugenic Standpoint. Eugen Fischer. Zahn. Burgdoerfer. Kuczynski. Housing. Labour and Wages. High Wages. Labour-India through German Eyes.

Exchange of Goods. Export and Import of Capital. The Theory of International Trade. Cabiati. The Rationing of Raw Materials and Foodstuffs. Currency Questions. The Return to Gold. Oualid. The Quantitative Theory as criticised by Rueff. German Banking Abroad. Concentration in British Banking. Branch Banking in America. Japanese Banks. Insurance Past and Present. Alfred Manes. Social Insurance Problems in America. Epstein. Public Finance. Income Tax in England and Germany. The Economic Organization of the Soviet Regime in Russia. The Five-Year Plan and After.

French and Italian Economic Journals: *Revue d'Economie Politique, Revue Internationale du Travail* (Genève), *Journal des Economistes, Bulletin de la Société d'Economie Politique de Paris, Journal du Commerce, Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, Rivista Internazionale di Scienze Sociali, Gerarchia.* American, Japanese and British Economic Journals: *American Economic Review, Bankers' Magazine, Federal Reserve Bulletin, Journal of the Economic Society of the Kyoto University, Oriental Economist* (Tokyo), *The Economic Journal* (London). *Barclays Bank Ltd. Monthly Review, Population* (London). Economic Journals in Germany: *Schmollers Jahrbuch, Jahrbuecher fuer*

Nationaloekonomie und Statistik, Weltwirtschaftliches Archiv, Geopolitik, R.T.A. Nachrichten, Technik und Wirtschaft, Allgemeines Statistisches Archiv. (Pp. 193-276).

The League of Nations in Economics. The World-Economic Depression. Balances of Accounts. Health and Economic Welfare. The World Crisis and Recovery. The Statistics of Unemployment. The "Second Industrial Revolution." Economic Planing in Eur-America. Socialism, Capitalism and National Welfare. Owen, St. Simon and Karl Marx. Syndicalism. State-Socialism. Bismarck. Guild Socialism. Fabians. Fascism. National-Socialism. Wanted Anglo-German Labour Welfare in India. Bengali Cultivators and Agricultural Labourers. Capitalism in Bengal.

Types of Economists (pp. 370-607). The Marginal Utility of von Wieser. The Mathematical Economics of Walras. The Economic Freedom of Cassel.

Pantaleoni and Pareto. Carli on Crises. The *Bonifica* Economists of Italy. Jandolo. Serpieri. Graziani. Tivaroni. Virgilii. Benini. Gini. Pietra. Mortara.

The Economists of *Laissez Faire*. Truchy. Yves-Guyot. R. G. Levy. The Bank-Economists of France. St. Genis the Agricultural Economist. Godferneaux the Railway Economist. French Population Economists. Boverat. Vieuille. Richard. Huber. Marsal. Bousquet. In the Workshops of French Economists. Hauser. Heni Sée. Levasseur. Gide. Rist. Aftalion. Colson. Brouilhet.

Max Sering the Economist of Internal Colonizing. Adolf Weber. Karl Diehl. Exponents of World-Economy. Harms. Schilder. Waltershausen. Schumacher. In German Economic Laboratories. Waffenschmidt. Beckerat. Sombart. Strieder. Buecher. Mombert. Damaschke. Roscher, Schmoller and Sombart *vs.* Classics, Menger and Schumpeter. The Crisis-Economist Wagemann. The Adam Mueller School and National-Socialist Economics. Fichte. Thuenen. List. Spann. Baxa.

American Tendencies in Economics. Walker. Fisher. Dublin. John Bates Clark. Seligman. Institutional Economics. Mitchell. The Sociologist of Economic Problems, Sorokin.

British Welfare Economists. Pethick-Lawrence. Pigou. Hobson. Income-Economist Bowley. Keynes's Sublimated Capi-

talism. Marshall's Value-Economics. Cannan the Economist of Progress.

The Japanese Economists. Ohuchi on Public Finance. Uyeda's Population Studies. Takahashi's Interpretation of Social Dumping.

Bengali *vs.* Non-Bengali Economic Thought in India. The General Characteristics of Indian Economists. *Economic Development.* The "Equations" of Comparative Industrialism. Ranade. Romesh Dutt. Satis Mukherjee. Ambika Ukil. The Successors of Kautalya, Shukra, Abul Fazl and Rammohun. The Methodology of Research Initiated by the *Arthik Unnati* (Economic Progress) Monthly. Economic Curves. Objectivity. World-Economy. Fisher's Monetary Laboratory. Taussig's Tariff Studies. The Crisis Institutes of Harvard and Berlin.

Appendices. The Problem of Technical Terms in Bengali Economics. The Establishment of the *Bangiya Dhana-Vijnan Parishat* (Bengali Institute of Economics) 1928. The Topics of Study and Economic Policy of the B.I.E. The Policy of Protection for Bengali Literature with reference to Economics.

Illustrations

1. Adam Smith. 2. Fichte. 3. Ricardo. 4. Rammohun Roy. 5. Adam Mueller. 6. Von Thuenen. 7. List 8. Ranade. 9. Marshall. 10. Gide. 11. Pareto. 12. Romesh Dutt. 13. Raphael-Georges Levy. 14. Pantaleoni. 15. Ambika Ukil. 16. Truchy. 17. Hauser. 18. Gini. 19. Graziani. 20. Niceforo. 21. Tivaroni. 22. Pietra. 23. Taussig. 24. Seligman. 25. Irving Fisher. 26. Dublin. 27. Sorokin. 28. Diehl. 29. Zahn. 30 Burgdoerfer. 31. Mombert. 32. Schumacher. 33. Manes. 34. Karl Haushofer. 35. Eugen Fischer. 36. Hainisch. 37. Spann. 38. Cassel. 39. Teijiro Uyeda. 40. International Congress for the Study of Population (Rome, September 1931). 41. *Bangiya Dhana-Vijnan Parishat* (Bengali Institute of Economics) (Calcutta, December 1933).